জয়যাত্রা
দেব
সাহিত্য
কুটীর
GUARANTEED
B. Roy

প্রকাশ করেছেন—
অরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিঃ
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলকাতা—৯

প্রথম মুদ্রণ—
শুভমহালয়া, ১৩৬৩

পুনর্মুদ্রণ—
মহালয়া, ১৪০৮
৩

ছবি এঁকেছেন—
প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বলাইবন্ধু রায়
সমর দে
শৈল চক্রবর্ত্তী
নবনীতা ঘোষ

ছেপেছেন—
বরুণচন্দ্র মজুমদার
বি. পি. এমস্ প্রিন্টিং প্রেস
দেশবন্ধুনগর, রঘুনাথপুর
২৪ পরগনা ( উত্তর )

দাম—
৯০·০০

# লেখক-লেখিকার সূচী

## সূচীপত্র

## সংস্কৃত-সাহিত্যের কাহিনী



## মণি ও মুক্তা

# আমাদের কথা

পুরাকালে আমাদের দেশে রাজারা শরৎকালে জয়-যাত্রায় বেরুতেন।

বর্ষায় তাঁরা অভিযানের আয়োজন করতেন, অপেক্ষা করে থাকতেন বৃষ্টিহীন শরতের নীল মেঘের জন্যে। শরতের আকাশ সুনীল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা জয়-যাত্রায় বেরুতেন।

ভারতে শরৎ হলো তাই জয়-যাত্রার ঋতু।

তাই এবার শরতে জয়-যাত্রায় তোমাদের করছি আহ্বান। বেদনায়, আঘাতে, অপঘাতে বাংলার প্রাণ এসেছিল শুকিয়ে, ম্লান মন্থর হয়ে এসেছিল বাঙালীর প্রাণের স্পন্দন। আবার ধীরে ধীরে তা উঠছে জেগে, জেগে উঠছে বাঙালীর সাহিত্য নতুন প্রাণে, নতুন স্পন্দনে। সমস্ত ব্যথা, সমস্ত বেদনা, সমস্ত লাঞ্ছনার ভেতর থেকে আবার জেগে উঠছে জয়-যাত্রার নব রাগিণী, নতুন আশার আশাবরী।

আজ শরতের নীল মেঘে, বাংলার কিশোর-কিশোরীর মন আবার উঠুক জেগে, জেগে উঠুক শরতের সোনালী আশায়।

বৃষ্টি-ধোয়া স্বচ্ছ নীল আকাশ, সে-আকাশের ছায়া পড়ুক তোমাদের নয়নে, মনে,—

নীল আকাশের বুকে উথলে উঠছে ফুটন্ত দুধের মতন শাদা শাদা মেঘ, ভেসে চলেছে ভারহীন ছন্দে,—তেমনি ভারহীন ছন্দে ভেসে চলুক শুভ্র সংকল্পের মেঘ, নবীন আশার মেঘ, নব নব আনন্দের মেঘ, ভেসে চলুক প্রত্যেক কিশোর-কিশোরীর মনে,—

মাঠে আজ সবুজ ধান, নদীতে আজ থৈ-থৈ নীল নীর, আকাশে ছড়ানো আজ মায়ের হাসি, বিশ্ব-মায়ের হাসি,—

মনেতে লাগুক সেই সবুজের ছোঁয়া, দেহেতে জেগে উঠুক নদীর নীল আবেগ, জীবনে জীবনে আলোর মত ঝরে পড়ুক মায়ের হাসি, বিশ্ব-মায়ের হাসি,—

বিশ্ব-মায়ের আশীর্বাদে বাঙালী আবার চলুক, এগিয়ে চলুক, দিকে-দিগন্তরে নব-নব জয়যাত্রায়...

বন্দে মাতরম্

# অভিলাষ

## স্বর্ণকুমারী দেবী

আজি এ মাধবী রাতে
মলয় মদির পান অধীর চাঁদিনী বিধুরাভাতে !
তারা দুটি হাসে নীল অম্বরে,
বৌকথাকও কাননে কুহরে,
রজনীগন্ধা সারাটি সন্ধ্যা আপনা গন্ধে শিহরে ।
তালপত্র বীথি গাহি মন্দ্রগীতি, কুহক নৃত্যে মাতে ।
বসন্তে বিকাশি নব মধুরিমা
এস বঁধু মোর বাসন্তী প্রতিমা
চকিতে চপল ভঙ্গীতে ।
এস, ফুল্ল ললিত লতাটির সম,
তিয়াষিত বাহুবন্ধনে মম,
ছড়ায়ে কুন্তল বাস মনোরম
ভূষণ শিঞ্জন সাথে ;
আমি, প্রেমের স্বপন আঁকিব যতনে
তোমার অধর-কোরকপাতে ॥

---

* স্বর্ণকুমারী দেবীর অপ্রকাশিত কবিতা।

# জয়যাত্রা

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শুভ কর্ম্মপথে ধর নির্ভয় গান
সব দুর্ব্বল সংশয় হোক অবসান।
চির শক্তির নির্ঝর নিত্য ঝরে,—
লও সেই অভিষেক ললাট-'পরে।

তব জাগ্রত নির্ম্মল নূতন প্রাণ
ত্যাগ ব্রতে নিক দীক্ষা—
বিঘ্ন হ'তে নিক শিক্ষা
নিষ্ঠুর সঙ্কট দিক সম্মান,
দুঃখ হোক তব বিত্ত মহান্ ।।
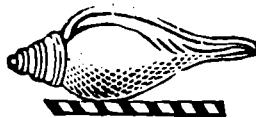
# নিরাপদ

## অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'এই তোর বোতাম লাগাবার ছিরি?'

'কেন, কি হয়েছে!'

'কি হয়েছে মানে? এই ছোট ঘরের জন্যে এত বড় বোতাম?'

নিরাপদ একবার আড়চোখে দেখল রঞ্জনকে। রঞ্জন ট্রাউজার পরে কোমরের বোতাম আঁটছে। কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছে না। ঘরের মধ্যে কিছুতেই ঢোকাতে পারছে না বোতামটা।

'তোর এটুকু সামান্য বুদ্ধি নেই? প্যান্টে তুই কোটের বোতাম লাগিয়েছিস?'

হাতের কাজ ফেলে সাহায্য করতে এল নিরাপদ। রঞ্জন দু'হাত ছেড়ে দিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়াল। নিরাপদ ট্রাউজারের মুখের দু'প্রান্ত টেনে ধরে ঘরের মধ্যে বোতাম ঢোকাবার চেষ্টা করতে লাগল প্রাণপণে। ঘর আসে তো বোতাম ফসকায়, বোতাম আসে তো ঘর মুখ বুজে থাকে।

অসম্ভব।

দু'হাত শূন্যে তুলে ধরল রঞ্জন। এতে যদি নিরাপদ আরো কর্তৃত্ব আরো স্বাধীনতা পায়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়।

গলদঘর্ম হতে-হতে নিরাপদ বললে, 'আপনি বাবু মোটা হয়ে পড়েছেন।'

'আমি মোটা হয়ে পড়েছি! কথা বলার কি ছিরি! লোকে বরং বলে প্যান্টটা ছোট হয়ে গিয়েছে।' গা-জ্বলা গলায় রঞ্জন বললে।

'ও একই কথা। কতদিন পরে ট্রাঙ্ক থেকে এই বালিশের খোলটা বেরুল বলুন তো।' আরেকবার হস্তদন্ত চেষ্টা করল নিরাপদ।

'যতদিন পরেই বেরুক না, তোর কি।'

'আমার আবার কি। আমার এই হায়রানি। একবার বোতাম লাগাও তারপর আবার পরিয়ে দাও।'

'নে, নে, খুব হয়েছে। একটা দড়ি নিয়ে আয়! যেমন চট মুড়ে বস্তা বাঁধে তেমনি করে বাঁধ্ কোমরটাকে।'

তা ছাড়া গত্যন্তর নেই। হাত ছেড়ে দিল নিরাপদ। বললে, 'তাই ভালো। কোটের নিচে প্যান্টের দড়ি কেউ দেখতে আসবে না।'

কিন্তু চাই বললেই দড়ি জোগাড় করা চারটিখানি কথা নয়। শুধু নিরাপদ বলেই তা সম্ভব। কবেকার কোন প্যাকেটের সঙ্গে দোকান থেকে একটা নীল রঙের দড়ি এসেছিল সেইটেই সে সযত্নে তুলে রেখেছিল। সেইটে এনে এখন সে হাজির করলে। মুরুব্বির মতন বললে, 'কোনো জিনিসই তুচ্ছ নয়। কখন যে কি কাজে লাগে কেউ বলতে পারে না।'

'এই দড়ি!' তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল রঞ্জন : 'এ দড়ি আমার কোমরে না বেঁধে গলায় জড়িয়ে দে।'

দড়ির আবার জাতগোত্র কি। বিশেষতঃ যে দড়ি প্রচ্ছন্ন থাকবে। এমনি কত কিছুই তো লুকিয়ে রেখে বাইরে ঠিকঠাক থাকবার চেষ্টা। দড়ির বেলায় ব্যতিক্রম কেন!

আরেকটা দড়ির সন্ধানে ছুটতে যাচ্ছিল নিরাপদ, রঞ্জন ধমকে উঠল : 'নে, এটাই বেঁধে দে। দেরি করবার সময় নেই। সাড়ে দশটায় ইন্টারভিয়ু।'

নীল দড়িটাই নির্লিপ্ত মুখে বেঁধে দিতে লাগল নিরাপদ।

জুতো পরতে গিয়ে আবার খেপে উঠল রঞ্জন : 'এ কি করেছিস হতভাগা? ব্রাউন জুতোয় ডার্কট্যান কালি লাগিয়েছিস?'

হাঁ হয়ে রইল নিরাপদ।

মাথায় করাত চালিয়েও ব্যাপারটা বোঝানো গেল না। এই জিব-ওলা জুতোটা এতদিন পরে আলনার তলা থেকে বেরিয়ে এসে অন্য রকম খোরাক চাইবে? রঞ্জন আর নিরাপদ কি এ বাড়িতে দু'রকম খাবার খায়?

'যা না সাহেবের বাড়িতে, দ্যাখনা তোকে কি খেতে দেয়!'

পায়ের তলায় বসে পড়ে জুতোর ফিতে বেঁধে দিতে দিতে নিরাপদ বললে, 'আপনার জুতোর দিকে কে চাইবে?'

'তুই একটা আকাট। কাঁকলাশের মত এক নজরে আপাদমস্তক দেখে নেয়, শুষে নেয়। সে যে কি চাউনি জানিস না। কোথাও এতটুকু খুঁত থাকলে, চেহারায় কি পোশাকে, গালে দাড়ির একটা খোঁচা, নখের কোণে একটু মাটি, জামার ভাঁজ বা জুতোর ছেঁড়া—এক চক্ষে বাতিল।'

'যাতে চোখে সুনজর আসে তা আমি করে দেব।' হাঁপিয়ে পড়েছিল রঞ্জন, তাকে পাখার হাওয়া করতে করতে নিরাপদ বললে। 'আপনি একটুও ভাববেন না।'

● নিরাপদ
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'তুই মন্ত্র জানিস?'

ফিকফিক করে হাসতে লাগল নিরাপদ।

বেরুবে, দরজার সামনে নিরাপদ কখন একটা জলে-ভর্তি ঘট এনে রেখেছে। কোত্থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে এনে জল ছিটোতে-ছিটোতে বিড়-বিড় করে মন্ত্র আওড়াতে লাগল : 'রথে তু বামনং দৃষ্টা—'

'সে কি রে ইডিয়ট? এ যে পুনর্জন্ম না হবার মন্ত্র।'

এক গাল হেসে নিরাপদ বললে, 'মন্ত্র একটা হলেই হল।'

সন্ধের পর পাতা বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে রঞ্জন আর তার পাশে দাঁড়িয়ে পাখার হাওয়া করছে নিরাপদ।

রঞ্জন বললে, 'চাকরিটা হল না। আরো যারা উমেদার এসেছিল তারা আমার চেয়ে ঢের বেশি ফিটফাট, ঢের বেশি তাদের সাজগোজ। ছুরির ধারের মত পেন্টালুনের ক্রিজ, আয়নার মত ঝকঝকে জুতো। তার মানে, বুঝতেই পাচ্ছিস, তাদের চাকর আমার চাকরের চাইতে কত ভালো।'

'কি করবেন বাবু! যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে।' কি রকম সুরে যেন কথাটা বললে নিরাপদ।

'তার মানে, তোর অদৃষ্ট খারাপ বলেই আমার মতন বাজে-মার্কা মুনিব পেয়েছিস! যা, হতভাগা, এক্ষুনি বেরিয়ে যা বাড়ি ছেড়ে—'

মুখে বললেই তো আর জগৎ রসাতলে যায় না। পাখা ছেড়ে এবার পা নিয়ে বসল নিরাপদ।

'চাকরি করতে যাওয়া মানেই চাকর হওয়া। তা আমার নিজের চাকরই যখন রদ্দি, ওয়ার্থলেস, তখন আমাকে আর কে চাকর রাখবে বল? ওরা বললে, এই যখন তোমার চাকরের নমুনা, তখন তুমি তার চেয়ে আর কোন ছিরির হবে! তাই দেখছিস তোর জন্যেই আমার কিছু হল না।'

'কি হবে আপনার চাকরি করে?'

'কি হবে মানে?' রঞ্জন প্রসারিত পা-টা চট করে গুটিয়ে নিল।

'এই তো দিব্যি খাচ্ছেন দাচ্ছেন বেড়াচ্ছেন।'

'খাচ্ছি দাচ্ছি বেড়াচ্ছি? বাড়ি ভাড়া দিতে হবে না? চাল ডাল তেল নুন? তোর মাইনে?'

'যখন-যেমন-পাচ্ছেন যেমন দিচ্ছেন তেমনি দেবেন।'

'তার মানে একটা ছন্নছাড়ার মতনই আমার দিন যাবে? আমি অবস্থার উন্নতি করব না?' শোয়া ছেড়ে রঞ্জন উঠে বসল : 'তুই তোর উন্নতি চাস না বলে আমাকেও এমনি জীবনের নিচের তলায় এঁদো অন্ধকারে সিঁড়ির নিচেই থাকতে হবে?'

পা সরে গিয়েছে তাই আবার পাখা তুলে নিল নিরাপদ। দার্শনিকের মত মুখ করে বললে, 'কিন্তু বাবু উন্নতি হলেই অশান্তি।'

কথাটা খুব মিথ্যে বলেনি নিরাপদ। রঞ্জন আবার গা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। এমনি ওষুধের

অর্ডার সাপ্লায়ারি কাজ করছে, ছুটো খুচরা কাজ, এর থেকে মোটা রোজগার কিছু নেই বটে কিন্তু ইচ্ছেমতো ঘোরো-ফেরো, ইচ্ছেমতো শুয়ে-বসে থাকো। কোনো কিছু বাঁধাধরা নেই, দশটা-পাঁচটা নেই, দায়-দায়িত্ব নেই। এই স্বাধীন ব্যবসা ছেড়ে কোনো কেমিক্যাল ফার্মে মোটা মাইনের কাজ নেওয়ার মধ্যে ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা বেশি, কে না জানে, কিন্তু তাতে ও বলবার কে!

'তার মানে তোর শান্তির জন্যে আমাকে এমনি ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে? দাঁড়া না, একটা চাকরি জোগাড় করি আগে, তারপর তোকে ডিসমিস করে দেব।'

'কত বছর ধরেই তো চেষ্টা করছেন।' পাখা ছেড়ে আবার পা নিয়ে বসল নিরাপদ। আঙুলগুলো টেনে দিতে লাগল।

'তুই লেগে আছিস বলেই তো আমার কিছু হচ্ছে না। তুই অপয়া, অনামুখো। কিন্তু মানুষের সব দিন সমান যায় না। একটা-না-একটা একদিন এসে জুটবেই। তখন উর্দি-পরা আর্দালি হবে, বাবুর্চি হবে,—আর তুই, ষাঁড়ের গোবর, তুই নিকাল যাবি।'

উঠে পড়ল নিরাপদ।

কবে গাঁয়ে আকাল হলে ছিটকে এসে পড়েছিল, সেই থেকে লেগে আছে। একটা তেতলা বাড়ির একতলার দুখানা ঘর নিয়ে একটা ফালি, সেখানেই রঞ্জনের ডেরা। সংসারে সে একা আর সর্বকর্মের গোঁসাই এই চাকর। দেশে-গাঁয়ে কে আছে না জানি রঞ্জনের, পিসি না খুড়ি, বাড়তি আয় হলে তাকে কিছু পাঠায় কালেভদ্রে। নতুবা সে একাই এক সহস্র। একা কাঁদে একা হাসে একাই স্বপ্ন দেখে। থাকবার মধ্যে আছে এই ঘেটের বাছা ষষ্ঠীদাস। ইস্তক জুতো সেলাই নাগাদ চণ্ডী পাঠ সব কাজের ওস্তাগর।

ছোট গ্লাশে করে রঞ্জনকে ওষুধ দিচ্ছে নিরাপদ।

'কাশি আজ আর নেই। খাবনা ওষুধ।'

'ডাক্তার বলে গিয়েছে কাশি সেরে গেলেও দিন কতক ওষুধটা চালিয়ে যেতে।' নিরাপদের মুখে পরম নিশ্চিন্ত ভাব।

'এখন থাক। রাতে খাওয়ার পর খাব'খন।'

'তখন তো আরেকটা ওষুধ, সেই পিলটা—' ওষুধের গ্লাশটা বাড়িয়ে ধরল নিরাপদ ঃ 'যতই আপনার বয়-বাবুর্চি বা আর্দালি-চাপরাশি আসুক কেউই নিরাপদ নয়।'

ওষুধটা এক ঢোঁকে খেয়ে ফেলে রঞ্জন বললে, 'কিন্তু কেউই তোর মত ভূত হবে না। ভূত না হ'লে তুই ও কথা বলিস যে আমার উন্নতি না হোক, আমার ঠাট-বাট না বাড়ুক, তোকে নিয়েই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিই। কোথাকার উড়ো খই গোবিন্দায় নমো হয়ে এসেছিস, তোর ইচ্ছে গোবিন্দ আর কোনো প্রসাদ না পাক। ঐ খই খেয়েই তোর হাতের পোড়াঝোরা রান্না খেয়েই তার দিন কাটুক।'

'আপনার উন্নতি হলে আমার উন্নতি কোথায়?'

'তোর উন্নতি রাস্তায়, নর্দমায়, আঁস্তাকুড়ে—'

● নিরাপদ
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

খাবার তদারক করতে গেছে নিরাপদ। কোন কাজটা না করে দিচ্ছে সে। দাঁত খোঁচাবার খড়কেটি পর্যন্ত হাতের কাছে এগিয়ে ধরছে। তারপর শুলে-বসলে ফাঁকা হাতে পাখার বাতাস করছে পাশে দাঁড়িয়ে। ঘুমিয়ে পড়লে মশারি গুঁজে দিচ্ছে। ঘুম থেকে উঠতেই এগিয়ে দিচ্ছে স্যাণ্ডেলজোড়া। কোন কাজটা না হচ্ছে শুনি! দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম পর্যন্ত ধুয়ে দিচ্ছে। কাঁচের গ্লাশে ঘষে ধারালো করে দিচ্ছে পুরোনো ব্লেড।

ওযুধটা এক ঢোকে খেয়ে ফেলে রঞ্জন......

দোষের মধ্যে, জেল্লা নেই, চেকনাই নেই। একটু গেঁতো, একটু বুদ্ধি-কম। মাঝে-মাঝে ভুলে যায়, ভুল করে বসে। এখানকার জিনিস ওখানে রাখে। বাজার থেকে ঠকে আসে। এক টাকা ভেবে কখনো দু'টাকার নোট দিয়ে দেয়। গ্লাশটা-কুঁজোটা হাতের বেকায়দায় ভেঙে ফেলে।

কিন্তু কেবল বাইরেটাই দেখবে, মন দেখবে না?

এবার যেটা ইণ্টারভিয়ু এসেছে সেটা বিদেশে। বাঙলা দেশের বাইরে।

'কবে যেতে হবে?' পাখা হাতে ছুটে এল নিরাপদ।

'দিন সাতেকের মধ্যেই। এবারের চাকরিটা পেয়ে যাব বলেই মনে হচ্ছে। লিখেছে আসছে মাসের গোড়াতেই জয়েন করতে পারব কিনা।'

'কোথায়?'

'মধ্যপ্রদেশে।'

সে না জানি কোথায় এমনি একখানা লেপা উনুনের মত মুখ করে রইল নিরাপদ। ঢোক গিলে জিগগেস করলে, 'কত মাইনে দেবে?'

- নিরাপদ
  অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'তাতে তোর কি মাথাব্যথা? চাকরি হলে তোকে তো আর সেখানে নিয়ে যাবনা।'

নিরাপদ চোখ নামিয়ে রইল।

'তোকে এখানেই একটা জোগাড়যন্ত্র করে নিতে হবে।' গম্ভীর গলায় রঞ্জন বললে, 'কিন্তু তোর কিই বা জুটবে? ঝাঁকামুটে? সে রকম গায়ে শক্তি কই? বরং তোকে কিছু দিয়ে যাব, তুই শিশিবোতলওলা হয়ে যাস।'

এক বাটি গরম দুধ নিয়ে এল নিরাপদ। শান্তমুখে বললে, 'এ কদিন আর টইটই করবেন না। খুব ঠেসে বিশ্রাম নিন। আর বেশ ভালো খাওয়া-দাওয়া করুন। চেহারায় একটু চেকনাই ফিরলেই ইন্টারভুতে আপনাকে পছন্দ করবে।'

'করলে তোর কি। তোর চেকনাই তো আর ফিরবে না। আর, তোর হাতে যতদিন খাব হাড়ের মাংস ঝরে যাবে।'

'কিন্তু দুধ তো আর আমার রান্না নয়। শুধু জ্বাল দিয়ে এনেছি।'

মুখে ঠেকিয়ে রঞ্জন বললে, 'তোর হাতের জ্বাল, হয়তো পুড়িয়ে ফেলেছিস।'

কাছে দাঁড়িয়ে হাওয়া করতে লাগল নিরাপদ। বললে, 'দুধটা খেয়ে এবার একটু শোন।'

'এখন শোব কি রে! আমার কত কাজ! সব গোছগাছ করে ফেলতে হবে।'

'শুলেই শান্তি।' নিরাপদ বিছানাটা টান করতে লাগল। বললে, 'আমিই সব গোছগাছ করে দিতে পারব। কোন দিন না করেছি! অনেক হাঁটাহাঁটি করে ক্লান্ত হয়ে এসেছেন, এখন একটু বিশ্রাম করুন, আমি হাওয়া করি।'

'মাথা খারাপ!' উঠে পড়ল রঞ্জন। 'আমাকে এখুনি টাকা-পয়সার জোগাড় দেখতে বেরুতে হবে। কোথাও ধারধুর পাই কিনা। তারপর কেনাকাটা, ট্রেনে অন্তত একটা সিট রিজার্ভ করার চেষ্টা—' হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল রঞ্জন।

আবার ফিরতেই এক গ্লাশ চিনির সরবত নিয়ে হাজির হল নিরাপদ। সঙ্গে সেই পাখা।

সরবত খেতে খেতে রঞ্জন বললে, 'যা যা ময়লা দেখছিস ডাইং-ক্লিনিং-এ দিয়ে দে। এখনো সময় আছে সেমি-আর্জেন্টের। বিছানার চাদরটা না হয় দুদিন আগে আর্জেন্ট দিয়ে দিবি। আর শু-জুতোটাতে একটা হাফসোল লাগাতে হবে—'

'আমি সব ঠিক করে রাখব।'

'বেশি টাকা পয়সা জোগাড় হল না। আমি আগে যাই। প্রাইভেটে খবর পেয়েছি আমাকেই নাকি নেবে। যদি নেয়, একেবারে জয়েন করে দু'দিনের ছুটি নিয়ে এসে বাকি জিনিসপত্তর সব নিয়ে যাব।'

'আর আমি?'

'তুই কি জিনিসপত্তর! তোকে নেব কোথায়?'

হাতে পাখাটা কি একবার কেঁপে উঠল নিরাপদর?

● নিরাপদ
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

স্বরে একটু মমতা মিশিয়ে রঞ্জন বললে, 'সেই অচেনা দেশে গিয়ে তুই করবি কি? তোর মন বসবে না। তুই এখানেই একটা কাজ-টাজ দেখে নিবি। তবে যে কটা দিন আমি না আসি—'

'ততদিন আমি ঠিক ঘরদোর আগলাব। আপনি ভাববেন না।' চোখের উপর চোখ ফেলতে দিল না নিরাপদ। মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল।

রাত আটটা ক মিনিটে ট্রেন।

শহর ঘুরে রঞ্জনের বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায় সাতটা। সাড়ে সাতটায় না বেরুলেই নয়। তা আধ ঘণ্টার মধ্যেই গোছগাছ করে নিতে পারবে। আর গোছগাছেরই বা আছে কি। একটা ছোট সুটকেসে কয়েকটা কাপড়-জামা আর দূরের রাস্তা বলে সামান্য একটা বিছানা। নিরাপদ এখন রান্না করে রাখলে হয়।

'কি রে, তোর তৈরি?'

'কখন!' থালা হাতে এসে দাঁড়াল নিরাপদ।

তাড়াতাড়ি সুটকেসটা গুছিয়ে ফেলল রঞ্জন। খেয়ে নিল ঝটপট। রান্না সম্বন্ধে ভালো-মন্দ কিছুই বললনা। আজ চলে যাচ্ছে, কদিন পরে আসে, ফিরে আসেই বা কিনা ঠিক কি, আজ কটূক্তি করতে মায়া করছে। মুখখানি হাসি-হাসি করে রঞ্জন বললে, 'বিছানাটা সতরঞ্চি মুড়ে বেঁধে ফ্যাল—'

'বিছানা?' যেন চমকে উঠল নিরাপদ।

'তা, বিছানা লাগবে বৈকি। রাস্তায় না মেলতে পারি, বিদেশে শুতে হবে তো? তোষক, চাদর, একটা বালিশ—দে, দে, তাড়াতাড়ি জড়িয়ে দে।'

এ কি, বিছানার চাদর কোথায়?

ধনুকের ছিলা যেন ছিঁড়ে গেল এমনি চেঁচিয়ে উঠল রঞ্জন, 'আনিস নি ডাইং-ক্লিনিং থেকে?'

থরথর করে কাঁপতে লাগল নিরাপদ। অস্পষ্ট স্বরে বললে, 'ভুলে গিয়েছি।'

'ভুলে গিয়েছিস মানে? ডিউ ডেট কবে? দেখি রসিদটা।'

'কাল গিয়েছে।' নিরাপদ রসিদ বার করে দেখাল।

'তবে যা, ছোট্। দোকান তো বন্ধ হয়নি। নিয়ে আয় চট করে।'

হতাশের মত মুখ করে নিরাপদ বলল, 'এখন তার সময় কোথায়?'

হাতঘড়ির দিকে তাকাল রঞ্জন। সত্যিই সময় নেই। ভাঁড় আনতে গেলে ষাঁড় পালাবে।

বোমার মত ফেটে পড়ল। যা নয় তাই বলে গালাগাল করতে লাগল। হাত থেকে পাখাটা কেড়ে নিয়ে প্রায় মারতে বাকি। তোকে আবার রাখবে! ছালা বেঁধে যেমন বেরাল তাড়ায় তোকে তেমনি তাড়াব। দেশছাড়া করব। পুলিশে দেব।

তোষক বালিশ সতরঞ্চি সব টান মেরে ফেলে দিয়ে শুধু সুটকেসটা নিয়েই দরজার দিকে এগুলো রঞ্জন।

- নিরাপদ
  অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'যা, তুই এখুনি বাড়ি ছেড়ে চলে যা। তোকে আমার ঘরদোর আগলাতে হবেনা। কী বা সম্পত্তি আমার আছে! আমি বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে চলে যাব। দে একটা তালা দে।'

যাকে তাড়াবে তার. কাছেই আবার তালা চাইছে! কোনো কথাই গায়ে মাখল না নিরাপদ। শুধু বললে, 'একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসি।'

'তুই নিয়ে আসবি? সে ট্যাক্সি কাল ভোরবেলা এসে পৌঁছুবে। বিছানা নেই, রাতের ঘুম তো গেছেই, এখন চাকরিটাও না যায়।'

সদরের কাছে এসে রঞ্জন থমকে দাঁড়াল। জলে-ভরা ঘট পাতা সেখানে। শুধু তাই নয়, ফুলে করে জলের ছিটে দিতে লাগল নিরাপদ। বিড়বিড় করে আওড়াতে লাগল ঃ ব্রহ্মা মুরারি ত্রিপুরান্তকারী—

এত দুঃখেও না হেসে পারলনা রঞ্জন। বললে, 'এ তো ভোরবেলাকার মন্ত্র।'

'আমাদের কাছেই ভোর-সন্ধে, তাঁর কাছে সব সমান।'

হাতে সুটকেস, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল রঞ্জন। গলির মোড়েই ট্যাক্সি পাওয়া গেল। বললে, 'হাওড়া স্টেশন। একটু তাড়াতাড়ি চালাও রেড রোড দিয়ে। ট্রেনটা ধরিয়ে দিতে হবে।'

তোকে আবার রাখবে!

স্ট্র্যাণ্ড রোডে এসে পড়ল প্রায় আট মিনিটে। কিন্তু হাওড়া ব্রিজের মুখের কাছটায় এসে গাড়ি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কি ব্যাপার?'

ব্যাপার অসাধারণ। প্রকাণ্ড ট্র্যাফিক জাম্ হয়ে গিয়েছে।

● নিরাপদ
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কেন?

লরির ড্রাইভাররা লাইটনিং স্ট্রাইক করেছে। বৈদ্যুতিক ধর্মঘট। মানে, আগে কিছু জানান না দিয়ে আচমকা ধর্মঘট করেছে। সব গাড়ি ব্রিজের এমুখ থেকে সুরু করে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের অনেকটা পর্যন্ত আড়াআড়িভাবে ফেলে রেখে সরে পড়েছে। ফলে অন্য গাড়ি পথ পাচ্ছে না। যারা ঢুকে পড়েছিল বেরুতে পাচ্ছে না। তাতে করে আরো তালগোল পাকিয়ে গেছে। সাধ্য নেই এই ব্যূহ ভেদ করে।

কিন্তু কেন, কেন এই ধর্মঘট?

নানা জনে নানা বুলি ছাড়ছে। কেউ বলছে কোন একটা লরি কাকে চাপা দিয়েছে বলে মারপিট হয়েছে তার জন্যে। কেউ বলছে পুলিশ নাকি জুলুম করেছে রাস্তায় তার প্রতিকারে।

আমার এখন প্রতিকার করে কে? রঞ্জন বিশ হাত জলের তলে পড়ল। আমি এখন ওপারে কি করে পৌঁছুই? কি করে ট্রেন ধরি?

ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। একবার তাকাল সামনের দিকে। শুধু ঢেউয়ের পর ঢেউ গাড়ির সমুদ্র।

ঝাঁকে-ঝাঁকে কুলি এসে গিয়েছে এপারের যাত্রীদের মাল নিয়ে যাবে। ওদের তো পৌষমাস। একেকটা বোঝা ধরতে যা দর হাঁকছে তা প্রায় দুটো ট্যাক্সি ভাড়ার সমান।

'মশাই, রিকসাও যাবে না।'

ভাগ্যিস বিছানাটা আনা হয়নি। তাই সুটকেসটা একাই বইতে পারল রঞ্জন। ব্রিজের ফুটপাত ধরে ছুটে এল জোর পায়ে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! ট্রেন কোথায়? ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে।

হাঁপাচ্ছে রঞ্জন। গলদঘর্ম হয়ে গেছে।

পাখা, পাখা কই? চারদিকে তাকাল রঞ্জন। শুধু পথ-খুঁজে-না-পাওয়া মানুষের ঠেলাঠেলি।

আর ট্রেন আছে মশাই রাত্রে? জায়গাটার নাম করল। এ-দোরে ও-দোরে জিগগেস করতে লাগল।

'না। কাল সকাল দশটার আগে আর ট্রেন নেই।'

তবে উপায়?

উপায়, বাড়ি ফিরে যাওয়া। আবার গিয়ে ইঁদুর হওয়া।

তখনো জাম্ পাতলা হয়নি। গাড়িতে গাড়িতে ছয়লাপ। আবার সুটকেস হাতে নিয়ে ফিরতি মুখে যাত্রা করল রঞ্জন।

ভাগ্যিস বিছানাটা নেই। থাকলে নিশ্চয়ই কুলি নিতে হত। নিলেই এক মুঠো খরচ। অকারণ খরচ। কুলির সুর এখনো সপ্তমে বাঁধা।

এপারে এসে একটা ট্যাক্সির জন্যে ছুটোছুটি করতে লাগল। কোথায় ট্যাক্সি। যা দু'একটা দেখা দিচ্ছে, কলা দেখিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। রঞ্জনের ডাক গ্রাহ্যও করছে না। শূন্য ট্যাক্সি অথচ মিটার নামানো।

হাতের সুটকেসটার দিকে তাকাল রঞ্জন। ব্রিজের উপর থেকে তখন গঙ্গার মধ্যে ফেলে দিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। যত জিনিস তত অধীনতা, তত উদ্বেগ।

- নিরাপদ

  অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একটা ট্র্যাফিক কনস্টেবলের শরণ নিল রঞ্জন। হাত তুলে কনস্টেবল একটা শূন্য ট্যাক্সি দাঁড় করাল। রঞ্জন সুটকেসটা ভিতরে ছুঁড়ে দিয়ে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল মুহূর্তে।

'কোথায়?' জিগগেস করল ড্রাইভার।

অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না রঞ্জন। গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে রইল।

বাড়ির গলির মুখে যখন এসে পৌঁছুল তখন চারদিক নিঝুম হয়ে গেছে। ফুটপাতে যারা শোয় তাদের কেউই বসে নেই, সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

এ কি, রঞ্জনের ঘরে এখনো আলো জ্বলছে যে। এত রাত্রে! এ কি, সদর যে খোলা!

তার মানে?

ব্যাটা সব জিনিসপত্তর নিয়ে সরে পড়েছে নাকি? সন্দেহ যাতে না হয় তারই জন্যে দরজা খোলা রেখেছে। রেখেছে আলো জ্বালিয়ে। না কি চোর-ছ্যাঁচড়ের আড্ডা বসিয়েছে? না কি জুয়াড়ীর?

চুপি চুপি দরজা পেরিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি মারল রঞ্জন।

ঘরের মধ্যে উঁকি মারল রঞ্জন?

দেখল ডাইং-ক্লিনিং থেকে বিছানার চাদরটা নিয়ে এসেছে নিরাপদ। তোষকের উপর ফর্সা চাদর টান করে পেতে পরিপাটি বিছানা করে রেখেছে। এবং পাশে একটা ভাঙা টুলের উপর বসে শূন্য বিছানাকে লক্ষ্য করে মৃদু-মৃদু পাখা চালাচ্ছে। আর ঢুলছে।
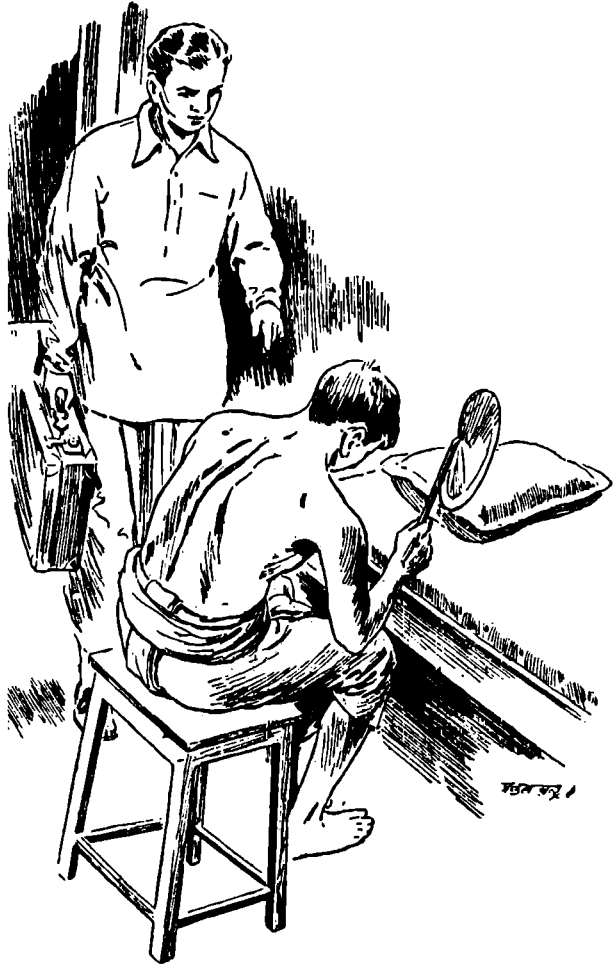
● নিরাপদ
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ঘরের বাইরে নিঃশব্দে জুতো খুলে ভিতরে ঢুকল রঞ্জন। সুটকেসটা এক কোণে নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি পাতা বিছানায় ক্লান্ত দেহ ঢেলে দিল।

যতটা চমকানো উচিত ততটা যেন চমকালনা নিরাপদ। শুধু বলল, 'কে?'

'যাকে এতক্ষণ পাখা করছিলি সে।'

সানন্দ বিস্ময়ে বিহ্বল দৃষ্টি তুলে তাকাল নিরাপদ। বললে, 'আমি জানতাম আপনি ফিরে আসবেন। আমাকে ফেলে আপনি কি চলে যেতে পারেন?'

---

# সংস্কৃত-সাহিত্যের কাহিনী

## ● কুমারসম্ভবম্

[ কুমারসম্ভব মহাকবি কালিদাসের অমর মহাকাব্য। এতে সতেরোটি সর্গ আছে। তবে পণ্ডিতেরা মনে করেন শেষের কয়েকটি সর্গ কালিদাসের লেখা নয়। কালিদাসের লেখার মধ্যে যা যা বিশেষত্ব, এই মহাকাব্যের প্রত্যেক শ্লোকে তা পরিস্ফুট। ]

ভারতের উত্তরে, পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম ব্যাপে রয়েছে হিমালয়। এই হিমালয়ের যিনি অধিরাজ, তাঁর গৃহে জন্মগ্রহণ করলেন পার্ব্বতী, গতজন্মে যিনি ছিলেন সতী, শিব-ঘরণী। রাজার ঘরে জন্মেও তিনি মনে মনে স্থির করলেন, মহাদেব ছাড়া আর কাউকে পতিরূপে বরণ করবেন না। সেই সময় তারকাসুরের অত্যাচারে দেবতারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হন এবং মহাদেবের শক্তিতে যার জন্ম নয়, সে তারকাসুরকে বধ করতে পারবে না। সেইজন্যে সব দেবতা মিলে তপস্যারত মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গিয়ে পার্ব্বতীর সঙ্গে মহাদেবের বিবাহের চক্রান্ত করলেন। মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গাবার জন্যে তাঁরা মদনদেবকে পাঠালেন। কিন্তু মহাদেবের তৃতীয় নেত্রের আগুনে মদন ছাই হয়ে গেল। তখন পার্ব্বতী কঠোর তপস্যায় মহাদেবের হৃদয় জয় করলেন এবং তার ফলে জন্মগ্রহণ করলেন কুমার, অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়। কার্ত্তিকেয়ের সঙ্গে সংগ্রামে তারকাসুর নিহত হলো। স্বর্গে আবার উঠলো দেবতার জয়ধ্বনি।

# আজ্ঞাবহ

কামিনী রায়

আমার অন্তরে ছিল কি যে লাজ ভয়,
চলি নাই পুরোভাগে, চলি নাই সাথে,
চলিয়াছি নত শির সবার পশ্চাতে।
শুধু জানিয়াছি মনে এ জীবন নয়
কেবল খেলার ছুটী। জ্ঞানের সঞ্চয়
পুণ্যের সাধন লাগি বিধাতার হাতে
জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা, হৃদয়ের পাতে
পড়িয়াছি আজ্ঞালিপি করিনা সংশয়।
সে আজ্ঞা পালিতে সাধ্য আছে, কি, না আছে
ভাবনা জাগিত নিত্য, নিশি দিন তাই
কহিয়াছি,—"হে স্বামিন্ যাহা নির্দেশিলে,
করিতেছি শিরোধার্য্য, ভিক্ষা তব কাছে,
পালিতে নির্দেশ যোগ্য শক্তি যেন মিলে,
জীবন বহিতে মৃত্যু তাও না ডরাই।"

* কামিনী রায়ের অপ্রকাশিত কবিতা।

# মৎস্য পুরাণ

—বনফুল

খুকুর বিয়ের গল্প, সে এক অদ্ভুত গল্প। বললে কেউ বিশ্বাস করে না। তোমাদেরও বলছি, দেখ তোমরা বিশ্বাস করতে পার কি না। খুকুর ভাল নাম মানকুমারী। মানের মরাই একটি, নামের মর্য্যাদাও রেখেছে। কথায় কথায় ঠোঁট ফুলে ওঠে, নাকের ডগা কাঁপতে থাকে, তারপর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। এখন তার বয়স ষোল, এখনও অমনি।

তার এই আশ্চর্য্য বিয়ের গল্প বলতে হ'লে শুরু করতে হবে তার ছেলেবেলা থেকে। যখন তার বয়স তিন কি চার তখন তার মাসী তাকে একটি বড় পুতুল উপহার দিয়েছিল তার জন্মদিনে। বেশ বড় পুতুল, যেন বড়সড় খোকা একটি। নীল চোখ, মাথার চুল চমৎকার কোঁকড়ানো, ঠোঁট দুটি টুকটুকে লাল, আর কি মিষ্টি হাসি তাতে। খুকু পুতুলটিকে দিনের বেলা তো কাছছাড়া করতই না, রাত্রেও কাছে নিয়ে শুত। কিন্তু এক আপদ জুটল দিন কয়েক পরে, ফন্তি মাসীর বায়নাদার মেয়ে মনু। ভালো নাম

জলের ভিতর সত্যিই একটা জীবন্ত পুতুল সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে।

ছেলে মেয়ে দু'টি ক্রমে বেড়ে ওঠে,……

মনোরমা, কিন্তু ওই নামেই মনোরমা, কাজের বেলায় ঠিক উলটো। একবার গলা ছেড়ে কাঁদতে আরম্ভ করলে আর রক্ষে নেই, কাঁদছে তো কাঁদছেই, বাড়িতে কাক-চিল বসবার উপায় নেই, বাড়ির লোকেদের প্রাণান্ত হবার উপক্রম। আর কথায় কথায় বায়না, এটা চাই, ওটা চাই। এই মেয়েকে নিয়ে ফনতি মাসী এল শরীর সারতে। খুকু জানত না তখন যে মনুটি কি 'চিজ্', তাহলে কি আর তাকে পুতুল দেখায়? আগেই লুকিয়ে ফেলত। কিন্তু তা হ'ল না। মনু আসতেই খুকু এক মুখ হেসে এগিয়ে গিয়ে বল্লে—'আমার পুতুল দেখ্। চল্ একে নিয়ে খেলি গিয়ে। একে আজ বর সাজাই আয়। পাশের বাড়িতে মান্তুর খুকী-পুতুল আছে, তার সঙ্গে বিয়ে দেব। মান্তুর বাড়ি যাবি?" মনু কিন্তু লুব্ধদৃষ্টিতে চেয়ে ছিল পুতুলটার দিকে। কিছু না বলে' ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়েই রইল মিনিটখানেক। তারপর বলল, "ও পুতুল তোমার নয়, আমার—"

'ইস্ তোমার বই কি। মাসী আমাকে জন্মদিনে কিনে দিয়েছে—"

যুক্তি মানবার মেয়ে মনু নয়। সে আরও খানিকক্ষণ পুতুলটার দিকে তির্য্যক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে লাফিয়ে এগিয়ে গেল খুকুর দিকে, ছোঁ মেরে পুতুলটা কেড়ে নিয়ে বললে—'আমার পুতুল—তোমার নয়। আমার—"

এ রকম জবরদস্তি সহ্য করা শক্ত। খুকু এক ধাক্কায় মনুকে ধরাশায়ী ক'রে কেড়ে নিলে পুতুলটা। তারপরই শুরু হ'ল মনুর আকাশ-ফাটানো চিৎকার। হাঁ হাঁ ক'রে বাড়িসুদ্ধ সবাই ছুটে এল। কুটুমের মেয়ে দু'দিনের জন্য বেড়াতে এসেছে, কি হ'ল তার। খুকু এক ছুটে আগেই চ'লে গিয়েছিল চিলে-কোটার ঘরটাতে। সেখানে শ্রীমন্ত মালীর খোলা কাঠের বাক্সটাতে লুকিয়ে ফেলেছে পুতুলটাকে। যখন জানা গেল সামান্য একটা পুতুলের জন্য এই কাণ্ড তখন খুকুর মা বললেন; কেঁদো না মনু, লক্ষ্মীটি, তোমাকেও আমি আনিয়ে দিচ্ছি ঠিক অমনি পুতুল। পুরীর সমস্ত দোকান খুঁজেও কিন্তু ঠিক অত বড় দ্বিতীয় পুতুল আর পাওয়া গেল না। মনু ছোট পুতুল নেবে না, ঠিক অত বড় পুতুলই চাই। কিছুতেই কান্না থামে না তার। খুকুর মা শেষে খুকুকে বললেন, দিয়ে দাও তোমার পুতুলটা মনুকে। তোমার

'ইস্ তোমার বই কি!

● মৎস্য পুরাণ
বনফুল

ছোট বোন হয়, কোলকাতা থেকে তোমাকে আনিয়ে দেব একটা পুতুল। এখন ওটা দিয়ে দাও ওকে, ছোট বোনকে কি কাঁদাতে আছে?—মায়ের কণ্ঠস্বরে আদেশের আমেজ পেয়ে খুকু আর আপত্তি করতে সাহস করলে না। দিয়ে দিলে পুতুলটা। কিন্তু বুক ফেটে গেল তার। মালী শ্রীমন্তের কাছে গিয়ে দুঃখে ভেঙে পড়ল সে একবারে। বৃদ্ধ শ্রীমন্ত মালীই তার মনের কথা বোঝে, বিপদে আপদে আশ্রয় দেয়, প্রশ্রয়ও দেয় ও নানাভাবে। কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছে কিনা, তাই যত আবদার তার কাছেই। সে ওড়িয়া ভাষায় তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, এতে কাঁদবার কি আছে। ওর চেয়ে ঢের ভালো পুতুল তাকে সে এনে দেবে। যদি এনে দিতে না পারে নিজের নাক কেটে ফেলবে সে, শুধু তাই নয় নিজের নামও বদলে ফেলবে। শ্রীমন্তের মুখে এমন সব কঠোর প্রতিজ্ঞা শুনে খুকুর আশা হল। আজ পর্য্যন্ত শ্রীমন্তর কথার খেলাপ হয় নি। এই সেদিনও সে তাকে একটি পাকা চালতা এনে দিয়েছে লুকিয়ে।

মাসখানেক পরেই মনুরা চ'লে গেল। বলা বাহুল্য, পুতুলটা নিয়েই গেল সে। পুরীর বাজারে আর তেমন পুতুল একটিও এল না। মামাবাবু কোলকাতা থেকে জানালেন সেলুলয়েডের বড় পুতুল আজকাল পাওয়া যাচ্ছে না আর। শ্রীমন্ত চেষ্টার ত্রুটি করছিল না অবশ্য। এদিক সেদিক থেকে প্রায়ই সে পুতুল জোগাড় ক'রে আনত। কখনও ন্যাকড়ার পুতুল, কখনও মাটির পুতুল, কখনও রবারের পুতুল। গালার পুতুলও এনেছিল একদিন। কিন্তু খুকুর একটাও পছন্দ হয় নি। শ্রীমন্ত কিন্তু নিজের নাক কাটবার জন্য বা নাম বদলে ফেলবার জন্য ব্যস্ত হ'ল না। সে ক্রমাগত খুকুকে আশ্বাস দিয়ে যেতে লাগল যে ওর চেয়েও ভালো পুতুল সে খুকুকে এনে দেবেই দেবে। দিলেও একদিন। ভারি আশ্চর্য্যজনক ঘটনা ঘটল একটা।

একদিন সকালে শ্রীমন্ত খুকুকে হাতছানি দিয়ে ডেকে আস্তে আস্তে বলল, তোর পুতুল এনেছি খুকু, জীয়ন্ত পুতুল।

কোথা?

বাগানের পিছনে যে চৌবাচ্চাটা আছে, তার ভিতরে।

চৌবাচ্চার ভিতরে পুতুল রাখতে গেলে! কি বুদ্ধি তোমার শ্রীমন্ত দা।

দেখেই যা না আগে—

খুকু গিয়ে সত্যই অবাক্ হয়ে গেল!

এক চৌবাচ্চা জলের ভিতর সত্যিই একটা জীবন্ত পুতুল সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। কাছে গিয়ে আরও অবাক্ হ'য়ে গেল সে। পুতুলের উপরটা মানুষের মতো, কিন্তু কোমর থেকে নীচ পর্য্যন্ত মাছ। মাছের প্রতিটি আঁশ যেন রূপোর তৈরি আর তার থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে রামধনুর সাতটি রং। মাছের ল্যাজের পাখনাগুলোও অপরূপ, ঠিক যেন মখমলের তৈরি।

শ্রীমন্ত বললে, আমার এক জেলে বন্ধু আছে, সে সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। কাল তারই জালে ধরা পড়েছে এটি। আমি তার কাছ থেকে দশ টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছি। চিড়িয়াখানায় বিক্রি করলে

● মৎস্য পুরাণ
বনফুল

আরও বেশী টাকা পেত সে। বন্ধু ব'লে আমাকে দশ টাকায় দিয়েছে।

খুকু অবাক্ হয়ে গেল।

খবর চাপা রইল না। দলে দলে লোক দেখতে এল মৎস্যনারীকে। খুকুর কিন্তু আশ্চর্য্য লাগল, নারী কি নর, তা এরা ঠিক করছে কি ক'রে! কিচ্ছু তো বোঝা যায় না। মাথার চুলগুলো একটু লম্বা। কিন্তু ছেলেদেরও লম্বা চুল হয় না কি? ওই তো মাখনবাবুর ছেলে বুলু, লম্বা লম্বা চুল তার, মঙ্গলচণ্ডীর কাছে মানত করা আছে। পুরুষ কি মেয়ে যাই হোক সুন্দর দেখতে কিন্তু। ধপধপে ফরসা গায়ের রং, টানা-টানা চোখ, মিশকালো চোখের তারা, পাতলা ঠোঁট দুটি টুকটুক করছে। খুকু এগিয়ে যায় তার সঙ্গে ভাব করতে, সে-ও এগিয়ে আসে কিন্তু কথা বলতে পারে না।

তোমার নাম কি—খুকু জিগ্যেস করে।

চুপ ক'রে চেয়ে থাকে সে, উত্তর দিতে পারে না। খুকুর মাঝে মাঝে মনে হয় তার চোখ দুটো যেন হাসছে। লজেন্স, বিস্কুট, সন্দেশ, রসগোল্লা, আচার নিয়ে খুকু রোজ তাকে সাধাসিধে করে, সে কিন্তু স্পর্শ পর্য্যন্ত ক'রে না কিছু। শ্রীমন্ত বললে, ও সমুদ্রের ছোট ছোট মাছ খায়, আমি রোজ সকালে এনে দি। শ্রীমন্ত আর একটা কাজও করে। সমুদ্র থেকে জল এনে চৌবাচ্চাটার জল বদলে দেয় রোজ। সমুদ্রের প্রাণী কি না, কুয়োর জল সহ্য হবে না হয় তো।

দেখতে দেখতে অনেক দিন কেটে গেল।

মৎস্যনারীর সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল খুকুর। মানুষের খাবারও খেতে লাগল সে ক্রমশঃ ; বিস্কুট, মাছভাজা, টোস্ট, ওমলেট্—খুকু তাকে রোজ খাওয়াতো। মনে হ'তে লাগল কথা বলবারও যেন চেষ্টা করছে, কু-কু বলত মাঝে মাঝে। খুকুর কি আনন্দ! প্রথম ভাগ এনে পড়াতেই শুরু ক'রে দিলে তাকে। মনে হ'ত সে-ও যেন পড়বার চেষ্টা করছে। খুকু স্কুলে যেত না! একজন মাস্টার মশাই তাকে বাড়িতে পড়িয়ে যেতেন। খুকুর জেদাজেদিতে মৎস্যনারীকেও পড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। তাঁরও মনে হ'ল, চেষ্টা করলে ওকে হয়তো কিছু শেখান যাবে। খুকুর বাবা-মাও কৌতুক অনুভব করলেন এতে, মাস্টার মশাইকে বললেন, দেখুন না, ওকে কথা কওয়াতে পারেন যদি। তাহলে খুকর বেশ সঙ্গী হয় একটি। মাস্টার মশাই চেষ্টা করতে লাগলেন। আর খুকুর তো কথাই নেই, সে যেন মেতে উঠল। সমস্তক্ষণই সে ওকে নিয়ে থাকত। অনেক বকাবকি ক'রে তবে তাকে খেতে বা শুতে নিয়ে যাওয়া হ'ত।

মৎস্যনারী ক্রমশঃ কথা কইতে শিখল, লেখাপড়াও শিখতে লাগল।

তারপর প্রায় দশ বৎসর কেটে গেছে। অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

● মৎস্য পুরাণ
বনফুল

এখন খুকুর বয়স ষোল। মৎস্যনারীও বড় হয়েছে বেশ। তার জন্যে আরও বড় চৌবাচ্চা করানো হয়েছে, আর সেই চৌবাচ্চা ঘিরে হয়েছে কাচের প্রকাণ্ড ঘর। আর একটা বিস্ময়জনক ঘটনাও ঘটেছে যা চমকে দিয়েছে সকলকে। মৎস্যনারী আর নারী নেই, সে রূপান্তরিত হয়েছে নরে। তার গোঁফ উঠেছে! চমৎকার বাংলা কথা বলতে পারে সে, বাংলা ইংরেজী দুই পড়তে পারে, অঙ্ক কষতে পারে, এমন কি অ্যালজেব্রার অঙ্কও। চৌবাচ্চার ধারে প্রকাণ্ড টেবিলে, টেবিলের উপর বইয়ের শেল্ফ। এখন রীতিমত ছাত্র সে। মাস্টার মশাই বলেন খুকুর চেয়ে, ওরই নাকি পড়ায় বেশী মন।

একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে কিন্তু। খুকুর বিয়ে নিয়ে হয়েছে মুশকিল। খুকু বলছে—সমুদ্রগুপ্তকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। মাস্টার মশাই ওর নাম দিয়েছেন সমুদ্রগুপ্ত। সমুদ্রগুপ্তকে সমুদ্রের ধার ছাড়া অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া চলবে না, কারণ সমুদ্রের জল না পেলে ও বাঁচবে না। অথচ সমুদ্রের ধারে যে সব শহর বা গ্রাম আছে তাতে খুকুর যোগ্য কোনও পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। খুকুর বাবা ওয়াল্‌টেয়ার, মাদ্রাজ পর্য্যন্ত খোঁজ ক'রে দেখেছেন।

শেষে তাঁরা ঠিক করলেন জোর করেই খুকুর অন্য জায়গায় বিয়ে দিতে হবে। পাটনায় খুব ভালো পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ পাত্র হাতছাড়া করা উচিত নয়। খুকু না-হয় মাঝে মাঝে এসে সমুদ্রগুপ্তকে দেখে যাবে। একটা পোষা জানোয়ারের জন্যে সমস্ত জীবনটাকে নষ্ট করার মানে হয় কোনও? সমুদ্রগুপ্তকে কিন্তু সামান্য একটা জানোয়ার বলে মনে করতে কষ্ট হচ্ছিল খুকুর বাবা-মার। রাজপুত্রের মতো চেহারা, কি বুদ্ধি, কি কথাবার্ত্তা।

খুকুর মা বললেন, "আহা, ওর নীচের দিকটা যদি মাছের মতো না হ'ত তাহলে ওর সঙ্গেই খুকর বিয়ে দিতাম। খুকুই তো আমাদের একমাত্র সন্তান, জামাইও ঘরে থাকত তাহলে"

খুকুর বাবা বললেন, "যা হবার নয় তা ভাবছ কেন"

বিয়ের কথাবার্ত্তা চলতে লাগল। একদিন খুকু শুনল তাকে দেখবার জন্য পাটনা থেকে পাত্রের বাবা আসছেন।

গভীর রাত্রি।

সমুদ্রগুপ্তের ঘরে বসে খুকু কাঁদছিল। সমুদ্রগুপ্ত খুকুকে কখনও কাঁদতে দেখে নি। খুবই আশ্চর্য্য হয়ে গেল সে।

"ও কি করছ তুমি—"

খুকু চোখের জল মুছে ফেললে।

"কি করছিলে?"

"কাঁদছিলাম"

"কাঁদছিলে? কেন! বইয়ে পড়েছি লোকে দুঃখ হলে কাঁদে। কি দুঃখ হয়েছে তোমার।"

- মৎস্য পুরাণ
  বনফুল

"তোমাকে ছেড়ে এইবার চ'লে যেতে হবে"

"সে কি! কোথায় যাবে—"

"শ্বশুরবাড়ি। আমার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে। পরশু আমাকে ওরা দেখতে আসবে—"

সমুদ্রগুপ্ত নির্ব্বাক্ হয়ে রইল খানিকক্ষণ।

"আমাকেও নিয়ে চল তোমার সঙ্গে"

"পাটনায় তুমি থাকবে কেমন ক'রে? তোমার চৌবাচ্চায় সমুদ্রের জল চাই। সেখানে তো সমুদ্র নেই। তোমার মাছের অংশটা যদি না থাকত তাহলে কোন ভাবনাই ছিল না"

তারপর একটু থেমে খুকু বললে—"মা কাল কি বলছিল জান? বলছিল সমুদ্রগুপ্তের নীচের দিকটা যদি মাছের মতো না হ'ত তাহলে ওর সঙ্গেই খুকুর বিয়ে দিতাম"

"তাই না কি—"

সমুদ্রগুপ্তের সমস্ত মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। তার যে অংশটুকু মাছের মতো সেটা জলের ভিতর নিস্পন্দ হয়ে গেল হঠাৎ।

তার পরদিন খুব ভোরে খুকুর ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। শুনতে পেলে সমুদ্রগুপ্ত খুব জোরে জোরে তার নাম ধ'রে ডাকছে। বিছানা থেকে তাড়াতাড়ি নেবে সে ছুটে চলে গেল সমুদ্রগুপ্তের ঘরে।

ঊর্দ্ধশ্বাসে ফিরে এল একটা হাফপ্যান্ট হাতে ক'রে।—[পৃঃ ২২

"খুকু দেখ দেখ, আমার মাছের খোলসটা ফেটে গেছে। আমি একা হাত দিয়ে ওটা ছাড়াতে পারছি না, তুমি একটু সাহায্য কর! আমি বুঝতে পারছি ওই খোলসটার ভিতর আমার পা আছে। একটু জোরে টান, মাছের খোলসটা

● মৎস্য পুরাণ
বনফুল

খুলে যাবে এখুনি”

খুকু বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইল। সত্যিই ফেটে গেছে খোলসটা।

“দাঁড়াও, আগে বাবার হাফপ্যাণ্টটা নিয়ে আসি তাহলে—”

ছুটে চলে গেল খুকু এবং ঊর্দ্ধশ্বাসে ফিরে এল একটা হাফপ্যাণ্ট হাতে করে।

আধ-ঘণ্টা পরে খুকুর বাবা-মাও অবাক হয়ে গেলেন হাফপ্যাণ্ট-পরা সমুদ্রগুপ্তকে দেখে। এ কি কাণ্ড!

পাটনায় তখ্‌খুনি ‘তার’ চলে গেল, পাত্রের বাবার আর আসবার দরকার নেই। খুকুর বাবা পুরোহিত মশাইকে খবর দিতে বেরিয়ে গেলেন। খুকুর মা গেলেন লুচি ভাজতে।

খুকু জিগ্যেস করলে—“আমার ভারি আশ্চর্য্য লাগছে। কি করে তুমি বেরুলে!”

সমুদ্রগুপ্ত বললে—“ইতিহাসের সমুদ্রগুপ্ত কত অসাধ্য-সাধন করেছিলেন, আর আমি এটুকু পারব না? চেষ্টায় কি না হয়। আমি তোমার কথা শুনে কাল সমস্ত রাত ধরে বেরুতে চেষ্টা করেছি—ভোরের দিকে ফেটে গেল খোলসটা—”

সাতদিন পরে খুকুর বিয়ে হয়ে গেল সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে।

বরকর্ত্তা হল শ্রীমন্ত।

---

# মণি ও মুক্তা

লোকেশ চৈতন্যময়াদিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে।

—প্রভাত-বন্দনা

হে লোকেশ, হে চৈতন্যস্বরূপ, হে শ্রীকান্ত, হে বিষ্ণু, তোমারই আদেশে তোমারই প্রিয়কাজ করবার জন্যে এই প্রভাতে শয্যাত্যাগ করে সংসারপথে অগ্রসর হলাম।

# ফসকান পালা

## অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কথামালার

**শৃগাল ও দ্রাক্ষাফল অবলম্বনে রচিত**

"একদা এক শৃগাল দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। দ্রাক্ষাফল অতি মধুর। সুপক্ক ফল সকল দেখিয়া ঐ ফল খাইবার নিমিত্ত শৃগালের অতিশয় লোভ জন্মিল। কিন্তু ফল সকল অতি উচ্চে ঝুলিতেছিল; সুতরাং ঐ ফল পাওয়া শৃগালের পক্ষে সহজ নহে। লোভের বশীভূত হইয়া ফল পাড়িবার নিমিত্ত শৃগাল যথেষ্ট চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনও ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অবশেষে ফল-প্রাপ্তির বিষয় নিতান্ত নিরাশ হইয়া এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, দ্রাক্ষাফল অতি বিস্বাদ ও অম্লরসে পরিপূর্ণ।"

### ।। আঙুর লতা ও আঙুর পাতার গীত ।।

পাতা। হ্যাদে ও আঙুর লতা<br>
এতকাল ছিলি কোথা?

লতা। এতকাল ছিলেম বনে<br>
আপন মনে একটি কোণে।

পাতা। বনে যে শ্যালটা এল?

লতা। পালায়ে আসতে হল।<br>
বলি ও আঙুর পাতা<br>
তুমি এতকাল ছিলে কোথা?

পাতা। ছিলেম আমি সেই সেখানে<br>
কাবুলের গুল বাগানে।

লতা। সেখানে যে ভালুক এলো?
পাতা। তারি তাড়ায় পালাতে হলো।
উভয়ে। এইখানে এক বাগান আছে,
সেইখানে এক আঙুর গাছে
নেশা করা ফল ধরেছে,
পাতে পাতে মাচার ছাতে।
পাহারা ফেরে ক'টা কাবুলী
ঢিলে পাজামা কাঁধে ঝোলা ঝুলি
গোলাপ বাগেতে রকব বাজায়
আঙ্গুর বাগেতে ভালুক নাচে।
ওই সে আসে, ওই সে আসে
তাথা তাথা—ঝোলা হাতা!

খিস্‌মিস্‌ বাদাম সালুন মিস্‌রী সালাম সালাম।

(কাবুলীওয়ালার প্রবেশ)

## ।। গীত ।।

পেশওর সে আতা হুঁ, আয়েস চয়েন মেরা কাম।
রাহিগীর অব্ হিন্দ্‌কা লেগা আঙ্গুর পেস্তা
খিস্‌মিস্‌ বাদাম সালুন মিস্‌রী সালাম সালাম।

## ।। সকলে নৃত্য গীত ।।

আঙ্গুর খরবুজ আলুবখরা
কাবুল কস্‌মীর মক্কট হাল্‌বা
খিস্‌মিস্‌ খিস্‌মিস্‌ আখরোট পিস্তা
গুর্জিন পস্তীন জাফেরান জোর হিং
হনহন হুজুর [illegible] খোরমা
হুজুর হুজুর সালাম হুজুর
[illegible]
[illegible] কিসমিস [illegible] বসরা।

(শ্যাল-ব্লুনীল ও হুক্কাবরদার হুক্কা শেয়ালের প্রবেশ)

### ।। ব্লুনীলের গজল ।।

আঙুর পাতার খঞ্জরেতে দিল্‌খানা মোর চাক করিল
পারা পারা হয়ে গেছি কি প্রকারে বাঁচি বল।
কুচ্ছ হোঁস গোঁস নাইকো পিয়ারী জ্বলতা হ্যায় কলেজা
চিড় খেয়েছে দিল হামারি, ইস্কে ভারি মুস্কিল হল।

### ।। হুক্কাবরদারের গীত ।।

আঙ্গুর নজুরি তম্বাখু ছিলিম মেরি
লিজিয়ে হুজুর পিজিয়ে
লিজিয়ে খুমারে
আজব চীজ্ তম্বাখু
দমকি সুধারে।
তম্বাকুকে খরিদ্দার
হরসক্‌স্ বেসোমার
দীজে টান মেহেরবান
ফুঁকিয়ে দোমারে।

(ভুঁড়ো বুড়ো ও আলটপ্‌কা
শেয়ালের প্রবেশ)

ব্লুনীল। এস এস এস এস
ভায়া দুইজন
কহ কহ আলটপ্‌কা
কিবা প্রয়োজন,
সকালে অকালে কেন
বিরস বদন?

বুড়ো। ভাই হে, বুড়া বয়সে
উপসে উপসে
শত্রে কিছু কাহিল হয়া।
ভেঙ্গে যাবার আগে ভাগে

তম্বাকুকে খরিদ্দার...

● ফসকান পালা
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাইতে এসে বাগিচা ঘেঁসে
দ্রাক্ষাক্ষেত্রে হত্যা দিয়া।
ফলাহারের চেষ্টা হুয়া
হুক্কা ফুঁকার ইচ্ছা হুয়া।

**ভুঁড়ো।** প্রচণ্ড শীতের ধূপ বড় তেজস্কার
পেয়াসের জোরে প্রাণ করে হাহাকার।

**আলটপ্‌কা।** দাহা দাহা করে অঙ্গ জ্বলে সর্ব্বক্ষণ
বাঁচন হইতে এবে মঙ্গল মরণ।
কিবা দ্রাক্ষালতায় ফল ধরেছে বাহ্বারে বাহ্বা
মাঞ্চাতে বাহা উচ্চাতে আহা—
চোখা চোখা আঙুর থোকা
মনকে দোলায় ছিকায় বাঁধা।

**নিলু।** বাহ্বারে বাহ্বা মাৎ কবে হওয়া।

**ভুঁড়ো।** আহাঃ রে আহা, হাঃ হারে হাঃ হা।

**বুড়ো।** না পিয়ে ধরে না যায় পাওয়া।

**সকলে।** হয় না পাওয়া, হয় না খাওয়া আঃ হারে আহা।

**আলটপ্‌কা।** নাগাল না পাই দুলছে খালি
নাকের ডগায় পাড়ার জালি।
আঙ্গুর ঝরি ধরতে পড়ি
গুমরে মরি ঘাড় বেদনায়।

**সকলে।** আহা রে আহা বাঃ হারে বাহা
ইক্যা হুয়া ইক্যা হুয়া—
মাঞ্চাখানা আগাশ ছুঁয়া,
গোচ্ছা আঙুর পাক্কা হুয়া
হাত না হুয়া হা বাহোয়া!

**আলটপ্‌কা।** এক পল চার ঘড়ি বাকি সাম হইতে
আসিবেক বাগোয়াল নেঘাবানি করিতে চৌকিদার সহিতে
লম্ফ দাও ইচ্ছা যদি থাকে পাড়িবার,
বিলম্বে কি ফল বল জগঝম্প কই হে!

**সকলে।** আস আস নিলু বুলু
বুড়ো ভুঁড়ো ঢুলু ঢুল—
তাল ঠোক ওই যে
কইছে এই যে ঐ হে।

● ফসকান পালা
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## (লম্ফ ঝম্প গীত, জগঝম্প বাদ্য)

আলটপ্কা। লাফালাফ লাফালাফ
ঝপাঝপ্ খপাখপ্
টপাটপ্ তোলো হাত।
নিলু। এই এক লাফ এক হাত,
দুই লাফ দুই হাত,
তিন লাফ চার লাফ
তিন হাত চার হাত।
বুড়ো। ছেঁড়ো পাতা হুপ্ হাপ্ মারি লাফ—
মাটি ছাড়া ওরে বাপ্—
খেয়ে পাক জোড়া লাত্
একেবারে চিৎপাত
ভাঙা দাঁত খালি হাত।
ভুঁড়ো। হঠাৎ কুপোকাৎ
হাঃ হাঃ পায়ে বাত
সর আমি পাড়ি ঝাঁপ।
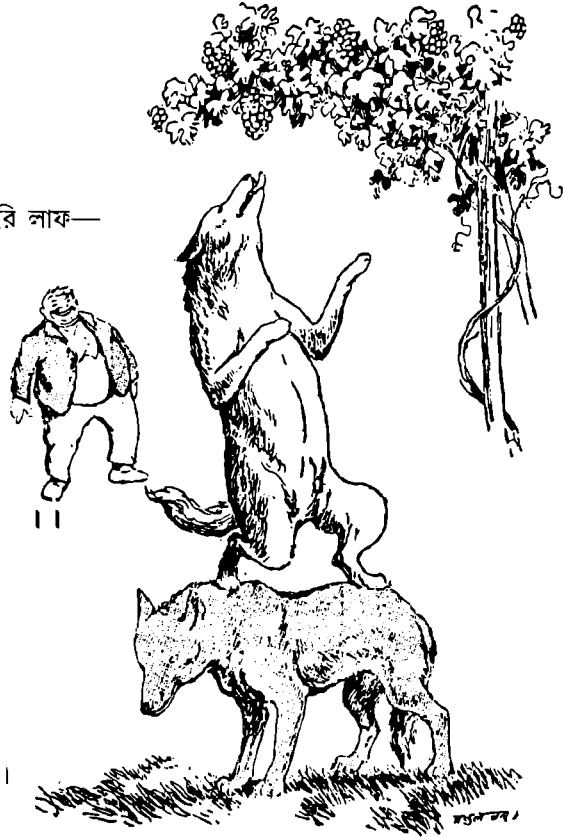
## ।। ভুঁড়োর গীত নৃত্য ।।

এই লো জম্প্, স্লো জম্প্,
ষ্ট্রেট জম্প্, সাইড জম্প্,
একস্ট্রা হাই, একস্ট্রা লো,
নো কুইক্ ভারি সোলো—
সোলো হাই ওহে মাই—
পড়ে মোলো পড়ে মোলো
ধরে তোলো ধরে তোলো।
হাই সোলো হলো হলো
ঊরুভঙ্গ ভূমিকম্প—
খুব হোলো বাড়ি চলো সোলো সোলো।

লম্ফ দাও ইচ্ছা যদি থাকে, পাড়িবার... [পৃঃ ২৬

## ।। শ্যাল ব্লুনীলের গীত ।।

হুকাবরদার হুক্কাটা ভর
আলটপ্কা এয়েছে জ্বর।
কোমরখানা জাতিয়া ধর
চটি পাট্রা দেখিগা চল।

● ফসকান পালা
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুঃখের সম্বল হুকার নল
শেয়াল গাড় গিয়া পড়।

(রামছাগলের প্রবেশ)

**রামছাগল।** ভাই তোমার দুই লয়ানে জলধারা দেখি কেন
কি হল কি হল কিবা হল বল বল—
ছল ছল আঁখি কেন?

**শ্যাল বুনীল।** দুঃখের কথা কইবো কি তোকে—
আমার বড় সাধের আঙুর লতা
ফল ক'টা তার গেছে টকে।
তৃষ্ণা মেটাতে এলেম এস্থান,
আশা না পুরিল বাহিরায় প্রাণ,
মনের খেদে ঝরিছে লয়ান কেলেশে শোকে।

**আলটপ্‌কা।** আমার মনে রইলো বড় খেদ
ভেবে নিশি দিবে হৃদি হল ভেদ।
ছিল বহু আকিঞ্চন
আঙ্গুর রসেরি সিঞ্চন,
আঙ্গুর ক'টার নাগাল পাবার পাইনে কোনো ছেদ—
হা অদৃষ্টম্ মাচাটা একদম আকাশ করেছে ভেদ।

**বুড়ো, ভুঁড়ো।** হায় কাহার ফলন্ত গাছ ফেলিলাম তুলি,
কাহার মধুর কলসী করিলাম চুরি,
দ্রাক্ষাগাছে খাট্টা হল দেখি ঝুড়ি ঝুড়ি।

**সকলে।** বনে বা ধরবে এবারে তেঁতুল গাছে
পেয়ারাপুলি।

**রামছাগল।** মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে
কে বলেছে সিটি বৃক্ষাগ্রে?
জেনে রাখ ভাই সর্ব্বাগ্রে—
মধুমক্ষিকার সাচ্চা বুলি
মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে—
দুঃখ পাও কেন ভুলি?
চল গা তুলি চল গা তুলি
পটুল তুলিবে আইলে কাবুলি।

● ফসকান পালা
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফতুয়া বানাইবে পট্‌পটাইবে
লয়ে দুই হাতে ছালগুলা খুলি
দেরে পিট্টান, দিবি কিরে প্রাণ
আলটপ্‌কান লাঙ্গুল তুলি।

সকলে। বস্তিতে চল, রাস্তা দে
ভেস্তে যাওয়া ফল হাতে।
পস্তিও ভাই পশ্চাতে
যাও কাঁধে ছালা তুলি।

## ।। ছাগলের গীত ।।

শ'য়ে রি ফলা ওহে শৃগলা ভাই রে ভাই,
তাইরে নাই তাইরে নাই
নাপাই ঝাঁপাই।
আগা সার সেলাম বাজাই
নাচ তামাসা শেষ করা চাই
তাজা বেতাজা রকম রকম।
আঙ্গুর বাগে আঙ্গুর ফলে
জম্বুদ্বীপে জাম কালো রং
তাজা বেতাজা রকম রকম।
লাওবে লাওবে ডজন ডজন
সবুরে মেওয়া বাজার নরম।

## ।। শৃগালের শেষ নৃত্য গীত ।।

চল আঙ্কু বাঙ্কু ঠ্যাংউ ঠাঙ্কু—
লেংচু লেংচু ন্যাজ গুড়াঙ্কু।
চোঁ চা চু-চু হাঃ হা হুঃ হু উঃ হু
এংচু ভেংচু লেংচু লেংচু।
ন্যাজ গুড়াঙ্কু ঠ্যাংউ ঠাঙ্কু
থেঙ্কু থেঙ্কু।
গ্রেপছার সাউআর
চোখে দেখে থেঙ্কু।

---

# খোকামণি

কুসুমকুমারী দাস

খোকামণি, সোনামণি উজল করি ঘর
এতদিনে এলে তুমি? এনেছ কি বর ?
কালো গরুর দুধ খাবে, দুধ খাওয়ার বাটি পাবে ?
হাসিতে পড়িবে ঝরে হীরা, মাণিক সোনা ?
অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, এক ফোঁটা তেল নাই—তাতে কিবা ক্ষতি
তুমি যে এসেছ সোনা, বংশে দিতে বাতি—
উলঙ্গ শিশুর প্রাণ, গাহিছে আনন্দগান
জানেনা অবোধ ছেলে কি আঁধার রাতি !
বাংলার ঘরে ঘরে শূন্য গোলা আছে পড়ে
সোনার বাংলা আজ দীনহীন অতি !

---

* অপ্রকাশিত কবিতা

মাতৃবক্ষ সুধানীরে, যে কদিন বাছা তোরে
বাঁচায়ে রাখেন মাতা, হেসে খেলে খাও,
বংশের উজল বাতি, আনন্দ ছড়াও।
তুমি যে এসেছ মণি, কোথা শঙ্খ, হুলুধ্বনি?
পাড়াপড়শীর হাসি তাও নাহি শুনি
তবু ধন, এস ধারে, ডাকিব আদর ক'রে
বিধাতার আশীর্ব্বাদে পেয়েছি তোমারে
তোমারে লইয়া কোলে, সুখে দিন যাবে চ'লে
দুঃখের সংসারে তুমি হাসি দাও ঢেলে।

# সংস্কৃত-সাহিত্যের কাহিনী

## ● মুদ্রারাক্ষস

[ মুদ্রারাক্ষস হলো নাটক। এই নাটক লিখেছেন বিশাখদত্ত। ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে, মুদ্রারাক্ষস সংস্কৃত-সাহিত্যে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। প্রাচীন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ মহামন্ত্রী চাণক্য ও রাক্ষস হলো এই নাটকের দুই প্রধানতম পুরুষ। এই মুদ্রারাক্ষস থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর বিখ্যাত নাটক চন্দ্রগুপ্ত লেখেন। ]

রাক্ষস হলেন পাটলিপুত্রের রাজা নন্দের মন্ত্রী, অতি চতুর, অতি বিচক্ষণ। নন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন চন্দ্রগুপ্ত। চাণক্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসলেন। নন্দের পতনের সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষস পালালেন। চাণক্যের সমস্ত চেষ্টা হলো, রাক্ষসকে স্ববশে আনা, রাক্ষসকেই চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করা। কিন্তু প্রকাশ্যে রাক্ষসের সঙ্গে চাণক্যের সুরু হলো প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দুই কূটবুদ্ধি রাজনীতিক পরস্পর পরস্পরকে জব্দ করবার জন্যে চক্রান্তের পর চক্রান্ত গড়ে তোলেন। সমস্ত নাটকটি হলো এই দুই কূটনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর সংগ্রাম ও সংঘর্ষ। নাটকের শেষে বিশাখদত্ত এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে আবার এক জায়গায় বন্ধুত্বের সূত্রে মিলিত করান।

# বীরবলী কৌতুক

প্রবোধকুমার সান্যাল

[ সম্রাট আকবরের রাজসভায় বীরবল ছিলেন একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী। পারিষদবর্গের মধ্যে বীরবলের স্থান অতি উচ্চে ছিল। সম্রাট ছিলেন সুরসিক এবং পরিহাসপ্রিয়। বীরবল কেবল যে বাকরসিক ছিলেন তাই নয়, তিনি সরস পরিহাস ও কৌতুকে সম্রাটকে মশগুল করে রাখতেন। অন্যান্য পারিষদের ন্যায় বীরবল চাটুকার এবং ভীরুপ্রকৃতি ছিলেন না। সম্রাট বীরবলকে দক্ষিণহস্ত স্বরূপও মনে করতেন। বীরবলের নানাবিধ কৌতুক-কাহিনী প্রচলিত আছে; তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকটি কাহিনী এখানে বলা হচ্ছে। ]

সম্রাট একদিন হঠাৎ তাঁর নানা গল্পের মাঝখানে বলে বসলেন, ওহে বীরবল, আলুভাজা কেমন লাগে বলো ত'?

নিজের মতামত প্রকাশ সম্বন্ধে বীরবল চিরদিনই খুব সতর্ক। সম্রাটের প্রশ্নে একবারটি মাথা চুলকিয়ে নিয়ে তিনি থতিয়ে বললেন, আজ্ঞে...হেঁ হেঁ...তা বলছেন বটে। তবে...হেঁ...হেঁ...

সম্রাট বললেন, তা তুমি যাই বলো, এক থালা আলুভাজা পেলে আমি আর কিছু চাইনে। ওটা

আমার ভারি প্রিয়।

বীরবল এবার সোৎসাহে বললেন, তা যা বলেছেন সম্রাট। আলুভাজার তুলনা নেই। ওইজন্যেই ত' পৃথিবীসুদ্ধ লোক আলুর ভক্ত। দেখুন না, বাজারে গিয়ে লোকে প্রথমে আলু কেনে। গরম ভাতে ঘি আর আলুসিদ্ধ,—ব্যস, শ্রেষ্ঠ খাদ্য। আলু ছাড়া তরকারি নেই। সন্দেশ রোজ খেলে অরুচি আসে, কিন্তু আলু রোজ খেলেও পুরনো হয় না। জাহাঁপনা, আপনার এই রুচি অতুলনীয়।

কিছুকাল যায়। তারপর একদিন হঠাৎ আকবর আলুর নিন্দা আরম্ভ করলেন। আলু খেলে শরীরে চর্বি বাড়ে, ক্ষুধা কমে যায়, পরিশ্রম করতে পারা যায় না—ইত্যাদি। বীরবল এই প্রকার নিন্দাবাদে মহা খুশী হলেন। বললেন, এই যা বলেছেন সম্রাট, এ হোলো লাখ কথার এক কথা!

সম্রাট প্রশ্ন করলেন, কি রকম?

ওই যে বললেন তখন? আলুর মতন এমন পাজি আনাজ ভূ-ভারতে নেই! যত খাও ততই পেট গরম, ততই মাথা ধরা, আর ততই শরীরের মধ্যে নানা অস্বস্তি। ওটার আগা-গোড়াই মন্দ!

বীরবলের মন্তব্য শুনে আকবর একটু অবাক হলেন। মুখে বললেন, তোমার এলোমেলো কথাবার্তা অনেক সময় বুঝতে পারিনে, বীরবল। একই বস্তুকে কখনও বলছ খুব ভালো, আবার এক সময় বলছ ওটা ভয়ানক মন্দ! এর মানে কি? এক নিশ্বেসে দু'রকম কথাই বা কেন, আমার সঙ্গে এমন ধাপ্পাবাজিই বা কি জন্য?

দমে' যাবার পাত্র বীরবল নন্। একবার তিনি নত হয়ে কুর্ণিশ জানালেন সম্রাটকে। তারপর সবিনয়ে বললেন, জাহাঁপনা, আমার প্রতি সুবিচার করুন, এই প্রার্থনা জানাই। আমার মনিব কে? আপনি, না আলু?

সম্রাট বললেন, নিশ্চয় আমি!

বীরবল বললেন, তবেই দেখুন সম্রাট, আলুর প্রতি আমার কোনও আনুগত্য নেই! ওর নিন্দা-সুখ্যাতি যখন খুশী করতে পারি। কিন্তু আপনার কথায় সায় দিয়ে আপনাকে আনন্দে রাখবো, এই কি আমার কর্তব্য নয়?

লজ্জায় সম্রাটের মুখ লাল, কিন্তু আনন্দে উজ্জ্বল।

সম্রাট একদিন সাদরে ডাকলেন : শোনো বীরবল।



বীরবল কাছে এলেন। সবিনয়ে বললেন, আজ্ঞা করুন, সম্রাট।

কাল ঘুমের ঘোরে আমি একটি ভারি মজার স্বপ্ন দেখেছি হে!

বীরবল তৎক্ষণাৎ বললেন, আশ্চর্য, আমিও একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি কাল রাত্রে, জাহাঁপনা।

সম্রাট বললেন, আগে আমারটা শোনো। সে ভারি মজা। স্বপ্নে দেখলুম, আমি পা পিছলে পড়ে গেলুম অতি সুগন্ধ গোলাপজলের এক চৌবাচ্চায়! তারপরেই দেখলুম তুমি টাল খেয়ে পড়ে গেলে,—

● বীরবলী কৌতুক
প্রবোধকুমার সান্যাল

কোথায়, বুঝতে পারছ?

বীরবল বললেন, আজ্ঞে, না সম্রাট!

সম্রাট বললেন, ভাবলেও এখন গা ঘিন ঘিন করে! তুমি হঠাৎ প'ড়ে গেলে এক নোংরা নর্দমার পাঁকের মধ্যে!

আমার কপাল মন্দ, সম্রাট।

আকবর এবার বললেন, তোমার স্বপ্নটি কি প্রকার?

বীরবল বললেন, সেটা প্রায় আপনারই মতন, তবে একটু ভিন্ন ধরণের।

কি রকম?

বীরবল বললেন, স্বপ্নে দেখলুম, আপনি আমার গা চাটছেন, এবং আমিও আপনার গা চাটছি।

মন্ত্রীর স্বপ্নকথা শুনে অপমানে সম্রাটের মাথা একেবারে হেঁট। কিন্তু এ নিয়ে নালিশ জানাবার উপায় নেই।

বৃদ্ধ বয়সে সম্রাট তাঁর পাকা চুলে মাঝে মাঝে কলপ মাখতেন। কলপ দিলে নাকি বয়স কম দেখায়।

একদিন সম্রাট একটু অন্তরালে ব'সে সবেমাত্র নিজের মাথায় কলপ লাগাবার সামগ্রীগুলি বা'র করছেন—এমন সময় বীরবল কি এক রাজকার্যে সেখানে এসে হাজির। সম্রাট একটু যেন থতিয়ে গেলেন, তারপর গুছিয়ে ব'সে বললেন, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, ভাবছিলুম।

বীরবল থমকে একবার দাঁড়ালেন : হুকুম করুন, সম্রাট।

সম্রাট প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, বলতে পারো বীরবল, মাথার চুলে কলপ মাখলে মস্তিষ্কের কোনও অনিষ্ট হয় কি না?

বীরবল অতি দুষ্টু। একবার তিনি বাঁকাচোখে ওই সামগ্রীগুলির দিকে তাকালেন। পরে বললেন, সম্রাট, ভয় কিছু নেই।

ভয় নেই! মানে?

একটা সুবিধে কি জানেন সম্রাট, যারা মাথার চুলে কলপ মাখে, তাদের মস্তিষ্ক নামক পদার্থই নেই। সেইজন্য মস্তিষ্কের অনিষ্টের কোনও কথাই ওঠে না।

সম্রাট আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বললেন, এ কি বলছ, বীরবল? কেমন ক'রে জানলে তাদের মস্তিষ্ক নেই?

বীরবল একটু হাসলেন। বললেন, হুজুর, মস্তিষ্ক থাকলে কি তারা বাজে কাজে সময় নষ্ট করতো? পাকা কি কখনো কাঁচা হয়? বার্ধক্য কি কখনো ফেরে যৌবনে? নদীর জল কি কখনও ফিরে যায় পাহাড়ে?

সম্রাট সেখান থেকে গা ঢাকা দিলেন। তিনি পালিয়ে বাঁচলেন।

● বীরবলী কৌতুক
প্রবোধকুমার সান্যাল

একদা সন্ধ্যাকালে সম্রাট এবং তাঁর দেশরক্ষা মন্ত্রী বীরবল নগর-প্রাকারের সংযোগস্থলে একটি গম্বুজের মধ্যে ব'সে রাজ্যের শাসন ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছিলেন। নীচের দিকে প্রাকারের বাইরে নগরের লোক-চলাচল হচ্ছিল।

ঠিক সেই সময় তাঁদের চোখের সম্মুখেই একটা মস্ত হৈ চৈ উঠলো। দুজনেই গলা বাড়িয়ে দেখলেন, কয়েকজন দস্যু মিলে জনৈক বণিককে পথের মাঝখানে আক্রমণ করে তা'কে লুণ্ঠন করছে। বণিক চীৎকার করে উঠলো সম্রাটের দিকে তাকিয়ে ঃ সম্রাট ধর্মাবতার, আপনার চোখের সামনে আমার সর্বস্ব লুট ক'রে ওরা চ'লে যাচ্ছে,—কিন্তু আপনি আমাকে রক্ষা করছেন না, সম্রাট!

দুজনেই গলা বাড়িয়ে দেখলেন, কয়েকজন দস্যু.......

তা'কে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে দেখে সম্রাট অতি ব্যথিত এবং ক্রুদ্ধ হলেন। ধমক দিয়ে তিনি বীরবলকে বললেন, প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষার ব্যাপারে তুমিই না দায়ী, বীরবল? চোখের ওপরে এই ঘটনা ঘটছে—একে তুমি কি বলতে চাও!

বীরবল একেবারে চুপ।

ক্রোধে ও উত্তেজনায় সম্রাট ঠকঠক করছিলেন। পুনরায় বললেন, যখনই তোমার কাছে কিছু জানতে চেয়েছি, তুমি আশ্বাস দিয়ে বলেছ, সব ঠিক আছে! এখন বেশ বুঝতে পাচ্ছি আমাকে তুমি এত কাল ধ'রে অন্ধকারে রেখেছ। রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা আমাকে জানতে দাওনি।

মাথা হেঁট করে বীরবল তিরস্কারগুলি শুনে গেলেন। তারপর এক সময়ে মুখ তুললেন। জোড় করে বললেন, সম্রাট, প্রবাদ আছে আলোর নীচেই সবচেয়ে অন্ধকার। আপনি মোগল রাজবংশের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল আলো, আপনি ব'সে রয়েছেন গম্বুজের ওপর,—নীচের তলাটা তাই অন্ধকার। দস্যুরা অন্ধকার পেয়েই ডাকাতি করেছে!
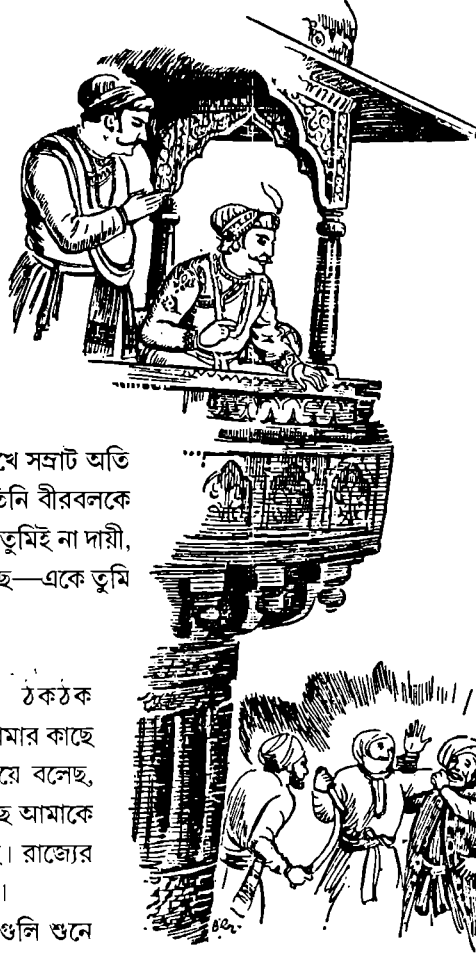
● বীরবলী কৌতুক
প্রবোধকুমার সান্যাল

বীরবলের হুকুমে তখনই অশ্বারোহীর দল ডাকাতের পিছনে পিছনে ছুটলো, এবং তাদেরকে ঘেরাও করলো।

সম্রাট তাঁর দেশরক্ষা মন্ত্রীর এই দ্রুত কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে গিয়েছিল।

সম্রাট আকবরের জাহাজ ছিল। নদীতে সমুদ্রে সেই সব জাহাজ চলাফেরা করতো, ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো। একবার কোনও সময়ে একখানা জাহাজে মস্ত এক চুরি ঘটে। কিন্তু কে চুরি করেছে, কোনমতেই ধরা গেল না। জাহাজের যিনি ক্যাপ্টেন তিনি নানা কলা-কৌশল ফেঁদে ঠিক চোরটিকে ধরার চেষ্টা করলেন, কিন্তু প্রকৃত চোরকে কিছুতেই ফাঁদে ফেলতে পারা গেল না। ক্যাপ্টেন মহা চিন্তিত। এর পর জানাজানি হ'লে তাঁর নিজেরই চাকরি নিয়ে টানাটানি প'ড়ে যাবে। সুতরাং আর কোনও উপায় না দেখে ক্যাপ্টেন কয়েকজন জাহাজের সন্দেহজনক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ক'রে সোজা সম্রাটের কাছে এনে হাজির করলেন।

রাজসভায় মহা গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠলো। বাস্তবিক, একজন চোরকে ধরবার জন্য এতগুলি লোককে সন্দেহক্রমে ধ'রে আনা হয়েছে—এই বা কেমন কথা! প্রত্যেকেই কেঁদে কেঁদে বলছে, সে নিরপরাধ। তা'হলে আসল চোর কে?

সম্রাট বীরবলের দিকে তাকালেন। বীরবল বললেন, তাই ত' জাহাঁপনা, এ এক মস্ত সমস্যা বটে।

সম্রাট বললেন, কিন্তু আমার রাজ্যে নিরপরাধের লাঞ্ছনা চলতে পারে না বীরবল,—তুমি এদের ভার নাও। তুমিই এদের ভেতর থেকে প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বা'র করো। এ তোমারই কর্তব্য।

বীরবল ব'সে ব'সে এক সময় একটি মতলব ঠাওরালেন। সভাস্থলের সবাই উৎসুক হয়ে বীরবলের দিকে চেয়ে রয়েছেন। সম্রাটও লক্ষ্য করছেন তাঁর প্রিয় মন্ত্রীকে। সন্দেহজনক ব্যক্তিরাও সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাজদরবার স্তব্ধ।

বীরবল হুকুম দিলেন, এক বস্তা ময়দা আনো।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ময়দার বস্তা এলো। বীরবল সন্দেহজনক ব্যক্তিদেরকে ডেকে বললেন, তোমরা প্রত্যেকে থুতু দিয়ে ময়দা মেখে এক একটা ডেলা তৈরী করো। তারপর আমি মন্ত্রপাঠ করবো, এবং যথার্থ অপরাধীকে বা'র করে দেবো।

প্রত্যেকেই বীরবলের হুকুম পালন করতে আরম্ভ ক'রে দিল। কিন্তু এক ব্যক্তির মুখে কোনমতেই থুতু এলো না। তার গলা ও জিভ শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তার হাতের ময়দাও ভিজলো না, ডেলাও তৈরী হলো না।



বীরবল এগিয়ে গিয়ে তা'কে প্রশ্ন করলেন। লোকটা এবার ভয়ে-ভয়ে তার অপরাধ স্বীকার করলো, এবং কোথায় চোরাই মাল রেখেছে, তাও সে ব'লে দিল।

**চোরকে** ধরবার এই বিচিত্র কৌশল দেখে সকলেই একেবারে হতবুদ্ধি। সম্রাট খুশি হয়ে বীরবলকে

● বীরবলী কৌতুক
প্রবোধকুমার সান্যাল

মহা মূল্যবান্ উপহার দান করলেন।

বীরবলের যশ ছড়িয়ে পড়লো রাজ্যময়।

বীরবলের মনে পড়ে বহুকাল আগেকার কথা। সম্রাটের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের কাহিনী। বীরবল সেই প্রথম দিল্লীতে আসেন।

তখনকার দিনে আসতো বড় বড় লোক। কেউ পণ্ডিত, কেউ গায়ক, কেউ কবি, কেউ বা শিল্পী। বীরবল এদের মধ্যে কোনটাই নয়। তাঁর নাম খ্যাতি প্রতিপত্তি—কিছুই নেই। সবাই এসে সম্রাটের কাছে আপন আপন প্রতিভার পরিচয় দেয়, সম্রাট খুশী হয়ে প্রত্যেককে সম্মান ও উপহারে ভূষিত করেন। তবু বীরবলের একান্ত বাসনা—তিনি সম্রাটকে একবার দর্শন করবেন।

গুটি গুটি তিনি রাজদরবারের দিকে এগোতে গিয়ে দেখতে পেলেন, যারাই ভিতরে যায় তারাই দ্বারপালকে কিছু কিছু বকশিস দিয়ে যায়। ওটা নাকি তা'র পাওনা। বীরবলের কাছে কানাকড়িও নেই, তবু তিনি ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করলেন। দ্বারপাল রুখে দাঁড়ালো ঃ কোথায় যাচ্ছ হে?

দরবারে!—বীরবল জবাব দিলেন,—এসেছি অনেক দূর থেকে। রাজদর্শন করবো।

বীরবল এগিয়ে গিয়ে তা'কে প্রশ্ন করলেন। [পৃঃ ৩৬

দ্বারপাল বললে, অত সহজ নয় রাজদর্শন, আমার পাওনাটা দাও দেখি? কত দিচ্ছ শুনি?

বীরবল বললেন, শোনো বাপু, আমার হাতে কিচ্ছু নেই। তবে যদি বাদশাহ কিছু দেন্ তা'র থেকে ভাগ দেবো।

অর্ধেক দেবে কিনা তাই বলো।

● বীরবলী কৌতুক
প্রবোধকুমার সান্যাল

অর্ধেক! আচ্ছা, তাই দেবো।

দ্বারপাল পথ ছেড়ে দিল বীরবলকে। বললে, ঠিক মনে রেখো, ভুলে যেয়োনা যেন।

চাবুক পড়তে লাগলো...

বীরবল রাজি হয়ে দরবারে গিয়ে ঢুকলেন। সেইদিনই তাঁর ভাগ্য খুলে গেল। তাঁর ধারালো পরিহাস, মধুর রঙ্গ-রস, তাঁর তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ এবং কৌতুক-কাহিনী—এসব শুনে সম্রাট একদিনেই মুগ্ধ এবং অনুরক্ত হয়ে উঠলেন। সম্রাট তাঁকে কাছে ডেকে বললেন, বীরবল, আমি বড় খুশী হয়েছি। বলো তুমি কি চাও? যা তুমি চাইবে তাই আমি দেবো।

বীরবল এবার সবিনয়ে বললেন, হুজুর, টাকা-পয়সা, ধনদৌলত—এসব কিচ্ছু আমি চাইনে।

তবে? বলো কি চাও?—সম্রাট প্রশ্ন করলেন।

বীরবল বললেন, আমি শাস্তি চাই, সম্রাট!

শাস্তি! মানে?

আমাকে একশো ঘা চাবুক মারুন, সেই আমার পুরস্কার।

সম্রাট ত' অবাক। এ লোকটা বলে কি? মাথার দোষ নেই ত'?—সম্রাট বললেন, বলছ কি তুমি? তুমি চোর-ডাকাত নও,—তোমাকে চাবুক মারবো কেন হে?

বীরবল কঠিনভাবে বললেন, নিজের প্রতিশ্রুতি পালন করুন, সম্রাট। আমি যা চাইবো তাই আপনি দেবেন বলেছেন!

অগত্যা সম্রাট কি আর করেন, তিনি হুকুম দিলেন, একশো ঘা চাবুক আস্তে আস্তে বীরবলের পিঠে মারতে।

চাবুক পড়তে লাগলো বীরবলের পিঠে। পঞ্চাশ ঘা পড়তেই বীরবল বললেন, থামো। একজন ভাগীদার আছে, তার সঙ্গে আমার আধাআধি বখ্‌রা। হুকুম করুন সম্রাট, তাকে ডেকে আনি। আপনি চেনেন তাকে, সে আপনার দ্বারপাল।

● বীরবলী কৌতুক
প্রবোধকুমার সান্যাল

সম্রাটের নির্দেশে দ্বারপাল এলো। বীরবল বললেন, হুজুর, আপনার কাছে পৌঁছবার আগে ওর পাওনা বকশিস দিতে পারিনি, কিন্তু আমার পুরস্কারের আধাআধি ওকে দেবো কথা দিয়েছিলুম। এবার পঞ্চাশ ঘা চাবুক ওর পিঠে বসাতে বলুন।

সম্রাট এবার সমস্ত ব্যাপারটা শুনলেন। এতদিন পরে তিনি জানতে পারলেন, তাঁর দ্বারপাল প্রত্যেক ভদ্রব্যক্তির কাছ থেকে ঘুষ আদায় করে।

পঞ্চাশ ঘা চাবুক—বেশ ওজনে ভারি—এবার দ্বারপালের পিঠে পড়লো। তা'কে জরিমানাও দিতে হোলো অনেক।

কিন্তু সেইদিন থেকে বীরবল সম্রাটের মন্ত্রণ-পরিষদের একজন স্থায়ী সভ্য নিযুক্ত হলেন।

একদিন মন্ত্রীসভার মাঝখানে ব'সে সম্রাট হঠাৎ এক আজগুবী প্রশ্ন করলেন ঃ তিনি বড়, না ঈশ্বর বড়?

কথাটা কানে শুনতে বড় খারাপ। অন্যান্য মন্ত্রীরা একটু আড়ষ্টভাবে চুপ ক'রে রইলেন।

বীরবল ফস ক'রে বললে, সম্রাট, ঈশ্বরের চেয়ে আপনি অনেক বড়। তাঁর চেয়ে অনেক শক্তিমান আপনি। আপনি যা পারেন, ঈশ্বরের তা সাধ্যও নেই।

এহেন মন্তব্য শুনে সবাই অবাক। সম্রাট পর্যন্ত দুঃখিত হয়ে বললেন, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, বীরবল? তুমি কি বলতে চাও আমি যা পারি, ঈশ্বর তা পারেন না?

বীরবল বললেন, হ্যাঁ, ঠিক তাই!

বীরবলের প্রতি অন্য একজন মন্ত্রীর কিছু বিদ্বেষভাব ছিল। তিনি বললেন, অত্যন্ত বাজে কথা! এ হতেই পারে না। সংসারে এমন কিছু নেই যা ঈশ্বর করতে পারেন না। তিনি সর্বশক্তিমান! ঈশ্বর সকলের বড়।

সম্রাট বললেন, নিশ্চয়! এতে কোনও ভুল নেই।

বীরবল দমলেন না। বললেন, ভুল আছে বৈকি। আচ্ছা বলুন ত' সম্রাট আপনি কি কোনও ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন নির্বাসনদণ্ড দিতে পারেন?

সম্রাট বললেন, গুরুতর অপরাধ করলে পারি বৈকি!

বীরবল বললেন, তবে শুনুন সম্রাট, ঈশ্বরের সেরূপ সাধ্য নেই!

মানে? কী বলতে চাও?

বীরবল জবাব দিলেন, ঈশ্বর এ বিশ্বপৃথিবীর সর্বময় কর্তা, তিনি সর্বব্যাপী। সর্বত্র তাঁর অধিকার। সুতরাং গুরুতর অপরাধ করলেও মানুষকে তিনি কোথাও নির্বাসন দিতে পারেন না। তাঁর সে-শক্তি নেই। সেইজন্যেই বলছি, আপনি যা পারেন, তিনি তা পারেন না।

সম্রাট হাসিমুখে এবার বীরবলের কাছে পরাজয় স্বীকার করলেন। অন্যান্য মন্ত্রীদের মাথা হেঁট হোলো।

● বীরবলী কৌতুক
প্রবোধকুমার সান্যাল

রাজসভায় অনেকেই সম্রাটের চাটুকার ছিলেন, এবং সম্রাট তাঁদের বিশেষ পছন্দ করতেন না। অনেক সময়ে তাঁদের অহেতুক তোষামোদ সম্রাটকে বিরক্ত ক'রে তুলতো।

একদিন সম্রাট সহসা পারিষদগণের দিকে তাকিয়ে ব'লে বসলেন, আপনাদের মধ্যে কেউ বলতে পারেন, ঠিক এই মুহূর্তে কা'র মনে কি ভাবনা আছে?

মনের অগোচরে পাপ নেই, সুতরাং অনেকেই যেন একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। কা'রো কা'রো মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে এল। কিন্তু কেউ মুখ খুলে একটি কথা বলতে সাহস পেলে না।

বাদশাহ্ এবার মুখ ফেরালেন বীরবলের দিকে। বীরবল তখন সবিনয়ে প্রশ্ন করলেন, সম্রাট, আমি কি এক একজনের মনের কথা আলাদা ক'রে ধরিয়ে দেবো, না সকলের মনের কথা এক কথাতেই বলবো?

সম্রাট হাসিমুখে বললেন, যদি এক কথায় বলতে পারো, মন্দ কি?

সভাস্থ সকলে ভয়ে ও অস্বস্তিতে কাঠ হয়ে রইলো। সকলের মুখে চোখে ভয়ানক উৎকণ্ঠা। বীরবলকে বিশ্বাস নেই, কি বলতে সে কি ব'লে বসবে—কেউ জানে না। হয়ত অপমানে সকলের মাথাই হেঁট হবে, হয়ত সকলেই হয়ে উঠবে সম্রাটের ঘৃণার পাত্র।

বীরবল বললেন, এখানে যাঁরা উপস্থিত রয়েছেন, তাঁদের সকলের মনে একটিমাত্র কথাই বুঝতে পারা যাচ্ছে, জাহাঁপনা!

অনেকের কপালে আর মুখে ভয়ে ঘাম বেরিয়ে গেল। সবাই যেন ভীষণ এক সঙ্কটের সামনে দাঁড়িয়েছে, প্রতি মুহূর্ত গুণছে সবাই। রাজসভা নিস্তব্ধ।

বীরবল ভাবলেন, এই হোলো ঠিক সময়! তখন তিনি হাসলেন। বললেন, সম্রাট, আকাশে সূর্য-চন্দ্র যতদিন, ততদিন আপনার রাজ্যে আনন্দ, মহিমা ও কল্যাণ বিরাজ করুক, এই হোলো সকলের একমাত্র মনের কথা!

সকলের দম আট্‌কে এসেছিল এতক্ষণ। এবার হঠাৎ চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। বীরবল যেন তাঁদের সবাইকে ম্যাজিক দেখিয়ে দিলেন।

সম্রাট তামাক খান না, এবং ধূমপান করেন না—একথা বীরবলের জানা ছিল। একদিন তাঁরা দুজনে রাজপ্রাসাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সবুজ মাঠের দিকে তাকিয়েছিলেন—সেখানে তামাকের চাষ করা হয়েছে। তাঁরা চারিদিকের প্রাকৃতিক শোভা দেখছিলেন। হঠাৎ বাদশাহের চোখে পড়লো, একটি গাধা তামাক-চাষের ক্ষেত্রে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বীরবল তামাক খান্, সম্রাট একথা জানতেন।

সম্রাট বললেন, দেখেছ বীরবল, এমন যে গাধা, সেও কিন্তু তামাক ছোঁয় না!

বীরবল বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ সম্রাট, আরো কোন কোন জন্তু আছে, যারা তামাক ছোঁয় না!

সম্রাট এই বাক্যবাণের আঘাতে হেসে উঠে বীরবলকে আলিঙ্গন করলেন।

---

# গীতাপাঠ

শ্রীকালিদাস রায়

[শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে]

দক্ষিণাপথে অনেক তীর্থ ঘুরে
শ্রীচৈতন্য জ্যৈষ্ঠের শেষে এলে শ্রীরঙ্গপুরে,
সিক্ত করিয়া ভক্তি অশ্রুজালে
সাধু বেঙ্কটভট্ট নমিল তাঁহার চরণ তলে।
নিবেদিল—"প্রভু, আমার ভবনে অতিথি হইতে হবে,
তীর্থ হউক আমার ভবন পদধূলি-গৌরবে।
কত কাল হ'তে পথ চেয়ে আছি আমি
আমারে করুণা করিতেই হবে, স্বামী।"
কহিলেন প্রভু—"আশ্রয় মোর নাই।
শুধু ভালবাসে যে ডাকে আমায় তাহারি ভবনে যাই।

গীতাব্যাখ্যাতা পণ্ডিত দলে দলে
শরণ লউক তোমার চরণতলে।
অভিমানে মাতোয়ারা,
গীতার মর্ম্ম বুঝে যাক এসে তারা।
গীতাপাঠে দেখি তোমারিত অধিকার,
তুমিই জেনেছ গীতার অর্থসার।
যত দিন আমি শ্রীরঙ্গপুরে আছি
হে ভক্তবর তোমারি সঙ্গ যাচি।"

উপহাস যারা করিত, সবাই তখন আসিল ছুটে
ধন্য হইল গীতাপাঠকের চরণের ধূলি লুটে।

---

বরং দরিদ্রঃ শ্রুতিশাস্ত্রপরায়ণো
না চাপি মুখে দশকোটিনায়কঃ।
—ন্যায়দীপিকা

## মণি ও মুক্তা

দশকোটি টাকা আছে যে ধনীর, তার মুখের চেয়ে কপর্দ্দকহীন দরিদ্র পণ্ডিতের মুখ শত কোটিগুণ ভাল।

# আয়রন ম্যান

## সুষমা সেন

"তারপর ফরাসীরা ইংরাজদের নিকট পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। এই সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী ফরাসীদের অধিকৃত স্থানগুলি ইংরাজদের নিকট ছাড়িয়া দিতে হইল। ইতিহাসে ইহাকে বলে বশ্যতামূলক সন্ধি। এই সন্ধির ফলে—"

"স্যার! বশ্যতামূলক সন্ধি কি?"

বাধা পেয়ে চুপ করে গেলেন নীলরতন মাষ্টার। বইখানা টেবিলে উপুড় করে রেখে চোখ থেকে চশমা খুললেন। তারপর দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলেন ক্লাশের সমস্ত ছেলের মুখের 'পরে।

"কেডা কয়? মাণিক নাকি রে?"

নীলরতনবাবু এককালে পূর্ব্ব বঙ্গে মাষ্টারী করতেন। মাঝে মাঝে তাঁর কথায় পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা বেরিয়ে পড়তো। বিশেষ করে ঠাট্টা বা বিদ্রূপ করতে কিংবা ক্রুদ্ধ হলে তিনি টানের মাত্রা বাড়িয়ে দিতেন। তার ওপর যদি ভয়ানক রেগে যেতেন তাঁর কথা বোঝা সহজ ছিল না তখন, কিংবা বলা যেতে পারে তাঁর কথাবার্ত্তা দুর্ব্বোধ্য হলেই ক্লাশের ছেলেরা বুঝতো আজ কারুর পিঠের চামড়া তুলবেন থার্ড মাষ্টার মশাই।

তাই নীলরতনবাবুর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে অনেকে প্রমাদ গুণ্‌লো। সামনে-বসা ভাল ছেলের দল বিরক্তমুখে লাষ্ট বেঞ্চের মাণিককে দেখে আবার মুখ ঘুরিয়ে নিল। তাদের একজন মোড় ফিরাবার জন্যে বললে, "স্যার! আপনি পড়াতে সুরু করুন।"
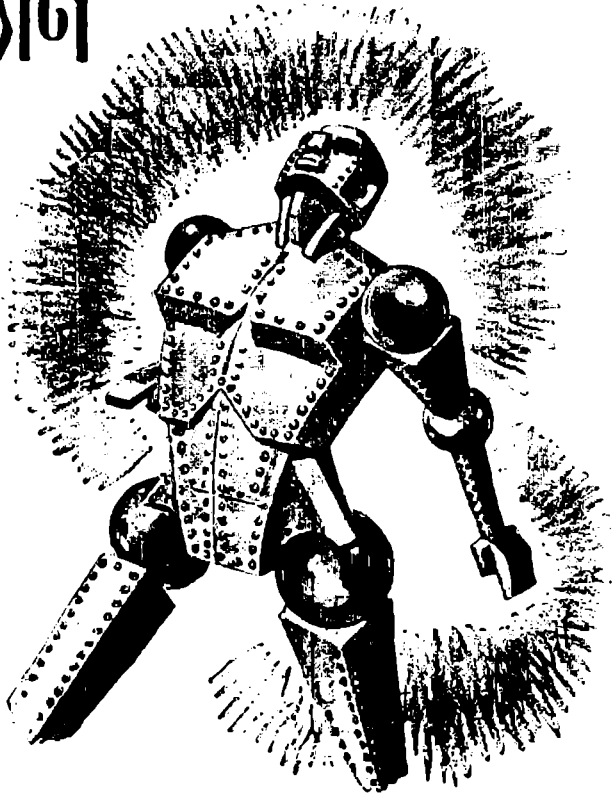
ক্লাসের অতি পাজী ছেলে মাণিক। এই মাণিকের জন্যে অনেকদিন অনেক পিরিয়ড নষ্ট হয়েছে অনেক মাষ্টারের।

অচিন্তনীয়, অকম্পিত উদ্ভট প্রশ্ন করে মাষ্টারদের উত্ত্যক্ত এবং ছেলেদের পড়ার ক্ষতি করাই ছিল তার স্বভাব। এক এক দিন কোন কোন শিক্ষক তার বেয়াদপির জন্যে তাকে মারতে মারতে ক্লাশের বাইরে বার করে পড়াতে আরম্ভ করতেন।

অথচ সকলেই জানে একমাত্র ছেলে মাণিকের ওপর কত ভরসা করে আছেন তার বিধবা মা।

অল্প বয়সেই মাণিক তার বাবাকে হারিয়েছিল। মাণিক তার মায়ের একমাত্র সন্তান। ঐ একটা ছেলেকে বড় করে তুলতে তার মা যে কত পরিশ্রম কত কষ্ট স্বীকার করছেন, মাণিক সে সব বুঝতো না, আর বোঝবার চেষ্টাও করতো না।

মৃত্যুর পূর্ব্বে মাণিকের বাবা কিছু টাকা রেখে গেছলেন। মাণিকের মায়ের উদ্দেশ্য ছিল কোন মতে ছেলেটাকে তিনি বড় করে তুলবেন। কিন্তু তাঁর আশার ইমারত ধূলিসাৎ হতে বেশীদিন দেরী হোল না। বয়স বাড়ার সঙ্গে মাণিকের পড়াশুনায় গাফিলতি প্রকাশ পেল এবং বদমাইসিতে পাকা হয়ে উঠলো সে। অনেক চেষ্টা করেও তিনি তার মতি ফেরাতে পারলেন না।

কথায় বলে, 'কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো'; কতদিন নীলরতনবাবু তার মায়ের মনোকষ্ট, তাদের সংসারের কথা তুলে নানারকমভাবে বুঝাতে থাকেন, কত বড় বড় মানুষের উদাহরণ দেন, ভাল ভাল বাছা বাছা কথা বলেন।

কাকস্য পরিবেদনা! বেতের চোটে পিঠ ফেটে রক্ত বেরিয়ে গেছে, মাণিক একটুও 'উঃ আঃ' করেনি। ক্লাশ থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে আহত জায়গায় হাত বুলিয়ে হাসতে হাসতে হয়ত পাশের সঙ্গীকে বললে, "বড্ড ঠেঙ্গিয়েছে রে নীলরতন স্যার! কাল দেখে নিস্ স্যার কাঁদবে নিজের হাতের বেদনায়।"

সেই নীলরতনবাবু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন এক মুহূর্ত্ত। মাণিকের মুখের পরে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। লক্ষ্য করলেন তার মুখে ভীতির কোন চিহ্নই নেই, নেই কোন সশঙ্কভাব। চোখ মিট্ মিট্ করে সে মৃদু মৃদু হাসছে।

ধৈর্য্যচ্যুতি হতে বেশী দেরী হোল না তাঁর। ক্ষিপ্র পায়ে বেঞ্চের সারি পার হয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। বাঁহাতে মাণিকের চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে বেঞ্চের বাইরে টেনে আনলেন, রুদ্ধশ্বাসে কয়েক মুহূর্ত্ত হিংস্রভাবে চড়, কিল, গাঁট্টা এলোপাথাড়ি চালালেন। পাতলা, রোগা, দোমড়ানো তাঁর দেহখানা রাগে উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে। ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "এইবার যা কইমু আমি তাই শুনবা। হেইটারেই কয় বশ্যতামূলক সন্ধি। বোঝলা?"

মাণিক কাঁধ দুলিয়ে জামা ঠিক করতে করতে বললে, "বড্ড কঠিন সন্ধির সর্ত্ত, স্যার!"

মুখের দু'পাশে, ঠোঁটের ওপরে ক্ষীণ দাড়ি-গোঁফের চিহ্ন। তার বিশাল শরীরটার দিকে আরো

● আয়রন ম্যান
সুষমা সেন

একবার চমকে তাকালেন। নিজের অসাড় হাত দুটো মুঠো করে নতমুখে ফিরে এলেন নীলরতনবাবু। লক্ষ্য করলে দেখা যেত তিনি নীরবে দু' ফোঁটা চোখের জল জামার হাতায় মুছে নিলেন।

হয়ত—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই ঐ হতভাগা ছেলেটার ভবিষ্যৎ এবং তার বিধবা মায়ের বেদনাক্লিষ্ট মুখখানা তাঁর চোখের জল বার করেছে।

বইপত্র গুটিয়ে ধীরে ধীরে ক্লাশ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন থার্ড মাষ্টার মশাই।

তবুও মাণিককে শুধরাতে পারা গেল না। কোন কোন দিন নীলরতনবাবু পুরো ঘণ্টাটাই মাণিককে সামনের বেঞ্চে বসিয়ে পড়া বোঝাতেন। আবার কোনদিন পুরানো পড়া ধরতে গিয়ে হয়ত জিজ্ঞাসা করতেন, "হ্যাঁরে মাণ্‌কে! পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কেন হয়েছিল?"

মাণিক গম্ভীর স্বরে জবাব দিত, "বোধহয় স্থলপথে সুবিধে হয়নি, স্যার।"

ব্যাস্‌! আর যায় কোথায়। নির্ব্বিকার মাণিক বেমালুম মার হজম করে 'সারে যাঁহাসে আচ্ছা, হিন্দুস্থান হামারা' গান গাইতে গাইতে মার্চ্চ করে বাড়ী রওনা হয়ে গেল।

হিড় হিড় করে বেঞ্চের বাইরে টেনে আনলেন... [পৃঃ ৪৬

কেউ কেউ সন্দেহ করতেন, মাণিকের মাথা খারাপ আছে। আবার অনেকে বলতেন, "তা নয়, ওটা সেয়ানা বদমাইস্‌।"

হেডমাষ্টার মশাই কতবার চেয়েছিলেন তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিতে। নিজে গোল্লায় গেছে, সঙ্গদোষে আরো কতকগুলো ছেলে যাতে নষ্ট না হয় আগে থেকেই সতর্ক হওয়া একান্ত দরকার। এই কথা তিনি বোঝাতেন নীলরতনবাবুকে।

● আয়রন ম্যান

সুষমা সেন

মাণিক তাঁকে অস্থির করে, ক্লাশের টিউটরী নষ্ট করে, এত জেনেও নীলরতনবাবু মাণিককে তাড়িয়ে দেওয়ায় সায় দেননি। মনের কোণে কোথাও হয়ত পিতৃহীন ছেলেটার জন্যে দুর্ব্বলতা লুকিয়েছিল, বিরলে বসে অনেকক্ষণ চিন্তা করতেন কোন্ পদ্ধতিতে ছেলেটাকে পথে আনা যায়।

তবুও যা হওয়ার নয় তার জন্যে মিথ্যা পণ্ডশ্রম করতেন তিনি।

বাৎসরিক পরীক্ষার আর বেশী দেরী নেই। সকলেই আসন্ন পরীক্ষার পড়ায় ব্যস্ত। নীলরতনবাবু ছেলেদের ইম্পরটেন্ট নোট দিচ্ছেন।

বলছেন, 'ক্লাইভ ছেলেবেলায় অত্যন্ত দুরন্ত ছিল। তার জ্বালায় সকলে অস্থির হয়ে উঠেছিল, পড়াশুনায় তার কোনদিন মন ছিল না। তখন তার বাবা উপায় না পেয়ে তাকে ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেরাণী করে পাঠিয়ে দিলেন। ভারতে এসে ক্লাইভ মসী ছেড়ে দিয়ে অসি ধরলো এবং ঐকান্তিক অধ্যবসায়ে ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে ক্লাইভ নবাবী ফৌজ পর্য্যুদস্ত করে ভারতে ইংরেজ শাসন কায়েম করলো। ইতিহাসে ক্লাইভের নাম এই কারণেই উল্লেখযোগ্য।'

"আচ্ছা মাণিক, আরো একজন ক্লাইভের মত ঐতিহাসিক নেতার নাম কর তো?"

সপ্রতিভ মাণিক তড়াক করে উঠে পড়লো। সামনের দিকে বুকের পেশী ঝুঁকিয়ে বললে, "আয়রণম্যান শ্রীমাণিক পাল।"

মাঝে মাঝে নীলরতন ভাবেন মাণিক কি ইচ্ছা করেই মার খাবার জন্যে ঐসব আবোল তাবোল বলে? কাছে ডেকে পিঠে হাত বুলিয়েও বুঝিয়েছেন, মাণিক তখন বলেছে, "স্যার, ওসব বাবা বাছা আমার ভাল লাগে না। যাতে পোষায় তাই করুন।"

বাৎসরিক পরীক্ষার ফল বেরুলো। মাণিক সব বিষয়েই ফেল করেছে আর ইতিহাসে পেয়েছে শূন্য।

মাণিকের মা বাড়ীর সামনে নিমের গাছে উদাসনয়নে চেয়েছিলেন। সন্ধ্যা হতে চললো মাণিক তখনও বাড়ী ফেরেনি। ক্লাশ প্রমোশনের দিন। অন্যান্য বাড়ীর ছেলেরা সকলে হাসিমুখে ফিরে এল, মাণিকের পাত্তা নেই। যদিও তিনি জানেন মাণিক পাশ করতে পারেনি তবুও উদ্বিগ্ন হন ছেলে তাঁর শান্ত নয়, এই কথা ভেবে।

হঠাৎ বাইরে গোলমালের আওয়াজ শুনে তিনি বারান্দায় নেমে এলেন। কোলাহল করতে করতে কয়েকজন লোক যেন তাঁর বাড়ীর দিকেই আসছে। মাণিকের মা অজানা আশঙ্কায় বিবর্ণ হয়ে উঠলেন। একাধিক দুশ্চিন্তা তাঁর মনের কোণে উঁকি দিল।

সহসা গোলযোগ সদর দরজার কাছেই বেশী মনে হোল। মাণিকের মা বেরিয়ে আসতেই একজন ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বললেন, "ঐ যে খুনেটার মা বেরিয়েছে।"

আরো একজন লোক কাছে এসে জোর গলায় বললে, "এই যে মাণ্‌কের মা। সেই গুণ্ডাটা কৈ? হারামজাদাকে পুলিশে দোব। কি মনে করেছ কি তোমরা? ছেলেকে খুনে, চোর, ডাকাত, লুঠেরা তৈরী

● আয়রন ম্যান
সুষমা সেন

করবার ইচ্ছা নাকি তোমার?"

মাণিকের মা পাংশুমুখে কাঠ হয়ে দরজা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"তোমাকে আমরা সাবধান করতে এসেছি এই শেষবার....তোমার ছেলে..."

"কে বটে মশাই আপনি?"—পিছনের লাঠিধারী লোকগুলোকে দু'হাতে সরিয়ে দিয়ে ইতিমধ্যে মাণিক হাজির হোল। মাকে আড়াল করে প্রথম বক্তার মুখোমুখি দাঁড়ালো মাণিক।

মাণিককে দেখে দুইজনে রাগে হুঙ্কার ছাড়লেন। গর্জ্জে উঠ্‌লেন, "কি মনে করেছিস রে ছোঁড়া?"

মাণিক বাধা দিল, বললে, "তার আগে আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, মাকে তুমি...তুমি করে কথা শোনাচ্ছেন কোন্ সাহসে? মা কি কাউকে তুই-তোকারি করেছেন?"

"তোরাও এক হাত লড়বি নাকি রে?" ।পৃঃ ৫০

থতমত খেলেন ভদ্রলোক, তবুও কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বললেন, "সে কথা পরে হবে। ব্যাপার কি তোর? সমীরকে মেরেছিস কেন?"

মাণিকের ঠোঁটের কোণে তাচ্ছিল্যের হাসি, বললে, "ব্যাপার পরে হবে। আগে ইংরাজী বলুন দেখি?"

● আয়রন ম্যান
সুষমা সেন

ভদ্রলোক ক্রমশঃ ঘাবড়ে যান। পিছনের লাঠিয়ালদের পানে এক ঝলক তাকিয়ে বললেন, "ইংরাজী বলব? তার অর্থ?"

"অর্থ গুরুতর।" মাণিক বললে, কলার তুলে দিয়ে, "হ্যাঁ, ইংরাজী বলতে হবে। আপনার ছেলে ইংরাজী বলেছে, 'Old Monkey, man may come, man may go, but you remain in same class.' তাতেই সমীরের ঘাড়টায় একটু ঝাঁকুনি দিয়েছিলাম। তা আপনার ঘি-দুধ, ননী-খাওয়া ছেলে মূর্চ্ছা গেলেন। তাই বলছি ইংরাজী বলবেন তো বলুন।"

"ওঃ তোর যে খুব চর্ব্বি হয়েছে রে!" ভদ্রলোক পিছনের একজন লাঠিয়ালকে চোখের ইসারা করলেন।

লোকটা কাছে আসতেই মাণিক ধাঁ করে তাকে লাঠি সমেত পাঁজাকোলা করে তুলে নিল, তারপর ছেড়ে দিয়ে হাতের লাঠিটা কেড়ে নিয়ে বাঁ হাঁটুর চাপে ভেঙ্গে দু'টুকরো করে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, "যা বাপু, ঐ ন্যাংলা শরীরটায় আর লাঠি নিয়ে এগিয়ে আসিস্ না, দেখলে ঘেন্না করে। তা যাক্, তোরাও এক হাত লড়বি নাকি রে?"

ভদ্রলোকের পিছনে দণ্ডায়মান আরো তিনজন লাঠিধারীকে উদ্দেশ করে মাণিক কথা কয়টা ছুঁড়ে দিল।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক বললেন, "চৌধুরীবাবু! এসব হাঙ্গামায় যাবার দরকার নেই। থানায় একটা আগে ডায়েরী করে রাখা ভাল।"

কথাটা তাদের মনঃপূত হোল। ওরা পিছন ফিরতেই মাণিক হো হো করে উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠে, "সেই ভাল, যা করলে পোষাবে তাই করুন।"

মাণিকের মা এমনিতেই কথা কম বলেন। এখনও কিছু না বলে নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে এলেন।

মাণিকের সঙ্গে তিনি একটি কথাও বললেন না। সোজা ঠাকুরঘরে এসে রাধাকৃষ্ণের চরণে লুটিয়ে পড়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

"ঠাকুর! কি পাপে এমন ভাবে আমায় শাস্তি দিচ্ছ! তুমি মাণিকের সুমতি দাও। আমার মৃত্যুতেও যদি ওর জ্ঞান হয় তবে তাই করো ভগবান। তাই করো তুমি।"

অনেকক্ষণ তিনি ঠাকুরঘরে বসে রইলেন।

এদিকে অন্ধকার জমে উঠেছে। খুনে ছেলেটা আবার কি করছে কে জানে! মাণিকের মা চোখ মুছতে মুছতে বাইরে এলেন।

মাকে দেখে মাণিক একগাল হেসে বললে, "নিরাপত্তার একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফেল্লুম মা। দু'জোড়া তেল চুকচুকে লাঠি মজুত রাখলুম। এবার নির্ভাবনায় থাকতে পার।"

ওর মা বললেন, "তুই আবার ফেল করলি মাণিক?"

মাণিক বললে, "জীবনে পাশ ফেল তো আছেই মা। রবার্ট ব্রুস নাকি—"

"চুপ কর্ হতভাগা! তোর জন্যে কি আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো? আমি মরলে তুই কি শান্ত হবি?"

মাণিক মৃদু হাসলো, বললে, "তুমি এখনও ছেলেমানুষ আছ মা।" তারপর পরম বিজ্ঞের মত

● আয়রন ম্যান
সুষমা সেন

মাথা দোলাতে দোলাতে বাইরে চলে গেল। আপন মনে বিড় বিড় করে বললে, "হুঁ! সব মা-রাই এমনি ছেলেমানুষ।"

পরদিন স্কুলে প্রধান শিক্ষক অন্যান্যদের সঙ্গে অফিস ঘরে অবসর যাপন করছিলেন। প্রমোশনের পর কয়েকদিন স্কুল বন্ধ থেকে আবার নতুন ক্লাশ সুরু হয়। ইতিমধ্যে প্রায়ই ফেল-করা ছেলেরা হেডমাষ্টারের কাছে প্রমোশনের জন্যে আসে। দু'এক নম্বরের জন্যে যারা ফেল করে, তাদের ভালভাবে পড়বার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ক্লাশে উঠিয়ে দেন।

মাণিক নীলরতনবাবুর পিছনে মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়ালো, অস্ফুটস্বরে বললে, "স্যার, মা পাঠিয়ে দিলেন।"

মাণিককে দেখে শিক্ষকদের ওষ্ঠপ্রান্তে ব্যঙ্গ হাসির ঢেউ খেলে গেল। নীলরতনবাবু বিদ্রূপ হাসিতে মুখ ভরিয়ে দিয়ে বললেন, "হেডমাষ্টার মশাই, মাণিক আইলো। এরে আপনি প্রমোশন দিয়া দ্যান। দ্যাখছেন...গোঁফ দাড়ি বেরাইয়া গ্যাছে গিয়া।"

হেডমাষ্টার মশাই একবারও দৃকপাত করলেন না। নিজমনেই অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে গল্প করতে লাগলেন।

নীলরতনবাবু আবার বললেন, "আহাহা বেচারা আবার ফেল করসে। এক ক্লাশেই মাণ্‌কে বুড়া হইয়া যাইব।"

তাঁর রসিকতায় সকলে হেসে উঠলেন। হেডমাষ্টার মাণিককে দূর দূর করে উঠলেন।

নীলরতনবাবু বললেন, "আহাহা, অমন করেন ক্যান। মাণ্‌কেরে একবার দ্যাখেন দয়া করিয়া।"

বিরক্তমুখে হেডমাষ্টার মশাই বললেন, "ওকে কি করে প্রমোশন দেব? ইতিহাসে গাধাটা জিরো পেয়েছে যে..."

"পাইসে তো?" নীলরতনবাবু সোৎসাহে বললেন, "জিরো তো পাইসে? কেডা পায়? কেডা জিরো পায় হেডমাষ্টার মশাই?"

মাণিককে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ মজা উপভোগ করলেন সকলে। অনেকের ধারণা মাণিকের হৃদয় আর মস্তিষ্ক বলে কোন জিনিষ নেই। মাণিক কাঁদতে জানে না। কোনদিন কেউ তাকে কাঁদতে দেখেনি। কুকুরের মত বেত্রাহত হয়েও সে অটল থাকে। ওর ঐ অদ্ভুত সহনশীলতা দেখে সকলে আশ্চর্য্য হয়,— মাণিক বোধ হয় একটা নরপশু। পশুও নয় তার অধম। পশুদের মারলে তারাও কাঁইকুঁই করে প্রতিবাদ জানায়।

মাণিকের মায়ের বরাবর হার্টের অসুখ ছিল। সেই ঘটনার পর মাঝে মাঝে হার্টের অসুখটা আবার প্রকাশ পাচ্ছিল। সেদিন বিকেলে কিছু সুস্থ বোধ করতে তিনি বারান্দায় মাদুর পেতে বসে ছিলেন।

"মাণিকের মা বাড়ীতে আছেন?"

কেউ ডাকলে মাণিকের মা ভীষণ চমকে উঠেন। বুকখানা ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। বুঝিবা হৃদ্‌পিণ্ডের ধুকধুকানি এখুনি থেমে যাবে। বাইরের যে কোন ডাকে তিনি ভয়ানক ভীত হন, তাই চোখ বুজে ঠাকুরের নাম জপ করতে লাগলেন।

নীলরতনবাবু বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, শব্দ করে ভিতরে ঢুকে ওর মাকে দেখে বললেন, "এই যে মা, ভাল আছেন তো?"

● আয়রন ম্যান

সুষমা সেন

একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন মা, স্মিতমুখে বললেন, "আসুন! আসুন মাষ্টারমশাই, বসুন।"

"বুঝলেন মা, এবারও মাণিককে ক্লাশে উঠিয়ে দেওয়া হোল, হতভাগার আর শিক্ষা হোল না।",

ওর মা বললেন, "আমি মরলে হবে হয়ত। মাষ্টারমশাই, জ্ঞানতঃ আমি কোন অন্যায় করিনি, আমার এত মন্দভাগ্য হোল কেন?"

সন্তানের মূর্খতা মাতৃত্বের চরম অপমান। মাষ্টারমশাই গুম্ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। আস্তে আস্তে বললেন, "হতভাগার হৃদয় বলে কোন বস্তু নেই। এত যে মারি, গালাগাল দিই—কোন চেতনাবোধ নেই। মার খেয়ে ও যদি কাঁদতো, তাহলে বুঝতাম ওর মধ্যে মানুষ আছে। ওটা একটা পাষাণ, একটা কালাপাহাড়।"

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে মাণিকের মা বললেন, "মাষ্টারমশাই, আমি মরলে ও কি ভাল হবে? আমার মৃত্যুতে ওর চেতনা হবে?"

"নারায়ণ! নারায়ণ! এসব কথা আমি ভাবতে পারি না মা, আজ উঠি আমি। ভগবান্ মাণিকের সুমতি দিন!"

নতুন ক্লাশে উঠেও মাণিকের কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। নীলরতনবাবু লম্বা চাবুক এনে একেক দিন বেধড়ক বেতিয়েছেন। শেষে নিজেই পরিশ্রান্ত হয়ে চেয়ারে বসে পড়েছেন।

মাণিক হেসে বলেছে, "স্যার! 'ইন্‌কমপ্লিট' রয়ে গেল। এদিকটা বাকী আছে এখনও।" বলে তার শরীরের ডান অঙ্গ দেখিয়ে দিয়েছে। তারপরেই, "...আঘাত খেয়ে অচল রবো, বক্ষে আমার দুঃখে তব বাজবে জয়ডঙ্ক।" রবীন্দ্রনাথের কবিতা আওড়াতে আওড়াতে ক্লাশ ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

কয়েকদিন পর ক্লাশের শান্তশিষ্ট ভাব দেখে নীলরতনবাবু অবাক্ হলেন। কোথাও যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেক্‌ছে অথচ লজ্জাতে ছাত্রদের কাছে কিছু প্রকাশ করতেও পারছেন না।

পড়াতে বসে দেখলেন নিজেই কেবল অমনোযোগী হয়ে যাচ্ছেন। অবশেষে আর থাকতে না পেরে বলেই ফেললেন, "হ্যাঁরে অতনু, আজ মাণিক এলো না কেন?"

"মাণিকের মায়ের খুব বাড়াবাড়ি অসুখ স্যার। বোধহয় সেইজন্যেই আসতে পারেনি।"

সেদিনই সন্ধ্যায় তিনি মাণিকদের বাড়ী গেলেন। খুবই অসুস্থ দেখাচ্ছিল তার মাকে। কয়েকজন অল্পবয়স্কা ভদ্রমহিলা তাঁর শুশ্রূষা করছিলেন। মাণিককে তিনি কোথাও খুঁজে পেলেন না।

জিজ্ঞাসা করতে একজন মহিলা বললেন, "সে কি বাড়ীতে থাকে, মাষ্টারমশাই? মায়ের আজ তিনদিন ধরে অসুখ, একবার কাছে এসেও বসেনি ছোঁড়া। কোথায় যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে হতভাগা।"

অত্যন্ত চিন্তাকুল হয়ে গভীর আঘাত বুকে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন নীলরতনবাবু।

সেইদিনই রাত্রিশেষে মাণিকের মা হার্টফেল করে মারা গেলেন। শববাহকেরা শ্মশানে মৃতদেহ উপস্থিত করলো। তখনও পর্য্যন্ত মাণিকের কোন পাত্তাই নেই। মৃত্যুর পরেও বিধবা তাঁর একমাত্র সন্তানের হাতের আগুন পেলেন না। অবশেষে তাঁর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হোল।

শববাহকেরা বাড়ী ফিরছে এমন সময়ে দূরে দেখতে পাওয়া গেল, মাণিক গান গাইতে গাইতে মাঠের আল ধরে গ্রামের দিকে চলেছে।—"এ কূল ভাঙ্গে, ও কূল গড়ে, এইতো নদীর খেলা।"

মাণিককে তারা ডাকলো, বললে, "কোথায় গেছলে মাণিক?"

মাণিক বললে, "নবগ্রামে যাত্রা শুনতে গেছলাম। তিনদিন জবর প্লে করলে রঞ্জন অপেরা।"

● আয়রন ম্যান

সুষমা সেন

"এদিকে যে তোমার মা স্বর্গে গেছেন।"

মাণিক বললে, "নবগ্রামে খবর পেলুম। কি করবো, মৃত্যু তাঁর কপালে ছিল।"

সকলে হতবাক্। বিস্মিত চোখে চেয়ে রইল তার গমনপথে।

ঘরে ঢুকে মাণিক একবার থমকে দাঁড়ালো। বিছানাশূন্য খাট। মায়ের কয়েকখানা ছেঁড়া কাপড় ইতস্ততঃ ছড়ানো। মাণিক ধীরে ধীরে তার মায়ের ফটোর সামনে দাঁড়ালো। ফটোখানা পেড়ে অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে দেখলো, তারপর বললে, "এইতো মরে গেলে। কেন যে এত আমার জন্যে ছট্‌ফট্ করতে বলতো? কোন লাভ হোল তোমার?"

ফটোটা মাথায় ঠেকিয়ে তাকে রাখতে রাখতে বিমর্ষভাবে নিজ-মনেই বললে, "এই জীবনে তোমার কোন সাধ পূরণ করতে পারলুম না। আমায় ক্ষমা করো মা।"

ক্লাসে এসে নীলরতনবাবু পড়ায় মন বসাতে পারেন না। বাইরে বাইরে শোনেন মাণিক নাকি ভয়ানক বদমাইসি করে বেড়াচ্ছে। এমন কি কাণাঘুষায় জানা গেল কতকগুলো লোক মাণিকের হাত-পা ভেঙ্গে দেবার ষড়যন্ত্র করছে।

একদিন হেডমাষ্টার মশাই নীলরতনবাবুকে ডাকলেন, হেসে বললেন, "আপনার নামে একটা অভিযোগ আছে মাষ্টারমশাই, কিছু মনে করবেন না। ক্লাশের ছাত্রদের কোন কোন গার্জ্জেন অভিযোগ করেছে আপনি নাকি ক্লাশে একদম পড়াচ্ছেন না? আপনার কি শরীর খারাপ হয়েছে, না-হয় কিছুদিন ছুটি নিন্।"

ব্যস্তভাবে নীলরতনবাবু বললেন, "বলেছে বুঝি? না, না, আমি ভালই আছি।"

বাইরে এসে ভাবেন কি হবে কোথাকার কে একটা বদ ছোঁড়া, তার কথা চিন্তা করে? তবুও কেন জানিনা মন অকারণে চঞ্চল হয়ে যায়। বইয়ের পাতা থেকে জান্‌লা গলিয়ে দূর নীল দিগন্তে দৃষ্টি প্রসারিত করে আনমনা হয়ে পড়েন নীলরতনবাবু।

একদিন চুপি চুপি অতনুকে ডেকে বললেন, "মাণিককে একবার আমার কাছে ডেকে আনিস বাবা! বল্‌বি থার্ড মাষ্টার মশাই জরুরী ডেকেছেন, বুঝলি?"

অতনু চলে যায়। থার্ড মাষ্টার নীলরতনবাবু অফিস রুমের এক কোণে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন।

কিছুক্ষণ পরেই অতনু ফিরে আসে। নীলরতনবাবুকে ডাকতে গিয়ে চমকে থেমে পড়ে। ডেস্কে মাথা নীচু করে তিনি ফুলে ফুলে কাঁদছেন। অতনু ভয়ে ভয়ে পাশে এসে দাঁড়ালো, বললে, "স্যার! আপনি কাঁদছেন?"

নীলরতনবাবু মুখ তুললেন, তাঁর দু'চোখ থেকে অবিরাম ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে। কান্নাবিকৃত কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁরে বাবা, আমি কাঁদছি। দেখে যা তোদের থার্ড মাষ্টার ছেলেমানুষের মত কাঁদছে। আমি কাঁদছি কিন্তু সেই পাষাণটা তো কাঁদে না? বুঝলি বাবা, আমার ত্রিশ বছরের মাষ্টারী জীবনে আমি কিছুই পড়াতে শিখিনি। কিছুই শিখিনি। একটা ছেলেকে মানুষ করতে পারলুম না-রে। আমি আবার মাষ্টার!"



অতনু ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, মৃদুকণ্ঠে বললে, "মাণিক এল না স্যার। বললে কারো চাকর নই আমি। যার দরকার পড়বে সে আমার কাছে আসবে।"

"জানি সে আসবে না। যা বাবা, ক্লাশে চলে যা। ভাল করে মন দিয়ে পড়িস্। সেই আয়রণম্যানটার

● আয়রন ম্যান

সুষমা সেন

মত হোস্ না তোরা। ভগবান তোদের মঙ্গল করুন।"

তারপর আরো একদিন হেডমাষ্টার নীলরতনবাবুকে ডেকে পাঠালেন। কিছুক্ষণ আমতা আমতা করে সরাসরি বলেই ফেললেন, "মাষ্টার মশাই, অনেকদিন তো আপনার চাকরী হোল। এবার 'রিজাইন' করুন।"

নীলরতনবাবু চুপ করে রইলেন, পরে বললেন, "তাই ভাবছি হেডমাষ্টার মশাই। বহু বৎসর মাষ্টারী করলাম। বয়সও হোল অনেক। আজকাল আবার চোখেও চালশে দেখছি। আমি ভাবছিলাম চাক্‌রী ছেড়ে দিয়ে দেশে গিয়ে শেষ জীবনটা কাটাই।"

আরো একদিন মধ্যাহ্নে বিরাট সভায় ফুলের মালা দিয়ে নীলরতনবাবুকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানানো হোল। অনেকে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। অনেকে নীলরতনবাবুর মাষ্টারী জীবন আলোচনা করলেন।

সভার শেষে নীলরতনবাবু অতনুকে ডাকলেন, "মাণিক আসেনি অতনু?"

"না স্যর।"

চিরজীবনের মত এই গ্রামের মায়া কাটিয়ে তাঁকে চলে যেতে হবে। যাবার আগে একবার মাণিকের সঙ্গে দেখা হলে যেন ভাল হোত। কোথায় আছে, কেমন আছে, কি করছে ছেলেটা কে বল্‌বে? অনেক চেষ্টা করেও তিনি মাণিকের সঙ্গে দেখা করতে পারলেন না। অবশেষে যাবার দিন ঘনিয়ে এলো। সন্ধ্যার সময় ট্রেন। নদীর ওপারে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে। নীলরতনবাবু বেলা থাকতেই রওনা হয়ে পড়লেন। ঘাটে এসে নৌকা ভাড়া করে মাল-পত্তর বোঝাই করে নৌকা ছাড়তে যাবেন এমন সময়ে কে যেন তাঁর পিছন থেকে পায়ের ধুলো নিল।

পিছন ফিরে দেখলেন মাণিককে। হাতে তার একটা পুঁটুলি। তাতে হয়ত খানকতক জামা প্যান্ট আর তার মা বাবার একটা ফটো আছে।

মুহূর্ত্তে তিনি জ্বলে উঠলেন, "নাম্, নেমে যা হতভাগা। কেন এসেছিস এখানে?"

মাণিক তাঁর দু' হাঁটুর ওপর ভেঙে পড়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেল্‌লো।

"স্যার, আমি অসহায়। আপনি ছাড়া আজ আমার আর কেউ নেই জগতে। আমায় নিয়ে চলুন স্যার।...আমি...আমি ভাল হবো...প্রতিজ্ঞা করছি, আমি ভাল ছেলে হবো স্যার।"

বিদ্যুতাহত হয়ে চমকে উঠলেন নীলরতনবাবু। দেখলেন...সবিস্ময়ে দেখলেন...মাণিক কাঁদছে... আয়রণম্যান মাণিক পালের দু'চোখে শ্রাবণের পাগলা ধারা নেমেছে!

মাণিক কাঁদছে...মাষ্টার মশাই হাসছেন...এক অচিন্তনীয় অকল্পিত স্বর্গীয় আনন্দে তাঁর অন্তরপাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠলো। সেই আনন্দে—তিনি ভুলে গেলেন নিজেকে...ভুলে গেলেন তাঁর বিগত ত্রিশ বৎসরের মাষ্টারী জীবনকে...ভুলে গেলেন এই পৃথিবী।

দু'হাতে মাণিককে বুকে টেনে আবেগের সঙ্গে বললেন, "তুই যে আমার সাত রাজার ধন মাণিক। সর্দ্দার প্যাটেলের মত তোকেও আমি তেম্‌নি আয়রণম্যান করবো। তোকে মস্ত বড় করবো। তুই বড় হবি। লোকে তোকে দেখিয়ে বলবে নীলরতন মাষ্টারের সুযোগ্য ছাত্র লৌহমানব মাণিক পাল।

চল্ বাবা, আমরা আলোয় আলোয় চলে যাই।"

বিকেলের পড়ন্ত সূর্য্যের আলো চারচোখে ঝাপসা হোল।

---

● আয়রন ম্যান
সুষমা সেন

# এস নর, এস নারী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

মহাভারতের এই মহাপুণ্যময় তপোবনে,
যজ্ঞধূম পরিব্যাপ্ত নভে, উদাত্ত বৈদিক সামগানে।

অধ্বর্য্যু উদ্‌গাতা হোতা
ব্রহ্মারূপী ব্রহ্মর্ষি-মণ্ডল,
নর-কল্যাণের লাগি
তুষিতেন দেবতা সকল।
ইন্দ্র মিত্রে বরুণেরে
অশ্বিনীকুমারে হবির্দানি,
দৈব-কোপ শান্ত করি;
দেবতা যে মন্ত্র-অভিমানী।
সেদিনে তাঁদের পাশে
শোভা পেতো কন্যা মনোরমা,
জ্ঞানে গরীয়সী দৃপ্তা;
ব্রহ্মার মানস-পুত্রী সমা।
ব্রহ্মবাদী-জনকের
ব্রহ্মবিদ্যা-পারগা দুহিতা,
পবিত্রা কুমারী চির,
কৃচ্ছ্রব্রতা পুণ্যা শুচিস্মিতা।

আজিও ভারত হ'তে সে আদর্শ হয়নি বিলীন,
তাঁদের কল্যাণবাণী আজিও ধ্বনিছে রাত্রিদিন।

শুনিতে পাইবে আজও শ্রদ্ধাভরে যদি পাতো কান,
গগনে পবনে আজও ভাসিতেছে সে মহা আহ্বান।

গার্গী ও মৈত্রেয়ী তাঁরা
উঠেছেন বহু উপরে যে,
সীতা সাবিত্রীর সনে
গান্ধারীও ছিল এ সমাজে।
দময়ন্তী মদালসা খনা
লীলাবতী আরও কে, কে,
কাহারে রাখিয়া বাকি
পরিচিতা করিব কাহাকে ?
বুদ্ধের শান্তির বাণী
মানবের শ্রেষ্ঠতম দান,
সঙ্ঘমিত্রা চারুমতী
লয়ে সেই মহা অবদান,

দুর্লঙ্ঘ পর্ব্বত লঙ্ঘি
উত্তাল সাগর হয়ে পার,
বুদ্ধের অহিংসনীতি
দেশে দেশে করেছে প্রচার।
হে মোর কুমারীবৃন্দ
তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরি,
নবীন ভারতে আজ
তাঁদের আসন লও বরি।

আজও সেই যজ্ঞধূমে মেঘে মেঘে ভরে দেয় জল,
দাহ জ্বালা জুড়াইয়া ধরণীরে করে সে শীতল।

● এস নর, এস নারী
শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

উদ্ধত উন্মত্ত গিরি, কারে যার পাদে মাথা নত,
যাবে তা' বিলুপ্ত হয়? মরে যাহা করেছে অ-মৃত !
মন্ত্র-বীর্য্যহত সর্প মন্ত্র-সিদ্ধ বংশীরব শুনি,
সেমত বিক্ষুব্ধ বিশ্বে সেই শক্তি শান্তি দিবে আনি।
সিদ্ধার্থ ও মহাবীর শুনালেন যে শান্তি-বচন,
আজও তা' হয়নি স্তব্ধ, চলিতেছে সে অনুরণন্ !
মন্ত্র-স্তব্ধ বিশ্ববাসী চেয়ে আছে পূর্ণ প্রত্যাশায়,
যে মন্ত্রে উদ্দাম-সিন্ধু সংযমে সংহত হয়ে যায়।
রক্ত লোভাতুর বিশ্বে শুনাতে সে বাণী সুমহান্,
বিশ্বাধীশ দিয়েছেন তোমাদেরই বিশ্বস্ত আহ্বান।
এসো নর, এসো নারী ! একসূত্রে বাঁধি প্রাণ-মন,
স্বদেশ বিদেশ ভুলি শান্তিযজ্ঞে লহ নিমন্ত্রণ !

গ্রীষ্মকালে দিনং দীর্ঘং শীতকালে তু শব্বরী
পরোপতাপিনঃ সর্ব্বে প্রায়শো দীর্ঘজীবিনঃ।
—উদ্ভট শ্লোক

গ্রীষ্মকালে দিন দীর্ঘ, শীতকালে রাত্রি দীর্ঘ, পরকে যারা কষ্ট দেয় তারাই বুঝি দীর্ঘজীবী হয়!

# কমল মাঝির গল্প

## তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন বুড়া কমল মাঝি মারা গেল। বয়স হয়েছিল নব্বুই, বিরানব্বুই কি পঁচানব্বুই। আমারই বয়স যাট হতে চলল। ছেলেবেলায় কমলকে দেখেছি—ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর বয়স তো হবেই তখন। কমল কত গল্প বলত। ওদের নিজেদের গল্প। খবর পেয়ে দেখতে গেলাম কালকেপুরের ডাঙ্গায়। শান্তিনিকেতনের আশপাশের লাল কাঁকরের টিলা খোয়াই ছিল কালকেপুরের ডাঙ্গা। আজ সোত্তর বছর ওখানে ওরা বাস করছে। দেখলাম শস্য-শ্যামল প্রান্তর হয়েছে আজ কালকেপুরের ডাঙ্গা। ওরাই কেটে কেটে ক'রেছে। চাষ ক'রে ক'রে উর্ব্বর ক'রে তুলেছে।

কমলের ছেলেরা নেই। মরে গেছে। পাড়ার লোকেরা গান গেয়ে কাঁদছে। কাঁদতে হয়।

'হায়রে—হায়রে! ছাতার উমুল তিএঃ দ।'

তার মানে—হায়রে হায়রে—আমার ছাতার ছায়া! আমার ছত্রছায়া আজ উড়ে গেল!

একজন কাঁদছিল—'হায়রে হায়রে কুঁইডি মিরু তিএঃ দ।' অর্থাৎ হায়রে হায়রে আমার মহুয়া বনের টিয়া—আমার মহুয়া বনের টিয়া আজ উড়ে গেল!

এসব গান ওদের চিরকেলে গান। এসব প্রথা ওদের সেই আদ্যিকালের প্রথা। কাঁদবার নিয়ম। তাই কাঁদছে। নইলে নব্বুই পঁচানব্বুই বছরের বৃদ্ধের জন্য কাঁদবে কে? কমলের জন্য যারা কাঁদবার মানুষ তারা সবাই চলে গেছে। কমলই তাদের জন্য কেঁদেছে।

আমার ছেলেবেলায় কমল আমাদের বাড়ীতে কৃষাণ ছিল। সজীব একটি পাহাড়ের মত কমলের চেহারা ছিল তখন। আমার সঙ্গে একটি হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল তার। ভারী ভালবাসত আমাকে। আমাকে

সে গল্প বলত। ওদের গল্প। কমল ছিল ওদের সমাজের মাতব্বর ব্যক্তি। কালকেপুরের ডাঙ্গার সাঁওতালদের সমাজপতি।

কমলের সংকারের জন্য ওরা প্রস্তুত হচ্ছে।

আমার মনে পড়ল কমলের মুখে শোনা একটি গল্প। আমি তখন সাহিত্যসেবা এবং দেশসেবা একসঙ্গে ক'রে যাই। জেল থেকে সদ্য ফিরেছি তখন। উনিশ শো একত্রিশ সাল। কমল এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। বললে—তুর সঙ্গে দেখাটি কুরতে এলম গো। লোকে বুলছে, তু সাহেবান লোকের লোকের সঙ্গে লড়াই দিছিস। আবার বুলছে, অনেক সব লিখছিস পড়ছিস। ছাপা হ'চ্ছে সি সব গুলান। তা তু জানিস এই পিথিমী টো কি ক'রে তৈয়ার হলো? বুলছিস, ই মাটি গুলান তুদের। তা জানিস ই সব? শুন আমার কাছে। তুর বইয়ে লিখে দিস। আর বিচার ক'রে তবে কাম করিস। বুঝলি?

আমার কৌতূহল হয়েছিল। বলেছিলাম—বল, শুনি। কি ক'রে এ সব জানব বল? তুই তো কখনও বলিস নি।

কমল বলেছিল—তবে শুন্।

ওদের সৃষ্টিতত্ত্বের কথা।

পায়ে দলে মানুষটি ভেঙে দিলে।

আদিতে পৃথিবী জলময় ছিল। জলের নীচে ছিল, মাটি। তখন ঠাকুরজীউ অর্থাৎ ভগবান জলজীব,—কাঁকড়া, হাঙ্গর, কুমীর, রাঘব বোয়াল, শোল, চিংড়ী মাছ, কেঁচো, কচ্ছপ ইত্যাদি সৃষ্টি করলেন। তারপর ঠাকুর বললেন—এবার কাদের সৃষ্টি করব? মানুষ সৃষ্টি করবার ইচ্ছা হল তাঁর। তিনি মাটি দিয়ে মানুষ গড়লেন; মানুষ তৈরী শেষ হলে প্রাণ দেবেন সেই মানুষে, এমন সময় আকাশ থেকে 'সিঞ্ সাদম' অর্থাৎ সূর্য্যের ঘোড়া নেমে এসে পায়ে দলে মানুষটি ভেঙে দিলে। সৃষ্টি নষ্ট হওয়ায়

● কমল মাঝির গল্প
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠাকুর খুব দুঃখিত হলেন।

তখন ঠাকুর ঠিক করলেন—আর কোন কিছু মাটি দিয়ে তৈরী করবেন না। তাই পাখী সৃষ্টি করলেন নিজের বুকের ময়লা দিয়ে। তৈরী করলেন হাঁস এবং হাঁসীল পাখী। এ দুটি হাতের ওপরে রেখে দেখতে লাগলেন, খুব সুন্দর লাগায় ঠাকুর ফুঁ দিলেন। পাখীরা ঠাকুরের ফুঁয়ে প্রাণ পেয়ে আকাশে উড়ে গেল। জলমগ্ন পৃথিবীতে কোথাও বসবার জায়গা নাই, পাখীরা তাই উড়ে উড়েই বেড়ায় আর পরিশ্রান্ত হলে নেমে এসে ঠাকুরের হাতে বসে।

সেই সময় 'সিঞ্ সাদম' 'ওড়ে সুগম' অর্থাৎ সূর্য্যের ঘোড়া পবিত্র সুতোর সাহায্যে জল খাবার জন্য আকাশ থেকে নেমে এল। জল খাবার সময় 'সিঞ্ সাদম' মুখের ফেনা ফেলে গেল জলের উপরে। ফেনা জলে ভাসতে থাকল এবং এই থেকেই জলের ফেনা সৃষ্টি হল।

ঠাকুর তখন পাখী দুটিকে বললেন—যাও ফেনার উপরে বস। পাখী দুটি ফেনার উপরে বসল এবং জলে জলে সমস্ত পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে লাগল। ফেনা যেন তাদের নৌকো হল। কিছুদিন পর পাখীরা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বললে—ঘুরে ঘুরেই তো শুধু বেড়াচ্ছি, খাবার তো কোথাও পাচ্ছি না।

ঠাকুর কুমীরকে ডেকে পাঠালেন। কুমীর এসে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলে—ঠাকুর, আমাকে ডেকেছেন কেন?

ঠাকুর বললেন—কুমীর, মাটি তুলে আনতে পারবে জলের তলা থেকে?

কুমীর জানাল—ঠাকুরের আদেশ পেলেই তুলে আনব।

কুমীর ঠাকুরের নির্দ্দেশে জলের তলা হতে মাটি আনছিল, কিন্তু সেই সমস্ত মাটি জলেই গলে গেল।

চিংড়ী মাছকে ডাকলেন ঠাকুর। চিংড়ী মাছ এল। চিংড়ী বললে—ঠাকুর, আমাকে স্মরণ করেছেন?

ঠাকুর তাকেও বললেন—মাটি এনে দিতে পারবে?

চিংড়ী মাছ বললে—আপনার আদেশ পেলে নিশ্চয় পারব।

ঠাকুর বললেন—নিয়ে এস মাটি।

চিংড়ী জলে ডুবে দাঁড়ায় করে মাটি তুলে আনতে আনতে দেখলে সব মাটিই গলে যাচ্ছে। সেও পারলে না।

এবার রাঘব বোয়ালকে ঠাকুর ডাকলেন। রাঘব বোয়াল এসে প্রশ্ন করলে—ঠাকুর, আমাকে ডেকেছেন কেন?

ঠাকুর বললেন—মাটি এনে দিতে পার?

রাঘব বোয়াল উত্তর দিলে—আপনার আদেশে নিশ্চয়ই পারি। এই বলে সে জলের নীচে নেমে গিয়ে কিছু মাটি মুখে কামড়িয়ে এবং কিছু নিজের পিঠে চাপিয়ে জলের ওপরে উঠতে লাগল। কিন্তু

- কমল মাঝির গল্প
  তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ওপরে এসে দেখলে সব মাটি জলে ধুয়ে গেছে। সেই সঙ্গে পিঠের আঁশও আর নেই, মাটির সঙ্গে উঠে গেছে। এই সময় হতে বোয়াল মাছ আঁশশূন্য হল।

তারপর ঠাকুর ডাকলেন পাথুরে কাঁকড়াকে। সে এল এবং বললে—কেন ডেকেছেন ঠাকুর?

ঠাকুর বললেন—মাটি তুলতে পারবে?

কাঁকড়া ঠাকুরকে উত্তর দিলে—আপনি আদেশ করলে নিশ্চয়ই পারি।

কাঁকড়া জলে নেমে দাঁড়ায় করে মাটি আনবার সময় বুঝলে মাটি গলে যাচ্ছে জলের স্পর্শে। সেও ব্যর্থ হল।

এবার কেঁচোর কথা মনে হল ঠাকুরের। কেঁচো এল। সেই একই প্রশ্ন করলে কেঁচো—কেন ডেকেছেন ঠাকুর?

ঠাকুরের এক কথা—মাটি আনতে পারবে জলের তলা থেকে?

কেঁচো ঠাকুরকে উত্তর দিলে—যদি কচ্ছপ জলের উপরে স্থির হয়ে দাঁড়ায় তা হলে আপনার আদেশে নিশ্চয়ই পারব।

ঠাকুর কচ্ছপকে ডেকে বললেন—মাটি কেউ তুলতে পারছে না। কেবল কেঁচো বলেছে, যদি কচ্ছপ জলের ওপর দাঁড়ায় তবেই সে পারবে।

কচ্ছপ জবাব দিলে—আপনি আদেশ করলে দাঁড়াতে পারি। কচ্ছপ জলে গিয়ে স্থির হয়ে ভেসে থাকল। ঠাকুর তখন কচ্ছপের চার পায়ে শেকল দিয়ে বেঁধে চার কোণে টান করে আটকে দিলেন; যাতে কচ্ছপ সরে না যায়। কচ্ছপও এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কেঁচো তখন মাটি তুলবার জন্যে জলের নীচে নামল। মাটির নাগাল পেল সে মুখ দিয়ে, আর লেজের অংশটি রাখল কচ্ছপের পিঠের ওপরে। কেঁচো জলের নীচে মুখ দিয়ে মাটি খেতে লাগল আর সেই মাটি লেজ দিয়ে কচ্ছপের পিঠের ওপর বার করে দিলে। সেই মাটি কচ্ছপের পিঠে সরের মত বসে গেল। কেঁচো মাটি খায় আর তুলেই যায়, তুলেই যায়। সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তুলে গেল। পৃথিবী পূর্ণ হলে কেঁচো মাটি তোলা বন্ধ করলে।

মাটি তোলা শেষ হল, ঠাকুর মই দিতে বললেন মাটি ঠিক করবার জন্য। মই দিতে দিতে স্থানে স্থানে মাটির স্তূপ সৃষ্টি হল মই আটকিয়ে গিয়ে। এই স্তূপগুলিই হল পাহাড়-পর্ব্বত। যে ফেনাগুলি জলে ভাসছিল সেগুলি মাটিতে আটকে গেল। ঐ ফেনার ওপরে ঠাকুর বেনা বীজ বুনলেন এবং তা হতে প্রথম গাছ বেনা গাছের জন্ম হল। এর পর ঠাকুর দূর্ব্বা ঘাসের বীজ বুনলেন; তার পিছনে করম গাছ, তার পরে সরজম অর্থাৎ শাল, ক্রমে আসন, মহুয়া এবং আরও নানাপ্রকার গাছের বীজ।

পৃথিবী শক্ত হল। যেখানে যেখানে জল থেকে গেল সেখানে ঘাসের চাপড়া বসিয়ে এবং যে সব বড় বড় ছিদ্র দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছিল সেখানে পাথরের চাটানী অর্থাৎ বড় চাপ বসিয়ে দিয়ে পৃথিবী আরও শক্ত করা হ'ল।

● কমল মাঝির গল্প

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়

এদিকে বেনা গাছের ঝোপে ঐ পাখী দুটি বাসা বেঁধে দুটি ডিম পাড়লে। স্ত্রী পাখীটি তা দেয় আর পুরুষটি খাদ্য সংগ্রহ করে। ক্রমে ডিম দুটি ফেটে বাচ্ছা হল। কি আশ্চর্য্য! এই বাচ্ছা দুটি তো পাখীর বাচ্ছা নয়! এ তো মানুষের বাচ্ছা! একটি ছেলে আর একটি মেয়ে! তাই পাখী দুটি গান গাইল—

'হায় হায় জলাপুরির
হায় হায় নুকিন মেনেয়া
হায় হায় বুসি আকান্‌কিন্
হায় হায় নুকিন মেনেয়া'

অর্থাৎ—

হায় হায় দুঃখ সাগরে
হায় হায় এই মানব শিশু
হায় হায় জনম নিল যে
হায় হায় এই মানব শিশু।

ছেলে মেয়ে দুটিকে পিঠে নিয়ে হিহিড়ী পিপিড়ী দ্বীপে রওনা হল।

পাখী দুটি মহা ভাবনায় পড়ল। এই শিশুদিকে কেমন করে পালন করবে! এরা খাবে কি? তখন পাখী দুটি ঠাকুরকে ডাকতে লাগল। ঠাকুর এলেন ওদের কাছে। ওরা তখন শিশু দুটিকে কেমন করে বড় করে তুলবে এই কথাই নিবেদন করলে। ঠাকুর তাদের তুলো দিয়ে বললেন—যে যে জিনিষ তোমরা খাবে তার রস তৈরী করবে, সেই রসে তুলো ভিজিয়ে ঐ তুলো শিশুর মুখে চুষতে দেবে।

ঐ রকম করে তুলোর চুষি খেয়ে মানুষের বাচ্ছা দুটি একটু একটু করে বড় হতে থাকল। ক্রমে পাখীর ছোট বাসাতে তাদের থাকবার আর জায়গা হল না, এমন অবস্থায় পাখী দুটি আবার ঠাকুরের কাছে দরবার করলে। ঠাকুরকে শিশু দুটির থাকার কথা জানালে। ঠাকুর তাদের বললেন—তোমরা নিজেরাই খুঁজে বের কর। উড়ে উড়ে সন্ধান করে বেড়াও।

বিকেলবেলায় পাখী দুটি ছেলে মেয়ে দুটির থাকবার জায়গা খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল। খুঁজতে খুঁজতে তারা হিহিড়ী পিপিড়ী দ্বীপে এসে হাজির হল। দ্বীপটি তাদের ভাল লাগল। ফিরে গিয়ে পাখী দুটি হিহিড়ী পিপিড়ী দ্বীপের কথা ঠাকুরকে জানিয়ে সেখানে যাবার প্রার্থনা জানালে। ঠাকুর তাদের ছেলে মেয়ে

- কমল মাঝির গল্প
  তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়

দুটিকে সেখানে নিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন। পাখী দুটি তাদের পিঠে নিয়ে হিহিড়ী পিপিড়ী দ্বীপে রওনা হল।

ছেলে মেয়ে দুটিকে দ্বীপে পৌছে দিয়ে হাঁস হাঁসালী পাখী দুটি কোথায় চলে গেল। তারা যে কোথায় গেল সে কথা আমাদের পূর্ব্বপুরুষ বলে যান নি, তাই আমরা জানি না—এই পর্য্যন্ত বলে কমল মাঝি হাত জোড় করে উর্দ্ধদিকে মুখ করে নমস্কার করলে। সম্ভবতঃ ঐ পাখী দুটির উদ্দেশে।

এই মানুষ দুটির নাম 'হাড়াম' এবং 'আয়ো'—কমল মাঝি আবার বলতে শুরু করলে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা।

—কেউ কেউ বলে 'পিলচু হাড়াম' 'পিলচু বুড়ো' এবং 'পিচুচুবুটি' অর্থাৎ পিলচু বুড়ি। সেই হিহিড়ী পিপিড়ী দ্বীপে তাঁরা সুন্থুবুকুচ ঘাস ও শ্যামা ঘাসের বীজ খেয়ে বেড়ে উঠলেন।

ওই উরাই হলেন মানুষদের বাবা আর মা। উয়াদের হল ছেল্যা-পিলা। বেটা বিটি।

তা পরেতে 'লিটা' ঠাকুর এসে উয়াদের কাপড় পরতে শিখালে। তা পরেতে—সব জোড়া জোড়া চলে গেল ই দেশ উ দেশ। কারুর রঙ হল সাদা, কারুর হল কাল, কারুর হল হলুদ। তাদের আবার ছেলে পিলা হল। পিঁপড়ার মত পিল পিল ক'রে বাড়ল। দেশ ভ'রে গেল। তা পরেতে মারামারি লাগালে। এ ইয়াক সঙ্গে ও উয়ার সঙ্গে মারামারি লাঠালাঠি। তীর ধনুক। তা পরেতে তুরা বন্দুক সন্দুক নিয়ে মার করছিস।

* * * *

সে দিন হেসে ছিলাম।

তারপর কতদিন চলে গেল। মহাযুদ্ধ হয়ে গেল। নাগাসিকি—হিরোসিমা। চীনের গৃহযুদ্ধ। কোরিয়ার উত্তর দক্ষিণে লড়াই। কত রক্তই না পড়ল পৃথিবীতে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। কত মানুষ মরল দুর্ভিক্ষে অনাহারে। এর মধ্যে আর দুবার দেখা হয়েছিল কমলের সঙ্গে।

একবার শুনেছিলাম—সাঁওতালেরাই কমলের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। দেখতে এসেছিলাম। কমল মাথায় ফেটা বেঁধে একটা ভাঙা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল। রক্তপাত বেশ হয়েছিল। ক্লান্ত কমল চোখ বন্ধ করে ঝিমুচ্ছিল। কমলকে ডাকতেই সে চোখ মেলে তাকিয়ে আমাকে দেখে হেসেছিল। বলেছিল—দেখ।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কি হল? গাঁয়ের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করলি কেন?

বলেছিল—উঁহু আমি ঝগড়া করি নাই রে! উয়ারা দু দল হয়ে ল্যাই (ঝগড়া) করলে—আমি থামাতে গেলাম। তা মারলে দু দলেই আমাকে। শেষ যখন লহু (রক্ত) পড়ল—তখন থামল। বললাম সবাই বুড়া বুড়ীর ছেল্যা পিলা—ল্যাই করিস না! তা বুঝে না। মানে না। বুঝলি রক্ত পড়লে তবে থামে।

কিছুক্ষণ পর আবার বলেছিল—তাও বুঝলি—ই উয়ার রক্ত লিলে—উ ইয়ার রক্ত লিলে—

● কমল মাঝির গল্প
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সে রক্ত থামে না। তাতে মাতন বাড়ে। ঝগড়া যি করে না—সি এসে মাথাটি পেতে দিলে—সেই মাথা থেকে রক্ত পড়লে তবে থামে।

বুড়া বুড়ীর ছেল্যা পিলাদের বুকের ভিতর একটো ক'রে পিরেত আছে। তারাই রক্ত খায়। ই উয়াকে মেরে খায় উ ইয়াকে মেরে খায়। কিন্তুক শুধু রক্ত খেতে পারে না। রক্তর সঙ্গে রাগের ফোড়ন না থাকলে সি রক্ত পিরেতের তেতো লাগে। হয় রাগের ফোড়ন লয় লোভের ফোড়ন। রাগ করে ল্যাই ক'রে আমরা এ উয়ার মাথা ফাটাই কাঁড় দিয়ে বিঁধে মারি। আর লোভ করে মদের সঙ্গে মাস (মাংস) খাবার লেগ্যা পাখী মারি, হরিণ মারি, বরা মারি, জানোয়ার মারি। কিন্তুক যার লোভ নাই—যার রাগ নাই—তার লহু তিতো লাগে পিরেতের। আর তার ছিটে গায়ে লাগলে—কুঁকুড়ে যায়। পিরেতের গায়ের বল চলে যায়। তার ভয় লাগে। সি তখন লুকায়ে পড়ে।

হেসে বলেছিল—তাই পড়ল লইলে আমি বাঁচতম না। মেরে ফেলাইত। দেখ কেনে এখুন উয়াদের কত লাজ হয়েছে দেখ কেনে! কেউ ছামুতে আসতে লারছে। ওই পিরেতটা যদি না থাকত মানুষের বুকে—তবে যি হড় গুলান (মানুষ) দেবতা হয়ে যেত।

বিস্ময়াভিভূত হয়ে ফিরে এসেছিলাম। বুঝতে পারিনি এ বোধি ওই আরণ্য সভ্যতার মধ্যে থেকেও মানুষটি পেলে কি করে?

মনে পড়েছিল গান্ধীজীর কথা বুদ্ধের কথা।

সেই কমল মরেছে।

মরেছে আঘাতের ফলেই। কমলের বুকে একটা ক্ষত চিহ্ন দগ্‌দগ্ করছে। এবার কিন্তু কমল ঝগড়া থামাতে গিয়ে আঘাতটা পায়নি। কমল এবার ঝগড়া করতে গিয়েছিল। এই বিরানব্বই বছর বয়সে—সেই পিরেতটা তাকে ঝগড়া করিয়েছে। লড়াই করিয়েছে। আশ্চর্য্য মনে হবে। কিন্তু আশ্চর্য্য সত্য। লড়াই হয়েছে সোনা মাঝির সঙ্গে!

সোনা মাঝিরও বয়স হয়েছে প্রায় সোত্তোর। সেই কমলের পরে মাতব্বর হবে সাঁওতালদের। কমলই সে কথা সাঁওতালদের কাছে হাজারবার বলেছে। এই দেখ, আমার পরে তুরা সোনার কথা মানবি। উয়ার পিরেত বশ মেনেছে উয়ার। হুঁ!

সত্যই সোনা কমলের মহত্ত্ব বুঝেছিল। সে তাকে গুরুর মত মানত। তার পথ ধরে চলত। মধ্যে মধ্যে এসে বসত কমলের কাছে। কমল জিজ্ঞাসা করত—

—কি রে? এসে বুসলি ক্যানে এমন করে?

—পিরেত টো হাঁকু পাঁকু করছে মরং মাঝি। রাগ হছে।

কখনও বলত—লোভ হছে। কখনও বলত—এমন হছে কি বুলব। মনে হছে ওই ছোঁড়াটার বুকের লহু গড়ায়ে দি।

কমল বলত—মনে মনে বল—বুড়া বুড়ীর ছেল্যা—উ বটে—তু বটে। হুঁ। ভাই বটে। ভাই বটে।

● কমল মাঝির গল্প
তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়
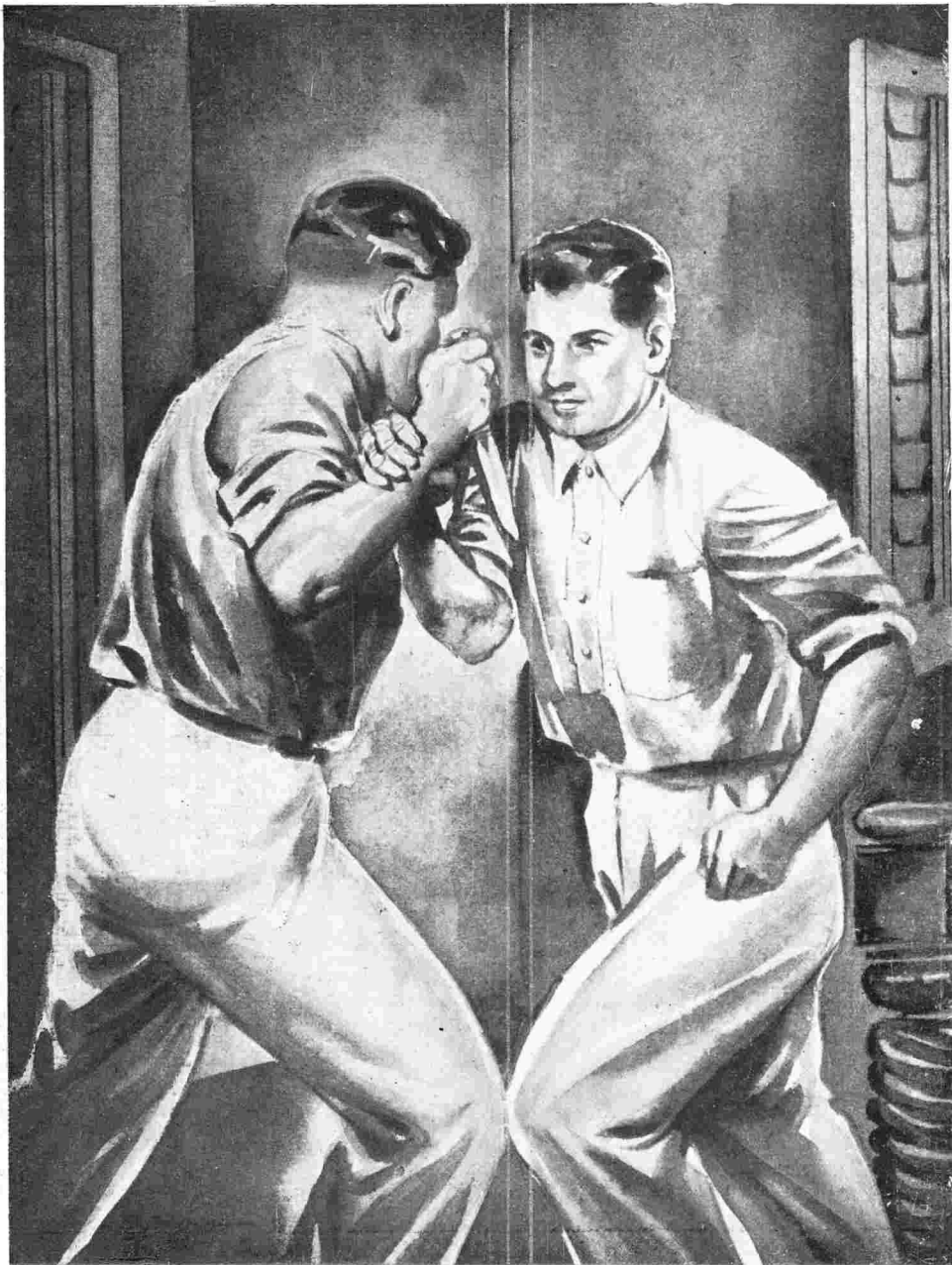
টর্চটা ফেলে দিয়েই তার ছোরাশুদ্ধ হাতখানি চেপে ধরলো।
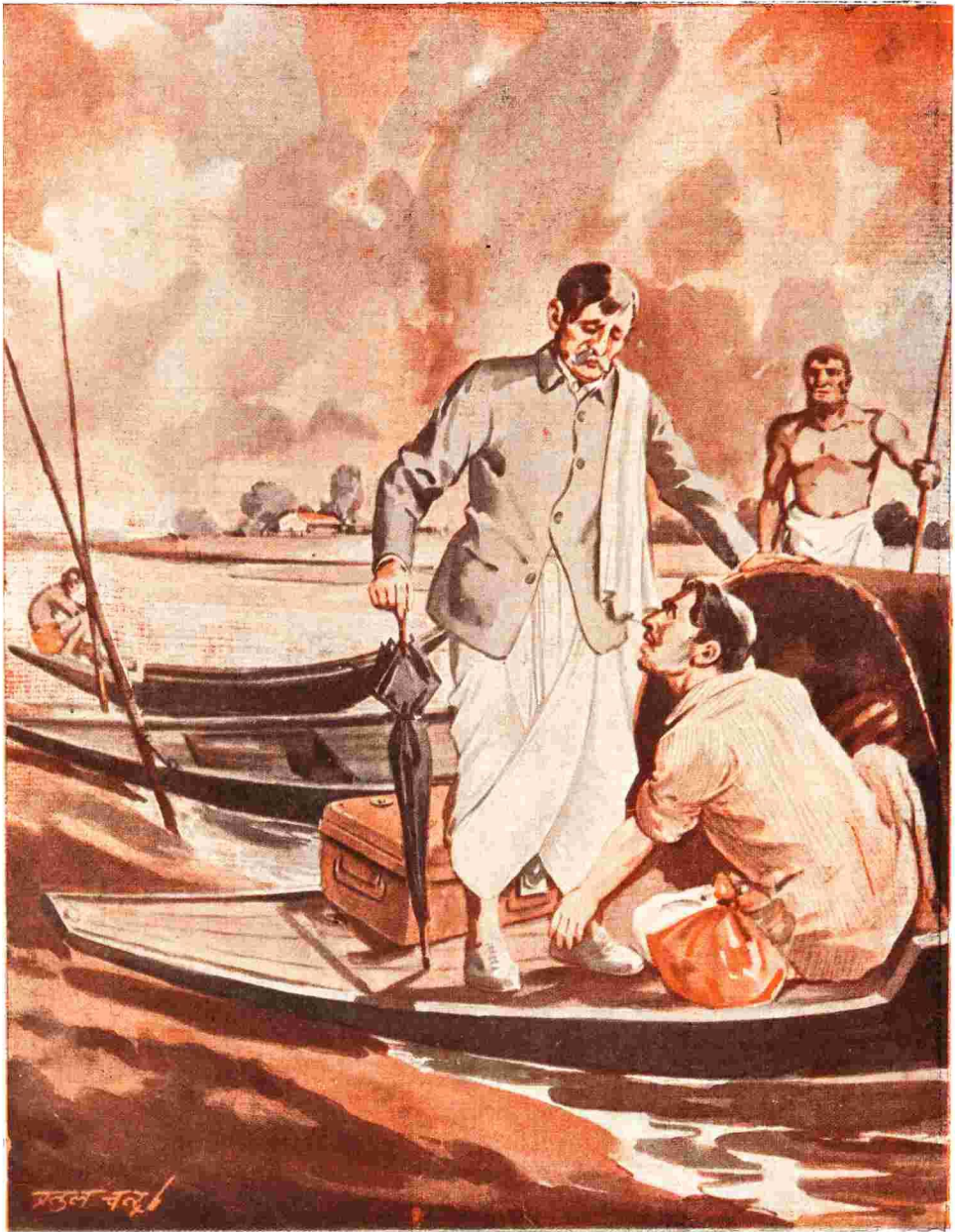
স্যার, আমি অসহায়, আপনি ছাড়া আজ আমার আর··

ভাই বটে ! আর আজ হাঁড়িয়া খাবি না। বেশী যদি হাঁকু পাঁকু করে পিরেতটো তবে নিজের লহু খানিকটা চিরে মাটিতে ফেলায়ে দে। বল—লে খা। লে খা। লে খা।

সোনা তাই করত।

ইদানীং সোনাই ওদের পাড়ার ঝগড়া-ঝাঁটি মেটাত। কমলই পাঠাত। কমলের কাছে সোনা আসত—খবর দিত—কমল বলত—তুই যা।

আজ সপ্তাহ খানেক ধ'রে পাড়ায় একটা বিবাদ ধোঁয়ানো আগুনের মত গুমরে গুমরে জ্বলছিল। সোনা মেটাবার চেষ্টা করছিল। কমলের শরীর ভাল ছিল না—কমলকে খবরটা দেয় নি। কেনই বা দেবে? বুড়োকে আর বিব্রত কেন করবে? হয় তো বা সোনা ভেবেছিল বুড়া যা পারে—সেও তাই পারে। সুতরাং বুড়াকে আর কেন?

হঠাৎ কাল মারামারি বেধে উঠেছিল।

মারামারি হবার কথা নয়। ব্যাপারটা সোজা মিটিয়েই এনেছিল। কিন্তু সন্ধ্যায় হাঁড়িয়া খেয়ে দু দুলই নেশার ঝোঁকে গালাগালি সুরু করে। তাই থেকে মারামারি। কিল চড়। দেখতে দেখতে লাঠি বেরিয়ে পড়েছিল! সোনা ছুটে এসে দাঁড়িয়েছিল মাঝখানে।

—না। না। বুড়া বুড়ীর ছেলা। ভাই বটে। ভাই বটে।

—আঁ—আঁ—আঁ। তু কে? [পৃঃ ৬৬

হঠাৎ ভাঙা গলায় কে চীৎকার ক'রে উঠেছিল—সরে যা—তু সরে যা। পালা—তু পালা।

কমল মাঝি সে।

বুড়ো কমল মাঝির ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি কেউ দেখে নি। সে ভয়ঙ্কর ভীষণ মূর্ত্তি। বলতে বলতে—সে এসে সোনা মাঝির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

—তু কে? তু কে? আঁ? আমাকে খবর না দিয়ে—ইসব করবার তু কে?

সোনা চীৎকার করে উঠেছিল—মাঝি—মাঝি—সর্দার—মরং মাঝি!

কমল এ কথার উত্তর দেয় নি। শুধু ওই এক কথা তার মুখে—

—তু কে? তু কে? তু কে?

সোনার কণ্ঠনালীটা চেপে ধ'রেছিল বৃদ্ধ বাঘের মত ; না—ভালুকের মত। আর সে এক গোঁ-গোঁ চীৎকার।—আঁ—আঁ—আঁ! তু কে?

শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল সোনার। সবলে সে বৃদ্ধ কমলকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল—কমল আছাড় খেয়ে পড়েছিল একটা পাথরের উপর। ধারালো কোণা ছিল পাথরটায়। সেই কোণাটায় পড়েছিল বুকের পাঁজরা চেপে। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল কমল। রক্তও পড়েছিল।

আজ পাঁচ দিনের কথা। এর মধ্যে জ্ঞান হয় নি কমলের। মধ্যে মধ্যে বিড় বিড় করেছে—তু কে? তু কে? তু কে?

সোনাই ওর ছেলের কাজ করছে। সৎকার সেই করবে।

# সংস্কৃত-সাহিত্যের কাহিনী

## ● সুভাষিতাবলী

[বাংলা ভাষায় কবিতার চয়নগ্রন্থকে প্রথা করে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর চয়নিকা প্রকাশ করে। সংস্কৃত ভাষায় এইরকম কতকগুলি চয়নিকা গ্রন্থ আছে, যার কাব্যমূল্যের তুলনা হয় না। সুভাষিতাবলী হলো এইরকম একটি কাব্য চয়নিকা।]

এই অপরূপ চয়নগ্রন্থের গ্রন্থকার হলেন বল্লভদেব, তিনি অনুমান একাদশ শতাব্দীর লোক। এই বিরাট কাব্য-সংগ্রহে ৩৫২৭টি শ্লোক আছে এবং প্রায় সাড়ে তিনশো কবির রচনা আছে। তবে এই বিরাট সংখ্যক কবিদের নাম আমরা অনেকেই জানি না এবং তাঁদের অন্যসব লেখা হারিয়ে গিয়েছে। কারুর আছে মাত্র একটি শ্লোক, কারুর হয়ত সাত আটটি কিন্তু এই স্বল্প শ্লোক থেকে বোঝা যায় সেই সব কবিদের ছিল কি অপূর্ব্ব কাব্য-প্রতিভা। বহু কবিতা আছে যা পড়লে মনে হয় কালিদাস বা ভবভূতির মতন কবি ছাড়া আর কারুর দ্বারা তা লেখা সম্ভব নয়। বল্লভদেব এগুলি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন বলে আমরা জানতে পারছি, নইলে এই অসংখ্য কবিদের কোন চিহ্নই থাকতো না।

# আদর কর বাঁদরকে

অন্নদাশঙ্কর রায়

আদর কর বাঁদরকে
বাঁদর যদি কামড়ায় তো
করবে তোমায় আদর কে ?
আদর করবে দাদা
দাদার সঙ্গে আড়ি তোমার—
কাঁচকলা আর আদা ।
আদর করবে দিদি
দিদির দিকে তাকাও না তো—
দিদি কেমন নিধি !
আদর করবে মা
মায়ের কথা কোনো দিন যে
একটি শুনবে না ।
আদর করবে বাবা
বাবাকে তো করতে আদর
উচিত ছিল ভাবা ।
তাই তো বলি, খুকু
সবার সঙ্গে ভাব কর গো
নইলে পাবে দুখু ।

# গৌরব

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

শঙ্কর পড়তে বসেছে।

ভাগিনেয় সুজিত কাছে এসে দাঁড়ায় ; বলে, "বইপত্তর এখন রাখো গুড বয়,—চাকরটাকে নিয়ে একবার বাজারে যাও দেখি। অবিশ্যি তোমায় কিছু কিনতে কাটতে হবে না, শুধু দেখবে, ঠিক দাম দিয়ে সে জিনিসপত্র কিনছে কি না। জানোই তো—রঘুয়া চোরের শিরোমণি, পাঁচ পয়সার জিনিস কিনে পাঁচ আনার হিসেব দেয়, সর্ব্বদা নজর না দিলে চলে না।"

শঙ্কর মাথা চুলকায়, সুজিতের পানে একবার তাকায়, কতকটা অসহায়ভাবে বলে, "কিন্তু আমার যে পরীক্ষা এসে পড়েছে, না পড়লে আমি—"

সুজিত চটে উঠলো, বলে—"পাশ করে তো সবই হবে—কি দরকার লেখাপড়া করে? তোমায় থাকতে হবে তো ধাবধাড়া গোবিন্দপুরের পাড়াগাঁয়ে, সেখানে হয় জমিতে লাঙ্গল চালাবে নয় পুকুরে মাছের চাষ করবে—এছাড়া আর তো কিছু নয়—তুমি জজও হবে না, বাবার মত পুলিশ অফিসারও হবে না ; যাও যাও, উঠে পড়ো, চট করে বাজারটা ঘুরে এসো, দেরী করো না।"

চোখের জল এসে উছলে পড়ে আর কি, অতি কষ্টে বই-খাতাপত্র তুলে রাখে শঙ্কর।

সমবয়সী ভাগিনেয় ততক্ষণ আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে, বার্ণিশ সু পায়ে গুন গুন করে সিনেমার গান ভাঁজতে ভাঁজতে বার হয়ে যায় বন্ধুর বাড়ী ক্যারাম খেলতে। সামনে আসছে ক্যারাম প্রতিযোগিতা, সে প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছে এবং সে জন্য তার হাঁফ ফেলবার অবকাশ নেই।

এ কেবল আজই নয়—প্রায়ই এরকম ব্যাপার ঘটছে। প্রায়ই দেখা যায়—শঙ্কর পড়তে বসলেই বিবিধ ফাই-ফরমাশ এসে উপস্থিত হয় এবং শঙ্করকে সঙ্কুচিতভাবে বইখাতা তুলে রাখতে হয়।

অপরাধ তার অদৃষ্টের।

পিতা সম্পন্ন গৃহস্থ,—দূর পল্লী গোবিন্দপুরে তাঁর বাড়ী। জমি-জমা, বাগান-পুকুর কিছুরই তাঁর অভাব ছিল না। অতিথি সে-বাড়ীর দরজা হতে কোনদিন ফিরে যায়নি। পিতার অকস্মাৎ মৃত্যুর পর কাকা ও জ্যাঠারা বিষয় সম্পত্তি ভাগ করলেন, বেশীর ভাগ তাঁদের ভাগে পড়লো। শঙ্করের ভাগে পড়লো অতি সামান্য, যাতে তাদের মা-ছেলের একটি বৎসরও চলে না।

তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারতেন শঙ্করের মা মহামায়া—যদি শঙ্করের লেখাপড়া শিখবার ব্যবস্থা তার কাকা জ্যাঠারা করতেন।

লেখাপড়া শিখবে—মানুষ হবে, এই ছিল শঙ্করের একান্ত ইচ্ছা। তার জন্যই তার মা দেবর ও ভাসুরের দ্বারস্থ হয়েছিলেন—যাতে তাঁরা গ্রামের স্কুলে শঙ্করকে ফ্রিতে ভর্ত্তি করে দেন।

কিন্তু কাকা জ্যাঠারা তা করতে পারলেন না, এতে—অর্থাৎ এতখানি মাথা নত করতে তাঁরা পারবেন না, তাঁদের আভিজাত্য তাঁরা বাঁচিয়ে চলতে চান।

মহামায়া নিজেও হেডমাষ্টারের কাছে আবেদন করতে যেতে পারলেন না।

শেষ পর্য্যন্ত ধরতে হল সম্পর্কীয়া ভ্রাতুষ্পুত্রী অরুণাকে, যদি সে দয়া করে দরিদ্র পিসীমার ছেলেটির ভার নেয়—দয়া করে তার বাড়ীতে রেখে পড়ায়।

অরুণার স্বামী ক্যালকাটা পুলিসের এ. সি. জগৎ ঘোষাল অনেক ভেবে চিন্তে রাজি হলেন শেষ পর্য্যন্ত। স্ত্রীকে বুঝালেন—"আসুক ছেলেটা,—খেয়ে দেয়ে স্কুলে পড়ুক, সংসারের কাজকর্ম্মও চলবে তো। যা তোমার ফাই-ফরমাশ, একটা বাচ্চা না হলেও তো চলে না।"

স্বামীর কথায় বিশেষ খুসী হন না অরুণা। হাজার হোক পিসীর ছেলে, তাকে দিয়ে চাকর-বাকরের কাজ তো চলবে না, পিসীর কাছে মুখ দেখাবেন কি করে?

তবু পত্র দিতে হয়, চক্ষুলজ্জা বলে তো কিছু আছে। বিশেষ এই পিসীর কাছেই মানুষ হয়েছিলেন অরুণা ; পিতৃমাতৃহীনা এই মেয়েটির বিবাহ দিয়েছিলেন শঙ্করের পিতা, আর কেউই এ দায়িত্ব নেন নি।

নেহাৎ দায়ে পড়েই রাখতে হয়েছে শঙ্করকে। ফাই-ফরমাশ সব সময়েই আছে, তিন বৎসরের মধ্যে শঙ্কর যে কতবার চলে যাওয়ার কথা মনে করেছে, আবার ভবিষ্যৎ ভেবে থেকে গেছে।

সব সহ্য হয়, সহ্য হয় না সুজিতের ধারালো কথা।

একই ক্লাসে তারা দুজনে পড়ে। এবারে দুজনেই নাইন হতে টেন-এ উঠেছে। শঙ্কর উঠেছে নিজের ধারে, আর সুজিত উঠেছে পিতার ভারে।

পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলে দেখা গেল সুজিত ফেল করেছে, শঙ্কর সকলের প্রথম হয়েছে। তিন

● গৌরব
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

বৎসর শঙ্কর এখানকার স্কুলে পড়ছে, এর মধ্যে শিক্ষকদের দৃষ্টি সে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেছে। হেডমাষ্টার নিবারণ ঘোষ তাকে ভালোবাসেন, নিজে অনেক সময় তাকে পড়িয়ে দেন, যাতে সে ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পায় সেজন্য চেষ্টা করেন।

সেদিন কমনরুমে এই সম্বন্ধেই কথা হচ্ছিল—অ্যাসিষ্টান্ট হেডমাষ্টার রমণীবাবু বলছিলেন, "এবার যদি আমাদের স্কুলটার নাম হয়—হবে শঙ্করের জন্যে। এত বছর এই স্কুলে এসেছি, এমন ব্রিলিয়েন্ট ষ্টুডেন্ট যদি দেখে থাকি। চমৎকার ছেলে, যেমন শান্ত নম্র আচরণ, তেমনই কথাবার্ত্তা।"

বৃদ্ধ হেডমাষ্টারের মুখখানা উজ্জ্বল দেখায়, বললেন, "আপনারা সবাই ওর দিকে দৃষ্টি দেবেন রমণীবাবু। এই ছেলেটি যদি এবার ষ্ট্যাণ্ড করতে পারে, তবেই আমাদের এতকালের পুরাণো এই স্কুলটার নাম হবে—নইলে আস্তে আস্তে যেভাবে ছাত্র কমছে, তাতে এ স্কুল শীগ্‌গিরই উঠে যেতে বাধ্য হবে এতে আমার একটুকু সন্দেহ নেই।"

কমনরুমের সামনে দিয়ে যেতে থমকে দাঁড়িয়েছিল সুজিত।

শঙ্করের প্রশংসা শুনতে শুনতে তার বুকের মধ্যে জ্বলে ওঠে, মুখখানা কালো করে সে বাড়ী ফিরে আসে।

সেদিন স্পষ্টই সে জানালে—সে আর পড়বে না।

একমাত্র পুত্রের আব্দারে পিতা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, মা প্রলয় গুনলেন—

"কেন কেন? না হয় ফেল হয়েছিস, তাতে কি হল?" পিতা বলেন, "আমি একবার ক্লাস সিক্সে ফেল হয়েছিলাম, তাই বলে কি পড়া ছেড়ে দিয়েছিলাম? তুই এবার ফেল করেছিস, ভালো করে এ বছরটা পড়, আসছে বছর মোটা নম্বর পেয়ে টেন-এ উঠবি।"

অধীর হয়ে ওঠে সুজিত, বিকৃত মুখে বলে, "আমি কিছুতেই ভালো নম্বর পাব না বাবা। যা রাঘব বোয়াল তুমি এনে রেখেছো ও শুধু আমাকেই খাবে না, তোমাদেরও খাবে তা আমি বলে রাখছি। তোমরা জানো না—ওর চেয়েও আমি ভালো অ্যানসার করেছি, স্যারেরা নেহাৎ ওকে বড় করবেন বলেই আমাকে একেবারে ফেল করে দিয়েছেন। সব পার্সেলিটি বাবা, আমি কিছুতেই এখানে পড়বো না।"

কথাটা মনেও লাগে। অমন যে দুর্দ্দান্ত হেডমাষ্টার, তিনি পর্য্যন্ত ছেলে পাঠিয়ে শঙ্করকে ডেকে নিয়ে যান নিজের বাড়ীতে,—একমাত্র রজনী গুপ্ত ছাড়া আর সব শিক্ষকেরাই শঙ্করকে বিশেষভাবে পড়ান। রজনী গুপ্ত সুজিতের প্রাইভেট টিউটার,—তিনিই অতি গোপনে এ সত্য ব্যক্ত করেছেন।

এ. সি. মিঃ ঘোষালের মুখ লাল হয়ে ওঠে, সেই মুহূর্ত্তে তিনি হেডমাষ্টারের কাছে ছুটতে চান।

বিপদ হয় সুজিতের। হেডমাষ্টার অন্যায় সইতে পারেন না, পরীক্ষার খাতা আনিয়ে এখনই পিতাকে দেখাবেন এবং দেখালেই সুজিত যে মিথ্যা কথা বলেছে তা প্রমাণ হয়ে যাবে।

তার বিবর্ণ মুখের পানে তাকিয়ে মা হয়তো খানিকটা বুঝতে পারেন, তাই স্বামীকে বাধা দেন,

"পাগলের মত তুমি করছো কি? হতে পারো তুমি পুলিস অফিসার, কিন্তু তিনিও হেডমাষ্টার, ক্ষমতা তাঁরও বড় কম নয়। তুমি জোর করে তাঁকে কিছু বললে সে অপমান তিনি সইবেন না, ফলে ছেলেটার ভবিষ্যৎ একেবারেই যাবে। তার চেয়ে তুমি নরম ভাবে যাও, খোশামোদ করে—হাতে পায়ে ধরে ছেলেটাকে ক্লাসে তুলবার চেষ্টা করো। তুমি গিয়ে ধরলে হয় তো তিনি তোমার ছেলেকে ক্লাসে তুলে দেবেন।"

হলও তাই।

মিঃ ঘোষাল নিলেন সুজিতকে ভালো করে পড়ানোর দায়িত্ব—যাতে সে টেষ্টে অ্যালাউ হতে পারে। হেডমাষ্টার অনেক ভেবে চিন্তে সুজিতকে ক্লাসে তুলে দিলেন, কিন্তু বার বার বলে দিলেন, "বার বার এক পলিসি চলবে না জগৎবাবু। আপনার ছেলে একবারই মাত্র নিজের কৃতিত্বে পাশ হয়েছিল, তারপর প্রতিবারই সে অন্ততঃ-পক্ষে পাঁচ সাত নম্বরের জন্যও ফেল হয়, আপনার বা রজনীবাবুর অনুরোধে ওকে ক্লাসে তুলে দেওয়া হয়। এই কিন্তু শেষবার আমার কথাটা মনে রাখবেন।"

"কিছুতেই ভালো নম্বর পাব না বাবা।" [পৃঃ ৭০

মনে মনে আহত হয়েও মুখে প্রচুর হাসি ফুটিয়ে জগৎ ঘোষাল বাড়ীতে ফিরে আসেন। সেই দিনই রাত্রে দুই থালা মিষ্টান্ন প্রেরিত হয়ে হেডমাষ্টারের বাড়ীতে, কিন্তু দুর্ভাগ্য হেতু দুই থালাই ফিরে আসে, হেডমাষ্টার একটা স্লিপে লিখে পাঠান—তিনি অসুস্থ, পুলিস অফিসারের উপহার দ্রব্য নিতে পারলেন না, সেজন্য আন্তরিক দুঃখিত।

ক্লাসে যায় শঙ্কর সুজিত।

● গৌরব

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

সুজিত যায় ইউরোপীয় পোষাক পরে, ধুতি সার্ট পরতে তার বড় অসুবিধা হয়। জগৎ ঘোষাল নিজে বার হওয়ার সময় বেশীর ভাগ দিন পুত্রকে তাঁর বেবী-কারে তুলে নিয়ে স্কুলে পৌছে দিয়ে যান।

বাজারের ভার রীতিমত শঙ্করের মাথায় চেপেছে। পূবে ফরসা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠে নির্জ্জন ছাদের এক পাশে সে বই নিয়ে বসে খানিকটা পড়ে নেয়। আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে চাকরটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয় মাণিকতলা বাজারে, ঘণ্টাখানেক বাজারে যায়, তারপর ফিরে এসে স্নানাহার করতে করতে সুজিত পিতার সঙ্গে বার হয়ে যায়। শঙ্কর কোন রকমে স্নানাহার সেরে পায়ে হেঁটে যখন স্কুলে গিয়ে পৌছায়, তখন প্রথম ঘণ্টা হয়ে যায়—ছেলেরা পড়া দিতে থাকে।

“চমৎকার বয় পেয়েছেন মিঃ ঘোষাল,—”

কেবল হেডমাষ্টার নন, সকল শিক্ষকেরাই জানেন কেন তার বিলম্ব হয়। কিছু বলবার হেতু থাকে না, কারণ মেধাবী ছেলেটি তার ক্ষতি পূরণ করতে পারে।

তাঁরা বড় জোর দুঃখিত হতে পারেন, এ ছাড়া আর কিছু করবার উপায় তাঁদের নেই। ম্যাট্রিকে যদি কোন রকমে স্কলারশিপটা পায় সে, আই. এ. পড়লেও পড়তে পারবে, বিশেষ করে সেই চেষ্টাই তাঁরা করেন।

প্রাণপণ যত্নে শঙ্কর পড়াশুনা করে। কিন্তু তাতেও তো বাধা বড় কম নয়।

বাড়ীতে লোকজন প্রায়ই আসেন, পড়তে পড়তে পড়া বন্ধ রেখে শঙ্করকে আসতে হয় ফরমাশ খাটতে। সেদিন এসেছিলেন জগৎ ঘোষালের উপরের অফিসার ডি. সি. ভট্টাচার্য্য ও তাঁর স্ত্রী। সে সময় তাঁদের চা এনে দেওয়া বিস্কুট এনে দেওয়া এসব কাজ করতে হচ্ছিল শঙ্করকে।

“চমৎকার বয় পেয়েছেন মিঃ ঘোষাল,—আপনার দেশের ছেলে নিশ্চয়ই। কাইগুলি একে আমায় দিন, আপনি বরং দেশ থেকে আর কাউকে আনিয়ে নেবেন—”

ডি. সি.-র কণ্ঠে অনুনয়ের সুর।

বিব্রত হয়ে ওঠেন জগৎ ঘোষাল এবং ততোধিক বিব্রত হয়ে পড়েন অরুণা।

● গৌরব
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

চা-এর টেবিলে সুজিতের মুখ কেবল হর্ষে দৃপ্ত হয়ে ওঠে, সে সকৌতুকে শঙ্করের পানে তাকিয়ে থাকে।

বিবর্ণ হয়ে যায় শঙ্করের মুখখানা। উত্তর সে হয়তো দিতে পারতো,—নিজেকে সামলে নিয়ে ধীরভাবে সে বার হয়ে গেল।

"ওহে—ওহে বয়, এদিকে আয়, এক প্যাকেট 'গোল্ডফ্লেক' দোকান হতে নিয়ে আয় দেখি—"

ততক্ষণে শঙ্কর অদৃশ্য হয়ে গেছে।

নিচের তলায় তাকে যে ঘরটি দেওয়া হয়েছিল সেই ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দেয় সে। ডাকুক ওরা, হাজার বার—লক্ষ বার ডাকুক, সে কিছুতেই দরজা খুলবে না, বার হবে না।

কিন্তু এর পর অরুণা ও জগৎ ঘোষাল সতর্ক হয়ে যান। এ অপমান কিশোর শঙ্করের বুকে লেগেছে তা তাঁরা বুঝতে পারেন, এবং বুঝতে পারেন বলে বন্ধু-বান্ধব এলে চায়ের টেবিলে তাকে ডাকেন না।

সুজিত উসখুস করে—"মা'র যত সব বাড়াবাড়ি। হলই বা সম্পর্কে তোমার পিসীর ছেলে—তাও নিজের নয়, খুড়তুতো পিসীর ছেলে, তাকে তোমার এতটা সমীহ করবার দরকার কি শুনি? আর লেখাপড়া শিখে ও কি জজ হবে, না ম্যাজিস্ট্রেট হবে—এসব বালাই ওর কেন? থাকবে তো সেই ধাবধাড়া গোবিন্দপুরে, সেখানে হেঁটোর ওপর কাপড় তুলে মাঠে লাঙ্গল চালাতে হবে, ধান বুনতে হবে। ওকে তোমরা বড্ড বাবু করে তুলছো, এরপর গাঁয়ে গেলে ও থাকতে পারবে না সেখানে।"

মা অন্যমনস্কভাবে বলেন, "থাকতে পারুক না পারুক—আমরা তা দেখতে যাব না। ওর মা নেহাৎ ধরেছিলেন, তাই ওকে রাখতে হয়েছে, লেখাপড়ার ভার নিতে হয়েছে।"

সুজিত বক্রমুখে বলে, "চাষার ধরণ যাবে কোথায়? জানো মা, স্কুলে যায় ওই আধময়লা কাপড় আর জামা পরে, পায়ের চটিটা ছিঁড়ে গেছে, সেলাই করাবে না। রোজ দেরী করে স্কুলে যাবে—তবু পয়সা খরচ করে ট্রামে বাসে উঠবে না। অথচ ছুটিতে ছুটিতে বাড়ী যায়—এত টাকাপয়সা নিয়ে এসে বাক্সে রাখে আমি নিজের চোখে দেখেছি।"

মা চুপ করে থাকেন।

মহামায়া ছেলের হাতে টাকাপয়সা দেন এ কথা সত্য। স্কুলে প্রথম বৎসর সে বেতন দিয়ে পড়েছিল, তারপর ভালো ছেলেকে ফ্রি করে নিতে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ আপত্তি করেন নি।

তবু স্কুলের অন্য খরচ আছে। শিক্ষকেরা বই দিয়ে সাহায্য করেন, হেডমাষ্টার মহাশয় খাতাপত্র দেন। এ সব খরচ বেঁচে যাওয়ায় মায়ের পেটের উপর বাণিজ্য করে সংগ্রহ করা টাকা শঙ্কর আর আনে না। জামা কাপড় মাঝে মাঝে কেনে, সে টাকা মা কারও হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দেন।

শঙ্করকে সব দিক্ দিয়ে অপদস্থ করতে চায় সুজিত, শঙ্কর তা জানে, সেই জন্যই সুজিতের দিক্ দিয়ে আক্রমণের আশঙ্কায় সে সর্ব্বদা সাবধান হয়ে থাকে।

● গৌরব

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

কিন্তু বিপদ বাধে সেইখানে, —সে যত সুজিতকে এড়িয়ে চলতে চায়, সুজিত ততই তার কাছে আসে, তাকে বিদ্রূপ করবার চেয়ে আনন্দ তার আর নাই।

শঙ্করের নামকরণ সে করে ফেলেছে—গুড বয়। পিতা গম্ভীর হন, ধমক দেন, মা মুখ বিকৃত করেন, সুজিত থোড়াই কেয়ার করে।

এর পরকার কথা—

ম্যাট্রিকে অ্যালাউ হতে পারলে না সুজিত, শঙ্কর অ্যালাউ হলো।

মুক্তকণ্ঠে সুজিত বললে, "এ সব মাষ্টারমশাইদের কারসাজির ফল তা জানি। আচ্ছা রসো আমিও দেখবো কি হয়।"

শঙ্করের মুখখানা বিমর্ষ হয়ে যায়, সুজিতের হাতখানা ধরে অনুনয়ের সুরে সে বললে, "তুমি আবার পড় সুজিত, তুমি কিছু করতে যেয়ো না লক্ষ্মীটি, আমার কথা শোন।"

সুজিত হাত ছাড়িয়ে নেয়—"আর না, আর বইয়ে হাত দিচ্ছিনে গুড বয়। দেখি না, লেখাপড়া ছাড়াও জগতে আর কোন কাজ আছে কি না।"

শঙ্কর জানে—সুজিত শুধু একা নয়—তার দলে ছেলে আছে কম নয়। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে ওঠে সে, তবু সে কোন কথা কাউকে বলতে পারে না।

ফাইনালের সময় এসে পড়ে।

সুজিত এখানে নাই, মাস দুই তিনের মত মাকে সঙ্গে নিয়ে মামার বাড়ী এলাহাবাদে চলে গেছে। বাড়ীতে আছেন জগৎ ঘোষাল ও শঙ্কর। চাকরই রন্ধনাদি করে। একদিক দিয়ে নিশ্চিন্তে পড়াশুনা করবার অবকাশ পেয়েছে শঙ্কর। তবু মনটা তার সুজিতের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে—কেন সে মানুষ হল না তাই সে ভাবে।

অপরাধ সুজিতের নয়,—অপরাধ তার পিতামাতার। একমাত্র সন্তান বলে তাকে অতি আদরে তাঁরা লালন পালন করেছেন, বাইরের জগতের সঙ্গে তার কোন পরিচয় নাই, নিজের খেয়াল নিয়েই সে থাকে।

তার সঙ্গীদের সম্বন্ধে শঙ্কর সন্দেহ করে। শঙ্কর বেশ জানে—সুজিতের এমন সব সঙ্গী আছে যাদের মধ্যে কেউ কেউ তার চেয়ে বয়সে ও বুদ্ধিতে অনেক বড়। এরা সুজিতকে কুপথে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। মাসে মাসে অরুণার পয়সা টাকা হারিয়ে যায়, একদিন চাবিবন্ধ ড্রয়ার হতে নেকলেস অন্তর্হিত হয়েছে। এ নিয়ে বাড়ীতে হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল—তবু চোরকে পাওয়া যায়নি। পুরাতন চাকর কাজে জবাব দিয়ে গেছে, চোর সন্দেহে নূতন চাকরকে পুলিশের অনেক লাঞ্ছনা সয়ে জেলে বাস করতে যেতে হয়েছে।

সৌভাগ্য শঙ্করের, সে কোনদিন উপরে যায় না; আর যেদিন হার চুরি যায়, সেদিন সে বাড়ীতেও

ছিল না। আগের দিন সন্ধ্যায় বাড়ী গিয়ে দুদিন পরে ফিরেছে।

অরুণা হয় তো আন্দাজে কতকটা বুঝেছিলেন, তাই একদিন চুপি চুপি শঙ্করকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুই বলতে পারিস শঙ্কর, সুজিত কাদের সঙ্গে মেশে,—লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে সে সারাদিন বাইরে কোথায় ঘোরে? এক একদিন গভীর রাত্রে বাড়ী আসে; পাছে তোর দাদাবাবু জানতে পারেন, তাই সুজিতের খোঁজ করলে আমায় মিছে কথা বলতে হয়; জানাতে হয়—সে তোর ঘরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তুই বল শঙ্কর, না জানলেও খোঁজ নে—সে কোথায় যায়, কি করে?"

অরুণার দুচোখে জল দেখতে পাওয়া যায়।

শঙ্করের মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়, একটু ভেবে বলে, "আমি খোঁজ নেব বড়দি, সে কোথায় যায়—কাদের সঙ্গে মেশে।"

হায় রে মা,—মায়ের মন বুঝতে পেরেছে পুত্র তাঁর কুসঙ্গে মিশে রসাতলে যেতে বসেছে। তাই যে শঙ্করকে এতদিন দূরে রেখে এসেছেন, আজ তারই কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন; পুত্রের জন্য আজ শঙ্করকে দরকার।

বলতে পারলে না শঙ্কর—তোমরাই অধঃপাতের পথে ঠেলে দিয়েছো তোমাদের সন্তানকে। অপর্য্যাপ্ত আদর পেয়েছে সে, যা চেয়েছে তাকে তাই দিয়েছো; তাকে ভাবতে দিলে না কিছু। বাল্য হতে অসৎ সঙ্গে পড়ে সে মিথ্যা কথা বলা শিখেছে, ছলনা করে অর্থ আদায় করতে, বদ সংসর্গে পড়ে বাজি রেখে ফ্ল্যাস খেলতে সুরু করেছে। তোমরা কোনদিন ছেলেকে দেখ নি, তার পড়া দেখ নি, তাকে শিক্ষা-সহবত দাও নি। সে যে অধঃপাতে গেছে, এর মূল কারণ তোমরা—তার স্নেহান্ধ পিতামাতা।

শিক্ষা দিয়ে—সৎ আদর্শ সামনে রেখে গড়তে পারলে এই সুজিতই সোনা হয়ে উঠতো, পিতা-মাতা আত্মীয় বন্ধু সবাই সুখী হতে পারতেন; সুজিতও সুখী হতে পারতো।

শঙ্কর মাকে পত্র দেয়—আমায় আশীর্ব্বাদ করো মা; আমি যেন মানুষ হতে পারি, তোমার শিক্ষা আমার জীবনে ফলপ্রসূ হোক।

সে পত্র যথাসময়ে দুঃখিনী মায়ের হাতে পৌঁছায়, পুত্রের পত্রখানা বুকের মধ্যে চেপে ধরে মা উদাস দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

ভগবানের কাছে ছেলের কল্যাণ কামনা করেন।

•

দুই মাস নয়, মাস খানেক বাদে স্বামীর অসুস্থতার খবর পেয়ে ফিরে এলেন অরুণা।

"সুজিত—সুজিত আসেনি?"

পিতার কণ্ঠে ব্যগ্র ব্যাকুল সুর।

অরুণা জানালেন—"সুজিত মামা-বাড়ীতেই আছে, লজ্জায় এখানে আসতে চাচ্ছে না। মামারা

ওখান হতে তাকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়াবেন তাই রেখে এলাম।"

কিন্তু তাঁর পাংশু মুখ ও কম্পিত কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে শঙ্কর—সে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।

ম্যাট্রিকের রেজাল্ট আউট হয়েছে, শঙ্কর প্রথম দশজনের মধ্যে প্রথম হয়েছে। হেডমাষ্টার মশাইয়ের একান্ত আগ্রহে প্রেসিডেন্সী কলেজে সে ফ্রীতে পড়তে গেল, পড়ার খরচের ভার কলেজ কর্তৃপক্ষ নিলেন।

অরুণা আশীর্ব্বাদ করলেন, "মানুষ হ ভাই, বিধবা দুঃখিনী মাকে সুখী কর। তোকে কতদিন কত কথা বলেছি শঙ্কু, সে সব কিছু মনে রাখিসনে ভাই—"

তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে, চোখ ছাপিয়ে ঝর ঝর করে অশ্রুজল ঝরে পড়ে।

ব্যাকুল হয়ে ওঠে শঙ্কর—"না, তুমি কেঁদো না দিদি, মা বলেছেন মায়ের চোখের জলে ছেলের অমঙ্গল হয়। তুমি চোখের জল ফেললে সুজিত আর দাদাবাবুর অমঙ্গল হবে দিদি।"

আর্দ্রকণ্ঠে অরুণা বললেন, "আজ ভাবছি শঙ্কু, অতটা আদর যদি না দিতাম—সুজিত এমন-ভাবে অধঃপাতে যেতো না। সে আমার ভাইয়ের বাড়ী নেই, আমাকে দিয়েই এখানে চলে এসেছে,—যত সব বদ ছেলেদের সঙ্গে মিশে কত খারাপ কাজই না করছে! তোর দাদাবাবু বলছিলেন যে—"

"—বল, তুই তাকে ফিরিয়ে আনবি?" [পৃঃ ৭৭

বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে, বললেন, "তিনি নাকি এদের দলের ফটোসহ অনেক

● গৌরব
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

চিঠিপত্র হাতে পেয়েছেন, গোপন আড্ডার সন্ধানও পেয়েছেন। সেই গ্রুপ ফটোর মধ্যে আমি দেখেছি সুজিতকে—হ্যাঁ, সুজিতকে। তোর দাদাবাবু চিনতে পারেন নি, কিন্তু আমি যে তার মা—আমার চোখকে সে তো ফাঁকি দিতে পারে নি—আমি তাকে দেখেই চিনেছি আমি বুঝেছি শঙ্কু—সব বুঝেছি—"

তিনি শঙ্করের হাত দুখানা চেপে ধরেন, কান্না-ঝরা কণ্ঠে বললেন, "তোর দিদিকে বাঁচাতে হবে শঙ্কু—বল, তুই তাকে ফিরিয়ে আনবি?"

শঙ্কর শান্তকণ্ঠে উত্তর দেয়, "নিশ্চয়ই চেষ্টা করব দিদি, আমি তাকে ফিরিয়ে আনবই। বল আমায় কি করতে হবে, জানো তো বল—সে কোথায় আছে, আমি সেখানে যাব।"

চোখের জল মুছতে মুছতে অরুণা সব বলেন।

এই দলটি বড় দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠেছে। এদেরই মধ্যে একজন ধরা পড়েছে, তার মুখে জানা গেছে এই দলটি সিঁথিতে একখানা বাড়ী নিয়ে ছাত্র পরিচয়ে বাস করছে। এরা চুরি, ডাকাতি, খুন যে কিছু করেই হোক অর্থ সংগ্রহ করে। সুজিতও এই দলে গিয়ে পড়েছে। স্বামীর কাছে তিনি জেনেছেন—আজ রাত্রিতে পুলিশ সে বাড়ী ঘিরে ফেলবে; সেখানে যে যে আছে, সকলকে গ্রেপ্তার করবে। নিজে পুলিশ কমিশনার যাবেন—কাজেই তাঁর সহকারী হিসাবে এ. সি. জগৎ ঘোষালকে সঙ্গে থাকতে হবে। তাঁরই একমাত্র কিশোর পুত্র এই দলের একজন,—এ কলঙ্ক কি তিনি সইতে পারবেন?

শঙ্কর ঠিকানাটা তাঁর কাছেই সংগ্রহ করে, বললে, "কোন ভাবনা নেই দিদি, আমি এখনই যাচ্ছি—যেমন করেই হোক তাকে তোমার কাছে এনে দেব কথা দিচ্ছি।"

আশ্বস্ত হন দিদি, শঙ্করের দীর্ঘজীবন, তার সুস্থ শরীর কামনা করেন।

কিন্তু মনে যা ভেবে গিয়েছিল, কাজে তা হল না। ভীষণ একজেদী সুজিত, বাড়ীতে সে কিছুতেই ফিরবে না।

"জানলে গুড বয়, বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এখন আদায় কাঁচকলায়,—অথবা সাপে নেউলে বলতে পারো।"

ব্যথিত হয়ে ওঠে শঙ্কর, "বেশ, তুমি আজ রাতটা বাড়ীতে কাটিয়ে এসো। আজ তোমার জন্মদিন, দিদি রান্না করে বসে আছেন, সারাদিন তাঁর উপবাসে গেছে, তোমায় খাইয়ে তবে তিনি খাবেন। এখন বাড়ীতে তোমার বাবা নেই,—রাত্রে ফিরে তোমায় দেখে খুসী হবেন ছাড়া অখুসী হবেন না। তিনি কিছু জানেন না, কাজেই তোমার সম্বন্ধে কোন কথাই উঠবে না।"

"জন্মদিন—?"

সুজিত ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে কি ভাবে, তারপর বলে, "এ বড় অন্যায়। আমি কখন কোথায় থাকি, মা অমনি আমার জন্মদিন পালন করবেন, উপবাস করে থাকবেন। কিন্তু আমিই বা যাই কি করে,—দলের ছেলেরা রাত্রে ফিরবে,—বাসায় আর কেউ নেই,—আমি কার চার্জ্জে বাসা রেখে যাই বল?

● গৌরব
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

অনেক দামী দামী জিনিস আছে, চাবি বন্ধ করে রেখে যাওয়া চলবে না তো।"

শঙ্কর গম্ভীর মুখে বললে, "আমি বরং ততক্ষণ থাকছি সুজিত, তোমার বন্ধুরা ফিরলে তারপর আমি যাব। তুমি আমায় বিশ্বাস করে স্বচ্ছন্দে যেতে পারো।"

সুজিত একটু হাসে, বললে, "আর যাই হও, তুমি যে আমার মামা গুড বয়,—আমার অনিষ্ট তুমি কিছুতেই করতে পারবে না তা আমি জানি। তোমায় বলছি গুড বয়, দেখো তোমার ওই একচোখো হেডমাষ্টারের বেলের মত মাথাটা আমি যদি না ফাটাই, আমার নামই সুজিত ঘোষাল নয়।"

তার চোখ দুটি জ্বলে, শুষ্ক কর্কশকণ্ঠে বললে, "এর শোধ আমি নেবই—এ অপমান আমি কিছুতেই ভুলব না।"

শঙ্কর তার গায়ে হাত বুলায়, স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, "ছিঃ সুজিত,—হেডমাষ্টার মশাইয়ের দোষ কি বল, তুমি যদি কোনরকমে আর কয়টা নম্বর টেনে টুনে রাখতে পারতে, তোমায় কিছু করতে হতো না, তুমি নিজেই পাশ হয়ে আজ আমারই মতন আই. এ. পড়তে পারতে। এখন ওসব কথা থাক, রাত হয়ে আসছে, দিদি জলস্পর্শ করেন নি অথচ শরীর তাঁর বড় খারাপ। তুমি তাড়াতাড়ি চলে যাও সুজিত, মাকে খাওয়াও গিয়ে। মনে রেখো,—মা গেলে মা পাবে না, অথচ মায়ের মত আপনার তোমার কেউ নেই।"

সুজিত হাসলো, তারপর জামাকাপড় বদলে সে যখন শঙ্করের কাছ হতে বিদায় নিল, তখন রাত নয়টা প্রায় বাজে। বার বার বলে গেল—বন্ধুরা না ফেরা পর্য্যন্ত শঙ্কর যেন ওখানে থাকে।

স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলে শঙ্কর।

দিদির নিমকের মর্য্যাদা সে রাখবে। দিদিকে কথা দিয়েছে সুজিতকে সে আজ বাড়ীতে আনবেই, এখন আসুক পুলিশ, তাকে গ্রেপ্তার করুক—সুজিত বেঁচে যাক, দাদাবাবু যেন পুত্রের পরিচয় না পান।

তারপর?

তারপরের ব্যাপারের জন্য প্রস্তুতই ছিল শঙ্কর। মিঃ ঘোষাল আসতে পারেন নি, কাজেই ধৃত শঙ্করকে পুলিশবাহিনী চিনতে পারলে না। দলের আর সকলের সঙ্গে হাতে হাতকড়া পরে পুলিশ ভ্যানে উঠে সেও চললো হাজতে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বাস করতে।

দুদিন পরের কথা।

আস্তে আস্তে হাজতের দরজাটা খুলে সুজিত হাজতে প্রবেশ করলে।

"একি—সুজিত—?"

ধড়ফড় করে উঠে বসে শঙ্কর,—"তুমি এখানে কেন—কে তোমাকে আসতে বলেছে?"

সুজিত দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরলো, তার কাঁধের উপর মুখখানা রেখে উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদতে লাগলো।

● গৌরব
**শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী**

অনুতপ্ত—হাঁ, সত্যই বড় অনুতপ্ত সুজিত।

তার চোখের জল মুছায় শঙ্কর, শান্ত হাসি হেসে বললে, "কি হয়েছে সুজিত, কাঁদছো কেন?"

"গুড বয়"—সুজিত চোখ মুছতে মুছতে বললে, "তুমি যে সত্যি এত বড় গুড বয় তা আমি জানতাম না। আমায় তুমি মাপ কর শঙ্কর মামা, আমি চিরদিন তোমার শত্রুতা করে এসেছি, আজ আমার সব দোষ ক্ষমা কর।"

একটু থেমে সে বললে, "সেদিন কেবল আমায় বাঁচাবার জন্যেই তুমি সিঁথিতে গিয়েছিলে গুড বয়, অনেক ফিকির করে আমার জন্মদিন বলে আমায় সরিয়ে দিয়ে নিজে ইচ্ছে করে বন্দী হয়ে হাজতবাস করতে এলে। তাই ভাবছি—সত্যি তুমি কত বড়, কত মহৎ! আমাকে সকলের ঘৃণা হতে বাঁচাবার জন্যে, আমার বাবার চোখে আমায় নির্দ্দোষী করবার জন্যে নিজে সব অপরাধ নিলে? কিন্তু কেন—কেন সকলের কাছে নিজেকে এত ছোট করলে গুড বয়—সকলে যে তোমার এ সব কথা শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছে!"

শঙ্কর তার পিঠে হাত রাখে, শান্তকণ্ঠে বললে, "দাদাবাবুর চোখে তুমি ভালো ছেলে হয়ে থাকো সুজিত—মাকে সুখী করো, কেবল এই জন্যেই আমি বিপদ জেনেও তোমাদের ওখানে গিয়েছি, তোমায় মতলব করে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি, সেটা বুঝেছো—এই তো ভালো।"

হাঁপিয়ে ওঠে সুজিত "কিন্তু তোমারও তো মা আছেন, তিনি কি করবেন তা ভেবেছো কি?"

শঙ্কর শান্ত হাসি হাসে, বললে, "আমার মা সব জানেন সুজিত। আমি আগেই তাঁকে জানিয়েছি, তিনি লিখেছেন—উপকারীর প্রত্যুপকার করতে চেষ্টা কর, ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন। তাঁর আশীর্ব্বাদ নিয়ে তবে আমি এগিয়েছি সুজিত, দিদিকে এ কথা বলো। দাদাবাবুকে যেন কিছু জানিয়ো না, তাতে বিপদ ঘটবে।"

বাহির হতে জগৎ ঘোষালের গুরু গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়—"সুজিত এত কি গল্প হচ্ছে, চলে এসো বলছি।"—তিনি আরো কি বলেন বুঝা যায় না।

সুজিত বিবর্ণ হয়ে যায়।

শঙ্কর বললে, "চিন্তা করোনা সুজিত, কেউ আমার কিছু করতে পারবে না—মায়ের আশীর্ব্বাদ আমি পেয়েছি, আমার কিছুই হবে না, স্যারেরা আমার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, বাড়ী যাও—আর এসো না।"

সুজিত খানিক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ শঙ্কর কিছু জানবার আগেই দুহাতে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তার ললাটে একটা চুমো দিয়েই দ্রুত বার হয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে হাজতের দরজা ঝনাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল।

---

# হাতি
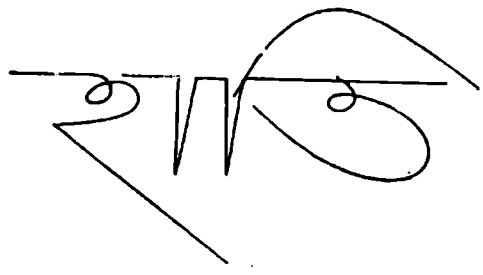
**শ্রীপ্রমথনাথ বিশী**

নূতন আইনের বলে সরকার যাবতীয় জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন।

সদর হইতে হাকিম ভাঙাকলসী গ্রামের জমিদার বাবুর কাছারীতে আসিয়াছেন কাছারীবাড়ী দখল লইবার জন্য। কাছারীর মধ্যে প্রকাণ্ড ফরাসের উপরে জমিদার দক্ষিণাবাবু, হাকিম সামন্ত সাহেব, নায়েব ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ উপবিষ্ট। দক্ষিণাবাবু বিমর্ষ, নায়েব প্রভৃতিও কর্ত্তব্য-বোধে বিমর্ষ, সামন্ত সাহেবের মুখে সমবেদনা প্রকাশের চেষ্টা।

সামন্ত সাহেব বলিলেন—দক্ষিণাবাবু, আপনার অবস্থা আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমরাও তো ছোটখাটো একটা জমিদার ছিলাম, ঘুষখোর সরকার সব বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে।

সরকারী চাকুরেগণ সুযোগ পাইলেই সরকারের নিন্দা করিয়া নিজের মর্য্যাদা ও স্বাধীনতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর সামন্তের জমিদারী পৌরাণিক আমলে হয় তো ছিল, ঐতিহাসিক কালে কেহ তাহার সাক্ষাৎ পায় নাই।

দক্ষিণাবাবু বলিলেন, সরকারের দোষ দিয়ে লাভ নেই, দেশের লোকেই তো দাবী করেছিল। তবু মন্দর ভালো এই যে সরকার জমিদারী ও কাছারী বাড়ী প্রভৃতি নিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে, বসতবাড়ীটা সুদ্ধ টান মারেনি।

সামন্ত একবার এদিক ওদিক দেখিয়া লইয়া গলা নীচু করিয়া বলিলেন, বসতবাড়ীও বাদ যাবে না, সমস্ত ধ'রে টান মারবে, ঐ যে বল্‌লাম—আগাগোড়া ঘুষখোরের দরবার।

আগাগোড়ার মধ্যে সামন্তর মতো সরকারী কর্ম্মচারী পড়ে কিনা এ প্রশ্ন কাহারো মনে উঠিল না।

প্রসন্ন পাল নায়েব। জমিদারবাবু ও হাকিম সাহেব দু'জনকেই খুশী রাখিবার আশায় একবার নড়িয়া বসিয়া বলিল, নিশ্চয় নিশ্চয়! তাহার বিশ্বাস ঐ দুটি শব্দে লাঠি না ভাঙিয়া সে সাপ মারিয়াছে, জমিদার রাগ করেন নাই, হাকিম খুশী হইয়াছেন।

দক্ষিণাবাবু বলিলেন, আর দুঃখ ক'রে লাভ নেই। কাছারী সংক্রান্ত সব জিনিস—খাতা-পত্র, সিন্দুক, বন্দুক সব মিলিয়ে নিন। দাও প্রসন্ন, হাকিম সাহেবকে সব বুঝিয়ে দাও।

সামন্ত বলিলেন, ওর আর বোঝাবুঝি কি, আপনার মতো মহাশয় ব্যক্তি কি আর মিথ্যা হিসাব দাখিল করবেন। নায়েববাবু যা দেবেন আমি চোখ বুজে সই ক'রে দেবো।

সে আপনার দয়া। জমিদারবাবু বলিলেন, সামন্ত সাহেব মধ্যাহ্ন-ভোজনটা কিন্তু আমার বাড়ীতেই—অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

বিলক্ষণ। আপত্তি? আপত্তি কিসের? আমি ওসব জাতভিৎ মানিনে, তা ছাড়া মহাশয় তো আমাদের স্বজাতি।

বিশেষ আপ্যায়িত হ'লাম। আমি তা হ'লে এবারে উঠি। বলিয়া দক্ষিণাবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ও হাতিটা কার?

অদূরে নদীর ধারে একটা হাতি দেখা গেল।

এই গরীবেরই—

সামন্ত একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, প্রসন্নবাবু তবে ওটাও তালিকায় ধরুন।

দক্ষিণাবাবু বলিলেন, মাতুর সঙ্গে জমিদারীর সংস্রব নেই। ওটা আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি, কিংবা আরো সত্য ক'রে বলতে গেলে বলা উচিত—ওটি আমার কন্যা বিন্ধ্যবাসিনীর সম্পত্তি। অন্নপ্রাশনের সময়ে তার মাতামহ তাকে ওটি দিয়েছিলেন।

হঠাৎ কর্ত্তব্যভারে পীড়িত সামন্ত সাহেবের মুখ গম্ভীর হইল, তিনি বলিলেন, আরো সত্য ক'রে বল্‌লে কি দাঁড়াবে কে জানে।

আমার শ্বশুরের লিখিত চিঠি দেখাতে পারি।

বিচার করবার ভার আমার উপরে নেই, প্রয়োজন হ'লে আদালতে দেখাবেন।

কোন রকমেই কি ওটাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না—?

সামন্ত হাসিয়া বলিলেন, সে রকম অফিসার তো আমি নই, আসতো বোস, আপনার কিছু ভাবনা ছিল না, কিছু খেয়ে ছেড়ে দিয়ে যেতো। হাজার হোক 'অনেষ্টি' বলে একটা কিছু আছে তো!

আগাগোড়া-ঘুষখোর সরকারের একজন কর্ম্মচারী অন্ততঃ নির্লোভ ও সাধু জানিয়া দক্ষিণাবাবুর যে পরিমাণ আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল, তেমন আনন্দিত হইলেন বলিয়া মনে হইল না।

দক্ষিণাবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—তা বটে। সবই যখন গেল ওটাকে রেখে আর কি করবো, তা ছাড়া এখন হাতির খোরাক জোগাবো কি ক'রে? নিয়ে

যান, তবে একটা অনুরোধ, কয়েকটা দিন পরে নেবেন।

কৌতূহলী সামন্ত শুধাইলেন, কেন বলুন তো?

দিদির বিয়ের দিন মাহু আসবে।— [পৃঃ ৮৩

সামনের পূর্ণিমায় বিন্ধ্যবাসিনীর বিয়ে, সেই দিনটা পর্য্যন্ত থাকুক, তারপরে ছেড়ে যাবে আমাকে।

সামন্ত সরকারী কর্ম্মচারী হইলেও অমানুষ নন, হয়তো দক্ষিণাবাবুর অনুরোধ রক্ষা করিতেন, কিন্তু জমিদার-দুহিতার কন্যার বিবাহ সংবাদে মনে পড়িয়া গেল সামনের পূর্ণিমাতে তাঁহার পুত্রেরও বিবাহ।

যে-কারণে দক্ষিণাবাবুর হাতিটি প্রয়োজন, তাঁহার নিজের ক্ষেত্রেও সেই কারণ উপস্থিত। বলা বাহুল্য এই দুই কারণের দ্বন্দ্বে সামন্ত বিজয়ী হইলেন, কারণ তিনি আগাগোড়া-ঘুষখোর সরকারের একমাত্র অনেষ্ট অফিসার, আর দক্ষিণাবাবু হৃত-সর্ব্বস্ব সামান্য জমিদার।

মাপ করবেন দক্ষিণাবাবু, ওটি পারবো না। মেয়ের বিয়ে পর্য্যন্ত কাছারী বাড়ী দখল নেওয়া বন্ধ রাখতে পারি, কিন্তু অস্থাবর সম্পত্তি ছেড়ে যেতে পারি না।

তবে নিয়ে যান। কিন্তু একটু সাবধানে রাখবেন, বড় একগুঁয়ে জন্তু, ডানে যেতে বললে বাঁয়ে যাবে, আমরাই সময়ে সময়ে মুস্কিলে পড়ি, ওখানে তো পড়বে নূতন লোকের হাতে।

আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। ভারত সরকার পঞ্চশীলের রশি দিয়ে রুশ-মার্কিনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে, এ তো সামান্য একটা হাতি।

- হাতি
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
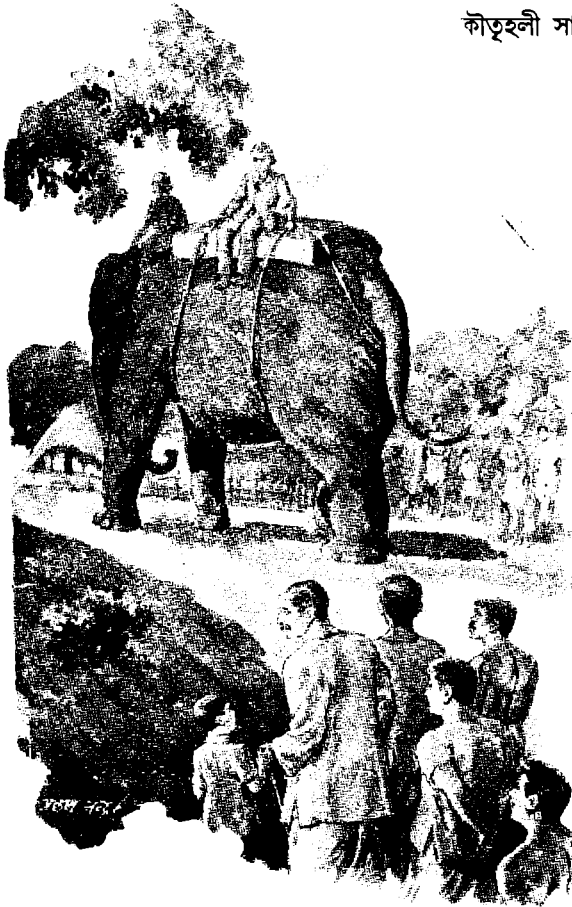
আমার মাহুত বরঞ্চ গিয়ে সদরে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

সেটা মন্দ নয়। বলিলেন সামন্ত সাহেব।

সরকার হাতি বাজেয়াপ্ত করিতেছে শুনিয়া দক্ষিণাবাবুর গৃহিণী সরকারের বাপান্ত করিলেন, বিন্ধ্যবাসিনী কাঁদিল, কিন্তু কর্ত্তব্যবুদ্ধির হিমালয় সামন্ত সাহেবের সঙ্কল্প টলিল না।

মধ্যাহ্ন-ভোজন ও অপরাহ্ণ-নিদ্রা সাঙ্গ করিয়া সমস্ত গ্রামবাসীর নীরব অভিশাপের মধ্যে হস্তীপৃষ্ঠারূঢ় বিজয়ী সামন্ত সাহেব ভাঙাকলসী গ্রাম ত্যাগ করিলেন।

জমিদার পরিবার দুঃখে মুহ্যমান ও নীরব, হঠাৎ কোথা হইতে দক্ষিণাবাবুর শিশুপুত্র ছুটিয়া আসিয়া ব্যাপারটা কি যথাসাধ্য বুঝিতে চেষ্টা করিল, তারপরে দ্বিধামাত্র না করিয়া বলিল, দিদির বিয়ের দিন মাতু আসবে।

সে মাঝে মাঝে সম্ভব অসম্ভব অনেক প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী করে, লোকে খুব হাসে। কিন্তু আজ কেহ হাসিল না। আত্মীয়-স্বজনের রসবোধের অভাবে বিরক্ত হইয়া সে স্থানান্তরে প্রস্থান করিল।

## দুই

সামন্ত সাহেব বলিয়াছিলেন যে পঞ্চশীলের বাঁধন অতিশয় মজবুৎ, রুশ-মার্কিন বাঁধা পড়িয়াছে। কিন্তু হাতের কাছে সেরূপ দৃঢ় রজ্জু না থাকাতে মাতু ওরফে মাতঙ্গিনীকে লইয়া তিনি মুস্কিলে পড়িলেন। সরকার হাতি পোষেন না; কাজেই সদরে বা মহকুমায় বা রাজধানীতে পিলখানা কিংবা মাহুতের ব্যবস্থা নাই। তারপরে হাতির যে এমন অমিত ক্ষুধা তাহাই বা কে জানিত। এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে মাতু দুবেলায় আধমণ চাল খায়—সঙ্গে ভাইটামিন হিসাবে পাঁচটি তাজা কলাগাছ। সামন্ত সাহেব মাথায় হাত দিয়া পড়িলেন, গৃহিণীর কাছে বলিলেন—দেখছ খোরাকের নমুনা।

গৃহিণী কিছুমাত্র বিস্মিত না হইয়া বলিলেন, হাতির খোরাক বেশি তো হবেই। ও তো আর পেট-রোগা হাকিম নয়।

সামন্ত সাহেব বুঝিলেন, কথাটা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া। তিনি পেট-রোগা ও হাকিম দুইই সত্য।

সামন্ত সুর বদলাইলেন, বলিলেন, ভাবছি হাতিটা কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিই।

গৃহিণী রুষ্ট-কণ্ঠে ঝঙ্কার তুলিয়া শুধাইলেন, কেন, কেন?

সরকারের জিনিস সরকারের কাছে চলে যাক্। নিজের বাড়ীতে রাখা উচিত নয়।

সামন্তের কথা শুনিয়া গৃহিণী স্বামীর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিলেন—কি আমার ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির রে! নিজের বাড়ীতে রাখা অন্যায়। ওসব ধর্ম্মের কথা আর যেখানে হয় শুনিয়ো—এখানে নয়।...হাতিটা থাকবে, আমার বাড়ীতেই থাকবে, আমার সুরু ঐ হাতি চেপে বিয়ে করতে যাবে, বিয়ে করে বউ নিয়ে হাতি চেপে ফিরবে। পাঁচ গাঁয়ের লোক দেখে বলবে—হাঁ একটা বিয়ে দেখলাম বটে।

সামন্ত নিজের ফাঁদে নিজে পড়িয়াছেন। হাতিটা লইয়া পৌঁছিয়া পুত্রের আসন্ন বিবাহে হস্তীপ্রয়োগের মৎলবটা তিনিই গৃহিণীকে জানাইয়াছিলেন। এখন আর 'না' বলেন কি উপায়ে? কাজেই হাতিটা সামন্তগৃহে

থাকিয়া দৈনিক আধমণ চাল ও পাঁচটি তাজা কলাগাছ নিয়মিত আহার করিতে থাকিল। সামন্ত মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন বিবাহটা চুকিয়া গেলে হাতে পায়ে ধরিয়া দক্ষিণাবাবুকে ফিরাইয়া দিয়া আসিবেন।

ইতিমধ্যে সামন্ত-গৃহিণী দু-একদিন হাতি চাপিয়া হাওয়া খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল যে হাতির ইচ্ছা অন্যরূপ। মাহুতের (সামন্ত একটা মাহুত জোগাড় করিয়াছেন) উপরোধ অনুরোধ তাড়ন পীড়ন সত্ত্বেও মাতঙ্গিনী এক পা-ও নড়ে নাই। তখন গৃহিণী ক্ষমার সুরে বলিয়াছিলেন, থাক্, থাক্, মাতু আমার বিয়ের বর ছাড়া আর কাউকে পিঠে তুলবে না।

এ তো যে-সে হাতি নয়, পাটহাতি...

তারপর ব্যাখ্যার ছলে দর্শকদের বুঝাইয়া বলিলেন, এ তো যে সে হাতি নয়, পাটহাতি, ওদের রকম-সকমই আলাদা।

অতএব পাটহাতি আম্রবৃক্ষতলে অচল অটল দাঁড়াইয়া রহিল—আর উদ্বিগ্ন সামন্ত বিবাহের দিন গণনা করিতে লাগিলেন।

তারপরে একদিন শুভদিনে শুভক্ষণে শ্রীমান্ সুরেন্দ্র রেশমী ধুতি চাদর চন্দন ও টোপরে সুসজ্জিত হইয়া শঙ্খ ও সানাইয়ের ধ্বনির মধ্যে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিল, সঙ্গে দু'চার জন বন্ধুবান্ধব চলিল। বরকর্ত্তা ও অন্যান্য প্রবীণ বিজ্ঞজনেরা চলিলেন ঘোড়ার গাড়ীতে। নিকটেই একটি গ্রামে কন্যাপক্ষের বাস। মাহুতের সঙ্কেতমাত্রে সেদিন হাতিটি যাত্রা করিল, কোনপ্রকার অসম্মতি বা অশিষ্টতা জ্ঞাপন করিল না।

পুলকিত গৃহিণী সকলকে শোনাইয়া শোনাইয়া বলিলেন—কেমন বলেছিলাম না, এ আমার পাটহাতি, বিয়ের বর না নিয়ে নড়বে না। কেমন, এখন দেখলে তো!

সকলকেই স্বীকার করিতে হইল যে দেখিল—কিন্তু তখনো কেহই জানিত না যে এখনো দেখিবার অনেক বাকি।

- হাতি
  শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

## তিন

দক্ষিণাবাবু নীরবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন, গৃহিণী তারস্বরে কাঁদিতেছেন, বিন্ধ্যবাসিনী পাথরের মতো নিশ্চল, অন্যান্য সকলে সময়োচিতভাব অবলম্বন করিয়াছে। নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে মেয়ের বিবাহ স্থির হইয়াছিল। অদ্য বিবাহের দিন বিকাল বেলায় বরপক্ষ জানাইয়া দিয়াছে এ বিবাহে তাহাদের সম্মতি নাই, কারণ স্বরূপ বলিয়া পাঠাইয়াছে বর আনিবার জন্য দক্ষিণাবাবুর হাতি পাঠাইবার কথা ছিল, তিনি হাতি পাঠান নাই। কিন্তু আসল কারণ অন্যরূপ। জমিদারী বাজেয়াপ্ত হওয়াতে দক্ষিণাবাবুর অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনকাল একসঙ্গে ডুবিয়াছে। এই স্থূল সত্যটিই বরপক্ষের আকস্মিক মতি পরিবর্ত্তনের হেতু। যিনি 'আখেরে' জামাইকে দেখিতে পারিবেন না—তাঁহার কন্যাকে ঘরে লইয়া গিয়া লাভ কি? তা ছাড়া বর নিজেও তৈরি ছেলে, ইতিমধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরূপে দু'চার বার বিদেশে যাইবার ফলে বিবাহ প্রথা সম্বন্ধেও সে ভিন্নমত পোষণ করিতে সুরু করিয়াছে। ফলে সপরিবারে দক্ষিণাবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন।

প্রথম সংবাদ শ্রবণের বজ্রচকিত অবস্থা কাটিলে সঙ্কট-উদ্ধারের সম্ভব অসম্ভব বহুপ্রকার উপায় আলোচনা হইয়া গিয়াছে কিন্তু সঙ্কট গোড়াতেও যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে।

বিন্ধ্যবাসিনীর মামা বলিল—হতভাগাটাকে একবার হাতে পেলে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দিতাম।

দক্ষিণাবাবুর জ্ঞাতি ভাই বলিল—আরে হাতে পেলে আর মারতে যাবো কেন, কানে ধ'রে পিঁড়িতে বসিয়ে দিতাম না!

মামা কোর্ট ছাড়িবার পাত্র নয়, অবশ্যই পিঁড়িতে বসাতাম কিন্তু তার আগে একবার ধোলাই দিয়ে নিয়ে।

দক্ষিণাবাবু বলিলেন, নাও এখন চুপ করো। বাচালতা ভালো লাগছে না। তারপর বলিলেন—এই কদিনের মধ্যে সাতপুরুষের জমিদারী গেল, কত সাধের মাতু মা গেল—সে সমস্তই সয়েছিলাম। এ যে অসহ্য! বলিয়া তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

হিন্দুগৃহে যথা-নির্দ্দিষ্ট লগ্নে বিবাহ না হইলে সামাজিক ও মানসিক কিরূপ দুরবস্থা যে ঘটিয়া থাকে তাহার বিশদ বর্ণনা অনাবশ্যক। দক্ষিণাবাবু স্থির করিলেন আজ রাত্রেই সপরিবারে গ্রাম ত্যাগ করিবেন। তিনি ভাবিলেন ক'দিন পরে তো যেতেই হতো; কিন্তু না, এর পরে আর একটা দিন থাকাও অসম্ভব।

অবশ্য অন্য বর সংগ্রহের একটা প্রস্তাব উঠিয়াছিল কিন্তু তাহার সুদূর মাত্র সম্ভাবনাও না থাকাতে অনেকক্ষণ সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে। দীপহীন বাদ্যহীন আনন্দহীন রাত্রির দণ্ডপলগুলি ক্লেদাক্ত সরীসৃপের মতো সেই বিমূঢ় পরিবারটির মাথার উপর দিয়া মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল।

## চার

মাতঙ্গিনী দ্রুত চলিতেছে। যে-হাতি এতদিন এক পা নড়ে নাই, আজ যেন সে এতকালের ক্ষতিপূরণ করিয়া লইবার জন্য উদ্যত। বর ও তাহার বন্ধুগণ হাতির চালে অনভ্যস্ত, কৌতুক ও কৌতূহলের সঙ্গে তাহারা সেই ঢেউয়ের দোলা উপভোগ করিতে লাগিল। আধঘণ্টা-খানেক পরে তাহারা দেখিল যে হাতিতে ও মাহুতে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হইয়াছে। মাহুত ঘন ঘন অঙ্কুশের খোঁচা মারিতেছে আর হস্তীর অভিধানে যে-সব বোধগম্য শব্দ আছে তাহা ব্যবহার করিতেছে।

● হাতি
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

কে এলো, কে এলো...'পিঠে ও কারা?'

বর শুধাইল—ব্যাপার কি?

মাহুত বলিল—জানোয়ারটা বড় পাজি।

কেন, বেশ তো চলছে।

বাবু, চলছে বটে কিন্তু এ যে সুন্দরপুরের পথ ছেড়ে ভাঙাকলসীর পথ ধরলো।

সুন্দরপুর কন্যা-পক্ষের গ্রাম।

বর এবার উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, ভাঙাকলসী আবার চল্‌ল কেন?

ঐ গ্রামে এতকাল ছিল কি না, হাতিটা ছিল ভাঙাকলসীর বাবুদের।

এখন উপায়?

ফেরাতে চেষ্টা করছি, কিন্তু গাঁয়ের পথের গন্ধ পেয়ে বড় দামাল হ'য়ে উঠেছে।

মাতঙ্গিনী প্রমত্ত গতিতে ভাঙাকলসীর দিকে ছুটিল।

বরপক্ষের কেহ বলিল, লাফিয়ে পড়া যাক্।

কেহ বলিল, ডাল ধ'রে ঝুলে পড়ো।

কেহ বলিল, যেমন আছ বসে থাকো, ওসব কাজের কথা নয়।

কার্য্যতঃ তাহাই হইল।

মাতঙ্গিনী কিছুক্ষণের মধ্যে একেবারে ভাঙাকলসীর বাবুদের দেউড়িতে আসিয়া থামিল।

কে এলো, কে এলো রবে দক্ষিণা-বাবুর বাড়ীর সকলে ছুটিয়া আসিল। সকলে বিস্মিত আনন্দে দেখিল মাতঙ্গিনী। 'পিঠে ও কারা?' 'কোন্ গাঁয়ের বর গো?' প্রভৃতি প্রশ্ন-বাণ ছুটিল। অবশেষে সমস্ত অবস্থা শুনিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর মামা বলিয়া উঠিল, হাতে পেয়েছি, এবারে ঘা কতক আচ্ছা ক'রে বসিয়ে দিই—সামন্তর জন্য আজ আমাদের এই হেনস্তা।

বিন্ধ্যবাসিনীর কাকা বলিল, আহা-হা ঘা-কতক দিতে হয় সামন্তকে দিয়ো, আমি হাতে বর পেয়েছি, ছাড়ছি না।

তবে তুমি কি করতে চাও?

একেবারে পিঁড়িতে নিয়ে বসাতে চাই।

● হাতি
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বর্ত্তমান পরিস্থিতির মধ্যে যে এতখানি সম্ভাবনা নিহিত থাকিতে পারে কাহারো মনে আসে নাই। সকলে 'জয় মা আনন্দময়ী' ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

আনন্দময়ী দক্ষিণাবাবুদের কুলদেবী।

বিন্ধ্যবাসিনীর কাকা বলিল, ঐ সঙ্গে একবার বলো 'জয় মা মাতঙ্গিনী'—ও না থাকলে বর পেতে কোথায়?

তারপরে ভাঙাকলসীর সকলে একপ্রকার জোর করিয়াই বর ও বন্ধুদিগকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল।

বর আপত্তি করিলে এক বন্ধু বলিল—তুমি তো আর 'লভে' প'ড়ে বিয়ে করছ না, এক জায়গায় না হ'য়ে অন্যত্র হলে ক্ষতি কি!

তাছাড়া, অন্য এক বন্ধু বলিল, এঁদের যা ভাবগতিক দেখছি এখন চুপ ক'রে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

কাজেই বরপক্ষ বুদ্ধিমানের কাজ করিল। সত্য কথা বলিতে কি গতানুগতিক বিবাহের মধ্যে একটু এড্‌ভেঞ্চারের রস পাইয়া তাহারা কিঞ্চিৎ গর্ব্বও অনুভব করিতেছিল।

অতঃপর পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট শুভক্ষণে সামন্তপুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রের সঙ্গে শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনীর শুভ-বিবাহ যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহান্তে বিন্ধ্যবাসিনীর মাতা গলবস্ত্রে মাতঙ্গিনীর পায়ে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া এক কাঁদি কদলী নিবেদন করিলেন।

## পাঁচ

পরদিন অতি প্রত্যূষে উদ্‌ভ্রান্ত সামন্ত সাহেব সদলবলে দক্ষিণাবাবুর বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন।

সারারাত্রি বরের ব্যর্থ সন্ধান করিয়া, কন্যাপক্ষের কাছে লাঞ্ছিত হইয়া অবশেষে কিভাবে মাতঙ্গিনীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এ গ্রামে আসিলেন সে বিস্তর কথা। দক্ষিণাবাবু তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। সামন্ত সাহেব প্রথমে রাগ, পরে মুখ ভার, অবশেষে পুত্রবধূ দেখিয়া উৎফুল্ল হইলেন, বলিলেন প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাতে পারে!

মেয়ে-জামাই বিদায়ের সময়ে দক্ষিণাবাবু সামন্ত সাহেবকে বলিলেন, বেয়াই বিন্ধ্যবাসিনীর হাতিটা বিন্ধ্যবাসিনীর সঙ্গেই যাক।

উদ্বিগ্ন সামন্ত সাহেব বলিলেন—ঐটি মাপ করবেন, জমিদারের হাতি পুষবার ক্ষমতা আমার নেই। তারপরে একটু ভাবিয়া বলিলেন, অবশ্য হাতি পুষতে পারে এমন অফিসারও আছে, বুঝলেন কি না—সব ঘুষখোরের দরবার।

যাত্রাকালে দেখা গেল মাতঙ্গিনী সর্ব্বাগ্রে গা ঝাড়া দিয়া প্রস্তুত হইয়াছে।

দক্ষিণাবাবু বলিলেন—দেখলেন তো!

সামন্ত হতাশভাবে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তবে সঙ্গেই চলুক, কি আর করবো।

যাত্রার ঠিক প্রাক্কালে কোথা হইতে দক্ষিণাবাবুর শিশুপুত্র ছুটিয়া আসিয়া বলিল—দেখো, আমি আগেই বলেছিলাম যে মাতু আবার ফিরে আসবে।

---

# ছিন্ন-কুসুম

**শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)**

আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে গড়গড়ার নল থেকে প্রচুর ধোঁয়া ছড়িয়ে দাদু রসিকতা করে বল্লেন, আর কত মুখস্থ করবি হেনা? তোর মুখে যে ফেনা উঠে গেল!

বেণী দুলিয়ে হেনা উত্তর দিলে, এই ভূগোলটা ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে একটু দেখে নিলেই আমার কাজ শেষ দাদু। তখন আর কেউ আমায় ঠকাতে পারবে না।

ফোটা ফুলের মতোই রূপে-রসে ঢল ঢল মেয়ে হেনা। দাদু-দিদিমার বড় আদরের নাতনী। খুব যখন ছোট, তখুনি সে মাকে হারিয়েছে। কিন্তু দাদু-দিদিমা একেবারে জোড়া ডানা দিয়ে যেন আগ্‌লে রেখেছেন। পড়া-শোনা, খেলাধূলায় একেবারে চৌকস। স্বাস্থ্যটিও ওর খুব ভালো। একটু বাড়ন্ত গড়ন, তাই বয়সের চাইতে একটু বড়ই দেখায়।

পনরোয় পা দিয়েছে, এই বছর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবে।

পড়ার কথা কিন্তু হেনাকে একবারও বল্‌তে হয় না। সেই কোন্ সকালে বইপত্তর গুছিয়ে ছাদে পড়তে বসে। রোদ্দুর এসে পড়ে—আর হেনাও সরে-সরে যায়। ছাদের এ-মাথা থেকে ও-মাথা অবধি।

দিদিমা বলেন, ও রাক্ষুসী বইগুলোকে গিলে খাবে। কি যে রস পায় ওর মধ্যে এত...বুঝ্‌তে পারিনে বাপু! আমরাও ত' এককালে ছেলেমানুষ ছিলাম।

হেনা দিদিমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, তোমার ত' আট বছর বয়সে দাদুর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল! তখন শাড়ী সাম্‌লাবে, না পড়বে?

দাদু উৎসাহিত হয়ে উত্তর দেন, ঠিক বলেছিস দিদি! আমার সঙ্গে তখন দিনরাত ঝগড়া করত তোর দিদিমা! একদিন ত' আমার হাতই কাম্‌ড়ে দিয়েছিল! একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড!

হেনা মাথা নেড়ে বলে, ভাগ্যিস তখন আমি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তোমার হাত ব্যাণ্ডেজ করে দিলাম! আমার ঠিক মনে আছে দাদু!

ফোক্‌লা দাঁতে দাদু হাসেন আর মাথা নেড়ে বলেন, ঠিক! ঠিক!

এইভাবে তিনজনের আসর ভারী জমে ওঠে।

মামারা হেনা বলতে একেবারে অজ্ঞান।

জন্মদিন এলো হেনার। কোন্ মামা ভাগ্নীকে কি উপহার দেবে ভেবে পায় না।

কেউ যদি দিল গ্রামোফোন ত' আর এক মামা পিংপং এনে হাজির করল। একজন শেলায়ের বাক্স...ত' আর একজন বাজাবার জন্যে সেতার। রকমারি প্রসাধন যেই এলো একজনের হাতে,—অমনি অপর মামা নাচের ঘুঙুর নিয়ে এসে হাজির।

তা নাচও চমৎকার শিখেছে হেনা।

ও বলে, যে রাঁধে—সে কি আর চুল বাঁধে না? তাই পড়াশোনার মধ্যে খেলাধূলা, খেলাধূলার সঙ্গে নৃত্যগীত, আর নৃত্যগীতের সঙ্গে ছবি আঁকা! এইভাবে চমৎকার যেন মালা গেঁথেছে হেনা।

ইস্কুলের উৎসব-অনুষ্ঠানে হেনাকে বাদ দিয়ে কোন কাজ হবার যো নেই। বড়দিদিমণি সব ব্যাপারে হেনাকে ডেকে পাঠান।

অন্যান্য মেয়েরা এজন্যে মনে মনে ভারী চটে যায়, কিন্তু মুখে কিছুই বল্‌তে পারে না। একে সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে হেনা, তার ওপর কত তার গুণ! মাকাল ফল ত' আর নয়! তাই হেনার আদর ঘরে বাইরে।

সেই হেনা এবার পরীক্ষা দিচ্ছে।

মাসিদের কারো ছেলেপুলে নেই। তাদেরও হেনা-অন্ত প্রাণ। হেনার শরীর যাতে ভালো থাকে, হেনা যাতে মোটা-সোটা হয়—এ জন্যে মাসিদের চোখে ঘুম নেই। রকমারি সব খাবার আস্‌ছে—এবাড়ী, ওবাড়ী, আর সে-বাড়ী থেকে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, সবই যেন বাড়াবাড়ি কাণ্ড!

দাদু মেয়েদের সব কাছাকাছি বিয়ে দিয়েছেন—চোখের আড়াল করবেন না বলে। তাই ত' হাত বাড়ালেই হেনার মাসির বাড়ীগুলোর নাগাল পাওয়া যায়। বড়মাসি পাঠাচ্ছে ফলের সরবৎ, মেজমাসি পাঠাচ্ছে পায়েস, ছোটমাসি হয়ত' পাঠাচ্ছে—ভেট্‌কি মাছের ফ্রাই।

● ছিন্ন-কুসুম

শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

হেনা সারা বাড়ী ঘুরে ঘুরে পড়ে, আর মাসিদের দেয়া খাবার চেখে চেখে দেখে। কোনো মাসিকেই সে চটাতে রাজী নয়।

দাদুর ত' ধারণা তাঁর নাতনী বৃত্তি পেয়ে পাশ করবে।

হেনা ঠোঁট উল্টে বলে, হুঁ, তোমার নাতনীর মতো হাজার হাজার মেয়ে গাছ-কোমর বেঁধে তৈরী হয়ে আছে। তাদের ডিঙিয়ে যেতে পারলে তবে ত' বৃত্তি।

দাদুও রসিকতা করতে ছাড়েন না!

—আমার নাতনীর মতো হাই জাম্প্ আর লঙ জাম্প্ ক'টা মেয়ে জানে শুনি? হুঁ! হুঁ! আমাদের হেনারাণীর কাছে আর কাউকে এগুতে হয় না!

পরীক্ষার দিন চারেক আগে দাদুর বাড়ীতে এক আসর বসেছে। তাতে দাদু, দিদিমা ছাড়াও মাসিরা আর মামারা উপস্থিত রয়েছে।

মামারা আগেই রায় দিয়েছে—এ ক'দিন আর পড়াশোনা নয়, এইবার মাথাটাকে ঠাণ্ডা কর হেনা। নইলে সব জমে কুলপী বরফ হয়ে যাবে।

মাসিরা বলেছে, শুধু রকম রকম খাবার চাখা, আর ঘুম। তবে ত' পরীক্ষার হলে পাঞ্জাব মেলের মতো ছুটবে কলম!

এক পল্লী-অঞ্চলে দাদুর প্রকাণ্ড বাড়ী। খেত-খামার, পুকুর-মন্দির, অতিথিশালা নিয়ে দাদুর বাড়ীর বিরাট্ সীমানা। কাজেই সেখান থেকে ত' আর পরীক্ষা দেয়া চল্‌বে না! যেতে হবে এক মহকুমা শহরে। দাদু সে সব আগে থাক্‌তেই ঠিক করে রেখেছেন। তাঁরই এক অবসর-প্রাপ্ত বন্ধুর বাড়ীতে থেকে হেনা পরীক্ষা দেবে। হেনার ছোট মামা ওকে নিয়ে যাবে সেখানে। পাকা ব্যবস্থা, চিন্তার কোনো কারণ নেই।

দাদুর বাড়ীর সেই বৈঠকে দাদু নিজেই প্রস্তাব করলেন, আগে আমার দিদির পরীক্ষাটা হয়ে যাক্—তারপর সবাইকে নিয়ে চমৎকার এক বন-ভোজনের আয়োজন করা হবে।

মাসিরা ধরেছে, তাদের বাড়ীতে পরীক্ষার পর কয়দিন করে থাক্‌তে হবে।

দিদিমার আবদার আবার অন্যরকম।

—এদ্দিন নাতনীর পরীক্ষার জন্যে আমি এক পা বাড়ীর বাইরে বেরুতে পারিনে! এইবার আমি আর কারো কথা শুন্‌বো না। সোজা একেবারে তীর্থ করতে বেরুবো। হেনা যাবে আমার সঙ্গে। ও নইলে আমার এক পা পথ চল্‌বার সাধ্যি আছে?

দিদিমার প্রস্তাব শুনে আর সবাইকার পরিকল্পনা একেবারে বাতিল হয়ে যায় আর কি!

মামারা গাঁই-গুঁই করতে লাগলো।

—বারে! আমরা ঠিক করে রেখেছি পরীক্ষার পর হেনাকে নিয়ে কল্‌কাতায় বেড়াতে যাবো।

- ছিন্ন-কুসুম

শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

সেখানে যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন, দক্ষিণেশ্বর, সিনেমা, থিয়েটার, হাওড়া ব্রিজ সব দেখাবো.......তা তুমি সব ওলট-পালট করে দিচ্ছ!

তখন হেনা এসে ওদের ঘরোয়া বিবাদ থামিয়ে দেয়।

—আগে আমার পরীক্ষা হোক তবে ত'! কে জানে বাপু, পাশ করবো কি ফেল করবো!

হেনার এই কথায় মামা আর মাসিরা একসঙ্গে হো-হো করে হেসে ওঠে! যেন কত বড় একটা রসিকতা করেছে হেনা!

অবশেষে যাত্রার দিন এলো।

দাদু জেলে ডেকে পুকুর থেকে মাছ ধরিয়েছেন। সেই জ্যান্ত মাছ দেখে নাতনী পরীক্ষা দিতে রওনা হবে। মঙ্গলাচরণের কোনোটাই বাকি নেই। দরজায় পূর্ণকুম্ভ, উঠোনে সবৎসা ধেনু, কপালে দিদিমার দেয়া দৈয়ের ফোঁটা, মাসিমারা মঙ্গলচণ্ডীর আশীর্ব্বাদী ফুল আঁচলে বেঁধে দিয়েছে,—সিদ্ধিদাতা গণেশ আর দুর্গানাম জপ করে হেনা ছোটমামার সঙ্গে মহকুমার শহরে যাত্রা করল।

জলাঙ্গী নদী দিয়ে নৌকোয় যেতে হবে পথটা। দাদু মাঝি-মাল্লা সব ঠিক করে রেখেছেন। সুবাতাস পেলে পাল তুলে দেবে নৌকোয়। সোজা পথ। ভাবনার কিছু নেই!

পরীক্ষার আগের দিন বিকেল বেলা ছোটমামা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে হেনাকে সিট্ দেখিয়ে এনেছে। যাতে পরীক্ষা দিতে গিয়ে কোনো অসুবিধায় না পড়ে।

পরপর দুটো দিনের পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছে। হেনার হাসি-খুশী মুখ দেখে ছোটমামা বাড়ীতে চিঠি লিখে দিয়েছে। আর ত' মাত্র তিনটি দিন। তারপর ভাগ্নীকে নিয়ে বাড়ী পৌছে যাবে। দিদিমা নাতনীর কল্যাণে সত্যনারায়ণ পূজো মানত করেছেন।

ভূগোল পরীক্ষার দিন হেনারই উৎসাহ সব চাইতে বেশী। সারা পৃথিবীটা ও যেন চোখের ওপর দেখ্‌তে পায়। তা ছাড়া চমৎকার ম্যাপ আঁকতে পারে হেনা। ইস্কুলের দিদিমণিরা পঞ্চমুখে ওর ম্যাপের প্রশংসা করেন।

পরীক্ষার হলে আজ হেনার কলম চলেছে দ্রুতবেগে। তুফান মেলকেও ছাড়িয়ে চলেছে ওর লেখনীর গতি। সমস্ত প্রশ্নের মনোমত উত্তর যখন লেখা হয়ে গেল—তখন হেনা সুন্দর করে ম্যাপ আঁকতে বসল।



হেনা বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করে নি যে, তার পেছনে একটি মেয়ে বসে ম্যাপ ট্রেস করে নিচ্ছে পরীক্ষার খাতায়। দূর থেকে গার্ডের মনে হয়েছে,—একটি মেয়ে ওই লাইনে কি যেন টুকে নিচ্ছে। বারে বারে খাতার পাতা ওল্‌টাচ্ছে আর মিলিয়ে নিচ্ছে। চুপি চুপি গার্ড এগিয়ে আসেন।

পেছনের মেয়েটি এক মুহূর্ত্তে ব্যাপারটা বুঝে নেয়। চোখের পলকে ম্যাপটা ভাঁজ করে হেনার

● ছিন্ন-কুসুম
শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

অজান্তে তার খাতার তলায় গুঁজে দেয়। তারপর ভালো মানুষের মতো খাতার ওপর মুখ গুঁজে কি যেন লিখতে থাকে।

হেনার অজান্তে তার খাতার তলায় গুঁজে দেয়।

গার্ড এসে দাঁড়ান ওদের দুজনের মাঝখানে। কিন্তু হেনার সেদিকে বিন্দুমাত্র হুঁস নেই। সে আপন মনে ম্যাপ এঁকে চলেছে। হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়ায় ওর খাতার তলা থেকে সেই ম্যাপটা বেরিয়ে আসে।

সঙ্গে সঙ্গে গার্ডও সেটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরেন। গম্ভীরভাবে হেনাকে বলেন, উঠে এসো আমার সঙ্গে—

হেনা কিছুই বুঝতে পারে না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে আসে গার্ডের আহ্বানে।

কিন্তু যখন সে গার্ডের অভিযোগ বুঝতে পারল—তখন আর তার মুখে কোনো কথা জোগাল না!

গার্ড প্রমাণ করে দিলেন, সে মানচিত্র দেখে দেখে আঁকছিল। কাজেই তার পরীক্ষা বাতিল হয়ে গেছে!

হেনা যে কি বল্‌বে কিছু বুঝে উঠতে পারল না! তার মুখ যেন চিরকালের জন্য বোবা হয়ে গেছে! অনেক কথাই তার বুক ঠেলে বেরিয়ে আস্‌ছিল! কিন্তু অপমানে আর অভিমানে সে কোনো কথাই বুঝিয়ে বলতে পারল না। তার কান আর চোখ দিয়ে যেন আগুনের হল্‌কা বেরুতে লাগ্‌লো।

গার্ড হুঙ্কার দিয়ে বল্লেন, এই মুহূর্ত্তে তুমি পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে চলে যাও। এখানে এক মুহূর্ত্তও আর তোমার স্থান হবে না।

হেনার মনে হল,—চারদিকে কারা যেন শুধু খিল্‌-খিল্‌ করে হাস্‌ছে! সামনে-পেছনে, ডাইনে-

● ছিন্ন-কুসুম
শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

বাঁয়ে, উপরে-নীচে শুধু ব্যঙ্গের হাসি!

হেনা দু'হাত দিয়ে নিজের দু'কান চেপে ধরল। তারপর উন্মাদের মতো গন্‌গনে আগুন-পথে পা চালিয়ে দিলে!

পথ সে চেনে না, তবু এখানে আর কোনোমতেই তার থাকা চলে না! দূর-দূর করে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে পরীক্ষার হল থেকে! খিল্‌খিলে হাসি ওকে যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে লোকালয়ের বাইরে,—যেখানে কেউ ওর মুখ দেখে ছি-ছি করে উঠবে না!

মাথার ওপর চৈত্রের প্রচণ্ড সূর্য্য আর পায়ের নীচে অগ্নিময় উত্তাপ...হেনার মনে হল, সে যেন ঝল্‌সে যাচ্ছে—পুড়ে যাচ্ছে... কালো অঙ্গার হয়ে যাচ্ছে—দেহের আর মনের দহনে!

আচ্ছা, গার্ড কি তার মুখের দিকে একবার চাইতে পারতেন না, একবার বল্‌তে পারতেন না,—আচ্ছা তোমার অভিভাবক আসুন, ততক্ষণ তুমি পাশের ঘরে অপেক্ষা করো। সমবেদনার দৃষ্টি দিয়ে তাকে কি বিচার করতে পারতেন না তিনি? ওর মুখে কি চোরের ছাপ দেয়া আছে—তাই তিনি এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করে পথের কুকুরের মতো ওকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিলেন?

এই মুহূর্ত্তে তুমি পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে যাও। [পৃঃ ৯২

দেহের যত না কষ্ট হচ্ছিল—তার চতুর্গুণ আগুন জ্বলছিল হেনার মনে! এই কালো মুখ নিয়ে সে কি করে দাদুর সাম্‌নে দাঁড়াবে? মামাদের মনে যে কত আশা! মাসিরাই বা কি মনে করবে? দিদিমা কি অলক্ষ্মী মনে করে মুখ ফিরিয়ে নেবে না?

হেনা আর কিছু ভাবতে পারে না!

পাগলের মতো ক্রমাগত এগিয়ে চলে। একটা গাছের ডালে—দুটো দাঁড়কাক বিশ্রী সুরে ডাক্‌ছিল।

হেনার মনে হল—কাক দুটো তারই দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলছে, তুই মর্—তুই মর্...!

হেনা যেন চোখে আর কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছে না, সাম্‌নে, পেছনে—ডাইনে, বাঁয়ে—শুধু ধোঁয়া, শুধু লাঞ্ছনা আর অপমানের কুয়াসা!

● ছিন্ন-কুসুম
শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

সেই কুয়াসা ওকে গ্রাস করে ফেল্লে!

সারা শহরময় তোলপাড় সুরু হয়েছে!

পরীক্ষার হল থেকে বহিষ্কৃত একটি মেয়ের কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না!

কেন তাকে একলা দুপুরের রৌদ্রের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, কেন তাকে অভিভাবকের হাতে সমর্পণ করা হয়নি এই নিয়ে কাগজে-কাগজে আলোচনা চলছে।

পরীক্ষা-অধিকর্ত্তারা এই নিয়ে বিষম বিপদে পড়েছেন। কৈফিয়ৎ তলব করে পাঠিয়েছেন—গার্ডের কাছ থেকে।

কিন্তু তাতেই ত' সব কিছু গোলযোগের মীমাংসা হয় না! সারা অঞ্চল জুড়ে একটা থম্‌থমে ভাব। এই ব্যাপারের পর অভিভাবকমণ্ডলী আর বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। তাঁরা সমস্ত ব্যাপারটা অনুসন্ধানের জন্যে একটি শক্তিশালী কমিটি নিয়োগের পক্ষপাতী।

মেয়েটি যে প্রকৃতই অপরাধী ছিল তার প্রমাণ কি? এ সম্পর্কে বহু অভিভাবক সন্দেহ প্রকাশ করে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চালাতে বদ্ধপরিকর।

কিন্তু ফুলের মতো সেই হেনা মেয়েটি...তার আর কোনো সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না!

অনুসন্ধান চলেছে চারদিকে!

ট্রেনে, ষ্টীমারে, উল্লেখযোগ্য ষ্টেশনগুলিতে সরকারের গোয়েন্দা-বিভাগ বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছে!

কিন্তু সকলের সমবেত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে সব সংবাদ যেন একেবারে মূক হয়ে আছে!

আবার সাতদিন পর সংবাদপত্রের এককোণে একটি ছোট খবর প্রকাশিত হতে সারা দেশময় আন্দোলনের ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠলো।

সেই সংক্ষিপ্ত সংবাদে জানা গেল,—শহরের একান্তে একটি নদী থেকে একটি মেয়ের মৃতদেহ জেলেরা জাল ফেলে তুলেছে। মেয়েটিকে নাকি ভালো করে চেনা যাচ্ছে না। মাছেরা ঠুক্‌রে মেয়েটির নাক আর চোখ তুলে ফেলেছে। সেই বিকৃত দেহটি ফুলে উঠেছে। কেউ সে দিকে ভালো করে তাকাতে পারছে না।

নানাদিক থেকে বিশেষজ্ঞরা ছুটে এলেন। এলেন পরীক্ষা-অধিকর্ত্তারা। আর এলেন খবর নিতে—শিক্ষক-শিক্ষিকার দল।

ওদিকে দাদুর সেই আনন্দময় ভবন হঠাৎ এই নিদারুণ সংবাদে যেন পাষাণপুরী হয়ে গেছে। সেখানে বুঝি ফুল ফোটে না, পাখী গায় না, ভোর হয় না,—সে অমারাত্রির বুঝি শেষ নেই!

---

# কফিন-জাহাজ

## শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

পেনাং পুলিসের বড়কর্ত্তা ক্যাপ্টেন ওয়ালড্রন

নানা জাতির—নানা বর্ণের লোক। তাদের কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। তাদের ভাষা আলাদা, পোশাক-পরিচ্ছদ আলাদা, আচার-ব্যবহার আলাদা। পেনাং থেকে উত্তর উপনিবেশগুলির মধ্যে তাদের গতিবিধি আর কার্য্যকলাপ। তাদের নিয়ে পেনাং পুলিসের বড়কর্ত্তা ক্যাপ্টেন ওয়ালড্রনের অশান্তির আর অন্ত নেই। এদের নিত্য-নূতন অপরাধের ভয়াবহতায় তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন। অপরাধ-বিজ্ঞানের সমস্ত জ্ঞান যেন তাঁর মাঝে মাঝে গুলিয়ে যায়, তিনি সমস্যার কোন কূল-কিনারাই খুঁজে পান না—রহস্য যেন রহস্যই থেকে যায়!

কিছুদিন ধরে যে সমস্যাটির সমাধান তাঁর সবচেয়ে বড় দুর্ভাবনার কারণ হয়ে উঠেছে, তা হচ্ছে এই 'কফিন-জাহাজ' থেকে যাত্রীদের নিখোঁজ হওয়া নিয়ে। এই জাহাজগুলি ষ্ট্রেট-সেটেলমেণ্ট আর চীনদেশের মধ্যে নিয়মিত যাতায়াত করে। মালপত্র ও যাত্রী ছাড়া জাহাজগুলিতে আর যা চালান যায় তা হচ্ছে মৃতদেহ। বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে মরবার সময় যারা এই ইচ্ছা প্রকাশ করত যে, তাদের নিজেদের দেশে তাদের কবর দেওয়া হবে, সেই সব শব কফিনের মধ্যে পুরে এই জাহাজগুলির মারফত পাঠান হ'ত। এই জন্যেই এই জাহাজগুলির নামকরণ হয়েছিল 'কফিন-জাহাজ'।

এই জাহাজগুলির মধ্যে যে জাহাজখানি সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী দুর্নাম রটেছিল, তার নামে হচ্ছেঃ 'ব্যান লি সেঙ্গ'। এই জাহাজের মালিক ছিল একজন চীনা। জর্জ্জটাউন, পেনাং ও চীনদেশের নানা বন্দরের মধ্যে জাহাজখানি যাতায়াত করত। এই জাহাজ থেকে যে সব যাত্রী নিখোঁজ হ'ত, তাদের মধ্যে বেশীরভাগই ছিল চীনা শ্রমিক। এই সব শ্রমিকরা মালয়ে রবারের চাষে অথবা টিনের খনিতে কাজ শেষ হয়ে গেলে দেশে ফিরে যেত। তাদের সঙ্গে, তাদের যে টাকাকড়ি থাকত, তারও কোন হদিশ পাওয়া যেত না।

পুলিসের বড়কর্ত্তা ওয়ালড্রন সাহেব এই ব্যাপারে ভেবে ভেবে শেষে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত

হলেন যে, এই অপরাধের পিছনে নিশ্চয়ই কোন গুপ্ত-সমিতির লোকেরা আছে। 'বিশ্বশান্তি সমিতি'র ছদ্মনামে যে চোর ও হত্যাকারীদের দলটি ছিল, এ তাদের কাজ না হয়ে যায় না! এই সিদ্ধান্তে উপনীত
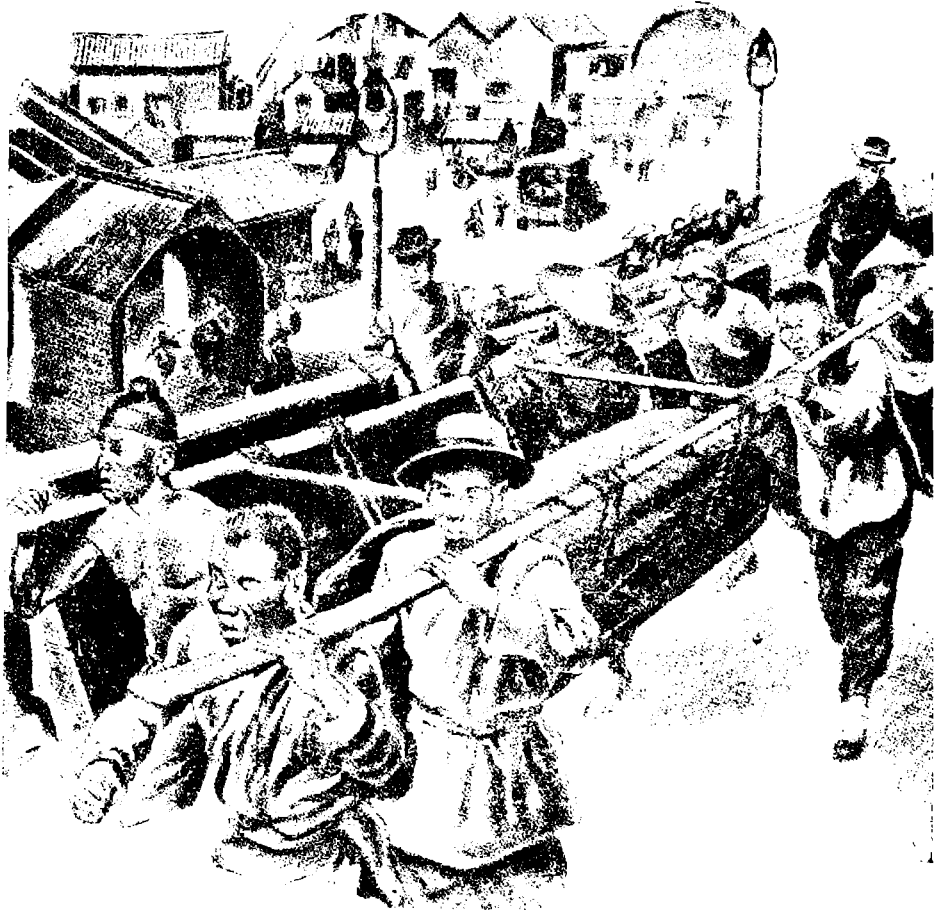
'ব্যান লি সেঙ্গ' জাহাজের উপর মৃত ব্যক্তিদের কফিনগুলি চীনা কুলিয়া ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে।

হয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ 'ব্যান লি সেঙ্গ' জাহাজের ইংরেজ পোতাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন বীটনকে খুঁজে বার করার জন্যে একজন গোয়েন্দাকে আদেশ করলেন, এবং তিনি যা ভেবেছিলেন, বোডেগাতে ক্যাপ্টেন বীটনকে

● কফিন-জাহাজ
শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

একটি মদের আড্ডায় খুঁজে পাওয়া গেল।

আধঘণ্টার মধ্যেই হেলতে-দুলতে পোতাধ্যক্ষ বীটন এসে হাজির হলেন পুলিসের বড়কর্ত্তার সামনে। মোটাসোটা চেহারা। মাথার টুপিটা বেঁকিয়ে পরা। ঠোঁটের কোণে একটা বর্ম্মা চুরোট গোঁজা। সেটা চিবুতে চিবুতে দুষ্টুমি ভরা চোখে ওয়ালড্রনের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আপনি কি আমায় ডাকছিলেন?—এই তো আমি এসে হাজির হয়েছি।'

ওয়ালড্রন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে ধীরভাবে বললেন, 'আপনি যদি আপনার মাথা থেকে টুপিটা খুলে, মুখ থেকে চুরোটটা সরিয়ে নেন, তা'হলে যে বেয়াদপিটা আপনি দেখাতে চাইছেন, সেটা একটু কম প্রকাশ পায়।'

এই হ'ল তাঁদের সাক্ষাতের সূত্রপাত।

আগন্তুক চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'আপনি বেয়াদব কাকে বলছেন? কোন পুলিসের লোকের কাছে এরকম ব্যবহার পেতে আমি অভ্যস্ত নই। আপনি কি জন্যে ঐ চীনেদের আড্ডায় লোক পাঠিয়ে আবার আমায় ডেকেছেন, তাই বলুন?—দেখুন, আমি জেলের কয়েদী নই, অতএব আমার সঙ্গে আপনি কি চাল চালতে চাইছেন বুঝতে পাচ্ছি না!'

'আপনাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি এই জন্যে যে, থানায় ডেকে পাঠানর চেয়ে এখানে ডেকে পাঠালে 'ব্যান লি সেঙ্গ' জাহাজের মালিকদের পক্ষে বা 'বিশ্ব-শান্তি সমিতি'র কর্ত্তাদের পক্ষে এটা জানাজানি হবার সম্ভাবনা ঢের কম। এটা আপনি স্বীকার করেন কিনা, ক্যাপ্টেন ফেল্‌টহ্যাম?'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাপ্টেনের মাথা থেকে টুপিটা আপনা-আপনিই যেন খ'সে পড়ার মত হ'ল, আর হাঁ ক'রে কি একটা বলতে যেতেই তাঁর মুখ থেকে চুরোটটা গেল প'ড়ে। পকেট থেকে একটা প্রকাণ্ড লাল রুমাল বার ক'রে তিনি তাঁর কপালটা একবার মুছে নিলেন। কথাটা শুনে তিনি যে বেশ বিচলিত হয়েছেন, তা বুঝতে আর বাকী রইল না ওয়ালড্রনের।

'কাকে—কাকে আপনি খুঁজছেন?' তিনি আমতা আমতা করে বললেন, 'আমার নাম তো বীটন!'

তাঁর কথা শুনে পুলিসের কর্ত্তা ওয়ালড্রন খুব জোরে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, 'সত্যিই আপনার সঙ্গে খুব অদ্ভুত মিল রয়েছে সেই নিখোঁজ জাহাজের ক্যাপ্টেন ফেলট্‌হ্যামের সঙ্গে। এঁকেই পুলিস খুঁজে বেড়াচ্ছে বম্বের একটি ছোকরাকে গুলি ক'রে হত্যা করার জন্য; ছোকরাটি বোধ হয় মালাবারীই হবে, কী বলেন?'

ক্যাপ্টেন একটু তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন, 'পুলিসের লোকের অজানা কি আছে বলুন! তবে ছেলেটা মাদ্রাজী ছিল, মালাবারী নয়। কিন্তু আপনি আমাকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে কি ডেকে পাঠিয়েছেন?'

'না, তা মোটেই নয়। কারণ আমার তা করবার ক্ষমতা নেই; সেই দক্ষিণ-আমেরিকার ব্যাপারেও তাই। সেবার সেটা বুশম্যান না জুলু ছিল?' ওয়ালড্রন প্রশ্নের সুরে বললেন।

ক্যাপ্টেন রেগে উঠে বললেন, 'এতও জানেন আপনি?'



● কফিন-জাহাজ
শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

ওয়ালড্রন আবার হেসে উঠলেন। তারপর তিনি তাঁর গলার স্বর যেন বদলে ফেললেন। কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ক্যাপ্টেনের বিক্ষিপ্তচিত্তে তিনি আইনের প্রতি এবং আইনের বাহনের প্রতি একটা মর্য্যাদাবোধ জাগাতে পেরেছেন। তাই তিনি অত্যন্ত কোমলভাবে বললেন, 'দেখুন, আমি আপনার সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলতে চাই এই মনে ক'রে যে, আমরা উভয়েই ইংরেজ।—আপনি বসুন ক্যাপ্টেন, আর এই টেবিলের উপর হুইস্কির বোতল রয়েছে, পান করুন।'

ক্যাপ্টেন রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে একখানা বেতের চেয়ার একটা বেতের টেবিলের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে তা'তে বসলেন। তারপর প্রাণ ভ'রে মদ্যপান করলেন খুব খানিকটা।

এই ভাবে যখন তাঁদের মধ্যে বেশ একটা সৌহার্দ্য জমে উঠল, তখন ওয়ালড্রন তাঁকে নানা রকম জেরা করতে আরম্ভ করলেন।

## ক্যাপ্টেনের বিবরণ

কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ হয়ে পড়ল যে 'চপ্‌জিন সেঙ্গ' নামে এক চীনা প্রতিষ্ঠান 'ব্যান লি সেঙ্গ' জাহাজের স্বত্বাধিকারী। ক্যাপ্টেন বীটন এই 'ব্যান লি সেঙ্গ' জাহাজে দু'মাস পূর্ব্বে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই জাহাজের নীচের খোলটা স্বর্গগামীদের কফিনে প্রত্যেকবারই যে ভর্ত্তি থাকত তাতে আর কোন সন্দেহ ছিল না। এর কারণ, প্রত্যেক আত্মসম্ভ্রমশীল চীনাই বিশ্বাস করত যে নিজের দেশে কবরিত না হলে, তারা আর তাদের পূর্ব্বপুরুষদের সঙ্গে মিলতে পারবে না। আর নিখোঁজ যাত্রীদের সম্বন্ধে এবং 'বিশ্ব-শান্তি সমিতি'র ছদ্মনামে যে গুপ্ত-সমিতিটি ছিল, তাদের ব্যাপারও প্রকাশ হয়ে পড়েছিল কিছু কিছু।

ক্যাপ্টেন বললেন যে, হ্যাঁ, মাঝে মাঝে দু'একটা ফিসফিসিনি তিনি শুনেছেন বটে, কিন্তু ছাদ থেকে যাকে ফেলে দেওয়া হয়, তার সঙ্গে সঙ্গে ছাদের পাথরগুলোও হুড়হুড় করে পড়তে থাকে, আর জাহাজের দেওয়ালগুলো এত শক্ত ও মসৃণ যে কারো সাধ্য নেই অন্ধকার বা কুয়াসার মধ্যে তাকে ফেলে দিলে, সেই দেওয়াল বেয়ে ওঠা। তিনি আরও বললেন, তাঁর কাজ হচ্ছে শুধু জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়া। এছাড়া তিনি আর কোন ব্যাপারে থাকেন না। গুয়ান চেঙ্গ ব'লে যে মাল-কর্ম্মচারী আছে সেই সব কিছু দেখে শোনে—সেই সব লোকজন ভর্ত্তি করে, এবং সেই লোকগুলোকে তার তাঁবে আনতে কোনই বাধা থাকে না—একটা আঙ্গুল তুলে নির্দ্দেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ে তারা তার আজ্ঞা প্রতিপালন করে।

এর পর আরও গম্ভীরভাবে ক্যাপ্টেন মন্তব্য করলেন যে, তাঁর নিজের জীবনও কখনও কখনও তিনি খুব নিরাপদ মনে করেন না। তাছাড়া যদি কোন গুপ্তকথা ব্যক্ত করে দিতে গিয়ে তিনি ধরা পড়ে যান, বা আপনার কোন চৈনিক গোয়েন্দা বোডেগাতে তাঁর সঙ্গে কথা কইছে ওরা দেখে, তা'হলেও তাঁর ভবলীলা শেষ হতে বাকী থাকবে না।

ক্যাপ্টেনকে জেরা করা যখন প্রায় শেষ হয়ে গেল, তখন পুলিসের কর্ত্তা বীটনকে বললেন, 'জাহাজ

● কফিন-জাহাজ
শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

যখন পরের বারে যাত্রা করবে তখন তিনি একজন গোয়েন্দাকে তাঁর জাহাজে রাখতে চান। গোয়েন্দা যদি প্রয়োজন হয়, নিজেকে চেনাবার জন্যে তাঁর সামনে একটি সঙ্কেত ব্যবহার করবে—তার ডান মুঠো থেকে তর্জ্জনী আর কড়ে আঙুলটি বার করা থাকবে। যদি গোয়েন্দা লোকটি কখনও কোন বিপদে পড়ে তা'হলে বীটন যদি তাকে সাহায্য করেন, তা'হলে তিনি তাঁর কাছে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ থাকবেন।

ক্যাপ্টেন রাজী হলেন এ প্রস্তাবে। তারপর খুব খানিকটা মদ গলায় ঢেলে তিনি যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'অনেক দেরী হয়ে গেল। পুলিসের লোক হলেও আপনি মানুষটি মন্দ নন! কিন্তু সেই লোকগুলোর কি হ'ল, যাদের সঙ্গে ফেল্‌টহ্যামের গণ্ডগোল বেধেছিল—সেই মাদ্রাজী এবং জুলু লোকগুলো?'

ওয়ালড্রন একটু হেসে বললেন, 'যদি সত্যি-সত্যিই এই গুরুতর ব্যাপারটি সম্বন্ধে আপনি কিছু করতে পারেন, তা'হলে আমি আপনার একটা মোটা আয়ের ব্যবস্থা ক'রে দেব। তা'হলে এটা ঠিক করতে হবে, আপনি কোন্ ক্যাপ্টেন সাজবেন—ফেল্‌টহ্যাম না বীটন?'

মুখে একটু হাসির রেশ টেনে ক্যাপ্টেন বিদায় নিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন বেয়ারা এসে জানাল যে, বাইরে কে একজন এসেছে—তার নাম বলছে হো সান। এরপর যে সুন্দরী জাপানী মেয়েটি ঘরে প্রবেশ ক'রে পুলিসের বড়কর্ত্তাকে অভিবাদন করল, সে হচ্ছে পেনাং গোয়েন্দা বিভাগের একমাত্র জাপানী কর্ম্মচারী। ওয়ালড্রন তাকে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে তার খবর শোনবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলেন।

মেয়েটি বললে যে, সে যেমন নির্দ্দেশ পেয়েছিল, সেই মত সে 'চপ্‌জিন্ সেঙ্গ' প্রতিষ্ঠানের মালিক চিঙ্গ সেঙ্গের বাড়ীতে পরিচারিকার কাজ নিয়েছিল। সেই বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরের দেয়ালের একটা ছোট ছ্যাঁদার ভেতর দিয়ে সে সব দেখেছিল এবং শুনেছিল যা কিছু সেই ঘরে হয়েছিল। একদিন সে দেখে যে, ঘরের মধ্যে রয়েছে চিঙ্গ সেঙ্গ, জাহাজের মাল-কর্ম্মচারী গুয়েন চেঙ্গ এবং রসদের ইন্‌চার্জ্জ লো মিঙ্গ। এরা তিনজনে সেদিন ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে যে সব কথাবার্ত্তা বলেছিল, সেই সব কথা সে বুঝতে পারে এবং নোট করে এনেছে।

## ষড়যন্ত্রীদের ষড়যন্ত্র

চিঙ্গ সেঙ্গ খুব গম্ভীরভাবে একটা কালো কাঠের চেয়ারে বসেছিল, আর দু'জন জাহাজের কর্ম্মচারী বসেছিল মেঝেতে। প্রথমেই মালকর্ম্মীটি গুপ্ত-সমিতির এই লাভজনক ব্যবসায় অফিসার ওয়ালড্রন বাধা সৃষ্টি ক'রে যে ক্ষতি করছেন সেই সম্বন্ধে অভিযোগ করলে। তারপর বললে যে, 'ব্যান লি সেঙ্গ' জাহাজের ক্যাপ্টেনকেও ওয়ালড্রন ডেকে নিয়ে গিয়ে নানা রকম প্রশ্ন করেছেন। যদি এই পুলিসের লোকটার এই রকম জিজ্ঞাসাবাদ করার উৎসাহকে বন্ধ করতে হয়, তা'হলে সে-ভার সে নিজে নিতে রাজী আছে। এই বলে সে ডান হাতের তর্জ্জনীটা গলার উপরে ঘষে কি রকম একটা ঘড় ঘড় শব্দ ক'রে উঠল।

● কফিন-জাহাজ
শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

ওয়ালড্রন এই শুনে শুষ্কভাবে বললেন, 'খুব ভালো ভবিষ্যৎ দেখছি!'

চিঙ্গ সেঙ্গ এই প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গেই কিছু উত্তর দিলেন না, কিন্তু রসদ-কর্ম্মচারী লো মিঙ্গ খুব যে ভয় পেয়ে গিয়েছিল, তা তার কথা থেকেই বোঝা গেল। সে মুখে কি একরকম শব্দ করে বললে, 'সবাইকে তোমরা যে বোকা ভাব তা তারা নয়।' তারপর সে অঙ্গভঙ্গী করে বুঝিয়ে দিলে যে, গুয়ান চেঙ্গ-এর গলায় এবার তারা ফাঁসির দড়ি লটকাবে।

চিঙ্গ সেঙ্গ যেন লো মিঙ্গের কথায় একমত হ'ল—এইরকম ভাব দেখাল। তারপর সে বললে, সে খুব ভাল ক'রেই এটা জানে যে, ক্যাপ্টেন ওয়ালড্রন তাদের এই 'বিশ্ব-শান্তি সমিতি'কে খুঁজে বার করবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, যার সভাপতি হয়ে নিজেকে সে ভাগ্যবান বলে মনে করে। সে আরও বললে যে, সে জানে ক্যাপ্টেন বীটনকেও খোঁজ করা হচ্ছে। কিন্তু তার মতে গুয়ান চেঙ্গের প্রস্তাব খুব বিপজ্জনক। তারপর, লো মিঙ্গ যখন তাকাচ্ছিল না, সে গুয়ান চেঙ্গকে কি ইশারা করলে, মালকর্ম্মীটিও পাল্টা একটা ইশারা করল।

এরপর চিঙ্গ সেঙ্গ হাতে তালি মেরে হো সানকে ডেকে তিনটে পাইপে আফিং ভরে দিতে বললে। হো সান তাই করলে। তারপরই হো সান পালিয়ে এসেছে ওয়ালড্রনকে সংবাদ দেবার জন্যে।

এই জাপানী মেয়েটির এজাহারে যেটি সবচেয়ে বড় সংবাদ প্রকাশ পেল, সেটা হচ্ছে যে, চিঙ্গ সেঙ্গ নিজে স্বীকার করেছে যে হত্যাকারী গুপ্ত-সমিতির (চীনা ভাষায় টঙ্গ) সেই হচ্ছে প্রধান কর্ত্তা। এই সমিতিটি পূর্ব্বেই সরকার কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছে, আর হো সানের খবর যদি ঠিক হয়, তা'হলে সেই বদমায়েসটাকে এখুনি ধরা যেতে পারে। ওয়ালড্রনের সন্দেহসূচক উক্তি শুনে মেয়েটি জোর ক'রে বললে যে, চিঙ্গ সেঙ্গ সম্বন্ধে সে যা বলেছে তা সম্পূর্ণ সত্য—কারণ সে সব কথা সে তার নিজের মুখেই শুনেছে। তখন ক্যাপ্টেন তাকে তার এই সৎ কাজের জন্য খুবই প্রশংসা করলেন। সে বিদায় নিল।

এর কিছুদিন পরে কিমবারলে রাস্তার উপরে এক চীনা বোর্ডিং-হাউসে একজন কুলি এসে একখানা ঘর ভাড়া চাইলে। তার দৃষ্টির মধ্যে একটা মিষ্টি শিশুকে ভাব, মুখখানা বোকার মত আর তার চালচলন খুব গেঁয়ো। তার ভারী কাঠের সিন্দুকটাতে যে লেবেল আঁটা ছিল, তা থেকে বোঝা গেল যে সে স্থানীয় টিন-খনির কেন্দ্র 'ইপো' থেকে আসছে।

যুবক কুলিটি যখন শুনল যে সে সেখানে ঘর পাবে, তখন সে একখানা চিঠি বার করে দেখাল ঐ বোর্ডিং-এর ম্যানেজারকে। 'ইপো'র এক টিন-খনির ম্যানেজারের লেখা সেই চিঠি। সেই চিঠিতে লেখা ছিল যে, এই চীনা যুবকটি প্রথম জাহাজেই হংকং-এ যাবে, অতএব এই ব্যাপারে তাকে কেউ সাহায্য করলে ভদ্রলোক কৃতার্থ হবে।

দাঁত বার ক'রে বোর্ডিং-এর ম্যানেজার আগন্তুককে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলে; তারপর সে তার নাম ও টিকিট কেনা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে। যুবকটি তার নাম বললে—অঙ্গ লি। এবং জানালে যে তার টিকিট কেনা হয়নি, আর সে জানেও না কি করে টিকিট করতে হবে। তাছাড়া সে

● কফিন-জাহাজ
শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

বললে যে, সে যখন খুব ছেলেমানুষ, সেই সময় থেকেই সে 'ইপো'তে ছিল, তাই বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তার কোন ধারণা নেই। শুধু এইটুকুই সে শুনেছে যে, এই পৃথিবীটা আয়তনে 'ইপো'র চেয়ে ঢের বেশী বড়।

তার কথা শুনে বোর্ডিং-এর ম্যানেজার হো হো ক'রে হেসে উঠল এবং আর একবার এই বোকা ছেলেটিকে আড়চোখে দেখে নিয়ে বলল যে, তার ভাগ্যটা খুবই ভাল, কারণ 'ব্যান লি সেঙ্গ' নামে বড় জাহাজখানা পরের দিনই যাত্রা করবে আর ঐ জাহাজের মাল-কর্ম্মচারীর সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব থাকায় সে তাকে জাহাজের পিছনের ডেকে ভাল ভাবে জায়গা ক'রে দেবে। তবে, এই ব'লে সে যুবকটিকে বিশেষ সাবধান করে দিলে যে, যদি তার কাঠের সিন্দুকটাতে টাকাকড়ি থাকে, তা'হলে সে যেন সতর্ক থাকে।

অবোধ যুবকটি ম্যানেজারের এই সৎ পরামর্শে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করলে এবং সে বলেই ফেললে যে, আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন, আমি ছ'বছর ধরে যা রোজগার করেছি তা সবই ঐ সিন্দুকটাতে আছে। তাছাড়া ওর মধ্যে আমার আত্মীয়-স্বজনের জন্যে অনেক উপহারের জিনিসও আমি নিয়ে যাচ্ছি। ম্যানেজার অত্যন্ত নিকট অভিভাবকের মত তার পিঠের উপর আদর ক'রে দু'তিনটে চাপড় মেরে সিন্দুকটাকে উপরে নিয়ে যেতে বললে। এবং একথাও তাকে বলে দিল যে, সে যেন সিন্দুকটার পাশেই ঘুমোয়, কারণ পৃথিবীর চারিদিকে যত লোক আমরা দেখি তার অধিকাংশই ভদ্রবেশে চোর-জোচ্চোর ঘুরে বেড়াচ্ছে, অতএব ভাল লোকদের তাদের থেকে সাবধান থাকা প্রয়োজন। ম্যানেজারের কথার আন্তরিকতায় যুবকটি উৎসাহিত হয়ে বললে যে, খনির ম্যানেজারও ঠিক এই কথাই তাকে বলে দিয়েছে।

## কফিন-জাহাজের উপরে

কফিন-জাহাজ ছাড়বার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে অঙ্গ লি তার টাকাকড়ি সমেত সিন্দুকটিকে সঙ্গে করে 'ব্যান লি সেঙ্গ' জাহাজে উঠে পড়ল। তারপর ডেকের শেষ প্রান্তে অপেক্ষাকৃত একটা নির্জ্জন জায়গা দেখে সেখানে সেটা রাখলে। বোর্ডিং থেকে জাহাজে নিয়ে যাবার সময় বোর্ডিং-এর ম্যানেজার সিন্দুকটার দু'দিকের কোণে দুটো খড়ির চিহ্ন এঁকে দিয়েছিলেন। এইভাবে খড়ি দিয়ে চিহ্নিত করে দেবার কারণ সম্বন্ধে তিনি যুবকটিকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, এ থেকে জাহাজের মাল-কর্ম্মচারী সহজেই বুঝতে পারবে যে এর মালিক হচ্ছে তার বন্ধু।

ক্রমশঃ যাত্রীদের আগমনে জাহাজ ভ'রে উঠতে লাগল। যাদের বাক্স-পেঁটরায় খড়ির চিহ্ন দেওয়া ছিল, তাদের সকলেরই ডেকের পিছনের দিকে বসবার ব্যবস্থা হ'ল; বাকী যাদের তা ছিল না, তাদের নিয়ে গিয়ে বসান হ'ল জাহাজের সামনের দিকে। অঙ্গ লি নিজের জায়গায় ব'সে, মনের আনন্দে পাশের লোকের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলে। জোর গলায় সে গল্প করতে করতে বলতে লাগল ঐ বোর্ডিং হাউসের ম্যানেজারের কথা। এতগুলি লোকের বন্ধুত্বের সৌভাগ্য যে লাভ করেছে, সে যে খুবই ভাগ্যবান এই ছিল অঙ্গ লি-র বক্তব্যের প্রধান উদ্দেশ্য।

● কফিন-জাহাজ
শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

পিছনের ডেকে নিজের সিন্দুকটার উপরে বসে অঙ্গ লি খুব উৎসাহের সঙ্গে দেখতে লাগল কেমন ক'রে আটজন লোকের কাঁধে দুটো কাঠের খুঁটিতে দড়ি ঝুলিয়ে জাহাজের প্রধান যা মাল সেই কফিনগুলো

অঙ্গ লি নিজের সিন্দুকটার উপর বসে দেখতে লাগল জাহাজে কফিন তোলার দৃশ্য।

বন্দর থেকে জাহাজে তোলা হচ্ছে। নানা রকমারী আকারের সেই কফিনগুলো। তাদের ভিতরের মানুষগুলোর চেহারার অনুপাতে, শেষের ছ'টা ছিল একই রকমের বড়। অঙ্গ লি ইপো'র সামান্য কুলি হলেও তা লক্ষ্য করেছিল; সে এটাও লক্ষ্য করেছিল যে, ওগুলো অন্যগুলোর সঙ্গে নীচেতে না রেখে, ওগুলোতে তালা বন্ধ করে উপরে এনে রাখা হ'ল। লো মিঙ্গ নিজেই তালা বন্ধ করলে এবং চাবিটা নিজের কাছেই রেখে দিলে।

তারপর ক্রমশঃ যখন জোয়ারের জল ফেঁপে-ফুলে উঠতে লাগল, তখন হইচই রব উঠল চারিদিকে। প্রথমটা অঙ্গ লি ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি,

● কফিন-জাহাজ
শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খুব জোরে জাহাজের বাঁশী বেজে উঠতেই সে বুঝল এবার জাহাজ ছাড়বে। সত্যিই জাহাজ ছাড়ল। বন্দর থেকে দড়ি-দড়া, মই সব তুলে নিয়ে জাহাজ ক্রমশঃই আস্তে আস্তে সরে আসতে লাগল দূরে অগাধ জলধির ব্যাপ্তির মধ্যে। জাহাজ ছাড়ল বটে, কিন্তু এদিকে ওয়ালড্রন যে গোয়েন্দাকে পাঠাবেন বলেছিলেন, তার কোন পাত্তা না পেয়ে ক্যাপ্টেন বীটন খুবই রাগান্বিত হয়ে উঠলেন। ওদিকে গুয়ান চেঙ্গ-এর মেজাজটাও খুব রুক্ষ হয়েছিল। কারণ, ডেকের যাত্রীদের কাছ থেকে তাড়াতাড়ি টিকিট সংগ্রহ করতে করতে অঙ্গ লি-র সিন্দুকটাতে ধাক্কা লেগে তার পা'টা বেশ জখম হয়েছিল।

—'খুব ভারী দেখছি যে!' গুয়ান চেঙ্গ ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে মন্তব্য করলে, 'অনেক টাকাকড়ি আছে দেখছি!'

কুলি যুবক অঙ্গ লি হেসে বললে, 'অনেক আছে!'

মাল-কর্ম্মচারী তার কথা শুনে খুব হেসে উঠল।

বেশ আনন্দেই যাত্রীদের সময় কাটতে লাগল। আর সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ অগ্রসর হতে লাগল মন্থরগতি থেকে দ্রুতগতির দিকে।

ক্যাপ্টেন বীটনের কিন্তু মনে শান্তি নেই। তিনি জাহাজের চারিদিকে তন্ন তন্ন ক'রে উৎসুক দৃষ্টিতে সব যাত্রীদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন, কিন্তু ওয়ালড্রনের প্রতিশ্রুত গোয়েন্দাকে তিনি কারুর মধ্যেই সনাক্ত করতে পারছেন না।

অঙ্গ লি কিন্তু জাহাজের মধ্যে প্রথম থেকেই বেশ জমিয়ে তুলেছে। জাহাজের চারিদিকে সে ঘুরে বেড়ায় আর সবার সঙ্গে তার অদ্ভুত সৌভাগ্যের কথা নিয়ে আলোচনা করে। সবাই অবাক্ হয়ে তার কথা শোনে। যখনি সে তার নিজের ভাগ্যের কথা গল্প করতে আরম্ভ করে, গুয়ান চেঙ্গও তার খুব কাছ ঘেঁষে ব'সে ব'সে চুপ করে তা শোনে।

এমন নির্ব্বোধ কি কেউ হতে পারে! এটাই তাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক যারা 'ব্যান লি সেঙ্গ' জাহাজের দুর্নামের কথা জানে। ছেলেটা যেন যেচে তার উপার্জ্জিত অর্থ হারাতে চায়। নইলে এমনভাবে নিজের টাকাকড়ির কথা কেউ কি জাহাজময় ব'লে বেড়াবার জন্যে উদ্‌গ্রীব। ক্যাপ্টেন বীটনও ঘটনাক্রমে তার এই রকম নির্ব্বুদ্ধিতার কথা শুনে তাকে একদিন সাবধান করে দিয়েছিলেন। একদিন তো তিনি তার কথা শুনে বলেই ফেললেন, 'তুমি ছোকরা দেখছি বড় বকবক কর! এইরকম ব'লে বেড়ানোর জন্যে তোমার টাকাকড়ি সব যাবে দেখছি!'

এর উত্তরে অঙ্গ লি তার হাঁ-টা খুব বড় ক'রে হেসে উঠে বলেছিল, 'আমার খুব কথা কইতে ভাল লাগে, ক্যাপ্টেন। 'ইপো'তে কেউ কথা বলে না। সেখানে জিবের কোন দরকার হয় না—একেবারে বোবা হয়ে থাকতে হয়।'

'এ্যামএ'তে যখন জাহাজ এসে লঙ্গর ফেললে, তখন একজন চীনা কর্ম্মচারী জাহাজে উঠে এসে যাত্রীদের পরীক্ষা করতে লাগল আর তাদের নাম ধরে ডাকতে লাগল। চারজন কুলি—যারা পিছনের দিকে ছিল—তাদের পাওয়া গেল না। কেবলমাত্র তাদের নয়,—দেখা গেল, তাদের বাক্সগুলোসুদ্ধ তাদের সঙ্গে উধাও হয়েছে!

● কফিন-জাহাজ
শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

'বড় মজার ব্যাপার তো! এসব বোকা কুলিগুলো গেল কোথায়!' একখানা বেশী টাকার নোট হাতের মধ্যে মুড়তে মুড়তে কর্ম্মচারীটি মন্তব্য করলে, 'যাকগে, এসব প্রশ্ন করে আর কি লাভ হবে! কিন্তু হংকং-এ কোন সাহেব কর্ম্মচারী উঠলে আপনারা খুব সাবধানে থাকবেন।'

গুয়ান চেঙ্গ-ই নোটখানা ঐ কর্ম্মচারীটির হাতে গুঁজে দিয়েছিল। সে একথা শুনে, নোটটা হাতে দিয়ে মাথাটা একটু নাড়লে। ক্যাপ্টেন এই ব্যাপারটা লক্ষ্য-ক'রে বেশ একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। যদিও এ ঘুষের ব্যাপারে তাঁর কোন কিছু বলবার ছিল না, তবুও তিনি হংকং-এ সাহেব কর্ম্মচারীর প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। 'ইপো'র এই নির্ব্বোধ লোকটিও ঘটনাটা খুব আগ্রহসহকারে লক্ষ্য করছিল এবং এক হাত থেকে অন্য হাতে নোট চালান যাওয়ার ব্যাপারটাও তার নজর এড়ায়নি।

যথাসময়ে বিদায়াভিবাদন জানিয়ে চীনা কর্ম্মচারীটি জাহাজ থেকে নেমে গেল। কিন্তু ক্যাপ্টেন বীটনের মন উত্তেজনায় অশান্ত হয়ে উঠল এই ভেবে যে, এর মধ্যেই চারজন যাত্রী উধাও! এবং এতক্ষণে তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে, ওয়ালড্রনের সন্দেহ মিথ্যা নয়। তাছাড়া তিনি যদি ঐ চীনা কর্ম্মচারীটির উপর কড়া নজর না রাখতেন, তা'হলে জাহাজের ক্যাপ্টেন হিসাবে তাঁকেও বিপদে পড়তে হ'ত!

বীটন তখন জাহাজের প্রত্যেক যাত্রীটিকে আবার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলেন—দু'একজনকে খুব সাবধানের সঙ্গে বাজিয়ে দেখবারও চেষ্টা করলেন, কিন্তু কেউই হাতের মুঠো থেকে তর্জ্জনী আর কড়ে আঙুল বার ক'রে তাঁর কাছে ওয়ালড্রনের লোক হিসাবে ধরা দিল না। একটা জায়গায় তাড়াতাড়ির মধ্যে ফিরে দাঁড়াতে দিয়ে সজোরে তিনি 'ইপো'র সেই লোকটির গায়ে ধাক্কা খেয়ে একেবারে হুড়মুড় ক'রে পড়ে যাবার মত হলেন।

'ওহে ছোকরা, জাহাজে ভাল করে চলতে শেখ।' বীটন একটু রাগতভাবেই ব'লে উঠলেন, 'আর নিজের সিন্দুকটার ওপর নজর রেখ।'

সেদিন সন্ধ্যার সময়, জাহাজ যখন প্রায় হংকং-এর কাছাকাছি এসেছে, তখন আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন ঘটল। আকাশের জমাট কালো মেঘ ভীষণ ঝড়-বৃষ্টির ইঙ্গিত করায় জাহাজকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হ'ল। অবিলম্বেই আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল, এবং রাত্রি ন'টার মধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি জাহাজের উপর আছড়ে পড়তে লাগল। সেই বৃষ্টির মধ্যে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস থেকে ডেকের যাত্রীরা কে যে কি ভাবে প্রাণ বাঁচাবে তার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল চতুর্দ্দিকে।

## অঙ্গ লি যা দেখেছিল

জাহাজের উপরে দড়ি দিয়ে দু'দিক বাঁধা যে লাইফ-বোটটা ঝুলছিল, তার উপরের ঢাকার দড়ি দু'এক জায়গায় ছিঁড়ে গিয়ে সেটা আল্‌গা হয়েছিল। অঙ্গ লি সুবিধা মত জায়গা বুঝে গুঁড়ি মেরে সেই নৌকোখানার মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। এবং সেই আরামদায়ক নিরাপদ স্থান থেকে জাহাজের পিছন দিকের ডেকের দৃশ্য বেশ পরিষ্কার ভাবেই দেখতে লাগল। বিশেষ করে চকিতের জন্যে হ'লেও বিদ্যুৎ চমকাবার সময় সবই স্পষ্ট ভেসে উঠতে লাগল তার চোখের সামনে।

- **কফিন-জাহাজ**
  **শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়**

ক্রমে ঝড় ও বৃষ্টির প্রকোপ কমে আসতে লাগল। জাহাজের মধ্যে তখন একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা। শুধু মাঝে মাঝে জাহাজের কঁ্যাচ-কঁ্যাচানি, ইঞ্জিনের ঘড় ঘড় আর জাহাজের গায়ে আছাড় খাওয়া ঢেউয়ের শব্দ শোনা যেতে লাগল।

অঙ্গ লি-র চোখে ঘুম নেই। সে অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে চেয়ে আছে। কি যে সে দেখছে, কিসের উদ্দেশ্যে সে যে চেয়ে আছে তা সেই জানে! রাত যখন প্রায় দুপুর হয়েছে, তখন হঠাৎ তার চোখ যেন চকচক ক'রে উঠল। সে অস্পষ্ট দেখতে পেলে, কে যেন একটা লোক জাহাজের খোল থেকে উঠে এল, আর সেই সময় একটা বিদ্যুৎ ঝল্‌সে উঠতে সে স্পষ্টই দেখতে পেলে, লোকটা হচ্ছে লো মিঙ্গ—তার হাতে একখানা লম্বা ছোরা। লাইফ-বোটটার ঢাকার মধ্যে থেকে চোখ দুটোকে আরও একটু বার করে দিয়ে সে দেখলে জাহাজের গবাক্ষের কাছে যে কুলিগুলো ছিল, সে তাদের উপর ঝুঁকে পড়েছে।

লোকটার পায়ে কোন জুতো না থাকায় এতক্ষণ কোন শব্দ হচ্ছিল না। কিন্তু লো মিঙ্গ ঐ কুলিগুলোর কাছে ঝুঁকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অস্ফুট শব্দ এবং চাপা ঝটপটানির আওয়াজ কানে এল অঙ্গ লি-র। হঠাৎ এই আওয়াজের সঙ্গে সে দেখতে পেল সেখানে

একটা কম্বল চাপা দিয়ে চেপে ধরল তারা। বেচারা একবার মাত্র গোঁ গোঁ করে তারপর চুপ হয়ে গেল। [পৃঃ ১০৬

● কফিন জাহাজ
শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রায় জন ছ'য়েক লোক এবং তাদের সকলের পিছনে রয়েছে গুয়ান চেঙ্গ। তারপর সেই সাতটা ছায়ামূর্ত্তিই তার সিন্দুকটার চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল, আর তারা যেন অতি কষ্টে ফিসফিস করে কি সব বলতে লাগল। অঙ্গ লি মনে মনে একটু হাসলে, এবং কিসের জন্যে তাদের ঐ ফিসফিসিনি তাও সে বুঝতে পারলে।

তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, অঙ্গ লি'টা গেল কোথায়? বোধহয় সামনের দিকে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে কোথাও আছে। ওকে কায়দা করে এখানে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং—

চক্ষু কর্ণ সজাগ রেখে অঙ্গ লি প্রতি কথাটি শুনতে লাগল। তারপর সে দেখতে পেলে যার হাতে ছোরাখানা ছিল, সে হামাগুড়ি দিতে দিতে চলে গেল। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অঙ্গ লি তার জামার নীচে থেকে পিস্তলটা বার করে চেপে ধরে রইল, আর যতটা পারলে নৌকোর সেই চাপাটার মধ্যে ভেতরের দিকে সরে গেল। ঠিক সেই সময়ে একটা গাঢ় কালো মেঘের পিছন থেকে চাঁদ উঠল। সেই চাঁদের আলোয় সে স্পষ্ট দেখতে পেলে একটা কম্বল তার সিন্দুকটার উপর তারা চাপা দিয়ে দিলে।

তারপর তার কানে গেল মোটা দড়ি কাটার আর তালার মধ্যে একটা বড় চাবি ঘোরাবার শব্দ। সে দেখতে লাগল তার সিন্দুকের ভিতরের টাকার বড় বড় থলেগুলো কেমন ভাবে একটার পর একটা হাতে হাতে পার হয়ে রসদ-কর্ম্মচারীর কাছে পৌঁছাতে লাগল—আর লো মিঙ্গ কেমন ভাবে সেগুলোকে একটার পর একটা জাহাজের খোলের মধ্যে নিয়ে গেল।

তারপর তারা একরাশ রাবিশ খালি সিন্দুকটার মধ্যে পুরে সেটাকে জাহাজের বাইরে ফেলে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পাশের লোকটার কাছে গেল। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঠিক সেই সময়েই লোকটার ঘুম গেল ভেঙে। লোকটা তাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই তার উপর একটা কম্বল চাপা দিয়ে চেপে ধরলে তারা। বেচারা একবার মাত্র গোঁ-গোঁ করে উঠল, তারপর একেবারে চুপ হয়ে গেল! এইভাবে আরও কতকগুলি হতভাগ্য তাদের জীবন হারাল একটির পর একটি।

কিন্তু অঙ্গ লি কি করতে পারে? সে যে খনিতে কাজ করত তার ম্যানেজার তাকে যাবার সময় উপদেশ দিয়ে দিয়েছিলেন যে, সে যেন বিপদের মধ্যে কিছুতেই না যায়—যাই ঘটুক না কেন, তাতে বাধা দেবার সে যেন চেষ্টা না করে। কর্ত্তৃপক্ষরা যদি সত্যিসত্যিই গুপ্ত সমিতির কার্য্যকলাপ বন্ধ করতে চায়, তা'হলে একটা জীবন্ত লোকের সাক্ষীতে যা হবে, তা হাজার মৃত লোকের প্রমাণ দিয়েও হবে না।

এর পর এক সময় অঙ্গ লি নৌকা থেকে বেরিয়ে ভয়ে ভয়ে এগুতে লাগল। হঠাৎ একটা 'বুল-আই' বাতি থেকে আলো এসে পড়ল তার মুখের উপর। সঙ্গে সঙ্গে তাকে আর এগুতে বাধা দেওয়ায় সে তাড়াতাড়ি তার ডান মুঠোটা বার ক'রে তর্জ্জনী আর কড়ে আঙুলটা উঁচু করে দেখাল।

## জানাজানি

'কে?' বীটন কম্পিত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন। 'তুমি শেষ পর্য্যন্ত এসে পৌঁচেছ! দেখি তোমার মুখখানা! এ কি! এ যে সেই 'ইপো'র বোকা ছেলে! কি যে তোমার ভাগ্যে আছে জাহাজে, তা ঈশ্বরই

● কফিন-জাহাজ
শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

জানেন! ওহে ছোকরা, তুমি আমার ম্যাপ-ঘরে একবার এস তো। কোন্ বন্দরের দিকে জাহাজ এগুচ্ছে তা খুঁজে দেখতে হবে এবার। তুমি হয়ত আমাকে কিছু সাহায্য করতে পারবে।'

সকাল হতেই 'ব্যান লি সেঙ্গ' হংকং-এ লঙ্গর ফেলার জায়গায় এসে পৌঁছে গেল। সেখানে দ্রুতগতিতে নানা জাহাজের পাশ কাটিয়ে যখন 'ব্যান লি সেঙ্গ' অগ্রসর হচ্ছে, তখন ক্যাপ্টেন দেখলেন, খুব বেগে একটা ছোট জাহাজ, পুলিসের ফ্ল্যাগ উড়িয়ে, অনেক লোক নিয়ে এই কফিন-জাহাজের কাছে আসছে।

'দশ মিনিটের মধ্যেই আমি সব কিছু ব্যাপারই জানতে পারব', এই ব'লে বীটন নীচে ইঞ্জিন ঘরের ঘণ্টা বাজালেন।

উল্লিখিত সময়ের মধ্যেই 'ব্যান লি সেঙ্গ' স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ছোট জাহাজখানা থেকে বহু লোক 'ব্যান লি সেঙ্গ'-এর ডেকের উপর এসে উপস্থিত হ'ল। একজন পুলিস কমিশনার, ক্যাপ্টেন ওয়ালড্রন, একজন ইনস্পেক্টর, একদল পাহারাওয়ালা, আর—সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার—ব্যান লি সেঙ্গ জাহাজের প্রধান মালিক চিঙ্গ সেঙ্গের হাতে বাঁধা শিকল ধরে একজন পুলিসের লোক দাঁড়িয়ে। জনতার মধ্যে সেই জাপানী গোয়েন্দা মেয়েটি, যার নাম হো সান, সেও রয়েছে। ক্যাপ্টেন বীটন তাঁর পুরু চশমার ভিতর দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

অঙ্গ লি তার বিবরণ বলবার পর, ইনস্পেক্টর সব যাত্রীদের হাঁটতে বলে তাদের প্রত্যেকের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। ন'জন কুলির কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, আর বারো জনেরও বেশী লোক তাদের বাক্সর মালপত্র পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ জানাল। তখন হুকুম হ'ল মাল-কর্ম্মচারী ও রসদ-কর্ম্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাপ্টেনকে হাজির হতে। তাদের সঙ্গে নিয়ে জাহাজের সর্ব্বত্র তল্লাসী হবে।

অঙ্গ লি সদর্পে ভয়ার্ত্ত লো মিঙ্গ-এর কাছ থেকে চাবিটা চেয়ে নিলে। তখন ক্যাপ্টেন ওদের দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়েছেন। সমস্ত দলটি প্রথমেই লোহার সিঁড়ি দিয়ে উঠে উপরের ডেকে গেল খানাতল্লাসী করতে। পুলিসের প্রত্যেক লোকটির হাতেই ছিল একটি ক'রে পিস্তল। প্রত্যেকটি বস্তা, প্রত্যেকটি মাল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হ'তে লাগল এবং চতুর্দ্দিকে আলো ফেলে তন্ন তন্ন করে সমস্ত ডেকটি তল্লাস করা চললো। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহজনক কোন বস্তুরই সন্ধান পাওয়া গেল না।



তদন্ত করতে বাকী ছিল মাত্র সাতটা কফিন। সেগুলো পর পর সাজানো ছিল। ওয়ালড্রন স্থির করলেন এই কফিনগুলো সরিয়ে ওদের তলাটা পরীক্ষা ক'রে দেখবেন। কিন্তু তাঁর চিন্তা হ'ল অঙ্গ লি-র কথায়। কারণ অঙ্গ লি বলেছিল খুনেরা এই জাহাজেই কোথাও লুকিয়ে আছে! অঙ্গ লি তো ভুল করার লোক নয়। নিশ্চয়ই, শয়তানরা জাহাজের মধ্যে কোথাও না কোথাও আছে ঘাপ্‌টি মেরে।

● কফিন-জাহাজ
শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

জাহাজের খোলের উপর থেকে একটা লোহার টুক্‌রো কুড়িয়ে, সেটা দিয়ে অঙ্গ লি কফিনের উপর ঠক্‌ঠক্ করে ঘা মারছিল, আর হো সান তার উপর কান রেখে এক মনে যেন শুনছিল।

ওয়ালড্রন এই দেখে ঠাট্টা করে অঙ্গ লি-কে বললেন, 'তুমি কি মড়াদের কাছে কোন গুপ্তসংবাদ পাঠাচ্ছ নাকি?'

একখানা ছোরা বার ক'রে গুয়ান চেঙ্গ হোঁ সান-এর দিকে ছুটে যাচ্ছে।

ঠিক এই সময় একটা ভীষণ চীৎকার শোনা গেল, আর সেই সঙ্গে ধস্তাধস্তি হওয়ার আওয়াজ হ'ল। প্রহরীদের কবল থেকে জোর করে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে মাল-কর্ম্মচারী গুয়ান চেঙ্গ একখানা ছোরা বার ক'রে কফিনের কাছে তাদের দু'জনকে মারবে বলে ছুটে গিয়েছিল। হো সান সবচেয়ে নিকটে ছিল, গুয়ান চেঙ্গ বাঘের মত তার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল। সে যেইমাত্র ছোরাটা তুলেছে তার উপর বসিয়ে দেবার জন্যে, ঠিক সেই সময়ে কোথা থেকে একটা গুলি এসে বিদ্ধ করল তাকে এবং বদ্ধ জায়গায় কামান ফাটার মত একটা ভীষণ আওয়াজ হ'ল। মাল-কর্ম্মচারী দুটো হাতে তার বুকের উপরটা চেপে ধরতেই, ছোরাটা তার হাত থেকে পড়ে গেল, সে সশব্দে মেঝের উপর পড়ে গড়াতে লাগল!

● কফিন-জাহাজ
শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

ওয়ালড্রন চীৎকার ক'রে উঠলেন, 'সাবাস্ অঙ্গ লি!'

তারপর যা ঘটেছিল তা সুদূর প্রাচ্যে বহুকাল ধরে লোকেরা বলাবলি করেছে। প্রত্যেক কফিনের ঢাকনা খুলতে—তা তালা দিয়ে বন্ধ না থাকায় প্রত্যেকটা এমনিই খুলে গিয়েছিল—দেখা গেল, তাদের ছ'টার প্রত্যেকটার মধ্যেই দু'জন ক'রে লোক—একজন চোর আর একজন খুনে; আর যেটা সাত নম্বরের, সেটার মধ্যে ছিল যত রাজ্যের লুটের মাল।

যখন বন্দীদের হাতে হাতকড়া পরানো হচ্ছিল, তখন কমিশনার বললেন, 'আমার মনে হয় এরা প্রত্যেকেই গুপ্ত-সমিতির লোক।'

'তা'তে কি আর সন্দেহ আছে!' ওয়ালড্রন উত্তরে বললেন, 'এরা হচ্ছে [illegible]শান্তি সমিতির সব সভ্য—এদের সভাপতি এই শয়তানটা—চিঙ্গ সেঙ্গ!'

কমিশনার ব্যঙ্গ করে বললেন, 'এবার সবাইকেই ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে!'

একজন খুনে বন্দীর হাতে হাতকড়া পরানো হচ্ছে।

শেষ পর্য্যন্ত হ'লও তাই—শয়তানরা সকলেই ফাঁসির দড়ি গলায় প'রে তাদের পাপের পুরস্কার লাভ করল। কিন্তু কফিন-জাহাজের ক্যাপ্টেনের ভাগ্য ছিল খুবই প্রসন্ন, কারণ যে রকম সন্দেহজনক ব্যাপারে তিনি জড়িত ছিলেন, তা'তে তাঁরও গলায় ফাঁসির দড়ি পরা খুব অসম্ভব ছিল না! কিন্তু ক্যাপ্টেনের আচরণে কোন অন্যায় না থাকায় তাঁর সম্পর্কে কোন অভিযোগ আনা হয়নি। আর এ-ব্যাপারে পুরস্কৃত করা হয়েছিল গোয়েন্দা অঙ্গ লি-কে।

---

# ঝাঁকামুটে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

পল্লীর দেবী-মন্দির পাশে<br>
বাস করে এক দুঃখী মুটে,<br>
থাকে যেন ক্ষীণ টুন্‌টুনি আহা—<br>
গরুড় পাখীর পক্ষপুটে।

কারে কদাচিৎ দেবীরে প্রণাম,<br>
বিপদে কেবল স্মরে তাঁর নাম,<br>
গেল একবার বারাণসী ধাম<br>
অন্নপূর্ণা অন্নকূটে।

২

দেখে মন্দির, দেখে সমারোহ—<br>
যা দেখে, দেখে সে ভক্তিভারে,<br>
পংক্তি ভোজনে বসিতে পায়না,<br>
বলে 'আছে দেরী—বসিবে পরে।'

উঠে যায় লোক, বসে নব সারি,
ভূরি ভোজনের দেয় বলিহারি,
দূরাগত দীন দাঁড়াইয়া থাকে
ভয়ে সঙ্কোচে দূরে যে সরে।

৩

সাঁঝ হয়ে আসে, পায়না প্রসাদ,
অন্নসত্র রুদ্ধ হবে,—
ভারী বারবার ফেরে চারিধার,
ভাবে তার ভার আজ কে লবে?

অফুরন্ত যে আনন্দ তার,
ভোজনের যেন নাহি দরকার
জিজ্ঞাসা করে পূজারীর মেয়ে
'তুমি পেলে নাক? খেলে তো সবে?'

৪

মুটে বলে মায়ি বড় আনন্দ—
পাই নাই ঠাঁই লোকের ভিড়ে।
না খেয়েও মাগো, খাওয়ার অধিক—
পরিতৃপ্তিতে যেতেছি ফিরে।

● ঝাঁকামুটে
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কিশোরী বলেন, সে কি হতে পারে?
তুমি চেননাকো? চিনি যে তোমারে।

'দাঁড়াও' বলিয়া সাজানো অন্ন
আনিয়া হস্তে দিলেন ধীরে।

● ঝাঁকামুটে
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৫

অমৃতভার লয়ে ভারবাহী
বলে এ জনম ব্যর্থ নহে,
জগন্মাতার বিশাল নয়ন,
আমার পানেও চাহিয়া রহে।

যতই নিম্নে পড়ে আমি রই,
তাঁহার স্নেহের অযোগ্য নই,
কটু কর্কশ ধরায়—মানুষ—
এই ভরসায় সকল সহে।

৬

কেহই আমারে চেনেনা জানেনা
জানিবে আমারে কেমন করি ?
মাথা উঁচু করে ভার বহিয়াছি
আজ ভূমে লুটি' ভাগ্য স্মরি।

দেবী নিজে খোঁজ লন অভাগার
ভারবহা এতো তপস্যা যার
ওরে ঝাঁকামুটে দেখ ঝাঁকা তোর
দুর্লভ দানে কে দিল ভরি ?

---

# মুন্না সারেং

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

মুন্না সারেং-এর সঙ্গে সেই আমাদের প্রথম আলাপ।

ফাল্গুনের অপরাহ্ণ। তখনও শীতের আমেজ আছে। আমরা পাঁচ-ছয় জন বন্ধু স্কুলের কি একটা বন্ধের দিনে যাদুঘর দেখতে এসেছিলাম। দেখা শেষ করে হল্লা করতে করতে বাইরে এসে যাদুঘরের সামনের মাঠে গিয়ে বসলাম। তখনও খানিকটা বেলা আছে। অথচ সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফেরারও কারও ইচ্ছা নেই। সুতরাং মাঠে গিয়ে বসা ছাড়া উপায় কি?

পাশেই গাছের ছায়ায় একটি ঝাঁকামুটে ঝাঁকায় মাথা রেখে নিশ্চিন্তে নিদ্রামগ্ন। তার দেহের খানিকটায় বিকেলের মিষ্টি রোদ এসে পড়েছে। অদূরে কয়েকটি ফিরিঙ্গী শিশু খেলা করছে। আর তাদেরই

আয়ারা গোল হয়ে বসে নিজের নিজের প্রভুগৃহের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে জমাটি সভা বসিয়েছে। তাদের একটু দূরে একটি চানাচুরওয়ালা তার পশরা নামিয়ে শিকারের সন্ধানে ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে।

এই পরিবেশের মধ্যে একটা অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে তর্কের নামে আমাদের হল্লা চলেছে। বিতর্কের বিষয়বস্তু হচ্ছে, যাদুঘরের প্রবেশপথেই যে তিমি মাছের চোয়ালটা দাঁড়িয়ে আছে, সেইটে।

মণীন্দ্র বললে, চোয়ালটাই যদি অত বড় হয়, তাহলে মাছটা কত বড় কল্পনা কর।

হেমাঙ্গ সেই কল্পনাটা পাটিগণিতের ছকে ফেলবার চেষ্টায় বললে, মনে কর একটা মস্ত বড় কাৎলা মাছের চোয়াল। তার কত গুণ হবে?

নবেন্দু বললে, তার ছোটদির বিয়েতে যে কাৎলা মাছটা এসেছিল, তার চেয়ে বড় কাৎলা মাছ সে দেখেনি। এক মণের কাছাকাছি ওজন। তার চোয়ালটা,

বাধা দিয়ে প্রেমাংশু বললে, ওর চেয়ে বড় বোয়াল মাছ আমাদের নদীতে ধরা পড়েছিল। তার পেটের মধ্যে একটা ছোট ছেলের বালা-পরা হাত পাওয়া গিয়েছিল। ওজন কত জানিনে, কিন্তু লম্বায় হাত চারেক নিশ্চয়ই হবে।

ওজনের চেয়ে লম্বাটাই হেমাঙ্গের বেশি দরকার। বললে, খুব ভালো। তার চোয়ালটা কত বড় হবে?

চোয়াল কেউই মাপেনি। মাছের দেহটার সঙ্গেই লোভী মানুষের কারবার। কে চোয়াল মাপতে যায়!

সুতরাং প্রেমাংশু চোয়ালের মাপ দিতে গিয়ে বিব্রত হয়ে উঠল।

আমি তাকে সাহায্য করবার জন্যে বললাম, ধর আধ হাত।

কল্যাণ হো হো করে হেসে উঠল। বললে, দূর! সব বাজে!

—কি বাজে?—আমি বললাম,—আধ হাত হবে না!

কল্যাণ তেমনি হাসতে হাসতে বললে, আধ হাতের কথা নয়।

—তবে? কিসের কথা? চার হাত বোয়াল মাছ হয় না?

প্রেমাংশু রেগেই উঠল।

কল্যাণ বললে, না রে, তা বলছি না। আমি তিমি মাছের কথা বলছি।

—তিমি মাছের কি কথা?

প্রেমাংশুর রাগ তখনও কমেনি। শুধু এবারে বলে নয়, যখনই কোনো একটা আলোচনায় আমরা মেতে উঠি, দেখা গেছে তখনই কল্যাণ বিজ্ঞের মতো হো হো করে হেসে আমাদের সেই তপ্ত আলোচনা জল ছিটিয়ে নিবিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

● মুন্না সারেং
শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

সুতরাং শুধু প্রেমাংশু নয়, আমরা সবাই অল্প-বিস্তর রেগে উঠেছিলাম।

কল্যাণ কিন্তু আমাদের রাগের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই যেন আগের কথার জের টেনে বললে, আমার জামাইবাবু বলছিলেন, ওটা তিমি মাছের চোয়ালই নয়।

—কিসের চোয়াল তবে?

—ওটা জমানো পাথর।

কী সর্বনাশ! আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

তাছাড়া উপায় কি! কল্যাণের সত্যিই কোনো জামাইবাবু আছেন কি না ভগবান জানেন। কল্যাণ বলে, তিনি ডি. এস্-সি. উপাধিধারী জনৈক জমকালো অধ্যাপক। তাঁর উপরে কথা বলার স্পর্ধা আমাদের নেই। কিন্তু আমাদের সন্দেহ আছে, এমন একজন জামাইবাবু যদি তার থাকেও, কল্যাণ তাঁর মস্ত বড় উপাধিটার খোঁচা দিয়ে তার নিজেরই তত্ত্ব আমাদের নিরীহ ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেয়। ও যা ছেলে, ওর পক্ষে তা অসম্ভব নয়।

এবারও তাই করছে কি না, স্তব্ধ হয়ে সেইটে যখন ভাবছি, তখন নীল কোর্তাপরা দাড়িওয়ালা একজন লোক একেবারে আমাদের গা ঘেঁষে এসে বসল। আমাদের থেকে দু'তিন হাত দূরে এতক্ষণ নিঃশব্দে এ বসে ছিল। সম্ভবত আমাদের আলোচনা উপভোগ করছিল।

হেসে বললে, আজ্ঞে না বাবু, ওটা তিমি মাছেরই চোয়াল।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্তম্ভিত ভাবটা কেটে গেল এবং একজোড়া করে কৌতূহলী চোখ যেন বিদ্যুৎবেগে তার প্রশান্ত মুখের উপর নিবদ্ধ হল।

কল্যাণ জোর করে একবার বলতে গেল, আমার জামাইবাবু বলেন,

কিন্তু লোকটি নির্বিকার। বললে, তিনি বলতে পারেন। কিন্তু ওটা তিমি মাছেরই চোয়াল। তবে বাচ্চা তিমির।

—বাচ্চা তিমির! বল কি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব বাচ্চা তিমির চোয়াল।

লোকটি তার দাড়ির ফাঁকে ফাঁকে মিষ্টি মিষ্টি হাসতে লাগল।

বললে, আমি মুন্না সারেং। জাহাজে সারেং-গিরি করে সারা দুনিয়া ঘুরে এসেছি। বড় তিমি কত বড় শুনবেন?

সবাই তাকে সাগ্রহে ঘিরে বললাম ঃ শুনব, শুনব।

লোকটির বয়স চল্লিশ, কি তার দু'এক বছর বেশি। কিন্তু যে কাজ সে করে, বোধহয় তার জন্যেই, মুখের চামড়ায় কেমন একটা কর্কশতা এসেছে। তার উপর সামনের একটি দাঁত না থাকায় বয়স অনেক বেশি মনে হয়। মাথার চুলের চেয়ে দাড়িতে পাক ধরেছে বেশি। কিন্তু সেই পাকা দাড়ির ফাঁকে যে

- মুন্না সারেং
  শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

হাসি দেখা যায়, তা একেবারেই শিশুর মতো। সেদিকে চাইলে, ওর পাকা দাড়ি, ভাঙা দাঁত এবং কর্কশ চামড়ার কথা ভুলে গিয়ে ওকে আমাদেরই সমবয়সী মনে হয়।

লোকটি বললে, শুনুন তবে বড় তিমি মাছের কথা ঃ

আমাদের জাহাজ সেবারে লিভারপুল থেকে নিউইয়র্ক যাচ্ছে। লম্বা পাড়ি। আটলান্টিকের ওপর দিয়ে চলেছি তো চলেইছি। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি। একটানা, একঘেয়ে। সূয্যি সকাল বেলায় উঠছে, সন্ধ্যে বেলায় ডুবছে। তারপরে অন্ধকার। তখন মনে হয় আর কোনোদিন সূয্যি উঠবে না, কোনোদিন অন্ধকার কাটবে না, কোনোদিন নিউইয়র্কে পৌঁছুব না।

—ওটা তিমি মাছেরই চোয়াল।... [পৃঃ ১১৬

ভাবতেও বুকের ভিতরটা ছমছম করে উঠত। গায়ে কাঁটা দিত। নিজেদের চেনা জাহাজ-টাকেই কেমন অচেনা মনে হত। মনে হত, কোথাকার একটা ভুতুড়ে জাহাজ।

আটলান্টিককে সবাই ভয় পায়। দরিয়া যেন সব সময়েই মারমুখো। এর ওপর কখন যে ঝড়-তুফান ওঠে তারও ঠিক নেই। যখন কাজ-কর্ম থাকে তখন বেশ থাকা যায়। মুস্কিল হয়, যখন কাজ থাকে না, ছুটি। অন্য লস্করের কি হয় জানি না, আমার তো আটলান্টিকের পথে জাহাজে পাড়ি দেবার সময় রাত্রে ছুটি থাকলে ঘুম প্রায়ই হত না।

প্রেমাংশু জিজ্ঞাসা করলে, আমেরিকা কি ওই একবারই গেছ?

—একবার!—মুন্না হাসলে,—কতবার গিয়েছি। কিন্তু কি যে আমার সঙ্গে আটলান্টিকের সম্বন্ধ, যতবার গিয়েছি, অমনই ভয় করেছে। মনের মধ্যে একদিনও সোয়াস্তি পাইনি। অত লোকের মধ্যে

● মুন্না সারেং
শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

থেকেও খালি ভয় করেছে, খালি ভয় করেছে। কি রকম যেন একটা ভুতুড়ে ভয়। গা ছম ছম করে। থেকে থেকে চকমক করে চারিদিকে চাই। অথচ কেন যে ভয় করে তাও জানি না।

মুন্না সারেং আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসতে লাগল।

অর্থাৎ তখন আটলান্টিকে জাহাজের উপর তার ভয় করত, আর এখন নিজের দেশে নিশ্চিন্তে বসে সেইটেই তার কাছে হাসির ব্যাপার!

জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর?

—তারপর চলেছি। একদিন, দু'দিন, তিনদিন, এমনি করে অনেক দিন। সেদিন দিনের বেলায় আমার ছুটি। খেয়ে-দেয়ে দিব্যি ঘুমুচ্ছি। হঠাৎ সারেং-লস্করের চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল।

—কী ব্যাপার? ঝড়-তুফান?

মুন্না হেসে বললে, প্রথমে আমিও তাই ভেবেছিলাম। চারিদিক অন্ধকার। ভেবেছিলাম, মেঘে অন্ধকার। তখনই জাহাজের বিজলী আলো জ্বলে উঠল বটে, কিন্তু সবারই মুখে একটা 'সামাল, সামাল' ভাব। জাহাজের সাইরেন বেজে উঠল। আমরা যে-যার জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম। কাপ্তেন ছুটতে ছুটতে নিচে এলেন। সবাইকে হুঁসিয়ারী করে দিলেন। কিন্তু কিসের যে হুঁসিয়ারী কেউ কিছু বুঝতে পারলাম না।

এর-ওর মুখের দিকে চাই। জিগ্যেস করি, কি ব্যাপার? সবারই চোখ-মুখে ভয়। সবাই নিঃশব্দে মাথা নাড়ে। কেউ কিছু জানে না। কাপ্তেন হয়তো জানেন, কিন্তু তাঁকে শুধোবে এমন কলিজা কারও নেই।

এমনি চলল মিনিট পোনেরো। আমার তো মনে হল, এক ঘণ্টাই হবে বুঝি। চারিদিকে শুধু আঁশটে গন্ধ। নাক বন্ধ করেছি। তবু সেই গন্ধে গা গুলিয়ে উঠছে। বমি-বমি করছে।

কী রে বাবা!

দরিয়া তো আমাদের ঘর-বাড়ি হয়ে উঠেছে। সারা দুনিয়া জাহাজে ঘুরেছি। কিন্তু এমন আঁশটে গন্ধ তো কোথাও পাইনি বাবা! কিসের গন্ধ? দরিয়া তো আর জমিন নয় যে, কেউ পথের ধারে দুর্গন্ধ ময়লা রেখে যাবে! আমাদের জাহাজেও এমন কিছু নেই যে, গন্ধ উঠবে। তাহলে তো সে গন্ধ জাহাজে ওঠবার সময় থেকেই পেতাম।

এই সব ভাবছি আর মনে মনে কান মলছি, ভালোয় ভালোয় একবার দেশে ফিরতে পারলে আর আটলান্টিকের জাহাজে কখনও চড়ছি না। খেতে পাই, আর না পাই। জানটা তো সব্বলের আগে!

মুন্না আমাদের সামনে আবার নতুন করে নাক-কান মলতে লাগল।

আমাদেরও ভয়ে গলা শুকিয়ে উঠেছিল। ঝড় নয়, তুফান নয়, অথচ অন্ধকার কেন? আঁশটে গন্ধই বা আসে কোথা থেকে?

মাঠেও তখন অন্ধকার নেমেছে। দূরে মাঠের অন্ধকারের বুক চিরে আলোঝলমল বাস-ট্রাম চলছে।

- মুন্না সারেং
  শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

আমাদের সন্দেহ হচ্ছে, ওগুলোও বোধ হয় ট্রাম-বাস নয়, মুন্না সারেং-এর ভুতুড়ে জাহাজ। স্থানটাও গড়ের মাঠ নয়, আটলান্টিক মহাসমুদ্র। আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে তখন আমাদের পাঠ্যপুস্তকের সেই বিখ্যাত ইংরাজি কবিতা "The Lays of Ancient Mariner". সেই মরা এ্যালবাট্রস পাখি! একটার পর একটা মরে যাচ্ছে মাঝি-মাল্লার দল। জল নেই, পানীয় জল কোথাও নেই। হাওয়া স্তব্ধ হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজখানিও।

অন্তত আমার মনে হল, এই লোকটা সেই 'প্রাচীন নেয়ে' নয় তো? আবার এসেছে এই সন্ধ্যায় তেমনি আর একটা ভয়াবহ কাহিনী শোনাতে!

ওর থেমে যাওয়াটা যেন গ্রীষ্মের দুপুরে হঠাৎ হাওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বুকের ভিতরটা অস্থির হয়ে উঠে। ওর থেমে যাওয়া কেউই আমরা সহ্য করতে পারছিলাম না।

বললাম, তারপরে?

—তারপরে? তারপরে কি আরম্ভ হল জানেন? যেন একটা ভূমিকম্প। পোনেরো মিনিট ধরে ভয়ঙ্কর একটা ভূমিকম্প। আমরা কখনও গড়াতে গড়াতে জাহাজের ডেকের একদিক থেকে অন্যদিকে যাই। আবার কখনও নিচের থেকে টোকা খেয়ে চাল-কড়াইভাজা যেমন ওপরদিকে ছিটকে ওঠে, তেমনি করে নিচের থেকে কিসের একটা মস্ত বড় টোকা খেয়ে আসমানে ছিটকে উঠি। তখনই আবার নিচে পড়ে তেলের পিপের মতো গড়াগড়ি যাই। পোনেরো মিনিট এমনি বেসামাল কাণ্ড!

বলে নিঃশব্দে গম্ভীরভাবে মুন্না পকেট থেকে একটা কৌটা বের করলে। ধীরে সুস্থে, বেছে বেছে যেন একটি পছন্দমত বিড়ি বের করলে। সেটার মোটা দিকটায় জোরে জোরে কয়েকটা ফুঁ দিয়ে সরু প্রান্তটা দাঁতে চেপে ধরলে। তারপরে দেশলাই জ্বেলে তাতে অগ্নিসংযোগ করে নিশ্চিন্তে টানতে লাগল।

অর্থাৎ আমরা সেই ভাপ্‌সা দমবন্ধ-করা গরমের মধ্যে হাঁপাতে লাগলাম।

এখন বুঝছি, ওটা ওর গল্প বলার একটা কৌশল মাত্র। শ্রোতার আগ্রহ জাগিয়ে তোলবার কৌশল। ওতে ওর গল্প আশ্চর্য রকম জমে ওঠে। এবং ওর যে গল্প বলার অসামান্য শক্তি আছে, এরই মধ্যে আমরা তা টের পেয়ে গেছি। ও যেন আমাদের ওর সামনে এই মাটির সঙ্গে গেঁথে রেখেছে। সাধ্য নেই যে নড়ি।

শুকনো গলায় বললাম, তারপরে?

উপর্যুপরি কয়েকটা জোর টানে বিড়িটা শেষ করে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তারপর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে আমাদের দিকে চাইতে লাগল। যেন আমাদের কথা ওর কানেই যায়নি।

আমাদের সকলেরই তখন ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। অন্যমনস্কভাবে সবাই জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিচ্ছি।

কতক্ষণ?

কে জানে কতক্ষণ! মনে হল, যেন অনন্তকাল মুন্না সারেং নিঃশব্দে আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

● মুন্না সারেং
শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

আমরাও তেমনি নিঃশব্দে ওর দিকে চেয়ে আছি। ওর কথাও যেন কোনোকালে শেষ হবে না, আমাদের বুকের কাঁপনও কোনোকালে থামবে না।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তারপরে?

জিজ্ঞাসা নয়, যেন কথা দিয়ে ওকে একটা খোঁচা দিলাম। সেই খোঁচা খেয়ে ও যেন এবার সচেতন হল। গল্পের কথায় ফিরে এল আবার।

বললে, পোনেরো মিনিট এমনি ধস্তাধস্তি চলল বাবুসাহেব, কোন্ দুশমনের সঙ্গে কে জানে! হঠাৎ এক সময় মনে হল জাহাজটা যেন একটা চড়ায় আটকে গেল।

—কোন্ চড়ায়?

—তা কি আমরা কেউ বুঝতে পারছি বাবুসাহেব! দিনের বেলা, অথচ অন্ধকার। জাহাজের বিজ্‌লী বাতি জ্বলছে, কিন্তু তার রোশনাই জাহাজের বাইরে পৌঁছুচ্ছে না। যেমন অন্ধকার, তেমনিই অন্ধকার। কি করে বুঝব, কোথায় এলাম, কোন্ চরে আটকাল আমাদের জাহাজ। কেবল আটকাল যে, সেইটাই মালুম হল।

—তারপরে? তারপরে বল।

মুন্না বলতে লাগল ঃ

চোঙ দিয়ে কাপ্তেন হুকুম দিলেন ঃ হুঁসিয়ার।

আমরা হুঁসিয়ার হলাম।

সঙ্গে সঙ্গে কাপ্তেন আবার হুকুম দিলেন ঃ তোপ দাগ।

তিন ইঞ্চি মুখের তোপ ফিট করাই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ হল,—একবার, দু'বার। কী ভয়ঙ্কর আওয়াজ! মনে হল যেন আমাদেরই তাক করে ছোঁড়া হয়েছে।

আমি তো বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলাম। আরও অনেকেও।

যখন জ্ঞান হল, দেখি ঝক ঝক করছে সূর্‌য। আঁধারের চিহ্নমাত্র নেই। আর সামনের দরিয়ার পানি লাল টকটক করছে! পেছুনে চেয়ে দেখি, আধখানা পেল্লাই তিমি মাছ ভাসছে!

—তিমি মাছ!

—আধখানা!

আমরা প্রায় চিৎকার করে উঠলাম।

মুন্না বললে, তোপে লেজটা উড়ে গেছে।

আমরা ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ তিমি মাছই বা এল কোথা থেকে, তার লেজটাই বা তোপে উড়ল কেন? সবই কেমন হেঁয়ালি বোধ হচ্ছিল।

এবং কিছুই বুঝতে না পেরে বোকার মতো পরস্পরের মুখের দিকে চাইতে লাগলাম।

—বুঝতে পারলেন না বাবুসাহেব?—মুন্না সারেং আমাদের মুখের অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করলে।

● মুন্না সারেং
শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

আমাদের বিমূঢ় ভাবটা তখনও কাটেনি। কথা বার হচ্ছিল না। শুধু ঘাড় নেড়ে জানালাম, না।

—চার পয়সার আইস-কিরিম খাওয়ান বাবু, বলছি। গলাটা শুকিয়ে গেছে।

একটা আইস-ক্রিমওয়ালা কখন যে আমাদের পিছনে বসে আমাদেরই মতো হাঁ করে গল্প গিলছিল, কেউ খেয়াল করিনি। মুন্না সারেং-এর কথা শোনামাত্র সে নিজে থেকেই একটা আইস-ক্রিম বের করে তার হাতে দিলে।

তারপর সবিনয়ে মুন্নাকে জিজ্ঞাসা করলে, লেকিন তিমি মছলি...

মুন্না পরিতোষের সঙ্গে আইস-ক্রিমটা লেহন করে সংক্ষেপে বললে, ওরই পেটের মধ্যে জাহাজ-শুদ্ধ আমরা ঢুকে পড়েছিলাম।

এবারে কাপ্তেন নয়, মুন্না সারেং নিজেই যেন একটা তোপ দাগলে। মুহূর্ত্তকাল আমরাও বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। তারপরেই কল্যাণ হো হো করে হেসে উঠল। সেই সঙ্গে আমরাও।

একটা আইস-ক্রিম তার হাতে দিলে।

হাসি থামলে আইস-ক্রিমওয়ালাকে বললাম, আমাদেরও একটা করে আইস-ক্রিম দাও তো। কত দাম হচ্ছে বল।

—দাম লাগবে না বাবুজি। খান একটা করে সবাই। সারেং সাহেব বহুৎ উমদা কেচ্ছা বলিয়েছে।

তারও ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে হাসি। কিন্তু সে অন্য হাসি,—আমাদের মতো অবিশ্বাসেরও নয়, বিশ্বাসেরও নয়। অন্য। রসিকের হাসি বলা যেতে পারে।

---

# শেয়াল ভায়ার বৌ-ছেলে নীলাম

শান্তা দেবী

চারধারে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, লোকের অবস্থা খারাপ—কেউ কিছু খেতে পায় না। এমন সময় একদিন শেয়ালভায়ার সঙ্গে খরগোশভায়ার দেখা হল।

শেয়ালভায়া বল্‌লে, "ওহে ভাই খরগোশ, এর পর খাবার জুট্‌বে কোত্থেকে?"

খরগোশভায়া বল্‌লে, "মনে ত হচ্ছে ভাগ্যে আর কিছু জুট্‌বে না।"

দুজনে বস্‌ল পরামর্শ করতে কি করে কিছু খাবার জোগাড় করা যায়।

অনেক ভেবে চিন্তে খরগোশভায়া বল্‌লে, "দেখ ভায়া, এক কাজ করা যাক্; বৌ-ছেলেগুলোকে বিক্রি করে দিলে কিছু টাকা পাওয়া যাবে। সেই টাকাতে কিছু গম কিনতে পারব। দিনকতক পেটটা চলবে তাতে।"

শেয়ালভায়া বল্‌লে, "ভাল কথা বলেছ। আমার গিন্নী আর ছানাগুলো ত আমায় জ্বালিয়ে খায়। ওদের বিদায় করতে পারলে আমার হাড় জুড়োয়। বেশ হবে ভাই, গাড়ী করে তোমার আর আমার বৌ-ছেলে সব বাজারে নিয়ে যাব, আর সেখানে সবাইকে বেচে দেব।"

মনস্থির করে যে যার বাড়ী চলে গেল। শেয়ালভায়া বাড়ী গিয়েই গিন্নীকে আর ছানাগুলোকে পাকড়ে আচ্ছা কসে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলে।

খরগোশভায়াও দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বাড়ী গিয়ে উপস্থিত। মনে মনে যা ফন্দি এঁটেছিল গিন্নীকে বল্‌লে। শেয়ালভায়াকে কি করে ঠকাবে তারই মতলব।

পরদিন সকালে খরগোশ-গিন্নী আর ছেলেপিলেকে বেঁধে নিয়ে সে চল্ল যেখানে শেয়ালভায়ার সঙ্গে দেখা করবে সেইখানে।

শেয়ালভায়া তার গাড়ী নিয়ে এসে ততক্ষণে হাজির। কোচবাক্সের তলায় বৌ-ছেলেপিলে সবাইকে ভরে নিজে কোচবাক্সের উপর চড়ে বসে আছে। খরগোশ তার বৌ-ছেলেদের গাড়ীর পিছন দিকে রাখ্লে।

সে বল্লে, "শেয়াল ভাই, আমি আমার ছানাপোনাগুলোর সঙ্গে পিছন দিকেই বসি, কেমন? নাহলে ওরা ভীষণ কান্নাকাটি করবে। গাড়ীটা খানিক চললেই আবার সব চুপ করে যাবে।"

শেয়ালভায়া ঘোড়ার লাগাম ধরে চাবুক নিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে সহরের দিকে চল্ল। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে বল্তে লাগ্ল, "ওহে ভায়া, জেগে আজ ত? ঢুলে পড়ো না যেন!"

ঢুল্বে কি? খরগোশভায়া বসে বসে তার গিন্নী আর সাত ছানার বাঁধন-দড়ি খুল্‌ছিল। যখন সব দড়ি-দড়া খোলা হয়ে গেল তখন খরগোশভায়া গিয়ে শেয়ালভায়ার পাশে কোচবাক্সে বস্ল। দুজনে নানা হাসি গল্প চল্ল, ছেলেপিলেগুলোকে বেচে যে গম পাওয়া যাবে তা দিয়ে কত কি হবে সে বিষয়েও পরামর্শ হল।

শেয়ালভায়া বল্লে, "ভুষিশুদ্ধ বড় বড় চাপাটি বানাব।"

খরগোশভায়া বল্লে, "আদা দিয়ে পরোটা করব।"

এদিকে খরগোশের একটা ছানা এক লাফে গাড়ী থেকে নেমে দৌড় দিল জঙ্গলের মধ্যে। শেয়াল-গিন্নী তলায় বসে সব দেখছিল। সে চেঁচিয়ে বল্লে,

"সাত থেকে এক বাদ
আর ক'টা থাকে চাঁদ?"

গিন্নীর গলা শুনে তাকে চুপ করবার জন্যে শেয়ালভায়া ধাঁই করে তার গায়ে এক লাথি মারল। খানিক বাদেই আর একটা ছানা-খরগোশ লাফিয়ে গাড়ী থেকে নেমে জঙ্গলের মধ্যে দৌড় দিল। শেয়াল-গিন্নী এবারও দেখ্ল আর চেঁচিয়ে বলে উঠ্ল,

"ছয় থেকে এক যাবে
কিছু কম গুঁতো খাবে।"

শেয়ালভায়া কথা কানেই নিল না। সে খরগোশভায়ার সঙ্গে গল্প করছে ত করছেই, খরগোশভায়াও মজা পেয়ে একের পর এক কথা বলে চলেছে। একটু পরেই আর একটা ছানা-খরগোশ লাফ দিয়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। শেয়াল-গিন্নী এবারেও চেঁচিয়ে উঠ্ল,

"পাঁচ থেকে এক যায়
চারটি শুধু বাকি রয়।"

শেয়াল আবার গিন্নীকে থামাবার জন্যে এক লাথি মার্ল। এবার তিনটি ছানাকে রেখে আর একটা ছানা লাফিয়ে নেমে পড়্ল। শেয়াল-গিন্নী চেঁচাল,

● শেয়াল ভায়ার বৌ-ছেলে নীলাম
শান্তা দেবী

"চার থেকে এক
তিনটে আছে দেখ্।"

তারপর যখন আবার একটা ছানা লাফিয়ে পালাল, শেয়াল-গিন্নী বল্‌লে,

"তিন থেকেও একটা সরে
দুটো মাত্র রইল পড়ে।"

এমনি করে ক্রমে সব ক'টা ছানাই পালিয়ে গেল। যখন শেষ বাচ্চাটাও দৌড় দিল তখন শেয়াল-গিন্নী সুর করে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল,

"একটা ছিল সেটাও গেল
শূন্য খাঁচা পড়ে রইল।"

ছানাগুলোর পরে খরগোশ-গিন্নীও একলাফে অন্তর্দ্ধান! এতক্ষণে শেয়ালভায়ার হুঁশ হল, সে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলে কেউ কোথাও নেই। সে ঘোড়ার লাগাম টেনে গাড়ী থামিয়ে চোখ কপালে তুলে বল্‌লে, "আরে আরে, খরগোশভায়া, তোমার বৌ ছানাপোনা সব গেল কোথায়?"

শেয়াল-গিন্নী শেয়ালের গায়ে হাত দিয়ে শপথ করে বল্‌লে যে,...

খরগোশভায়া তাকিয়ে দেখেই মাথা চাপড়াতে লাগল, কান্নায় ভেঙে পড়ে আর কি! কাঁদ-কাঁদ গলায় বললে, "ভাই রে, আমি আগেই জানতাম যে তোমার ছেলেপিলে বৌ-এর কাছে আমার ছানা-গুলোকে রাখলে আর রক্ষে নেই, ঠিক খেয়ে ফেল্‌বে সব ক'টাকে।"

শেয়াল-গিন্নী শেয়ালের গায়ে হাত দিয়ে শপথ করে বল্‌লে যে, সে খরগোশভায়ার ছানাপোনাকে ছোঁয়ওনি। কিন্তু শেয়ালভায়া সে কথা বিশ্বাস করলে না। ঐ খরগোশ-ছানাগুলোকে খাবার জন্যে শেয়ালের নিজের জিভ দিয়েই এমন জল পড়ছিল যে ও

● শেয়াল ভায়ার বৌ-ছেলে নীলাম
শান্তা দেবী

বৌ-ছেলেদের উপর ভীষণ চটে বল্‌লে, "যা বলিস্ তা বলিস্, আজই তোদের বিদায় না করে আমি ছাড়ছি না।"

সহরে গিয়েই ও নিজের বাড়ীসুদ্ধ সবাইকে বেচে দিলে। তারপর সেই টাকা দিয়ে বড় দুই বস্তা গম কিন্‌লে। খরগোশভায়া বল্‌লে, "আমাকে ভাই এক বস্তা গম দিতেই হবে। তোমার বৌ-ছেলেরাই আমার ছেলেমেয়েগুলোকে খেয়ে ফেলেছে, কাজেই তুমি তাদেরও ওই সঙ্গে বেচে দিয়েছ ধরতে হবে। তাই এখন আমায় এক বস্তা গম দাও, নইলে এমন কাঁদ্‌ব যে চোখের জলে পুকুর হয়ে যাবে।"

শেয়ালভায়া কি আর করে? এক বস্তা গম খরগোশকে দিয়ে দিলে। গম পেয়েই খরগোশ দৌড়, এক ছুটে একেবারে বাড়ী হাজির। গিয়ে দেখে গিন্নী উনুনে চায়ের জল চাপিয়ে বসে আছে। ছানাগুলো বস্তা-ভর্ত্তি গম দেখে মহানন্দে হাততালি দিতে লাগ্‌ল।

ধূর্ত্ত খরগোশ, এইবার না কোন্‌দিন ধরা পড়ে!

# সংস্কৃত-সাহিত্যের কাহিনী

## ● সারিপুত্রপ্রকরণ

[অশ্বঘোষ একজন প্রাচীনতম কবি, কালিদাসের বহু আগে তিনি জন্মেছিলেন। মহাপুরুষদের জীবনকে কেন্দ্র করে তিনি কাব্য রচনা করেন। তাঁর বুদ্ধচরিত বিখ্যাত; কিন্তু বুদ্ধের দুজন প্রধানতম শিষ্য, সারিপুত্র আর মৌদ্‌গলায়ন, তাঁদের নিয়েও তিনি কাব্য রচনা করেন। সেই কাব্যের নাম হলো, সারিপুত্রপ্রকরণ।]

সারিপুত্র ভগবান বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। সেই সময়কার ব্রাহ্মণ সমাজপতিরা কিন্তু বুদ্ধকে স্বীকার করেন নি, বুদ্ধ ক্ষত্রিয়, তাঁর কি অধিকার আছে ব্রাহ্মণকে শিষ্য করবার? সারিপুত্রকে তাই আক্রমণ করলো অশ্বজিৎ; ব্রাহ্মণ হয়ে তিনি কেন বুদ্ধকে গুরু বলে স্বীকার করলেন। সারিপুত্র অশ্বজিৎকে ধীরে ধীরে বুদ্ধের মহিমার কথা বোঝাতে লাগলেন এবং শেষকালে বল্লেন, নিম্ন জাতের বৈদ্যের কাছে যদি ব্রাহ্মণ ওষুধ গ্রহণ করেন, তাহলে কি সে ওষুধে কাজ হয় না? সারিপুত্রের দৃষ্টান্ত দেখে মৌদ্‌গলায়নও বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এই বইটিতে দেখা যায়, নতুন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের বিরুদ্ধে সমাজের সনাতন আক্রোশ, মহাকবি অশ্বঘোষ সারিপুত্রের চরিত্রে চিরকালের নব-নবীনকে এঁকেছেন।

# কেমন ওষুধ!

আশাপূর্ণা দেবী

এ বাড়ীর এতো জিনিষ থাকতে চুরি গেলো কি না মেজমামার ফাউণ্টেন পেন! যে মেজমামা কাল সকালে এ বাড়ীতে পা দিয়েছেন, আর যে পেনটি তিনি না কি মাত্র এক সপ্তাহ আগে কিনেছেন।

মেজমামা, মানে আর কি, ঝণ্টু কাণ্টুদের মেজমামা। ফাউণ্টেন পেন হারানোর ব্যাপারে নিশ্চিত হতেই সটান বিছানায় শুয়ে পড়ে ঝণ্টুদের মাকে ডেকে সনিশ্বাসে বললেন—দেখ্ পুঁটি, তোর বাড়ীতে গোটা সাতেক দিন থাকবো বলে এসেছিলাম, কিন্তু যা দেখছি ফেরার সময় বোধহয় সর্ব্বস্বান্ত হয়ে ফিরতে হবে!

পুঁটি সখেদে বললো—সে কি মেজদা, সে কি?

—কি আর, এই তো পড়েই আছে সোজা হিসেব! মাত্র সাতটাই জিনিষ আমার—যথা, ফাউণ্টেন, চশমা, ঘড়ি, সোনার বোতাম, জুতো, ছাতা, সুটকেস। তা'—দৈনিক যদি একটা করে হারাতে থাকে, তা'হলেই যাবার সময় দু'হাত ফর্সা!

পুঁটি কাতর হয়ে বলে—দৈবাৎ একটা হারিয়েছে বলে অতো কিছু ভেবোনা মেজদা! কই আমাদের তো কক্খনো কিছু হারায় না!

—হারায় না—বলেই তো আরো ভাবনার কথা! তোমাদের হারায় না, আমার হারালো—তার মানে, জানা চোর। উঃ কলমটার কথা মনে পড়লেই মনটা হু হু করে উঠছে! নগদ পঁয়তাল্লিশ টাকা দিয়ে কেনা!

পুঁটি বেচারা আর কি করে, মেজদার পঁয়তাল্লিশ টাকার পেনের শোক নিবারণ করতে মাংসের চপ্ ভাজতে বসে।

ঝণ্টুর বাবা কান্তিবাবু কিন্তু ব্যাপারটা শুনেও তেমন গায়ে মাখলেন না। বললেন—চুরি মানে? চুরি অমনি গেলেই হলো? বাড়ীর কোনো জিনিষ চুরি যায় না, আর তোমার দাদার জিনিষটিই চুরি যাবে?...আছে কোথাও, খুঁজে দেখো ভালো করে।—ছেলেগুলোকে লাগিয়ে দাও খুঁজতে।

পুঁটি বললে—সে কি তুমি বলবে, তবে হবে? কতো খুঁজেছে ওরা জানো কিছু?

কান্তিবাবু গম্ভীর ভাবে বলেন—জানি কিছু কিছু। ওদের খোঁজা মানে খানিকক্ষণ এঘর ওঘর বেড়িয়ে নিয়ে বলা—"কোথাও পেলাম না।" এই তো? আচ্ছা রোসো, আমি একটা ওষুধ ঝাড়ছি।

—আচ্ছা বেশ বাপু, পুরোপুরি ষোলো আনাই নিস। [পৃঃ ১২৮

অতঃপর কান্তিবাবু বাড়ীর সব ছেলে ক'টিকে জড়ো করলেন। ঝণ্টু কাণ্টু, তা'দের জেঠতুতো দাদা ঘণ্টু পিণ্টু, আর খুড়তুতো বোন মিষ্টি আর বৃষ্টি! সবাইকে ডেকে গম্ভীর ভাবে বললেন—দেখো, তোমাদের মেজমামার কলমটা হারিয়ে গেছে শুনছি। এটা খুবই দুঃখের কথা! শুধু দুঃখের নয়, লজ্জার কথাও। কারণ তিনি এ বাড়ীর অতিথি। নিজেদের জিনিষ হারানোর চাইতে অনেক পরিতাপের বিষয়, অতিথির জিনিষ হারানো! তবে—আমার ধারণা—বাড়ীতেই কোথাও আছে। এখন কথা হচ্ছে একটু কষ্ট করে খুঁজতে হবে। যে খুঁজে বার করতে পারবে, তাকে নগদ আট আনা প্রাইজ!

আট আনা!

● কেমন ওষুধ।
আশাপূর্ণা দেবী

প্রায় অর্দ্ধেক রাজত্ব!

তবু—ঝণ্টু গম্ভীর ভাবে বলে—আট আনা?...মেজমামা বলছিলেন কলমটার দাম পঁয়তাল্লিশ টাকা।

—আচ্ছা বেশ বাপু, পুরোপুরি ষোলো আনাই নিস। কিন্তু তাড়াতাড়ি চাই!

পুরোপুরি ষোলো আনা!

ঝণ্টুদের কাছে যা—পুরো একটা রাজত্বের সামিল।

লেগে গেলো খোঁজার ধুম ধড়াক্কা।

সে কী ধুম!

ইঁদুরের গর্ত্ত থেকে সুরু করে আলমারির মাথা পর্য্যন্ত খোঁজা চলতে থাকে।...পিণ্টু অনেক ডিটেকটিভ্ গল্প পড়ে, সে বললো—বালিশের তুলো ছিঁড়ে ভেতরগুলো দেখবো রে বৃষ্টি?

বৃষ্টি ভয়ে ভয়ে বললে—না রে মেজদা, জেঠীমা তা হ'লে রেগে কুরুক্ষেত্তর করবেন।

কথাটা ঠিক! কুরুক্ষেত্রকাণ্ড দেখবার সৌভাগ্য যার হয়নি, অথচ দেখবার সাধ যার আছে, সে ইচ্ছে করলে পিণ্টুদের জেঠীমার রাগ দেখে আসতে পারো।

সেটা আর হলো না, তবে লেপ তোষক বালিশ বিছানা লণ্ডভণ্ড হলো! বাড়ীর মহিলারা চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করতে লাগলেন! আর বলবো কি আশ্চয্যি কথা, কলমটা শেষ পর্য্যন্ত সত্যি পাওয়াই গেলো!

লেপ তোষক বালিশ বিছানা লণ্ডভণ্ড হলো!

● কেমন ওষুধ!
আশাপূর্ণা দেবী

শ্রীহরি সংযোগ খুঁজি এলেন সময় বুঝি…

'পাওয়া গেছে?' 'পাওয়া গেছে?' 'কোথায় ছিলো?' 'কোথায় পেলি?' রব উঠলো বাড়ীতে।

সত্যি কোথায় পাওয়া গেলো?

আর কোথাও নয়, মেজমামা যে ঘরে শুয়েছিলেন সেই ঘরের খাটের তলায়। খাটের তলা মানে জঞ্জালের আড়তে। বাঙালীর বাড়ীতে তো আর খাটের তলা ফাঁকা থাকে না, বাড়ীর যতো জঞ্জাল লুকোনো থাকে খাটের তলায়। সেখানে কেমন করে গড়িয়ে গিয়েছিলো কে জানে!

মেজমামা কলমটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললেন—আহা বাছারে, ধুলোয় পড়ে থেকে রোগা হয়ে গেছে, একটু খেতে দিই। বলে কালি ভরতে সুরু করলেন।

পুঁটি হরির লুট পাঠালো।

কান্তিবাবু এসে আত্ম-প্রসাদের হাসি হেসে বললেন—দেখলে তো? কেমন ওষুধ বাৎলেছি! লোভটি না দেখালে ব্যাটারা খুঁজতো? ছেলেপুলের ওষুধই হলো—লোভ দেখানো, বুঝলে? তা' নয়, তোমরা মারবে ধরবে ধমক দেবে। ওতে কি আর কাজ পাওয়া যায়?

কথাটা সত্যি!

স্বীকার করলো সবাই! 'ছেলে ভুলোনো' বলে কথাটার সৃষ্টি হয়েছিলো কেন তা' না হলে? ভুলিয়ে লোভ দেখিয়ে সব করিয়ে নেওয়া যায় ওদের দিয়ে।

যাক, বাড়ীতে আনন্দ পড়ে গেলো। কুটুম্ব মানুষের জিনিষ হারিয়েছিলো, কম লজ্জার কথা!

কিন্তু এ কী!

এ যে হরিষে বিষাদ!

পরদিন দেখা গেলো মেজমামার ঘড়ি নেই! এ কী সর্ব্বনেশে কাণ্ড!

মেজমামা চীৎকার করে বলে উঠলেন—ভূতের বাড়ী! ভূতের বাড়ী! রাতে টেবিলে ঘড়ি রেখে শুয়েছি, সকালে উঠে হাওয়া?...অথচ ঘরে খিলবন্ধ ছিলো। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্যই বা বলছি কেন? গোড়াতেই জানি, সাতদিনে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে ফিরতে হবে আমায়!

কিন্তু সত্যি গেলো কোথায়? রিষ্টওয়াচ কিছু আর কলমের মতো গড়িয়ে গিয়ে খাটের তলায় ঢুকবে না!

পুঁটি কেঁদে ঠাকুরঘরে গিয়ে বললো—হে হরি! এবার আর স'পাঁচ আনা নয়, পুরো পাঁচসিকে!

কান্তিবাবু হাঁকলেন—আজ আর ষোলো আনা নয়, বত্রিশ আনা!

খোঁজ—খোঁজ—খোঁজ!

আজকের ধুম ধড়াক্কা আরো জোরালো! সারাবাড়ী তন্ন তন্ন!...শেষ পর্য্যন্ত কাণ্টু পেলো খুঁজে! ছিলো নাকি সেলফের বইয়ের পিছনে!

পুঁটি বললে—অবাক কাণ্ড! ঘড়িটা কি হাঁটতে পারে?

কান্তিবাবু বললেন—মোটেই তা নয়। তোমার দাদারই কীর্ত্তি! বোধহয় হারিয়ে যাবার ভয়ে লুকিয়ে

রেখে ভুলে গিয়েছিলেন।

মেজমামা অবশ্য মানতে চাইলেন না সেকথা, ঢের তর্ক করলেন তবু ঘড়ি পেয়ে বাঁচলেন। কাঞ্চুর নগদ দু টাকা লাভ।

রাজত্ব নয়—পুরোপুরি সাম্রাজ্য!

বাড়ীর আর সব ছেলেরা কাঞ্চুর দিকে যে দৃষ্টিতে তাকাতে থাকলো, তাকে সাধু ভাষায় বলে ঈর্ষা!

অবিশ্যি পাঁচসিকের হরির লুটের বাতাসার ভাগটা সবাই সমান পেলো তাই রক্ষা!

তারপর?

তারপর দিন আবার বাড়ীতে এক অভাবনীয় কাণ্ড! সে শুনলে তোমরা বিশ্বাস করবে কি না জানি না!

আজ আর শুধু মেজমামা নয়, ঘুম থেকে উঠে সবাই তারস্বরে চেঁচাচ্ছে—'কোথায় গেলো!'

কাঞ্চুদের বাবা, কাকা, জেঠামশাই, মেজমামা, মা, কাকীমা, জেঠীমা মুহুর্মুহু ডুকরে উঠছেন—'কোথায় গেলো?' 'আমাদের চশমা কোথায় গেলো?'... 'আমার জুতো কোথায় গেলো?'...'আমার কাপড় কোথায় গেলো?'...'আমার কানের দুল খুলে রেখেছিলাম রাতে, কোথায় গেলো?' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এমনকি পুঁটির ঠাকুর ঘরের ঠাকুরের রূপোর গেলাস লোপাট!

সে বেচারা আজ মবলগ পাঁচ-টাকার পুজো মেনে বসে। আর কান্তি-বাবু সব দেখে শুনে গম্ভীর ভাবে বলেন—হুঁ, যা দেখছি দক্ষিণে আরো বাড়িয়ে দিতে হবে। আজ নগদ পাঁচ!

বাড়ীর আর সব ছেলেরা কাঞ্চুর দিকে যে দৃষ্টিতে তাকাতে থাকলো...

যে যা পাবে দক্ষিণা পাঁচ!

ব্যস এ কথায় মন্ত্রবলের মতো কাজ হলো! ঝড়াঝড় হারানো জিনিষ খুঁজে পাওয়া যেতে লাগলো।

● কেমন ওষুধ।
আশাপূর্ণা দেবী

সমস্ত জিনিষ না কি একতলায় নেমে পড়ে কয়লার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে!

কি করে ঢুকেছে?

সেই তো রহস্য?

মেজমামার কথাই হয়তো সত্যি! ভূত আশ্রয় করেছে বাড়ীতে।

'টাকা কই টাকা?' 'পাঁচটাকা?' ...'আমি খুঁজেছি আমি!'

সমবেত কণ্ঠে ঐকতানবাদন সুরু হয়েছে—'আমি পেয়েছি—আমি!' ...'আমি ঘড়ি!' ...'আমি চশমা' ...'আমি দুল'...'আমি জুতো—'

কান্তিবাবু বলেন—আলাদা আলাদা দেবো কেন? লাইন দিয়ে দাঁড়াও একসঙ্গে—পর পর দিয়ে যাবো!

সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়ালো।

উৎফুল্ল মুখ, আশাকাঙ্ক্ষিত হৃদয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে সবাই, আর কান্তিবাবু প্রাইজ বিতরণ করতে লেগে যান।

মাথা পিছু পাঁচ!

কি বলছো? পাঁচটাকা?

কান্তিবাবু তো পাগল নন?...গুণে গুণে পাঁচটি করে গাঁট্টা দিলেন মাথা পিছু!

নগদ দক্ষিণা!

তার পরদিন?

নাঃ তার পরদিন থেকে আর কিছু হারালো না!

গুণে গুণে পাঁচটি করে গাঁট্টা দিলেন মাথা পিছু।

কান্তিবাবু বললেন—হুঁ বাব্বা, দেখলে তো কেমন ওষুধ বাৎলেছি! ব্যাটাদের আসল ওষুধই হচ্ছে গাঁট্টা!

তা' তো নয়, তোমরা খালি গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ছেলে-মেয়ে মানুষ করতে চাইবে! হুঁঃ! ছেলেপিলে আর কাঁকড়া বিছে, দুটি হচ্ছে একজাত! বুঝলে?

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

সুবীর ইতিহাসের ছাত্র। যাকে সত্যিকারের ছাত্র বলে তাই। প্রত্নতত্ত্বের ওপর তার এই টান আজকের নয়,—অল্পবয়স থেকেই কোন জায়গায় পুরোনো ভাঙ্গা মন্দির, পুরোনো আমলের মূর্ত্তি, এমন কি পুরোনো আমলের হাঁড়িকুড়ি পেলেও সে তন্ময় হয়ে যেত। পুরোনো পুঁথিপত্রের ওপরও ঝোঁক ছিল তার; আর, ছুটি পেলেই, কোন ঐতিহাসিক জায়গা দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ত সে। কাজেই এ হেন সুবীর যে ইতিহাস নিয়েই এম্-এ পাশ করবে এবং শেষে ঐ বিষয়েই পি. এইচ-ডি. ডিগ্রী নিয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক হয়ে বসবে এ আর বিচিত্র কি? হ'লও তাই। চাকরী নিয়ে সুবীর চলে এল সুদূর পশ্চিম ভারতে—সুখনগড়ের শ্রীমহাতপ সিং কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক হয়ে।

সুখনগড় হচ্ছে একটি দেশীয় রাজ্য এবং বেশ সম্পদ্‌শালী রাজ্য। রাজ্যের একাংশে বিরাট বন। নানা রকম দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান্ গাছের সমারোহ্ সেখানে। বনজ সম্পদ্ থেকেই প্রচুর আয় হয় ষ্টেটের। তা ছাড়া অন্য দিকে আছে বড় বড় পাহাড়—বিভিন্ন খনিজ-সম্পদে পূর্ণ। তা থেকেও আয় বড় কম হয় না। রাজধানীর গা ঘেঁষে চলে গেছে কনকচূর নদী। প্রকাণ্ড নদী, লোকে বলে ওর বালিতে সোনার রেণু মেশান আছে।

যাই হোক, সুখনগড়ের বর্ত্তমান মহারাজা বাহাদুর শ্রীশ্রীমহাতপ সিং যে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্যও অর্থ ব্যয় করেন তা তাঁর নিজের নামে তৈরী প্রথম শ্রেণীর কলেজটি থেকেই বোঝা যায়। নানা বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছে এখানে,—সাহিত্য, ইতিহাস, এঞ্জিনীয়ারিং, ডাক্তারী, বিভিন্ন বিজ্ঞান। সুন্দর বাগানওয়ালা অট্টালিকা, বিরাট লাইব্রেরী, আধুনিক যুগের উপযোগী বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরী—সবই বসানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, নানা জায়গা থেকে জ্ঞানী, গুণী লোক বাছাই করে তাঁদেরই হাতে দেওয়া হয়েছে সুখনগড়ের ভাবী নাগরিকদের গড়ে তুলবার ভার।

সুখনগড়ে এসে সুবীর বেশ খুসীই হ'ল। সবচেয়ে ভাল লাগল তার লাইব্রেরীটা। শুধু আজকালকার সব রকম নতুন নতুন বই দিয়েই নয়, সেকালকার নানা পুঁথি আর দলিলপত্রে ঠাসা লাইব্রেরীটি। দিনের মধ্যে এখানেই তার সময় কাটতে লাগল বেশী, আর এখানেই তার সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হয়ে গেল

জয়মলের। জয়মল রাজাবাহাদুরের ভাইপো, গদীর ভাবী উত্তরাধিকারীও সে-ই। কারণ মহাতপ সিং-এর নিজের কোন ছেলে নেই। রাজ্যের ভবিষ্যৎ মালিক হ'লেও জয়মলের চালচলন ছিল খুবই সাদাসিধে। সাধারণের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতে কোন সঙ্কোচ ছিল না তার। কলেজের লাইব্রেরীটা খুব ভাল ব'লে প্রায়ই সে এখানে আসত। জয়মল সুবীরের প্রায় সমবয়সীই হবে। কাজেই, অবস্থায় আকাশ-পাতাল তফাৎ থাকলেও, দু'জনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। এমন কি শেষে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে চলে এল তারা।

এইখানেই একদিন পুরোনো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে সুবীর একটা অদ্ভুত তথ্য আবিষ্কার করে বসল।

হঠাৎ শুনলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হবে না, কিন্তু সুবীর যে অকাট্য প্রমাণ পেয়েছে তাও তো উড়িয়ে দেবার নয়! আর—আর এ যদি সত্যি হয়, তা হ'লে, সুখনগড় ষ্টেটকে কুবেরের ঐশ্বর্য্যের সন্ধান দিতে পারবে সে। তবে হ্যাঁ, গোড়াতে বেশ কিছু মোটা টাকা খরচ করতে হবে এর জন্য। নিজের টাকা থাকলে হয়তো সুবীর নিজেই চেষ্টা করে দেখত।

বলি বলি ক'রে কথাটা সে একদিন জয়মলকে বলে ফেলল।

শুনে লাফিয়ে উঠল জয়মল। "বল কি! এও কি সম্ভব? কনকচূরের জলে হাজার মণ সোনা চাপা পড়ে আছে! তার মানে পঁচিশ থেকে তিরিশ কোটি টাকার সোনা!"

"হ্যাঁ, বন্ধু! আমি তোমাকে তার সন্ধান দেব। কিন্তু তা তুলবার খরচ যোগাতে হবে ষ্টেটকে। সে ভার তোমার। রাজাবাহাদুরকে রাজী করাবার ভারও। আর, আমার—"

রাজাবাহাদুর "ফোঃ" ব'লে হেসে উড়িয়ে দিলেন। [পৃঃ ১৩৪

"তা আর তোমায় বলতে হবে না। সোনা যদি উদ্ধারই হয় তা হ'লে তার সিকি অংশ তোমার। এ আমি কাকাকে দিয়ে লেখাপড়া করিয়ে দেব।"

● সোনার হরিণ
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

রাজাবাহাদুর প্রথমটা "ফোঃ" ব'লে হেসে উড়িয়ে দিলেন। ভাইপোকে বললেন, "ছেলেমানুষ তোমরা, ছেলেবেলা থেকে বাজে বই পড়ে পড়ে দিবারাত্র গুপ্তধনের স্বপ্ন দেখছ। তিরিশ কোটি টাকার সোনা ডুবে রয়েছে কনকচূরের জলে, আর রাজ্যের কেউ তা জানে না! তোমার বন্ধুটির মাথা ঠিক আছে তো?"

কিন্তু জয়মল নাছোড়বান্দা। বললে, "না না, একবার দেখতেই হবে পরীক্ষা ক'রে। আমাদের ষ্টেট এমন কিছু গরীব নয় যে এই খরচটা করতে পারবে না। কিন্তু ধরুন, সত্যি যদি সোনাটা পাওয়া যায়—তা হ'লে আমাদের এই সুখনগড় বৃটীশ ভারতের সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়ে চলবে। না কাকাবাবু, আপনি আপত্তি করবেন না।"

শেষ পর্য্যন্ত রাজাবাহাদুরকে রাজী করিয়ে ছাড়ল জয়মল।

ব্যাপারটা তবে খুলেই বলি।

সে আজ প্রায় ১৮ শতাব্দী আগেকার কথা। এ অঞ্চলে তখন সাতবাহন রাজবংশের রাজত্ব চলছে। তখন এখানে যাকে বলে সুবর্ণযুগ। ধনে, মানে—ব্যবসায়, বাণিজ্যে সমৃদ্ধির তুলনা নেই। ভারতের বাইরেকারও নানা দেশ—ওদিকে আরব, মিশর, গ্রীস,—এদিকে চীন, পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং, এমন কি, তার মারফৎ মেক্সিকো আর পেরু দেশের সঙ্গেও বাণিজ্য চলছে তার। সেই সময়কার কথা।

সকলেই জানে অতি প্রাচীন কাল থেকেই মেক্সিকো আর পেরু ছিল সোনার দেশ। এত সোনা পৃথিবীর আর কোন দেশে ব্যবহৃত হ'ত বলে শোনা যায় নি। সেখানকার রাজা বসতেন নিরেট সোনার সিংহাসনে, রাজসভার সাজসজ্জায় ঝলমল করত সোনা। পথেঘাটে, দেবমন্দিরে—সর্ব্বত্র ছিল সোনার ছড়াছড়ি। আর এই সোনার বাণিজ্য চলত বহু দূর দূর দেশের সঙ্গে। মেক্সিকো থেকে জাহাজ আসত প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জে, আবার সেখান থেকে আসত ভারতের নানা বন্দরে।

একবার এইরকম এটি জাহাজ-ভর্ত্তি সোনা আসছিল রাজা শিখীবাহনের বৈদুর্য্যনগরে। এখন যেখানে সুখনগড় ষ্টেট সেইখানেই ছিল এই প্রাচীন বৈদুর্য্যনগর। সমুদ্র তখন রাজধানীর আরও কাছে ছিল, কনকচূর নদীও ছিল অনেক বেশী চওড়া। সারা সমুদ্রপথ নির্ব্বিঘ্নে পার হয়ে জাহাজ নদীর মুখে ঢুকল, তার পরেই সুরু হ'ল প্রচণ্ড ঝড়। এমন ঝড়ের কথা বড় একটা শোনা যায় না। তিন দিন তিন রাত্রি পরে ঝড় যখন থামল তখন দেখা গেল, অনেক আগেই সোনা সমেত জাহাজখানি নদীর অতল গর্ভে তলিয়ে গেছে। সেকালকার পাল-তোলা কাঠের জাহাজ, এত বড় ঝড়ের সঙ্গে এঁটে ওঠা সম্ভব হয় নি তার পক্ষে।



লাইব্রেরীতে বসে পুরোনো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে এই খবরটাই আবিষ্কার করেছিল সুধীর। প্রাচীন লিপিবিদ্যায় কুশলী সে, সেকেলে অক্ষরে, সেকেলে ভাষায় লেখা হ'লেও তার ভাবার্থ উদ্ধার করা কঠিন হয় নি তার পক্ষে। কাগজে যে হিসেব দেখা যাচ্ছিল তাতে মনে হয় জাহাজে সোনা ছাড়া অন্য কিছু বড় একটা ছিল না। সোনার ওজন হাজার মণ তো বটেই—তারও অনেক বেশী ছিল বলেই মনে হয়। জাহাজডুবি হ'লে নদীগর্ভ থেকে তা তুলবার কোন ব্যবস্থা ছিল না সে যুগে। আধুনিক কালে

- সোনার হরিণ
  শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

জলে ডোবা জাহাজ তুলবার জন্য যে সব যন্ত্রপাতি—যে সব বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে—যাকে বলা হয় 'স্যালভেজিং' সে যুগে তা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কাজেই সে জাহাজ হয়তো আজও নদীর তলায় তেমনি অবস্থায় পড়ে আছে। আর, অত প্রাচীনকালের খবরও কেউ জানে বলে মনে হয় না। নদীর নামও বদলে গেছে। তখন ওর নাম ছিল সর্পিলা—এখন বলা হয় কনকচূর। কে জানে, এই কনক অর্থাৎ সোনার জন্যই পরবর্ত্তী যুগে ওর নতুন নামকরণ হয়েছে কিনা। কোন কোন রাজার আমলে ওকে হিরণ্যগর্ভও বলা হ'ত। নদীর ভিতরে একটা ডুবো-পাহাড় থাকায় ওর গতি একটু বেশী রকম আঁকাবাঁকা। সর্পিলা নাম হয়তো তারই জন্য দেওয়া হয়ে থাকবে।

তা নদীর নাম যাই হোক্, তা নিয়ে এখন খুব মাথা না ঘামালেও চলতে পারে। এখন, কথা হচ্ছে, জাহাজডুবির নির্দ্দিষ্ট স্থান আন্দাজ ক'রে নিয়ে যদি সেটা 'স্যালভেজ' করে তোলবার ব্যবস্থা করা যায় তা' হ'লে ঐ সোনা, এতদিন পরেও, উদ্ধার করা হয়তো অসম্ভব নয়। জয়মলকে সেই কথাই বলেছিল সুবীর। স্যালভেজিং করতে অবশ্য খরচ অনেক। কিন্তু একটি দেশীয় রাজ্যের সরকারের পক্ষে তা' হয়তো এমন বেশী নয়।

জয়মলের সাহায্যে স্যালভেজিং-এর ব্যবস্থা করতে বেশী দেরী হ'ল না। জাহাজডুবির সময় ঝড়ের মুখে মস্ত একটা ডুবো-পাহাড়ের সঙ্গে তার ধাক্কা লাগে—এ খবরটা সুবীর কাগজ ঘেঁটে বের করেছিল। নদী অবশ্য তারপর কিছুটা সরে এসেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও জায়গাটা খুঁজে বের করা তত কষ্টকর নয়। কেননা ওর মধ্যে ডুবো-পাহাড় ঐ একটাই আছে। হিসাবপত্র, মাপজোক ক'রে জাহাজটা ঠিক কোন জায়গায় থাকা সম্ভব তার একটা মোটামুটি হিসেব করে নিয়ে সুরু হ'ল কাজ। কয়েকদিনের অক্লান্ত চেষ্টায় সত্যি সত্যি একটা জাহাজের আধ-ভাঙ্গা মাস্তুল বেরিয়ে পড়ল জলের তলা থেকে।

উৎসাহী কর্ম্মীর দল তখন দ্বিগুণ উৎসাহে সুরু করল কাজ, এবং কয়েক দিনের মধ্যেই জল ছেঁচে তুলে ফেলল এক মস্ত কাঠের জাহাজ। জায়গায় জায়গায় কাঠ পচে গেলেও তলার অনেকখানি অংশ পেতল দিয়ে বাঁধান থাকায় জাহাজটী সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নি। তা ছাড়া তার ওপর কাদা আর মাটির প্রলেপ পড়ে পড়ে এত পুরু হয়েছে যে তা-ই জাহাজটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ড্রেজার দিয়ে সেই কাদা-মাটির আস্তর কাটা হ'ল, তার পরই দেখা গেল আশ্চর্য্য ব্যাপার!

জাহাজের একটা কামরা ভেঙ্গে ডুবো-পাহাড়ের গায়ে গেঁথে গেছে, আর তারই ভিতর রয়েছে তাল তাল সোনা। শুধু সোনা আর সোনা! আর কিছু না। তিরিশ কোটী কেন, এর হালের দাম নিশ্চয়ই আরও অনেক—অনেক বেশী।

কিন্তু এ সোনার কথা কাউকে ঘুণাক্ষরেও জানানো হ'ল না। জান্‌ল শুধু জয়মল আর সুবীর। আর জানল মুষ্টিমেয় অতিবিশ্বাসী কয়েকজন কর্ম্মচারী।

সোনা তো উদ্ধার হ'ল, এইবারে তা সরিয়ে নেবার পালা। তোড়জোড় করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল; তাই ঠিক হ'ল, রাত করে আর এ জিনিষ নদীর ওপর দিয়ে টানাটানি করা উচিত হবে না। জাহাজটারও এমন অবস্থা নয় যে সেটাকে দড়ি দিয়ে টেনে আনা যায়। তাই জয়মল সেই বিশ্বাসী

কর্ম্মচারী কয়জনের সাহায্যে সমস্ত সোনা ওজন করিয়ে তারপর জাহাজটা একদল শান্ত্রী দিয়ে ভাল করে পাহারার ব্যবস্থা করে চলে এল। সুবীরও এল সঙ্গে। সমস্ত ব্যাপারটা এত গোপনীয় ভাবে রাখা হ'ল যে শান্ত্রীরাও কেউ টের পেল না—জাহাজের ভিতরে কি আছে।

পরদিন। সোনা আনবার জন্য রাজকীয় লঞ্চ যথাসময়ে হাজির হ'ল জাহাজে। লঞ্চে তুলবার আগে সমস্ত সোনা ফের ওজন করা হ'ল। কিন্তু এ কি! সোনা যে অনেকখানি কম! চারিদিকে শান্ত্রী রয়েছে, সবাই তারা বিশ্বাসী। তার ওপর সোনার বিষয় তারা কেউ কিছু জানেও না। এদের ভিতর থেকে সোনা নিল কে? কর্ম্মচারীদের মধ্যেই কারও ষড়্যন্ত্র কি? কিন্তু তারাও এতদিনের পুরোনো আর তাদের সততা সম্বন্ধে এত বেশী জানা আছে যে তাদের কারো দ্বারা এ কাজ হওয়া বিশ্বাসযোগ্য নয়। বাকি রইল সুবীর স্বয়ং। তবে কি এ সুবীরেরই কোন কারসাজি? গরীব বাঙ্গালী ছোকরা, এত সোনা দেখে কি তার মাথা বিগড়ে গেল? সিকি ভাগ তো সে পাবেই, আরও বেশী পাওয়ার লোভ কি তার? জয়মল একটু সন্দিগ্ধ হ'ল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

সোনা এসে উঠল রাজবাড়ীর কোষাগারে। অত্যন্ত সুরক্ষিত সেই ঘর। মাটির নীচে, চারিদিকে সুদৃঢ় কন্‌ক্রিট্ দিয়ে গাঁথা। একটি মাত্র দরজা, তাও পুরু ইস্পাত দিয়ে তৈরী। সামনে সর্ব্বক্ষণ বন্দুক ঘাড়ে সেপাই পাহারা দিচ্ছে। সেইখানে এনে রাখা হ'ল সব সোনা। ঠিক হ'ল, পরদিন আবার ওজন করে দেখা হবে।

কিন্তু পরদিনও দেখা গেল সেই অদ্ভুত ব্যাপার। সোনার ওজন আজও বেশ খানিকটা কমে গেছে কাল যা ছিল তার চেয়ে।

কোথায় গেল সোনা? কে নিল? সুবীর কি তবে এখানেও সেপাইদের সঙ্গে গোপনে গোপনে ষড়্যন্ত্র করে ভিতরে ভিতরে এই কাণ্ড করে চলেছে? সে ছাড়া আর কারো দ্বারা তো এ সম্ভব নয়!

সুবীরের ডাক পড়ল রাজাবাহাদুরের কাছে। জেরার চোটে অস্থির হয়ে উঠল সুবীর। রাজাবাহাদুর, মনে হ'ল নিঃসন্দেহ। ছি-ছি-ছি, বাঙ্গালীরা এমন বিশ্বাসঘাতক। ভদ্রবংশের শিক্ষিত ছেলে—তার কিনা এই কাজ! তিনি স্পষ্টই তাঁর সন্দেহের কথা জানিয়ে দিলেন। আর জয়মল? তারও কি ঐ বিশ্বাস! হ্যাঁ, সেও সুবীরকেই সন্দেহ করেছে।

সুবীর বুঝতে পারল, সহজে তাকে রেহাই দেওয়া হবে না। এখন থেকে তাকে প্রকৃতপক্ষে নজরবন্দী হয়েই থাকতেও হবে। শেষ পর্য্যন্ত তার অংশ সে হয়তো পাবেই না, উপরন্তু এত বড় একটা অপবাদ মাথায় নিয়ে তাকে চাকরী ছেড়ে চলে আসতে হবে।

কিন্তু না, তা অসম্ভব। রাতারাতি ক্রোড়পতি না-ই বা হ'তে পারল, তাই ব'লে এত বড় একটা জঘন্য মিথ্যার বোঝা মাথায় নিয়ে চলে আসবে সে? কিছুতেই নয়। রহস্যের সন্ধান সুবীরকেই উদ্‌ঘাটিত করতে হবে। কোথায় যাচ্ছে সোনা! এত সুরক্ষিত ঘর, একটা মশা-মাছির পর্য্যন্ত যেখানে ঢুকবার সুযোগ নেই, সেখান থেকে সোনা নিয়ে পালাবে এত সাহস কার? নাকি, তাকে ঠকাবার জন্য জয়মলদেরই এটা একটা চাল? কিন্তু ওদের যতটুকু দেখেছে—ও রকম তো মনে হয় না!

- সোনার হরিণ
  শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

উপায়ান্তর না দেখে সুবীর সুবন্ধুকে তার করল কালকাতায়।

সুবন্ধু সুবীরের বাল্যবন্ধু। স্কুলে, কলেজে একসঙ্গে পড়েছে বরাবর। ছেলেবেলা থেকেই সখের গোয়েন্দাগিরিতে ভারী উৎসাহ তার। বন্ধুরা বল্‌ত, বড় হয়ে ও নিশ্চয়ই একজন বড়দরের ডিটেক্‌টিভ হবে! সুবন্ধু কিন্তু তা হয় নি,—হয়েছে বৈজ্ঞানিক। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের অধ্যাপক সে। রসায়ন বিজ্ঞান নিয়ে মৌলিক গবেষণা করে বেশ কিছু খ্যাতিও অর্জ্জন করেছে ইতিমধ্যে। কিন্তু গোয়েন্দাগিরির উৎসাহ তার নেভে নি। সখের গোয়েন্দাগিরির সুযোগ পেলে এখনও এগিয়ে আসে সে। তা ছাড়া সহরের বড় বড় ডিটেক্‌টিভদের সঙ্গেও তার খুব খাতির,—বিশেষ করে প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভদের সঙ্গে। সুবীর তাকে সব কথা খুলে লিখল এবং অবিলম্বে একজন গোয়েন্দা পাঠিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ জানাল।

দিন দুই বাদে সুবন্ধু নিজেই এসে হাজির হ'ল সুখনগড়ে। সুবীরকে বল্‌ল, ডিটেক্‌টিভ সতীনাথবাবুকে খবর দিয়ে এসেছে সে, তিনি এখন কলকাতার বাইরে থাকায় আসতে হয়তো ২/৪ দিন দেরী হবে। ইতিমধ্যে সে নিজেই এসেছে—যদি কিছুটা গোড়ার কাজ এগিয়ে রাখতে পারে। আর, তেমন প্রয়োজন হ'লে সুখনগড়ের সুখে নুড়ো জ্বালিয়েও তো দিয়ে যেতে পারবে!

সুবীর জয়মলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল সুবন্ধুর, আর সোনা চুরি সম্পর্কে তদন্তের যাবতীয় সুযোগ দেবার জন্যও অনুরোধ জানাল সেই সঙ্গে।

সুবন্ধু জয়মলকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমেই গেল রাজবাড়ীর কোষাগারে। খুঁটিয়ে দেখতে লাগল চার ধার। একসঙ্গে এত সোনা দেখে সেও প্রথমটা থম্‌কে গিয়েছিল। তারপর সামলে নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে খানিকটা সোনা নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। দেখতে দেখতে তার কপালে গভীর চিন্তার রেখা ফুটে উঠল।

"আমি একবার ভাঙ্গা জাহাজটাও দেখতে চাই—যদি দয়া করে দেখতে দেন। অবশ্য আপনিও সঙ্গে আসতে পারেন যদি ইচ্ছে হয়।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। রহস্যের কিনারা করতে পারলে আমিও কম নিশ্চিন্ত হব না।"—বললে জয়মল।

লঞ্চে ক'রে সুবন্ধু হাজির হ'ল জাহাজে। তার হাতে কি সব যন্ত্রপাতি। জয়মল আর সুবীরও গেল সঙ্গে। যে কামরাটায় সোনা পাওয়া গেছে তার আশেপাশের দেয়াল খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সুবন্ধু, লেন্স দিয়ে। ডুবো-পাহাড়ের খানিকটা অংশ এই কামরার ভিতর ঢুকে গেছে, এইবার সেই দিকে নজর পড়ল তার। গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে সেই পাহাড়টাও পরীক্ষা করতে লাগল। ভাবখানা যেন, সমস্ত রহস্যের কিনারা ওরই মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। তারপর হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে হাতুড়ী দিয়ে পাহাড়ের এক কোণ থেকে খানিকটা পাথর ভেঙ্গে নিয়ে সন্তর্পণে ব্যাগে পুরে বলল, "চলুন, এবারে ফেরা যাক। ভাল কথা, এখানকার সায়ান্স কলেজটা একবার দেখবার ইচ্ছা আছে; ফেরবার পথে, চলুন না হয়ে যাই।"

সায়ান্স কলেজের অধ্যক্ষ হাচিন্‌সন্‌ সাহেব। সুবন্ধুর নাম শুনে খুবই আদরযত্ন করলেন তাকে। দেখা গেল, ওর নাম তাঁর খুবই পরিচিত এবং ওর কতকগুলো গবেষণামূলক প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁর খুব উঁচু ধারণা।

● সোনার হরিণ
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

সুবন্ধু বল্‌ল, "আপনার ল্যাবরেটরীতে ব'সে দু-একদিন একটু এটা-ওটা পরীক্ষা করতে চাই। অনুমতি পেলে ভারী খুসী হব।"

"সে কি কথা! আপনি এখানে কাজ করবেন—সে তো আমাদের সৌভাগ্য!—" হাসতে হাসতে বললেন হাচিন্‌সন্ সাহেব।

চোর আমার এই স্যুটকেসের মধ্যে।

পরদিন সকালে উঠেই সুবন্ধু চলে গেল হাচিনসন্ সাহেবের কলেজে। সারাদিন বসে সেখানে কাজ করল। নাইতেও এল না, খেতেও এল না একবার। সুবীর বার বার খবর নিতে গিয়ে শেষে বিরক্ত হয়ে ফিরে এল।

মহারাজা বাহাদুর শ্রীশ্রীমহাতপ সিং খাসকামরায় বসে আছেন। সুবীর আর জয়মলও এসেছে। রাজাবাহাদুর বিদ্রূপের স্বরে বললেন, "কি প্রফেসর সাহেব, হারানো সোনার খোঁজ পাওয়া গেল? আপনার বন্ধুটি কি বলেন?"

তাঁর কথা শেষ হ'তে না হ'তে একজন চাকর এসে সেলাম ক'রে বল্‌লে, "হুজুর সায়াান্স কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেব আর কলকাতার সেই বাবুটি এসেছেন, দেখা করতে চান।"

বুড়ো হাচিন্‌সন্ সাহেব! তিনি এসেছেন! নিজে! সকলেই অবাক্। ইঙ্গিতে তাঁদের নিয়ে আসতে বললেন রাজাবাহাদুর।

সুবন্ধুর হাতে একটা স্যুট্‌কেস্, মুখভরা হাসি। ঢুকেই বল্‌ল, "আপনাদের সোনা-চোরের খোঁজ পেয়েছি। শুধু খোঁজ নয়, তাকে গ্রেফ্‌তার করেও নিয়ে এসেছি।" বলে হাচিন্‌সন্ সাহেবের দিকে তাকাল সে।

হাচিন্‌সন্ সাহেব! তিনিও কি তাহ'লে এর সঙ্গে জড়িত?

কিন্তু না, সুবন্ধুই ভুল শুধরে দিল। বল্‌ল, "না না, ধ্যেৎ, উনি কেন! চোর আমার এই স্যুট্‌কেসের

● সোনার হরিণ
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

মধ্যে। তার জন্য আলাদা একটা চেম্বার তৈরী করতে হয়েছে যে!" বলতে বলতে স্যুট্‌কেসের ডালা খুলে ফেল্‌ল সে। ভিতরে একটা পুরু সীসের বাক্স, তার মধ্যে এক টুক্‌রো পাথর ভরা। এই পাথরটাই সুবন্ধু আগের দিন ভাঙ্গা জাহাজের পাশ থেকে ডুবো-পাহাড় ভেঙ্গে নিয়ে এসেছিল।

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। সুবন্ধু বল্‌ল, "এই আপনাদের চোর। কি ভাবে এই চোরকে ধরলাম তা আপনারা সবাই বুঝবেন কিনা জানি না। কিন্তু ইনি,—ডক্টর হাচিন্‌সন্‌,—ইনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। তবু সকলের সামনেই বলি।

"আপনারা হয়তো জানেন, কতকগুলো ধাতু আছে, তাদের পরিমাণ পৃথিবীতে খুবই কম,—যেগুলিকে আমরা, বিজ্ঞানীরা, বলি—'রেডিও-য়্যাক্‌টিভ্‌ এলিমেণ্ট'। আমাদের দেশীয় ভাষায় এদেরকে বলা যায় 'তেজষ্ক্রিয় ধাতু'। রেডিয়াম্‌, ইউরেনিয়াম্‌—এরা হচ্ছে এই জাতীয় ধাতু। তেজষ্ক্রিয় বলা হয় এই জন্য যে, এদের গা থেকে সর্ব্বদাই কয়েক রকমের তেজ বা বিদ্যুৎকণা ছুটে বেরুচ্ছে—যার ফলে এদের খানিকটা ক'রে অংশ সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হয়ে নতুন মৌলিক পদার্থে পরিণত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, যাদের ওপর ঐ কণা পড়ছে সময় সময় তাদেরও ওরা ঐ রকম তেজষ্ক্রিয় ধাতুতে রূপান্তরিত করে দিচ্ছে।

"এখন, আপনারা শুনলে বিশ্বাস করতে চাইবেন না, আপনাদের ভাঙ্গা জাহাজ থেকে উদ্ধার করা সোনার ক্ষেত্রেও, যে ভাবেই হোক, এই রকম কাণ্ড ঘটেছে। ও সোনা সাধারণ সোনা নয়—ও এখন তেজষ্ক্রিয় সোনায় পরিণত হয়েছে। ওর ভেতর থেকেও বেরিয়ে আসছে কয়েক রকম বিদ্যুৎকণা, আর সঙ্গে সঙ্গে ওর খানিকটা ক'রে অংশ বদলে অন্য মৌলিক পদার্থে পরিণত হচ্ছে। তার কতক গ্যাস, কতক অন্য জিনিষ। এই কারণেই সোনা ওজন করতে গিয়ে প্রত্যহই আপনারা কিছু কিছু কম পাচ্ছেন। অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের পরিমাণ খুবই কম। অল্প সোনা হ'লে হয়তো টেরই পাওয়া যেত না—কিন্তু একসঙ্গে হাজার মণ সোনা থাকায় সে পরিবর্ত্তন, সামান্য হ'লেও, উল্লেখযোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"কি করে এই সত্য আবিষ্কার করলাম? কোষাগারের সোনার গায়ে বিশেষ একরকম দাগ দেখে প্রথমটা আমার সন্দেহ হয়। তারপর ভাঙ্গা জাহাজের পাশে ডুবো-পাহাড় দেখে সে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হ'ল। তাই আমি ঐ পাথর খানিকটা ভেঙ্গে নিয়ে ডক্টর হাচিন্‌সনের কলেজে চলে যাই, এবং সেখানকার ল্যাবরেটরীতে বসে পরীক্ষা করি। আমার ধারণা যে ঠিক এই পরীক্ষার পরই তা ধরা পড়ে।

"এখানকার পাহাড়ে নানা রকম খনিজ সম্পদ্‌ লুকোনো আছে এ কথা সবাই জানে। কিন্তু সে খনিজ পদার্থগুলির মধ্যে যে দুষ্প্রাপ্য তেজষ্ক্রিয় ধাতুর 'আকর'ও—ইংরেজীতে যাকে বলে 'ওর্‌' কিছু কিছু আছে তা বোধ হয় কেউ জানে না। 'পিচ্‌ব্লেণ্ড' বা ঐ জাতীয় আকরের কথাই বলছি। এখানে যে পাথরের টুকরো দেখছেন—তাও ঐ জাতীয় জিনিষ—সোজা কথায় তেজষ্ক্রিয় ধাতু-মেশান পাথর বলতে পারেন। ভাঙ্গা জাহাজের পাশে ডুবো-পাহাড়ে এই রকম বেশ খানিকটা আছে ব'লে আমার মনে হয়। তার কারণ, ওর মধ্যে প্রচুর সীসে পেয়েছি আমি। আপনারা বোধ হয় জানেন না—রেডিয়াম্‌

প্রভৃতি ধাতু তেজ বিকীরণ করতে করতে দীর্ঘকাল পরে সীসেতে পরিণত হয়। কাজেই ওখানে অত সীসের আবির্ভাব দেখে, তেজস্ক্রিয় ধাতুর অস্তিত্বের কথা মনে আসা স্বাভাবিক। আসল ব্যাপারটা, আমার মনে হয়, ঘটেছে এই রকম ভাবে। ঝড়ের সময় ডুবো-পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে জাহাজ ডুবে যায়। তারপর ঐ জাহাজ-ভর্তি সোনা দীর্ঘকাল ধরে ডুবো-পাহাড়ের গায়ে লেগে থাকে। ডুবো-পাহাড়ের গায়ে পাথরের মধ্যে যে সব তেজস্ক্রিয় ধাতু ছিল তারা তেজ বিকীরণ করতে থাকে সোনার ওপর। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। এই ভাবে ১৮০০ বছর ধরে চলতে থাকে প্রকৃতির এই রাসায়নিক লীলা। তার ফলে ঐ সোনাগুলোও তেজস্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং ওগুলিও উল্টে তেজ বিকীরণ করতে থাকে। অবশ্য খাঁটী তেজস্ক্রিয় ধাতুর মত অত বেশী পরিমাণে নয়। যাই হোক্, এই কারণেই সোনা ক্ষয় হয়ে অন্য কম দামী পদার্থে পরিণত হ'তে থাকে, কতক গ্যাস হয়ে যায় বেরিয়ে। কতদিন ধরে এই ব্যাপার চলছে কেউ জানে না। তবে এ থেকে আন্দাজ করা যায় যে প্রথমে যে পরিমাণ সোনা নিয়ে জাহাজ ডুবেছিল, এখন সোনা তার চেয়ে কম রয়েছে। কি ক'রে এই প্রক্রিয়া বন্ধ করা যায় কিংবা বন্ধ করা সত্যি সম্ভব কিনা তা আমার জানা নেই, তবে এটা জোর করে বলতে পারি যে এই প্রক্রিয়া বন্ধ করতে না পারলে ভাবী যুগে একদিন না একদিন এই সোনার সমস্তটুকুই ক্ষয় হয়ে অন্য পদার্থে পরিণত হয়ে যাবে,—ঠিক যেমন এই পাহাড়ের কতকগুলো ধাতু সম্পূর্ণরূপে সীসেয় পরিণত হয়ে গেছে। রামায়ণের সেই মায়ামৃগ—সেই সোনার হরিণের গল্প মনে পড়ছে কি? কেমন হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল? এও যেন ঠিক তাই। তবে তফাৎ এই, সেটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল এক মুহূর্ত্তে, আর এটা অদৃশ্য হতে লাগবে বহু—বহু বছর। তবে একদিন অদৃশ্য হবেই। 'কলিযুগের সোনার হরিণ' নাম দেওয়া যেতে পারে স্বচ্ছন্দে—এই সোনার!"

সুবন্ধুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সোনা গেছে তাতে তার দুঃখ নেই মোটেই। এত বড় আবিষ্কারের আনন্দেই সে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছে।

ঘরের সবাই বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে রইল। কেবল হাচিন্‌সন্ সাহেব মুগ্ধদৃষ্টিতে সুবন্ধুর দিকে তাকিয়ে থেকে ঘন ঘন সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তে লাগলেন।

---

## মণি ও মুক্তা

শর্বরীদীপকশ্চন্দ্রঃ প্রভাতে দীপকো রবি
ত্রৈলোক্যদীপকো ধর্ম্মঃ সৎপুত্রঃ কুলদীপক।

—ন্যায়দীপিকা

রাত্রির প্রদীপ হলো চাঁদ, প্রভাতের প্রদীপ হলো সূর্য্য, ধর্ম্ম ত্রিভুবনের প্রদীপ, সৎপুত্র বংশের প্রদীপ।

# "খোদা জামিন!"

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

১২৬৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠমাস। এখন যেটাকে উত্তরপ্রদেশ বলা হয়—সেই সমস্ত ভূখণ্ডটা জুড়ে সূর্যদেব প্রলয়ঙ্কর অগ্নিবর্ষণ শুরু করেছেন—যেন আগুনের তাণ্ডব চলেছে চারিদিকে।

ফতেপুরের পুলিশ সাহেব হিকমৎ উল্লা খাঁ কিছুতেই ঘরে টিক্‌তে পারলেন না তবু। তখনও বেলা চারটে বাজেনি, পথেঘাটে বেরোনো দায়, যাদের একান্ত না-বেরোলে নয়, তারাই কেবল বেরিয়েছে, নইলে বাকী সবাই—বন্ধদোর-জানালা এবং খসখসের পরদা—এর ভেতর করেছে আত্মগোপন।

কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই, মানুষও যে আজ চুপ ক'রে বসে নেই। সেও শুরু করেছে আগুন নিয়ে খেলা। সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছে, সে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে ব্যারাকপুর থেকে মীরাট পর্যন্ত—সেই আগুনেরই স্ফুলিঙ্গ এসে পৌঁচেছে এই ফতেপুরেও। এখানেও জ্বলেছে দাবানল। কিন্তু আগুন যদি শুধু বাইরেটা পুড়িয়েই থামত!

সে আগুন জ্বলেছে আজ প্রবল প্রতাপান্বিত হিকমৎ উল্লা খাঁ সাহেবের বুকেও।

তাই তিনি সূর্যের দাবদাহ উপেক্ষা ক'রে—ছট্‌ফট্‌ করতে করতে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

বাগানের প্রান্তে বড় নিমগাছটার ছায়ায় মাটির ওপরই ধপাস ক'রে বসে পড়লেন। হাতে ছিল একখানা ভিজে গামছা—সেইটেতেই কপাল, মুখ, ঘাড় মুছে নিয়ে মাথায় চাপালেন।

না, স্বস্তি নেই কিছুতেই। ঘরে বাইরে, কোথাও না।

অথচ কয়েকদিন আগেও ত এমন ছিল না। টাকার সাহেবকে তাঁরা যেদিন সকলে মিলে হত্যা—হ্যাঁ হত্যাই করেছিলেন—সেদিন পর্যন্তও ত না। এমন কি তার পরের দিন পর্যন্ত নয়। সেদিনও বিজয়গর্বেই গর্বিত ছিলেন তিনি, সার্থকতার আনন্দে প্রসন্ন ছিলেন।

তবে আজ এ কী হ'ল?

টাকার সাহেব। বিচারপতি টাকার। ঐ লোকটাই যত নষ্টের মূল! বেশ করেছেন তাঁরা লোকটাকে মেরে ফেলে। এখন তার আত্মাটাকেও যদি হাতে পাওয়া সম্ভব হ'ত ত নখে টিপে মেরে ফেলতেন আবারও। তার জন্য এতটুকু অনুতাপ হ'ত না তাঁর।

বন্ধু। হ্যাঁ, টাকার সাহেব তাঁকে বন্ধুই মনে করতেন। তিনি ছিলেন বিচারপতি, হিকমৎ উল্লা খাঁ ছিলেন পুলিশের বড় সাহেব। দুজনের হৃদ্যতা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই ব'লে অত বিশ্বাস করার কোন কারণ ছিল না। টাকার একান্ত নির্বোধ ছিলেন—তাই এমনটা হ'তে পারল। তার জন্য হিকমৎ উল্লা খাঁ নিশ্চয়ই দায়ী নন!

খবর ত টাকার সাহেবও পেয়েছিলেন।

দিল্লী, মীরাট, আম্বালা, চারিদিকেই গোলমাল হচ্ছে, একথা টাকারের কানে গিয়েছিল নিশ্চয়ই। নইলে তিনি তাঁর স্ত্রী পুত্র, আত্মীয়স্বজন, ফতেপুরের অন্যান্য সাহেব মেমদের এলাহাবাদ দুর্গে পাঠাবেন কেন? আর সংশয় যখন মনে দেখা দিয়েছিল নিজে কী ভরসায় রইলেন ফতেপুরে? ঈশ্বরের ভরসায়! ছোঃ! ক্রেস্তানদের আবার ঈশ্বর! কী করলে সে ঈশ্বর? বাঁচাতে পারলে হিকমৎ উল্লা খাঁর দলবলের হাত থেকে?

বিচারপতি রবার্ট টাকারকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তুলনা করলে অবশ্য ভুল করাই হবে। শুধু ধর্মভীরু নন—একেবারে ধর্মপাগল ছিলেন তিনি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস করতে না শিখলে ভারতবাসীদের মুক্তি নেই, ওদের ভালর জন্যেই যীশুর বাণী প্রচার করা দরকার। বেচারীরা জানেনা কী অমৃত থেকে বঞ্চিত রয়েছে তারা।

তাই তিনি অবসর পেলেই, বা কাছারী থেকে ফিরে প্রত্যহই দেশীয় লোকজনদের ডেকে বাইবেল পড়ে শোনাতেন, ব্যাখ্যা করতেন যীশুর বাণী। তিনি ভাবতেন এদের উপকারই করছেন, এরা কৃতজ্ঞ থাকবে। আসলে ফল হ'ত উল্‌টো—হিন্দু-মুসলমান সকলেই—সামনে ভয়ে কিছু বল্‌তে পারত না, কিন্তু মনে মনে বিদ্বেষ পোষণ করত। ধর্ম কেড়ে নেবার ফন্দী বদমাইস লোকটার!

● খোদা জামিন!
গজেন্দ্রকুমার মিত্র

এদের দলে হিকমৎ উল্লাও ছিলেন।

অথচ তাঁকেই টাকার বিশ্বাস করতেন সবচেয়ে বেশী। যখন প্রথম গোলমেলে খবর এসে পৌঁছতে শুরু হ'ল তখনই তিনি হিকমৎ উল্লা খাঁকে ডেকে পাঠালেন, 'হিকমৎ এ কী শুনছি সব! এখানেও কি এসব হাঙ্গামা হবে না কি?'

'পাগল হয়েছেন! এখানে করবে কে? এখানে কি সিপাহী আছে?'

'তা নেই। কিন্তু পুলিশ, স্থানীয় লোকজন?'

'তার জন্যে আমি ত আছি।' আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন হিকমৎ উল্লা!

'তোমার ওপর ভরসা রাখতে পারি ত?'

'খোদা জামিন!'

হাত বাড়িয়ে ওর হাতখানা ধরে অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করেছিলেন টাকার—'ব্যস্! আমি নিশ্চিন্ত রইলুম!'

'খোদা জামিন।'

কিন্তু সবাই ঠিক টাকারের মত অত সরল এবং ঈশ্বরবিশ্বাসী নয়। তারা হিকমৎ উল্লা খাঁর শপথের ওপর ভরসা ক'রেও বসে থাকতে পারলে না। ভয়ে ভয়ে এসে টাকারকে জানাল যে—হাওয়া ভাল নয়, তারা আর এখানে থাকতে ভরসা পাচ্ছে না।

'বেশ ত, যারা যেতে চাও তারা চলে যাও। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

এলাহাবাদে পাঠিয়ে দিলেন সবাইকে। নিজের পরিবারের লোকজনও সেই সঙ্গে চলে গেলেন।

● খোদা জামিন!
গজেন্দ্রকুমার মিত্র

তাঁরা সবাই ওঁকেও নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি একেবারে নিরুদ্বিগ্ন, নিশ্চিন্ত। বললেন, 'পাগল! আমার কাজ ছেড়ে কোথায় যাবো?'

'কিন্তু আপনি বাঁচলে ত কাজ! কী ভরসায় থাকবেন আপনি?'

'কেন ঈশ্বরের ভরসায়। ঈশ্বরের নামে শপথ করেছে হিকমৎ। সে যদি বা বেইমানী করে, আমি তাঁর ওপর আস্থা হারাব কেন? তোমরা যাও, আমি ঠিক আছি!'

ঠিকই রইলেন তিনি। হিকমৎ উল্লা খাঁ রোজ আসেন, গল্প করেন, বাইবেল শোনেন। শেষে একদিন শোনা গেল সাহেবদের খালি ঘর-দোরে আগুন লাগানো হচ্ছে, লুঠপাট শুরু হয়ে গেছে। সারারাত উদ্বেগে কাটালেন টাকার, পরের দিন হিকমৎ এলে পরামর্শ করবেন। হিকমৎ কিন্তু এলেন না। তখন টাকার চিঠি লিখে পাঠালেন। এই ত অবস্থা।—সরকারী কোষাগার পাহারা দেবার কী হবে? হিকমৎ যেন এখুনি আসেন—একটা পরামর্শ করা দরকার।

এইবার হিকমতের আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়ল।

হিকমৎ বলে পাঠালেন, এখন বড় গরম, এই রোদে তিনি আসতে পারবেন না। বেলা পড়লে আসবেন—এবং স-দলবলেই। কোষাগারের জন্য ভাবনা নেই, ও ত এখন দিল্লীর বাদ্‌শা বাহাদুর শার সম্পত্তি। জজ সাহেব বুঝি এখনও জানেন না যে কোম্পানীর রাজ চলে গিয়েছে? তিনি এখন নিজের ভাবনা ভাবুন, তাঁর ঈশ্বরকে স্মরণ করুন তিনি—কারণ তাঁর দিনও ফুরিয়ে এসেছে।

চাকরটা ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছিল খবরটা দিতে দিতে। তার চোখে জল।

'সাহেব এখনও বোধহয় সময় আছে। পালান শীগ্‌গির।'

টাকার হাসলেন। ওর পিঠে হাত চাপ্‌ড়ে আশ্বস্ত করলেন। তারপর কাছে যা খুচ্‌রো নগদ টাকা ছিল সব দিয়ে, নিজের ঘড়িটি উপহার দিয়ে বললেন, 'পালাও বেটা। আমি ঠিক আছে। তুমি এবার নিজের জান বাঁচাও।'

কাছারী বাড়ীর সঙ্গেই ওঁর বাসস্থান। তিনি দোর-জানলা সব বন্ধ করলেন ভাল ক'রে। বন্দুক পিস্তল যা ছিল সবগুলিতে টোটা ভরলেন। সামান্য কিছু আহারও ক'রে নিলেন। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন বাইবেল নিয়ে।....

হিকমৎ এক-কথার মানুষ। বেলা পড়তেই তিনি দেখা দিলেন—এবং স-দলবলেই। হৈ হৈ করতে করতে এসে পড়ল প্রায় এক হাজার লোক। তাদের চোখে রক্ত এবং লুঠের নেশা।

'তোমার ভগবানকে স্মরণ করো টাকার সাহেব। শেষের কথাটা ভাবো।' হিকমৎ নিজেই এগিয়ে এসে বললেন।

'কিন্তু তুমি তোমার খোদার নামেও শপথ করেছিলে হিকমৎ উল্লা খাঁ। ঈশ্বর সকলেরই সমান!' বদ্ধ দোরের ভেতর থেকে টাকার সাহেব জবাব দিলেন।

'হ্যাঁ!' তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই হিকমৎ উল্লা খাঁ বললেন, 'কুকুর বেড়ালের কাছে শপথ, তার আবার

মূল্য কি! আংরেজ ক্রেস্তানকুত্তা ছাড়া কিছু নয়।'

'তবু ঈশ্বর ঈশ্বরই। এতটা বেইমানী ক'রো না হিকমৎ। পরকালে তোমাকেও জবাব দিতে হবে।'

'পরকালের এখনও দেরী আছে। ইহকালটা আগে ভোগ করি!'

হিকমৎ ইঙ্গিত করলেন, লোকজন এগিয়ে এসে জানলা-দরজা ভাঙ্গতে শুরু করলে। টাকার সাহেব এইবার ধরলেন হাতিয়ার। ছাদের একটা কোণ থেকে চালালেন গুলি। অব্যর্থ লক্ষ্য তাঁর! এক-দুই-আট-দশ—। একের পর এক লোক মাটি নিচ্ছে। একে একে যোলটি লোক ঘায়েল হ'ল। কিন্তু হাজার লোকের ভেতর যোলটা লোক গেলেই বা ক্ষতি কি! এধারে টাকারের টোটা এল ফুরিয়ে। দোরও ভেঙ্গে পড়ল এইবার। উন্মত্ত আক্রোশে ঢুকে সেই শত শত লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল টাকারের ওপর—টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলল তাঁকে। শেষবারের মত ঈশ্বরকে স্মরণ করলেন তিনি 'ঈশ্বর ক্ষমা করো।' বিচারপতি টাকার পরম বিচারপতির দরবারে গিয়ে হাজির হলেন এবার!

'তোমার ভগবানকে স্মরণ করো টাকার সাহেব।'[পৃঃ—১৪৪

না, হিকমৎ উল্লা খাঁ নিজের হাতে আঘাত করেননি টাকারকে—এটা ঠিক। কিন্তু করলেও অনুতপ্ত হ'তেন না। কুকুর বেড়ালকে মেরে মানুষ অনুতপ্ত হয় না। বিশেষ যদি সে পোষা কুকুর বেড়াল না হয়। ঠিকই হয়েছে, উচিত শাস্তিই হয়েছে লোকটার। ওদের সবাইকে ভুলিয়ে খ্রীশ্চান করতে এসেছিল। তার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হয়েছে। তার জন্য

একটুও দুঃখিত নন তিনি। টাকারকে হত্যা করার পর তাঁর সম্পত্তি লুঠ করতেও তিনিই হুকুম দিয়েছিলেন বটে—কিন্তু তাতেই বা কি? যাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হ'ল জনসাধারণের বিচারে—তার সম্পত্তিও জনসাধারণে বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত। তাঁর বাড়ীতেও এসেছে কিছু। তাতেও এমন কিছু অন্যায় হয়নি। তিনিও কি জনতার একজন নন্?

হু-হু ক'রে বইছে আতপ্ত হাওয়া। একেই 'লু' বলে। এ হাওয়া খালি-গায়ে লাগ্‌লে ফোস্‌কা পড়ে। এ হাওয়া মানুষের ঘাড়ের রক্ত শুষে নেয়, এ হাওয়া যমপুরীর হাওয়া।

মুখ কি পুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে হিকমৎ উল্লা খাঁর!

নেশার মত সর্বশরীর কি ভেতরে ভেতরে টল্‌ছে তাঁর? কাঁপছে তাঁর হাত-পা?

কিন্তু বুকের আগুন যে এর চেয়েও বেশী।

যে আতঙ্ক, যে অকারণ এবং অভূতপূর্ব ভয় তাঁকে ক-দিন ধরে পেয়ে বসেছে, যার বর্ণনা দেওয়া যায় না, যা উপহাসের ভয়ে বন্ধুবান্ধবদের কাছে এমন কি নিজের স্ত্রীর কাছেও বলা যায় না—তার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য তিনি এর চেয়েও ভয়ঙ্কর দাবদাহের মধ্যে জ্বলতে রাজী আছেন!

হে খোদা! যদি এই বিভীষিকা থেকে কোনমতে উদ্ধার পেতে পারতেন শুধু!

ঠিক সাত দিন আগে শুরু হয়েছে। টাকারের মৃত্যুর তিন দিন পর থেকে। দুটোর ভেতর কি কোন যোগাযোগ আছে?

এ-ক্‌দিন ধরে তিনি নিজের মনেই প্রবল প্রতিবাদ করেছেন এমন কোন ধারণার। কিন্তু আজ যেন কেমন আর জোর পাচ্ছেন না। ভেতরে ভেতরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

ছায়ার মত ফিরছে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে।

ঘরে গেলেই দু'পাশে এসে বসবে।

একটি কুকুর আর একটি বেড়াল।

কী ভয়ঙ্কর দেখতে দুটো জীবই! কী কদাকার এবং বীভৎস! কী হিংস্র তাদের চোখের চাহনি! তারা ডাকেনা, সাড়া দেয়না, তাড়া করেনা, শুধু দু-পাশে বসে শান্ত স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে থাকে।

প্রতিকার। হ্যাঁ—প্রতিকারের চেষ্টা করেছেন বৈ কি! লাঠি নিয়ে তাড়া করেছেন, তলোয়ার বর্শা বসিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন ওদের গায়ে—কিন্তু সে অস্ত্র প্রয়োগ ওঁকেই উপহাস করেছে শুধু। শূন্যে অস্ত্র আস্ফালনের মতই ফল হয়েছে। লাঠি ঘুরে এসেছে—ওদের গায়ে লাগেনি। সজোরে তলোয়ার চালাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন নিজেই। ওদের গায়ে লাগেনি কিছু, ওরাও নড়েনি একচুল।

সবচেয়ে মজা—আর কেউ যে দেখতে পায়না।

প্রথম দিনই স্ত্রীকে ডেকে বলেছেন, 'এ কুকুর-বেড়াল দুটো কোথা থেকে এল? দ্যাখো ত—কী বিশ্রী!'

তিনি অবাক হয়ে বলেছেন, 'কুকুর বেড়াল আবার কোথা থেকে পেলে? খোয়াব* দেখছ নাকি?'

'কী আশ্চর্য—দেখতে পাচ্ছ না? এই যে—'

আরও অবাক্ হয়ে বিবিজী উত্তর দিয়েছেন, 'কী হ'ল কি তোমার? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

---

* স্বপ্ন।

● খোদা জামিন!
গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সত্যিসত্যিই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন তিনি। সুতরাং চুপ ক'রে যেতে হয়েছে!

এ ভয়টা হিকমতেরও হয়েছে বৈ কি!

সত্যিই কি মাথা খারাপ হয়ে গেল তাঁর?

কিন্তু কৈ? আর ত কোথাও কোন গোলমাল নেই। ক-দিন ধরে শহর লুঠ হয়েছে, তার হিসাবপত্র ঠিক ঠিক বুঝে নিয়েছেন তিনি। ট্রেজারী বা কোষাগারের টাকা নিজের বাড়ীতে এনে তুলেছেন তাতেও কোন ভুলচুক হয়নি। নীলসাহেব কাশীকে সায়েস্তা ক'রে এলাহাবাদের কাছাকাছি এসে পড়েছেন খবর পেয়ে কানপুরে আজিমুল্লা খাঁর কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখেছেন তিনি—সব কাজই ত চলেছে ঠিক ঠিক। সবাই তাঁর বুদ্ধির তারিফ করছে, সকলে মেনে নিয়েছে তাঁকে নেতা ব'লে।

তবে?

এ কী দুর্বলতা তাঁর?

মজা এই—দিনের বেলা শুধু ঘরের ভেতর গেলেই ওদের দেখতে পাওয়া যায়। কাজের টেবিলে, শোবার ঘরে—সর্বত্র। বাইরে ওরা আসে না—দিনের বেলায় অন্তত। কিন্তু রাত্রে বাইরে শুলেও নিস্তার নেই, ঠিক দুটি দু'পাশে এসে বসবে। ক-রাত ঘুম নেই তাঁর। চোখের পাতা বুজোতেও ভয় করে—যদি এসে বুকে চেপে বসে? গত তিন-চার দিন শোবার চেষ্টাও ছেড়ে দিয়েছেন। কাজের ছুতো ক'রে পথে পথে ঘুরে বেড়ান। চোখের কোলে কেন এমন গভীর কালির দাগ, চোখ দুটো কেন এমন রক্তবর্ণ—সে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না ঐটুকু তবু সুবিধা হয়!......

তন্দ্রায় অবশ হয়ে আসছে শরীর। আঃ!

গরম হাওয়া—? তা হোক। হিকমৎ এখানে শুয়েই ঘুমোবেন!

কিন্তু ঘুম হ'ল না।

অকস্মাৎ তন্দ্রার মধ্যেই বজ্র গর্জনের মত কানে দুটি সামান্য শব্দ এসে পৌঁছল। 'মিঁউ', আর 'ঘেউ'!

চমকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঐ ত—আজ ত এই দিবালোকেই, জ্যৈষ্ঠের এই তীব্র রোদের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে—ঐ ত! দুটিতে শান্ত ভাবে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে।

কী সাংঘাতিক দৃষ্টি ওদের! কী অবিশ্বাস্য ঘৃণা ওদের চোখেমুখে!

অয় খোদা! এ কী করলে! তিনি ত কোন অপরাধ করেননি—একটা কাফেরকে মেরেছেন মাত্র। পাপের শাস্তিই দিয়েছেন বলতে গেলে। তবে? ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে শপথ ভেঙ্গেছেন? কিন্তু কুকুর বেড়ালের কাছে—।

আবারও চমকে উঠলেন তিনি।

হ্যাঁ—কথাটা তিনিই বলেছিলেন বটে—! টাকার সাহেবও জবাব দিয়েছিল, ঈশ্বর ঈশ্বরই!...

হিকমৎ উল্লা পাগলের মত ছুটে গেলেন কুয়াতলায়। বালতিটা নামিয়ে জল তুললেন এক বালতি। হড় হড় ক'রে মাথায় ঢাললেন সবটা। অসহ্য রোদে বাড়ীসুদ্ধ সবাই দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে ঘুমোচ্ছে, কেউ টেরও পেলে না!

আঃ! মাথাটা কি ঠাণ্ডা হ'ল?

● খোদা জামিন।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

চোখমুখ মুছে ফেললেন গামছায়। তাকালেন ভাল ক'রে। সে দুটো আছে কি? নেই। আপদ্ গেছে। অতিরিক্ত গরমেই বোধ হয়—আর মনের মধ্যে কথাটা দিনরাত তোলাপাড়া ক'রেই—

হিকমৎ সুস্থ বোধ করলেন খানিকটা। আবার নিম গাছটার দিকে চললেন। ঐ ছায়াতে বসে একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে, নইলে শরীর আর টিকবে না। সত্যিই পাগল হয়ে যাবেন তিনি।

কিন্তু—। দু'চার পা এগিয়েই পিছনে একটা অশরীরীর উপস্থিতি যেন অনুভব করলেন তিনি। কে যেন, কারা যেন চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। পিছন ফিরে তাকালেন। তারাই ত—অমোঘ নিয়তির মত নিঃশব্দে সঙ্গে সঙ্গে আসছে।...

পাগলের মত চিৎকার ক'রে উঠলেন হিকমৎ উল্লা খাঁ।...

ছুটে বেরিয়ে পড়লেন নিজের বাগান থেকে। রাস্তায় পড়েও থামতে পারলেন না। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললেন। পিছন ফিরে দেখবারও সাহস হ'ল না তাঁর...তারা আসছে কি না আসছে।...

রোদ পড়ে আসছে তখন। বাইরের বহ্নিতাণ্ডব যেন এবার পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। দু' একজন ঘরের বাইরে বেরোতে শুরু করেছে। দোকানীরা এক-আধজন ঝাঁপ খুলেছে দোকানের। তারা অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল। কী হল কি কোতোয়াল সাহেবের? বাড়ীতে কারুর অসুখবিসুখ হ'ল না কি? কিন্তু বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে প্রশ্ন করতে করতে কোতোয়াল সাহেব দূরে গিয়ে পড়ছেন—কোন প্রশ্নই তাঁর কানে যাচ্ছে না। কারণ তিনি ছুটছেন, ছুটছেন,—যেন পিছনে কোন আততায়ী তাঁকে তাড়া করেছে, প্রাণভয়ে তিনি ছুট্‌ছেন।...

অবশেষে একসময় তাঁকে থামতে হ'ল। কলিজার দম ফুরিয়ে এসেছে, বুকে হাপরের পাড় পড়ছে। আর নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না। ভারী শরীর—এতখানি ছুটে আসাই ত তাঁর উচিত হয়নি!

কিন্তু এ কি—?

এ কোথায় এসে পড়েছেন তিনি? এ যে কাছারী বাড়ীতে এসে থেমেছেন একেবারে!

দোর জানলা ভাঙ্গা—চারিদিক্ খোলা হা-হা করছে। আসবাব-পত্র সব লুঠ হয়ে গেছে। কতকগুলো কাঠ্‌রা বাইরে এনে আগুন লাগানোও হয়েছিল, তার ছাই পড়ে আছে এখনও। শ্মশানের মত মনে হচ্ছে বাড়ীটা।

আশ্চর্য! এবার আর পিছনে নয়। ওঁর নির্মম সহচর দুটি এবার চলেছে তাঁর আগে আগেই। যেন পথ দেখিয়ে চলেছে তাঁকে। ঐ ত ফিরে ফিরে ইঙ্গিত করছে—

অভিভূতের মত, মন্ত্রমুগ্ধের মত আচ্ছন্নভাবে এগিয়ে চললেন—পুলিশ সাহেব হিকমৎ উল্লা খাঁ। ভেতরের দুটো বড় বড় ঘর পেরিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন নিঃশব্দে।

উঁঃ! কী একটা দুর্গন্ধ! ও—ঐ যে সিঁড়ির কোণটাতে এখনও ক-খানা হাড় পড়ে আছে। শিয়াল-কুকুরে ছেঁড়াছেঁড়ি করেছে কতদিন ধরে কে জানে, মাংস প্রায় সবই গেছে, কঙ্কালের গায়ে লেগে আছে দু'এক টুক্‌রো পচা মাংস। তারই এত গন্ধ।

তবে কি এই টাকার সাহেবের দেহ? কে জানে। আজ আর চেনবার ত কোন উপায় নেই!

সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে হিকমৎ উল্লা খাঁর মনে হ'ল কঙ্কাল কথা বলছে। এ ওঁর কল্পনামাত্র—মাথা-গরমের কল্পনা—বার বার বোঝাতে লাগলেন মনকে, তবুও যেন কান পেতে রইলেন।

কী বলছে কবন্ধটা?

'খোদা জামিন!'

● খোদা জামিন!
গজেন্দ্রকুমার মিত্র

কিন্তু কার কণ্ঠস্বর এ? এ ত হিকমৎ উল্লারই গলা। এইখানে এই বাড়ীতে দাঁড়িয়েই যেন কথাগুলো বলেছিলেন তিনি। হ্যাঁ—এই মাত্র ক-দিন আগে।

চিৎকার ক'রে উঠলেন হিকমৎ। প্রাণপণ আর্তনাদের মত।

খালি বাড়ীতে কেমন একটা ভয়াবহ ধ্বনির তরঙ্গ তুলে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল শব্দটা। পাগলের মত চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন কোতোয়াল সাহেব।

একখানা তলোয়ার পড়ে আছে পাশেই। হয়ত এইটে দিয়েই ওরা মেরেছিল টাকারকে। টাকায়ের বন্দুক নিয়ে চলে গেছে লুটেরার দল—তলোয়ারখানা ফেলে গেছে। রক্তমাখা তলোয়ার।

ও কি! কুকুর বেড়াল দুটো এখনও যায়নি। ইঙ্গিত করছে তলোয়ারটার দিকেই! ছুটে গিয়ে তুলে নিলেন তলোয়ারখানা, পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন ঐ দুটো শয়তানের ওপর। কিন্তু আজও ব্যর্থ হ'ল সে আস্ফালন, শূন্যে আঘাত করার মত নিজেই মুখ থুব্‌ড়ে পড়লেন। মনে হ'ল—আজ এই প্রথম—কুকুর বেড়াল দুটো হেসে উঠল, তাঁকে বিদ্রূপ ক'রেই।

আর সহ্য করতে পারলেন না কোতোয়াল সাহেব—

তলোয়ার ঘুরিয়ে নিজের বুকেই বসিয়ে দিলেন।

সেই তলোয়ার ঘুরিয়ে নিজের বুকেই বসিয়ে দিলেন—আমূল!

'অয়্ খোদা! মাফ্ করো এবার। দয়া করো!' অস্ফুটকণ্ঠে এই কথা ক'টা বলতে বলতে লুটিয়ে পড়ল হিকমৎ উল্লা খাঁর দেহ।

'খোদা জামিন!' আবারও এটা শব্দ উঠল যেন কঙ্কালটার মুখগহ্বর থেকে। সেই সামান্য শব্দও বহুক্ষণ ধরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল খালি কাছারী বাড়ীটার শূন্য ঘরে ঘরে।

# মাথা গরমের ওষুধ

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

সেকালে অধিকাংশ মুনি-ঋষি ছিলেন বেশ শান্তশিষ্ট নিরীহ-গোছের মানুষ কিন্তু তার মধ্যে মাঝে মাঝে এক-আধজন মুনি থাকতেন যাঁদের মেজাজ ছিল ঠিক এর বিপরীত। সর্বদা তপস্যার তেজে উনুনের গন্‌গনে আগুনের মত তাঁদের অন্তর জ্বলছেই। একটু চট্‌লেই বিপদ্! চক্ষু রক্তবর্ণ করে পট্ করে হয়তো এমন একটা অভিশাপ দিয়ে বসলেন যে তার ঠেলা সামলাতে প্রাণ যায় আর কি!

সিংহাসনে বহাল তবিয়তে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে, গোঁফে তা দিতে দিতে, এক রাজা হয়তো পাত্রমিত্রদের সঙ্গে গল্প-গুজব করছেন, এমন সময় ঝট্ করে এক মুনিবর বিনা সংবাদেই সেখানে ঢুকে পড়ে এমন এক বেমক্কা ধরনের আবাদার করে বসলেন যে তক্ষুণি তা মেটানো শক্ত। রাজা তাঁর কথা শুনে আম্‌তা আম্‌তা করে মাথা চুলকেছেন—আর যায় কোথা?

কী!—আমি এত বড় মুনি, তুই বেটা সিংহাসনে বসে আমার বায়নাক্কা মেটাতে পারলি না?—তাহলে তুই সিংহাসনসুদ্ধু মাটিতে ডিগ্‌বাজি খেতে খেতে কচ্ছপ হয়ে যা!

ব্যস্‌! যেমনি এই কথা বলা অমনি অত বড় রাজা থুবড়ি খেয়ে প'ড়ে একটা খোলের মধ্যে ঢুকে চারটি গুট্‌গুটে পা বার করে, লম্বা সরু ঘাড় নিয়ে সেইখানেই মেজেতে হামাগুড়ি দিতে সুরু করলেন।

অবশ্য কান্নাকাটি করলে রেহাই পাওয়ারও বন্দোবস্ত ছিল, কিন্তু তা এত দেরীতে যে তখন কচ্ছপের ছোপ্ খসিয়ে সিংহাসনে বসে রাজার গোঁফ গজাতে গজাতে পাত্রমিত্রদের গোঁফদাড়ি ঝ'রে যেত—অনেককে পৃথিবী থেকে সরেও পড়তে হ'ত—তারপর বহুকাল বাদে রাজা আবার সিংহাসনে চেপে পা দোলাতে দোলাতে নতুন নতুন লোকজন আমদানি করতেন।

মুনি-ঋষিদের দাপট এত ছিল যে দেবতারাও তাঁদের ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকতেন। বিশেষ করে কয়েকজন ছিলেন মার্কা-মারা প্রচণ্ড রাগী—যেখানে যাবেন সেখানে গিয়েই গোলমাল সুরু করবেন। প্রথমে বাপান্ত দিয়ে আরম্ভ তারপর অভিশাপান্ত করে প্রস্থান। দোষের পরিমাণ যত অল্পই হ'ক, তাঁদের রোষের পরিমাণ ছিল দশগুণ।

মুনিসমাজে সবচেয়ে রাগী মুনি ছিলেন—দুর্বাসা। কথায় কথায় তাঁর রাগ, কথায় কথায় লোককে অভিশাপ দেওয়াটা ওঁর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। দুর্বাসা কোথাও গিয়ে বাসা বাঁধলে লোকে প্রাণের আশা ভরসা প্রায় ছেড়েই দিত—কারণ কখন যে বয়লার ফাট্‌বে তা কে জানে?
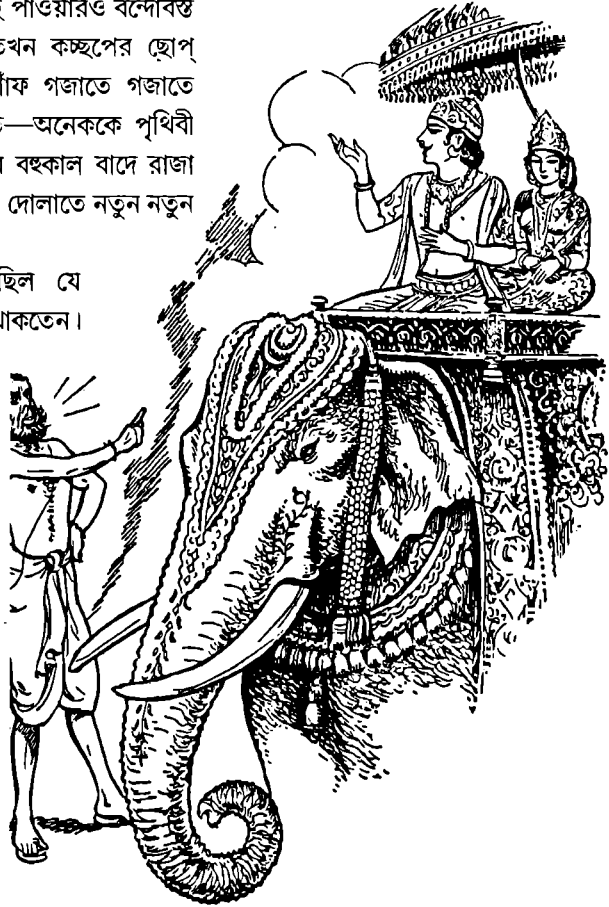
ঐরাবতের মাথায় ঝুলিয়ে দিতেই, ব্যস্—মুনি চটে কাঁই। [পৃঃ ১৫২

মানুষ তো ছার—মনে কর, দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবতে চেপে শচীদেবীর সঙ্গে গল্প করতে করতে

● মাথা গরমের ওষুধ
শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

একদিন বিকেলে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন এমন সময় দুর্বাসা এক ছড়া মালা নিয়ে সম্ভবতঃ কোন শিষ্যবাড়ী থেকে ফিরছিলেন। হঠাৎ তাঁর সঙ্গে রাজার পথে দেখা হয়ে গেল। মালাটি আদর করে ইন্দ্রের দিকে তিনি নীচু থেকে ছুঁড়ে দিলেন। ইন্দ্র হাসতে হাসতে সেটিকে লুফে নিয়ে ঐরাবতের মাথায় ঝুলিয়ে দিতেই, ব্যস্—মুনি চটে কাঁই!

কী, এত বড় স্পর্ধা! আমার দেওয়া মালা গলায় না পরে হাতীর মাথায় সেটি পরিয়ে দিলে—বড় অহঙ্কার হয়েছে তোমার—না? ঐশ্বর্যের দম্ভে তুমি আমার দেওয়া দানকে উপেক্ষা করলে? বেশ—সে ঐশ্বর্যের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী সেই শ্রীমতী লক্ষ্মী তোমার বাড়ী থেকে আজই পালাবেন ...তুমি লক্ষ্মীছাড়া হয়ে পথে পথে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরবে।

ইন্দ্রের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। বহুকষ্টে বহুদিন পরে তিনি অভিশাপ-মুক্ত হলেন।

আর একবার কণ্ব মুনির আশ্রমে গেছেন দুর্বাসা, সেখানে গিয়ে একটা হাঁক দিলেন, আমি এসেছি, বুঝলে? আশ্রমে কণ্ব মুনির পালিতা কন্যা শকুন্তলা সেই সময় দাওয়ায় বসে রাজা দুষ্মন্তের কথা তন্ময় হয়ে ভাবছিলেন। তন্ময় হয়ে ভাবারই কথা—যেহেতু দুষ্মন্ত তাঁকে গোপনে বিয়ে করেও নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্যে অনেকদিন আসেন নি, তাই রাজা কবে আসবেন, এটা ভাবনার বিষয়ই হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই কারণে দুর্বাসার কথা তাঁর কানে গেল না। দুর্বাসা এটুকু বুঝলেন না যে মানুষ কোন বিষয়ে নিবিষ্ট হয়ে ভাবতে থাকলে আশেপাশে কাউকে দেখতেও পায় না, কারুর কথা শুনতেও পায় না—তিনি চট্‌লেন!

চটা মানেই একটা অঘটন ঘটা—তাই ঘট্‌লো। দুর্বাসা শকুন্তলাকে অভিশাপ দিয়ে বসলেন, তুই যার কথা ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে গিয়ে আমাকে উপেক্ষা করলি সে তোকে ভুলে মেরে দেবে, দেখা হলেও জন্মে কখন চিনতেও পারবে না।

তারপর সেই অভিশাপের বাণী শকুন্তলার সখীরা শুনতে পেয়ে অনেক কষ্টে তাঁর হাতে পায়ে ধরে এইভাবে একটা কাটান করিয়ে নেন যে, ভবিষ্যতে যদি কোন চিহ্ন শকুন্তলা রাজাকে দেখাতে পারেন তাহলে আবার তাঁর বিয়ের কথা মনে পড়ে যাবে। রাজার অবশ্য শেষকালে সব মনেও পড়েছিল কিন্তু অভিশাপের ঠেলায় শকুন্তলাকে যে ঝামেলা পোয়াতে হয়েছিল তা কহতব্য নয়। ভদ্রমহিলার নাকালের একশেষ!

রাজা দুর্যোধন একবার পাণ্ডবদের জব্দ করবার জন্যে দুর্বাসাকে দুপুর কেটে যাবার পর তাঁদের বাড়ীতে দশ হাজার শিষ্য সমেত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ভোজ খেতে। তিনি জানতেন গেরস্থ বাড়ীতে দুপুর বেলায় আর রান্না চড়াতে হবে না—দ্রৌপদী যত বড় রাঁধুনিই হন দুর্বাসা আর দশ হাজার শিষ্যকে হঠাৎ রান্না করে খাওয়াতে গেলে হাতের বাঁধুনি আলগা হয়ে যাবে, শেষ পর্যন্ত পারবো না বলে কাঁদুনি গাইতেই হবে—তখন বুঝবেন দুর্বাসা কী রকম তাঁদের প্রতি ভালবাসা দেখান। এই মতলব করেই তিনি মুনিবরকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে দুর্বাসার পেট এমন ভরে গেল যে পাতে বসতে পারলেন না—পেট আইঢাই করতে লাগল।

● মাথা গরমের ওষুধ
শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

কিন্তু এ হেন দুর্বাসা মুনিকেও মাঝে মাঝে জব্দ হতে হয়েছে কয়েকজনের কাছে। অনেকদিন আগে এক দেশে দুই ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন—তাঁরা দুই ভাই, একজনের নাম হংস আর একজনের নাম ডিম্বক। এঁরা দুজনে কঠোর তপস্যা করে মহাদেবের কাছ থেকে এমন বর আদায় করেছিলেন যে, জগতে তাঁদের কোন রাজা বা মুনি-ঋষি যেন বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে না পারে। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে বলে ফেলেছিলেন, বেশ তোমরা যা চাইচ তাই হবে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ছাড়া কেউ তোমাদের চুলের ডগাটিও ছুঁতে পারবে না।

হংস ও ডিম্বক—মহাখুশী হয়ে রাজত্ব করতে সুরু করলেন। তাঁদের অত্যাচারে পৃথিবীর রাজারা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে সুরু করলে...ভয়ে কেউ কাছে এগোয় না। এঁরা দুই ভায়ে একদিন নদীর ধারে বেড়াচ্ছেন এমন সময় দুর্বাসা মুনির সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়ে গেল। দুর্বাসা হংস-ডিম্বকের প্রতাপ জানতেন তাই নিজের মান বাঁচাতে একটু পাশ কাটিয়ে চলে যাবার মতলবেই ছিলেন কিন্তু তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল না। হঠাৎ হংস তাঁকে ডেকে বলে বসলেন, ওহে মুনি, তোমার তো অনেক শিষ্য-সামন্ত আছে শুনি, তা কেউ একখানা ভাল কাপড়চোপড়ও তোমায় দেয় না। তা আমাদের কাছে চাইলেই তো হয়। ভবিষ্যতে ও-রকম কাপড়-চোপড় পরে ভদ্রসমাজে আর বেরিও না।

হংস এসে দিলেন তাঁর কাপড় ধরে এক টান। [পৃঃ ১৫৪

বাস্তবিক তাঁর দুর্বাসা নাম হয়েছিল খারাপ কাপড় পরে থাকার জন্যেই—দুর্‌বাসা, মানে নিকৃষ্ট

● মাথা গরমের ওষুধ
শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

বাস যার সে দুর্বাসা। তাই হংস সেই কথাটা বলে তাঁকে খোঁচা দিতেই মুনিবর অভ্যেসের বশে রুখে দাঁড়ালেন।

ডিম্বক হংসকে বললেন, ওর কাপড়টা টেনে খুলে দে! দুর্বাসা রাগে কি বলবেন ভেবে পেলেন না—ইতিমধ্যে হংস এসে দিলেন তাঁর কাপড় ধরে এক টান। কসি টেনে বাঁধা ছিল বলে সবটা খুলে গেল না কিন্তু টানা হেঁচড়ায় কাপড় ছিঁড়ে গেল—দুর্বাসা বুঝেছিলেন বড় কঠিন পাল্লায় পড়েছেন। কোন রকমে মুক্তকচ্ছ হয়ে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে একেবারে নারায়ণের কাছে হাজির।

নারায়ণ তাঁর লাঞ্ছনার কথা শুনে অবশ্য পরে হংসকে ধ্বংস করেছিলেন কিন্তু দুর্বাসার এই অপমানের স্মৃতি লোকের মন থেকে মুছে দিতে পারেন নি। এতে তাঁর নারায়ণের প্রতি খুব ভক্তি বাড়ে নি কিন্তু তারপর এমন কাণ্ড হল যে এক সময় দিনরাত নারায়ণকে স্মরণ করতে করতে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়া ছাড়া দুর্বাসার গত্যন্তর রইল না।

ব্যাপারটা কি হয়েছিল শোন। বিষ্ণুর এক মহাভক্ত ছিলেন রাজা অম্বরীষ। রাজা সর্বদা দান ধ্যান করে দিন কাটাতেন ও বিষ্ণুর অর্চনা করতেন। প্রজারা তাঁর রাজ্যে খুব সুখে বাস করতো। একবার রাজা অম্বরীষ এক বছর ধরে নারায়ণের তৃপ্তির জন্য একটি ব্রত পালন করেন। ব্রতের শেষ তিন দিন নিরম্বু উপবাস ও তারপর নারায়ণ পূজা সাঙ্গ করে পারণ অর্থাৎ আহার্য গ্রহণ—এই ব্রতের নিয়ম।

উপবাস শেষ হয়ে গেছে, রাজা ব্রতের পারণ করার উদ্যোগ করছেন এমন সময় দুর্বাসা সেখানে উপস্থিত। রাজা তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে বললেন—মুনিবর আমার মহাসৌভাগ্য যে আপনি আজ আমার এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, এখন কি করতে হবে আদেশ করুন।

দুর্বাসা বললেন, করতে বিশেষ কিছু হবে না, আমি তোমার অতিথি হলুম, আজ তোমার এখানেই খাওয়া-দাওয়াটা সারবো।

রাজা অম্বরীষ হেসে বললেন—এ তো আমার পরম সৌভাগ্য, তাহলে খাবার আনতে বলি!

দুর্বাসা বললেন, না দাঁড়াও—আমি নদীতে স্নান সেরে আসি, তারপর খাওয়া-দাওয়া করবো। বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু সেই যে গেলেন আর ফেরেন না। সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেল, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এল তবু তাঁর দেখা নেই—এদিকে পারণ সাঙ্গ না করলে ব্রতই নিষ্ফল, অথচ অতিথি এখনও অভুক্ত, তাঁকে না খাইয়েই বা রাজা খান কি করে? রাজা অম্বরীষ মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন।

তাইতো কি করা যায়? রাজা ভাবছেন, এমন সময় অমাত্যরা পরামর্শ দিলেন, মহারাজ আপনি নামমাত্র একটু ফলমূল ভক্ষণ করে পারণের মর্যাদাটা রক্ষা করুন, তাতে কোন দোষ হবে না—তারপর অতিথিকে খাইয়ে খাওয়া-দাওয়া করলেই হবে।



তাই ভাল—বলে অম্বরীষ সবে দাঁত দিয়ে ফলের একটি টুক্‌রো কেটেছেন কি না কেটেছেন অমনি দাড়ি নিয়ে দরজার সামনে দুর্বাসা দেখা দিলেন।

এই যে দিব্যি ভোজন সুরু করে দিয়েছ? বাঃ বেশ, বেশ—খুব অতিথিসৎকার-পরায়ণ রাজা

- **মাথা গরমের ওষুধ**
  **শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র**

তুমি তো হে! আমার চান করে ফিরে আসা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করতেও পারলে না—ফল খেতে সুরু করেছ?—দুর্বাসা কথাগুলো বলে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে সুরু করলেন। এ কাঁপুনি আর কিছুই নয় অভিশাপ দেবার আগে একটু দম নেবার ক্রিয়া আর কি! মোটর বা এরোপ্লেন চলবার আগে যেমন খানিকটা বেগ নিয়ে নেয়, সেই রকম গোছের ব্যাপার আর কি!

অপরে তাঁর সেই মূর্তি দেখলে সেইখানেই ভির্‌মি যেত ঠিক, কিন্তু রাজা অম্বরীষ স্থিরভাবে মুনিকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন যে তিনি বিন্দুমাত্র দোষ করেন নি বা অতিথিকে কোনমতে অপমান করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না।

কিন্তু মানুষ চটলে যুক্তিকে আগে সরিয়ে দেয়, তা না হলে ঝাঁজটা ঠিক বেরুতে পারে না, তার ওপর যাঁরা সর্বদাই ঝাঁজিয়ে আছেন তাঁদের তো যুক্তি বলে কোন বালাই নেই। যে রাগ করে সে পৃথিবীতে অপর লোককে দেখাতে চায় যে সে কত বড় শক্তিমান—দুর্বাসাও তাই নিজের শক্তির খেল্ দেখাতে অম্বরীষকে অভিশাপ দিয়ে বসলেন যে আমি তোমার সর্বনাশ করবো।

রাজা হাতযোড় করে বললেন, দেখুন আপনি সময়মত ফিরলেন না, ঠায় সারাদিন বসে বসে মাত্র পারণের নিয়ম রক্ষা করতে আমি একটু ফল খেয়েছি, এতে আপনি এতটা মাথা গরম করে ফেলছেন কেন?

কি আমার মাথা গরম? আচ্ছা, তোমায় এই মাথারই খেল্ দেখাচ্ছি। বলে পট করে নিজের জটার একটা চুল ছিঁড়ে ফেলেই এক উগ্রদেবতার সৃষ্টি করে বসলেন। আগুনের ভাঁটার মত সারা দেহ তাঁর জ্বলছে, তিনি মাটিতে দাঁড়িয়েই হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, বলুন মুনিবর কাকে সাবাড় করতে হবে?

দুর্বাসা দেখিয়ে দিলেন অম্বরীষকে। রাজবাড়ীর সবার মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে। অম্বরীষ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মুনির অন্যায় আচরণ প্রত্যক্ষ করছেন।

এদিকে দুর্বাসার খেয়াল ছিল না যে নারায়ণ স্বয়ং তাঁর সুদর্শন চক্রকে হুকুম দিয়ে রেখেছিলেন যে রাজা অম্বরীষকে সব সময় সকল আপদবিপদ থেকে যেন রক্ষা করা হয়।

তাই উগ্রদেব রাজা অম্বরীষের দিকে এগিয়ে যেতেই হঠাৎ চক্র এগিয়ে এসে কচ্ করে তাঁর মুণ্ডুটা সেইখানেই কেটে ফেললেন।

বাপ্‌রে বাপ্ এ কী কাণ্ড! এরপর চক্র বাঁই বাঁই করে ঘুরতে ঘুরতে ছুটলো দুর্বাসার মাথা ফাঁক করতে। ওরে গেছিরে, বাপ্‌রে বাপ্‌রে, বলতে বলতে দুর্বাসা ঋষিও পাঁই পাঁই করে ছুটতে সুরু করলেন। তিনিও ছুটছেন আর পেছন পেছন চক্রও তাড়া করছে। এ-পাড়া, সে-পাড়া, এদেশ, সেদেশ যেখানেই তিনি ছুটে যান চক্রও সেইখানে ছুটে তাঁকে মারতে যায়। ত্রিভুবনের যেখানে যান সেখানেই চক্রধারীর চক্র ঘুরছে। দুর্বাসা তখন চোখে সর্ষেফুল দেখছেন। বে-জায়গায় রাগ দেখিয়ে কী ভুলই করেছি বাবা, এখন রেহাই পেলে যে বাঁচি।

কিন্তু রেহাই দিচ্ছে কে? ব্রহ্মার কাছে গেলেন—তিনি বললেন, মাথা খারাপ, চক্রকে বাধা দেবে কে? তোমার একটা মাথা বাঁচাতে আমার চারটে মাথা এখুনি মাটিতে লুটোবে, আমি কিছু পারবো না, তুমি অন্য কোথাও যাও!

● মাথা গরমের ওষুধ
শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

দুর্বাসা পাহাড় ডিঙ্গিয়ে ছুটলেন মহেশ্বরের কাছে। উঁচু উঁচু ঢিবি পার হতে হতেই দম বেরিয়ে আসতে লাগলো—তাও আবার ছুট্‌তে ছুট্‌তে। একটু যে কোথাও জিরোবেন তার উপায় কি, চক্র সিধে চলে আসছে তাঁর মাথাটি লক্ষ্য করে।

ত্রিশূলের খোঁচা দিয়ে দুর্বাসাকে দিলেন ঠেলে।

মহেশ্বর দুর্বাসাকে দেখে বলে উঠলেন, এই যে ক্ষেপা মুনি এসে পড়েছ, ব্যাপার কি? বস বস অত হাঁপাচ্ছ কেন?

দুর্বাসা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, বসবার যো নেই...আমায় বাঁচান প্রভু—বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র আমায় তাড়া করেছে।

মহেশ্বর তিন চোখ কপালে তুলে বলে উঠলেন, সে কি, কি অপরাধ তুমি করলে যে...

সে অনেক ব্যাপার, বাঁচলে বলবো, আপাততঃ আপনি কিছু দিয়ে চক্রকে ঠেকান—বলে উঠলেন, দুর্বাসা। বলতে বলতে ঘর্ ঘর্ করে চক্র পাহাড়ে পাক মারতে লাগলো। মহেশ্বরও চক্রের তেজ আর ঘূর্ণী দেখে আঁৎকে উঠলেন, বুঝলেন দুর্বাসা তো গেছেই, তার সঙ্গে আবার আমি যাই কেন। তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, দুর্বাসা পালাও, আমার দ্বারা কিছু করা অসম্ভব।

আঁ, আঁ করতে করতে ভয়ে দুর্বাসা প্রায় মহেশ্বরের কোলে উঠে পড়েন আর কি, তখন সদাশিব তাঁর ত্রিশূলের খোঁচা দিয়ে দুর্বাসাকে পাহাড়ের অন্যদিকে দিলেন ঠেলে।

ক্যাঁক্ ক'রে খোঁচা খেয়ে দুর্বাসা আবার দৌড়তে সুরু করলেন। বুঝলেন ত্রিভুবনে কোথাও তাঁর

● মাথা গরমের ওষুধ
শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

আশ্রয় মিলবে না, কেউ তাঁকে বাঁচাতেও পারবে না—অতএব স্বয়ং চক্রধারী বিষ্ণুর পায়ে লুটিয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই। এই ভেবেই তিনি লাফাতে লাফাতে কাঁটা বন, ওল বন পেরিয়ে ছুটতে লাগলেন।

অবশেষে ক্ষতবিক্ষত দেহে বৈকুণ্ঠে একেবারে নারায়ণের সামনে গিয়ে সটান লম্বা হয়ে শুয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলেন, প্রভু আমায় বাঁচান, আমার খুব আক্কেল হয়ে গেছে।

নারায়ণ হেসে বললেন, কেন হে, তোমার আবার কি হল?

দুর্বাসা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে উঠলেন, সবই তো জানেন ছলনাময়, তবে আর ভোগাচ্ছেন কেন—আমি আপনার ভক্ত রাজা অম্বরীষের মনে দুঃখু দিতে গিয়েছিলুম, তাই আপনার চক্র আমায় অস্থির করে মারছে, ওকে ধরুন দয়া করে।

বিষ্ণু মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললেন, দেখ বাপু, চক্রকে তো আমি ছাড়িনি, আমি তাকে ধরবো কি করে। তুমি রাজার কাছে যাও, তিনি যদি তোমায় ক্ষমা করেন, তাহলে হয়তো বেঁচে যেতে পার।

দুর্বাসা কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, দেখুন প্রভু, একজন মর্ত্যের মানুষের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবো, এতে আমার মান একটু খাটো হবে না?

বিষ্ণু বললেন, বেশ মান খাটো করতে না চাও, প্রাণ দাও! ভক্তের লাঞ্ছনার চেয়ে তোমার লাঞ্ছনা আমার কাছে বড় নয় দুর্বাসা!

তাই তো কি করা যায়! দুর্বাসা ভাবছেন, এমন সময় আবার সেই গোঁ গোঁ আওয়াজ—চক্র আসছে। ছোট্, ছোট্, ছোট্! হোঁচট্ খেতে খেতে আবার দুর্বাসা ছুটতে লাগলেন। ছুটতে ছুটতে পা খসে যায়। বুড়ো মানুষ অনাহারে, অনিদ্রায় স্বর্গ মর্ত্য পাতালে একবার ছুটে গেছেন আবার ছুটে ফিরছেন, পা ফেটে, গা ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে, কাঁটা গাছে দাড়ি জড়িয়ে আর্ধেক সেইখানেই ছিঁড়ে রেখে এসেছেন, আবার সেই পথে ছুটে ফেরা সে কি সহজ কথা! কিন্তু উপায় নেই—ঘচ্ করে থামলেই কচ্ করে মুণ্ডুটি কাটা পড়বে, তাই ছুটতেই হল।

অবশেষে একেবারে রাজা অম্বরীষকে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন, মহারাজ আমায় ক্ষমা করুন। যেখানে সেখানে মাথা গরম করাটা যে অন্যায় তা আমি বুঝেছি। আপনি দয়া না করলে—

মহারাজ অম্বরীষ তৎক্ষণাৎ চক্রকে থামিয়ে দুর্বাসার কাছেই হাতযোড় করে বলে উঠলেন, ছি ছি ছি, আপনি এ কি কথা বলছেন—আমি ক্ষমা করবো কি, আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করে প্রসন্ন হন।

দুর্বাসা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে উঠলেন—ক্ষমা কি বলছো রাজা, তোমায় আমি আশীর্বাদ করছি, ভাল থাক। যে ওষুধ তুমি আমায় দিলে, এতে করে বছর কয়েকের মত আমার মাথা-গরম সেরে গেল। পৃথিবীতে আমাকে দেখে সবার যেন আক্কেল হয়! চট্ করে সব-সময় কেউ যেন মাথা গরম করে না বসে।

---

# বনমাই-রহস্য

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

> "জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে, আশার পিছনে ভয়—
> ডাকিনীর মত রজনী ভ্রমিছে
> চিরদিন ধরে দিবসের পিছে
> সমস্ত ধরাময়।"
> —রবীন্দ্রনাথ

## তথাকথিত চুম্বক এবং লৌহ

বরাবরই জানি, চুম্বক লোহাকে না টেনে ছাড়ে না। আগেও দেখেছি, আবার তারই অন্যতম দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল সেদিনে।

আগড়পাড়ায় গিয়েছিলুম আশীর্ব্বাদের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে। আমি আর জয়ন্ত। মনে ছিল আসন্ন মিলনোৎসবের বিমল আনন্দ। তার মধ্যে কোন করুণ বিয়োগান্ত দৃশ্যের কল্পনাই করা অসম্ভব।

আকাশ-বাতাসও ছিল প্রসন্ন। কিন্তু ভবিষ্য সূচনা দেবার জন্যেই রাত এগারোটার পরেই আকাশ-বাতাস আচম্বিতে প্রসন্নতা ভুলে করলে বিদ্রোহ-ঘোষণা। দেখা গেল আঁধার আকাশ-সায়রে বিদ্যুতের ছিনিমিনি-খেলা এবং ঝটিতি শোনা গেল ক্রুদ্ধ ঝটিকার ঝন্-ঝন্ ঝনাৎকার। তারপর ভেসে গেল পৃথিবীর

বুক ঝমাঝম্ বৃষ্টির ঝর-ঝর ঝরণায়।

কিন্তু আমরা এর মধ্যেও বিশেষ কোন ট্রাজেডির ইঙ্গিত পেলুম না। বৈশাখে তো জল-ঝড় হচ্ছে প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার!

প্রকৃতির ক্ষ্যাপামি থামল না রাত একটার আগে। গ্রামের অলিগলিতে দেখা দিলে অস্থায়ী নদী কলকল শব্দে। তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লে আমাদের মোটরযান যে নৌযানের কর্ত্তব্যপালন করতে রাজী হবে না, এটুকু অনুমান করা কঠিন নয়।

কিন্তু সেজন্যেও আমাদের মাথাব্যথা ছিল না কিছুমাত্র। এসেছি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাড়ীতে, বাকি রাতটুকুর জন্যে মাথা গোঁজবার ঠাঁই পাওয়া গেল অনায়াসেই।

পরদিনের তরুণ প্রভাত। ঝলোমলো সোনালী সূর্য্যকরে, অমলিন আকাশের নীলিমায়, গন্ধবহ বাতাসের গুঞ্জনে, সুরেলা পাখীদের কূজনে কোথাও নেই গত রাত্রের দুর্ব্বিষহ দুর্য্যোগের আভাস। পথও আর নদীর মত দুস্তর নয়, জল নেমে গিয়েছে চোখের আড়ালে।

আমি একমনে মোটর চালিয়ে যাচ্ছিলুম। পাশের আসনে জয়ন্ত। অদূরেই ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড।

হঠাৎ জয়ন্ত ব'লে উঠল, "গাড়ী থামাও মাণিক!"

গাড়ী থামিয়ে সুধলুম, "ব্যাপার কি?"

এদিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ ক'রে জয়ন্ত বললে, "পথের পাশে মাঠের ঐ গাছতলায় একটা সন্দেহজনক কি দেখা যাচ্ছে।"

—"সন্দেহজনক?"

—"হ্যাঁ। মনে হচ্ছে, একটা মানুষ জামাকাপড় প'রেই ওখানকার ভিজে জমির উপরে শুয়ে বা ঘুমিয়ে আছে। স্বাভাবিক নয়।"

—"কি করতে চাও?"

—"তদারক।"

জয়ন্ত গাড়ী থেকে নেমে মাঠের উপর দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ফিরে চেঁচিয়ে বললে, "মাণিক, দেখে যাও।" তার গলার আওয়াজ সচকিত।

আমিও কৌতূহলী হ'য়ে যথাস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

গাছতলার ভিজে ঘাসজমির উপরে চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে জনৈক ব্যক্তি। কিন্তু তাকে ঘুমন্ত লোক ব'লে সন্দেহ করবার উপায় নেই, কারণ তার জামার বুকপকেটের কাছটা রক্তরাঙা। মৃতদেহ।

লোকটির চেহারা সুন্দর ও সম্ভ্রান্ত। বয়স হবে ছাব্বিশ-সাতাশ। সুগঠিত দেহ, সুগৌর বর্ণ, সুশ্রী চোখ-নাক। জামা-কাপড়-জুতায় সৌখিনতার চিহ্ন। পাঞ্জাবীর উপরে মুক্তার বোতাম বসানো। বুকে সংলগ্ন বাম হাতে মধ্যমাঙ্গুলির উপরে একটি অঙ্গুরী থেকে সূর্য্যকিরণে জ্বল্-জ্বল্ করছে একখণ্ড হীরক।

জয়ন্ত মাটির উপরে ব'সে পড়ল। মৃতদেহের ডান হাতখানা ছড়িয়ে প'ড়েছিল এবং তার বদ্ধ-

মুষ্টির ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে কি-একটা জিনিষ—যেন কোন গাছের ডালের এক টুকরো।

পকেট থেকে আতসী কাঁচখানা বার ক'রে মৃতের বদ্ধমুষ্টির উপরে ধ'রে জয়ন্ত কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "মাণিক, আমি এইখানেই থাকি। গাড়ী নিয়ে থানায় গিয়ে তুমি খবর দিয়ে এস। ব্যাপারটা 'ইন্টারেষ্টিং' ব'লে মনে হচ্ছে। বোধ করি অভাবিত ভাবেই আমাদের কোন খুনের মামলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হবে।"

"কে আপনি? এখানে কেন?"

মোটরের দিকে এগুতে এগুতে মনে মনে ভাবতে লাগলুম, চুম্বক লোহাকে না টেনে ছাড়ে না। খুনের মামলা সর্ব্বদাই জয়ন্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়!

## 'বন্-সাই' কি চীজ?

সদলবলে যথাসময়ে যথাস্থানে এসে হাজির হ'ল থানার ইনস্পেক্টর। নাম সুজন সেন। আর কোন মামলায় তার সঙ্গে আমাদের মোলাকাত হয় নি। আমাদের অপরিচিত।

পুলিসে কিছুকাল কাজ করবার পর থেকেই লোকের ভুঁড়ি বাড়তে সুরু করে কেন, তার গুপ্তকথা আমার জানা নেই। সুজনেরও বপুখানি রীতিমত মেদপুষ্ট। মাথার চুল খাটো ক'রে ছাঁটা। মস্ত মুখমণ্ডলে ছোট্ট দুটো কুৎকুতে চোখ। পুরু ওষ্ঠাধরের দুই পাশ দিয়ে ঝুলে প'ড়ে একজোড়া জাঁদরেলি গোঁফ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গায়ের রং এমন যে, অমাবস্যার রাতে সে দুই হাত দূর থেকেও অদৃশ্য মানুষের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে।

জয়ন্ত অপেক্ষা করছিল মৃতদেহের পাশেই। তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে সুজন উদ্ধতভাবে বাজখাঁই গলায় সুধোলে, "কে আপনি? এখানে কেন?"

● বনসাই রহস্য
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

জয়ন্ত বিনীতভাবে বললে, "আজ্ঞে, আমিই লাসটাকে প্রথমে দেখতে পেয়েছি।"

—"আপনার নাম কি?"

জয়ন্ত নিজের পরিচয় দিলে।

নিজের দুই ভুরু কপালের উপরদিকে যথাসম্ভব তুলে সুজন বললে, "ওহো, মাঝে মাঝে আপনার নাম আমার কাণে আসে বটে! শুনি আপনি নাকি অ্যামেচার ডিটেকটিভ—অর্থাৎ সখের গোয়েন্দা?"

—"আজ্ঞে, এখনো আমি 'ডিটেকটিভ' উপাধিলাভের যোগ্য হই নি। নিজেকে আমি অপরাধ-বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ব'লেই মনে করি।"

সুজনবাবু হঠাৎ অতিশয় গম্ভীর হ'য়ে বললেন, "যাক্‌গে ও-সব ছেঁড়া ছেঁড়া ছেঁদো কথা, এখন আমি নিজের কাজ সুরু করি। হ্যাঁ মশাই, আপনি লাস-টাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন নি তো?"

—"আজ্ঞে না।"

—"উত্তম। আনাড়ীরা ঘাঁটাঘাঁটি করলে ভালো ভালো সূত্র নষ্ট হয়ে যায়।"

সুজন এদিকে-ওদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে মৃতদেহের চারিদিকটা একবার পরিক্রমণ করলে। তারপর লাসের পাশে ব'সে প'ড়ে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল। তারপর মৃতের জামা-কাপড় হাতড়াতে লাগল, কিন্তু একখানা চেকবই আর একটা ফাউন্টেন পেন ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না।

সুজন বললে, "অনেক কথাই জানা যাচ্ছে। এটা যে খুনের মামলা তাতে আর সন্দেহ নেই। মৃত্যুর কারণ রিভলভারের গুলি। লাসের বুকে আর হাতে রয়েছে মুক্তার বোতাম, হীরার আংটি আর সোনার হাত-ঘড়ি, সুতরাং অর্থলোভে কেউ একে খুন করে নি। হত ব্যক্তি ধনী। যখন চেকবই পেয়েছি, লোকটিকে সনাক্ত করাও কঠিন হবে না।"

জয়ন্ত বললে, "আরো একটা কথাও বোঝা যাচ্ছে। ভদ্রলোককে এখানে খুন করা হয় নি।"

মুখ টিপে একটু হেসে সুজন বললে, "তাই নাকি?"

—"মাটির দিকে তাকিয়ে দেখুন। কোথাও এক ফোঁটা রক্তের দাগ নেই।"

আবার ফিক্ ক'রে হেসে সুজন বললে, "কালকের বিষম বৃষ্টির পরও মাটির উপরে রক্তের দাগ থাকে নাকি?"

—"কিন্তু জামার উপরে রক্তের দাগ অস্পষ্ট হয় নি কেন? আরো লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, অমন তুমুল দুর্য্যোগেও লাসের ধোপদস্ত ইস্ত্রী-করা জামা-কাপড়ের ভাঁজ ভেঙে যায় নি।"

জয়ন্তের যুক্তি শুনে সুজন মনে মনে কি ভাবলে জানি না, কিন্তু মুখে অবহেলাভরে বললে, "সখের গোয়েন্দার সৌখিন মতামত নিয়ে এখন আমার মাথা ঘামাবার সময় নেই। আপাতত এখানকার তদন্ত শেষ করলুম। আগে লাস সনাক্ত করি, তারপর অন্য কথা।"

এতক্ষণে মৃত ব্যক্তির মুষ্টিবদ্ধ হাতের দিকে সুজনের নজর গেল। মুঠো খুলে খণ্ডিত গাছের ডালের অংশটা বার ক'রে নিয়ে সে নিজের চোখের সামনে তুলে ধরলে।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "কি দেখছেন?"

—"গাছের ডালের টুক্‌রো।"

—"কি গাছ?"

—"কোন ছোট জাতের গাছ।"

—"মৃত ব্যক্তির হাতে ওটা এল কেমন ক'রে?"

—"খুব সম্ভব অন্তিমকালে মৃত ব্যক্তির হাতে ছিল কোন একটা ছোট গাছ।"

—"ঠিক বলেছেন!"

—"মারাত্মক চোট খেয়ে মৃত ব্যক্তি মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ে, সেই সময়ে গাছের একটা ডাল ভেঙে তার মুঠোর ভিতরে থেকে যায়।"

—"এও ন্যায্য অনুমান। কিন্তু ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখুন, ও-রকম কোন গাছের চিহ্ন পর্য্যন্ত এখানে নেই। ঐ ভাঙা ডালটায় কিছু কিছু পাতাও আছে। বলতে পারেন, ওটা কি গাছের ডাল?"

—"হঠাৎ দেখলে মনে হয় দেবদারুর। কিন্তু তা অসম্ভব।"

—"কেন?"

—"দেবদারুর আকার হয় বিশাল। তার ডাল আর পাতাও এত ছোট হ'তে পারে না। চারা অবস্থায় দেবদারুও ছোট থাকে বটে, কিন্তু এটা কোন চারা গাছের ডাল নয়।"

—"ঠিক। এটা চারা গাছের ডাল নয়। এ হচ্ছে 'বন্‌-সাই'।"

—"কি, কি বললেন?"

—"বন্‌-সাই!"

—"সে আবার কি চীজ্‌ বাবা?"

—"আপাতত আমার এর বেশী আর কিছু বক্তব্য নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, 'বন্‌-সাই'য়ের মধ্যেই আছে এই মামলার প্রধান সূত্র! চল মাণিক, বেলা বাড়ছে, আমাদের প্রাতরাশের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়!"

পাগলের দিকে লোকে যে ভাবে চেয়ে থাকে, ঠিক সেই ভাবেই সুজন ফ্যাল্‌ফেলিয়ে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে।

## পুলিসের অতিথি

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার একদিন পরে।

জয়ন্তের হাতে রূপোয় গড়া শামুকের নস্যদানী। আমার হাতে খবরের কাগজ। আমি কাগজ পড়ছি, জয়ন্ত চোখ মুদে শুনছে। সামনের টেবিলে খাদ্যপানীয়শূন্য চায়ের পেয়ালা, কেটলি ও পিরিচ প্রভৃতি।

এইমাত্র আমাদের প্রাতরাশ জঠরস্থ হয়েছে।

আমি পড়তে লাগলুম ঃ

## আগড়পাড়ার হত্যাকাণ্ড

আগড়পাড়ার মাঠে যে ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইয়াছে, গতকল্য আমরা সে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছি। এ সম্বন্ধে এখন কয়েকটি নূতন তথ্য জানা গিয়াছে।

নিহত ব্যক্তির নাম সত্যেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। বালিগঞ্জের বাসিন্দা। তিনি জমিদার এবং কলিকাতার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজে সুপরিচিত।

ঘটনার দিন সন্ধ্যাকালে সত্যেন্দ্রবাবু বিশেষ কোন লোকের সঙ্গে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, তাহার পর আর বাড়ীতে ফিরেন নাই। পরদিন প্রভাতে আগড়পাড়ার এক মাঠে তাঁহার রক্তাক্ত মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়।

রাত্রে তিনি আগড়পাড়ায় গিয়েছিলেন কেন, পুলিস তাহার কারণ ধরিতে পারে নাই। সেখানে তাঁহার পরিচিত কোন লোকই বাস করে না।

হত্যাকারী সত্যেন্দ্রবাবুর মূল্যবান মুক্তার বোতাম, হীরার আংটি ও সোনার হাতঘড়িতে হস্তক্ষেপ করে নাই। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরোপকারী, দানশীল ও জনপ্রিয়। তাঁর চরিত্রও ছিল নিষ্কলঙ্ক, নিম্নশ্রেণীর লোকের সঙ্গে তিনি মেলামেশা করিতেন না। তবু এমন শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পড়িলেন কেন, তাহারও কারণ কেহ অনুমান করিতে পারিতেছে না।

এ বিয়োগান্ত ঘটনার উপরে রহিয়াছে একটা ঘনীভূত রহস্যের আবরণ। উদ্দেশ্যহীন নরহত্যা কেউ করে না, কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য কি? প্রতিহিংসা? কিন্তু সত্যেন্দ্রবাবু ছিলেন অজাতশত্রু।

মামলার ভারগ্রহণ করিয়াছেন সুযোগ্য পুলিস কর্ম্মচারী শ্রীসুজন সেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, তিনি এমন একটি বিশেষ তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহার ফলে অবিলম্বেই রহস্যভেদ হইবার সম্ভাবনা আছে।"

জয়ন্ত চোখ খুলে বললে, "বাহাদুর সুজনবাবু, বাহাদুর! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! এর মধ্যেই রহস্যভেদ হবার সম্ভাবনা!"

আমি বললুম, "তুমি কি সেটা অসম্ভব ব'লে মনে কর?"

—"হয়তো অসম্ভব নয়, কিন্তু সম্ভবপর হওয়াও কঠিন।"

—"কেন?"

—"পুলিস ভুল পথে চলেছে।"

● বনসাই রহস্য
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

—"কি ক'রে জানলে?"

—"খবরের কাগজের রিপোর্টটা দেখ। সত্যেনবাবু রাত্রে আগড়পাড়ায় গিয়েছিলেন কেন, পুলিস এখনো তার কারণ ধরতে পারে নি।"

"কি আশ্চর্য্য! আপনার কি হয়েছে?" [পৃঃ ১৬৫

—"কিন্তু সে কারণের সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের সম্পর্ক কি?"

—"সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। সত্যেনবাবু স্বেচ্ছায় আগড়পাড়ায় যায় নি।"

—"তুমি কি মনে কর, সত্যেনবাবুকে জোর ক'রে সেখানে ধ'রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?"

—"না।"

—"তবে?"

জয়ন্ত কোন জবাব দেবার আগেই দোতলার সিঁড়ির উপরে শোনা গেল উদ্দাম পায়ের দুদ্দাড় শব্দ এবং তারপরেই হুড়মুড় ক'রে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল একটি যুবক। তার মুখ-চোখ উদ্‌ভ্রান্ত। আমরা তার দিকে তাকিয়ে রইলুম সবিস্ময়ে।

যুবক অবসন্নের মত একখানা চেয়ার চেপে ধ'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। ভালো ক'রে তার মুখের পানে তাকিয়ে আমি আর একটা ব্যাপার আবিষ্কার করলুম। গতপূর্ব্ব দিনের সকাল বেলায় আগড়পাড়ার মাঠে যে সত্যেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে, তার সঙ্গে যুবকের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে আশ্চর্য্য-রকম।

● বনসাই রহস্য
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
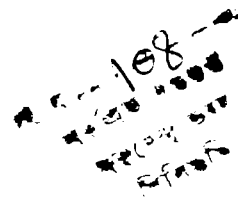
জয়ন্ত সুধোলে, "কে আপনি? কি চান?"

যুবক সকাতরে বলে উঠল, "আমাকে রক্ষা করুন!"

—"কি আশ্চর্য্য! আপনার কি হয়েছে?"

—"পুলিস আমাকে গ্রেপ্তার করতে চায়!"

—"কেন?"

—"পুলিস আমাকে হত্যাকারী ব'লে সন্দেহ করে। আমি সত্যেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর ছোট ভাই। আমার নাম দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।"

—"বটে? কিন্তু কেমন ক'রে জানলেন, পুলিস আপনাকে সন্দেহ করে?"

—"তাদের ভাবভঙ্গি দেখে আর প্রশ্ন শুনে। আমার উপরে ঢালাও হুকুম হয়েছে, আমি যেন বাড়ীর বাইরে পা না বাড়াই। এমন কি আমাদের বাড়ীর দরজায় পাহারাওয়ালা মোতায়েন হয়েছে। আমি খিড়কীর দরজা দিয়ে কোনরকমে বেরিয়ে এখানে চ'লে এসেছি।"

—"বোকামি করেছেন। এতে পুলিসের সন্দেহ আরও বাড়বে।"

—"উপায় কি? আমি নির্দ্দোষ, কিন্তু পুলিস আমায় বিশ্বাস করে না। শুনেছি, এই মামলার সঙ্গে আপনার নাম জড়িত আছে! তাই—"

জয়ন্ত বাধা দিয়া বললে, "আপনি আমায় চেনেন?"

—"নিশ্চয়ই চিনি! আপনি হচ্ছেন বিখ্যাত ব্যক্তি, আপনার কাছে যারা অপরিচিত, তারাও আপনাকে চেনে। চিনি ব'লেই বিপদে প'ড়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আপনি ছাড়া আর কেউ এই বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। আপনার হাতেই আমি আমার ভার অর্পণ করতে চাই।"

—"আপনার ভার বহন করবার শক্তি আমার হবে কিনা জানি না। কারণ আপনি যদি সত্যসত্যই অপরাধী হন, তবে—"

দ্বিজেন বাধা দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ব'লে উঠল, "আমি অপরাধী? যাঁকে দেবতার মত দেখি, সেই বড় ভাইকে আমি খুন করব? বলেন কি মশাই?" সে উত্তেজিত হয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে তার কাছে গিয়ে সান্ত্বনাভরা কণ্ঠে বললে, "শান্ত হোন দ্বিজেনবাবু, আমি আপনাকে অপরাধী বলছি না। কিন্তু আপনার কোন কথাই আমি জানি না। এই চেয়ারের উপরে স্থির হয়ে বসুন। এখন বলুন দেখি, ঘটনার দিন বৈকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন, কি করেছিলেন?"

—"বৈকাল সাড়ে পাঁচটায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে চৌরঙ্গীর লাইট-হাউসে যাই। সিনেমা দেখে রাত ন'টার সময়ে বাড়ীতে ফিরে আসি। রাত দশটা পর্য্যন্ত রেডিয়োর গান শুনি। সাড়ে দশটার সময়ে আহারাদি শেষ ক'রে ঘুমোতে যাই, রাত তখন এগারোটা।"

—"তাহ'লে আপনার অবর্ত্তমানেই সত্যেনবাবু বেরিয়ে গিয়েছিলেন?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"তিনি কোথায় গিয়েছিলেন তা জানেন?"

—"তা জানি না, তবে কেন গিয়েছিলেন সেটা বৌদিদির মুখে শুনেছি।"

—"কি শুনেছেন?"

—"দাদা নাকি কি-একটা দুর্লভ 'কিউরিও' কিনতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আগড়পাড়ায় নয়, কলকাতাতেই। দাদার বেজায় সখ ছিল 'কিউরিও' কেনার। সখটা প্রায় বাতিকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, ফলে হরেক-রকম দুষ্প্রাপ্য জিনিস দেখা যাবে আমাদের বাড়ীর যেখানে সেখানে। সে-সবের কোনটা সুন্দর, কোনটা বিচিত্র, কোনটা আবার একেবারেই উদ্ভট। এমন সব জিনিসও দাদা চড়া দাম দিয়ে কিনতেন, সাধারণ লোকের কাছে যেগুলো জঞ্জাল ছাড়া আর কিছুই নয়।"

—"এইবারে আপনাদের সংসারের কথা কিছু বলুন।"

—"জমিদার হিসাবে আমাদের নামডাক আছে। নিজেদের ধনী বললে অত্যুক্তি করা হবে না। পিতার অবর্ত্তমানে দাদা আর আমিই জমিদারির মালিক। দেড় বৎসর হ'ল, দাদা বিবাহ করেছেন। বৌদিদিও ধনী পিতার একমাত্র সন্তান, বিবাহের পর কয়েক মাস যেতে না যেতেই তাঁরও পিতৃবিয়োগ হয়। আমি এখনো অবিবাহিত।"

—"সত্যেনবাবু পরলোকে, এখন জমিদারির স্বত্বাধিকারী কে?"

—"আমি। দাদা নিঃসন্তান।"

—"পুলিসের সন্দেহের কারণ অনুমান করছি। আচ্ছা দ্বিজেনবাবু, আপনি জানেন কি, মৃত সত্যেনবাবুর হাতের মুঠোয় গাছের একটা অংশ পাওয়া গিয়েছে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, ইনস্পেক্টর সুজনবাবু সেটা আমাকে দেখিয়েছেন।"

—"সে-রকম কোন গাছ আপনাদের বাড়ীতে আছে?"

—"আজ্ঞে না।"

—"ঠিক জানেন?"

—"হ্যাঁ, এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।"

—"আপনার বৌদিদির নাম কি?"

—"শ্রীমতী লতিকা দেবী।"

—"তিনি কি অবগুণ্ঠনবতী কুলললনা, অন্তঃপুরের বাইরে পদার্পণ করেন না?"

—"না মশাই, তিনি একেবারে আধুনিকা। এম-এ পাস করেছেন—ঘরে-বাইরে তাঁর অবাধ গতি।"

—"তাহ'লে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে নারাজ হবেন না?"

—"নিশ্চয়ই হবেন না। কিন্তু এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?"

—"আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।"

—"বেশ তো, এখুনি চলুন না! যদিও তিনি এখন অত্যন্ত কাতর হয়ে আছেন, তবু—"

দ্বিজেনের কথা শেষ হবার আগেই ভৃত্য মধু ঘরের ভিতরে প্রবেশ ক'রে বললে, "পুলিসের সুজনবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান!"

● বনসাই রহস্য
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

দ্বিজেন ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে উঠল এবং দেখতে দেখতে তার গৌরবর্ণ মুখ হয়ে গেল মড়ার মত হল্‌দে। প্রায়বদ্ধকণ্ঠে সে বললে, "পুলিস এসেছে পিছনে পিছনে! আমার কি হবে জয়ন্তবাবু?"

জয়ন্ত ডান হাত তুলে আশ্বাস দিয়ে বললে, "মাভৈঃ!"

ধুপ-ধাপ্ পদশব্দ তুলে সুজন ঘরের ভিতরে ঢুকে দ্বিজেনের দিকে কট্‌মট্ ক'রে তাকিয়ে উষ্ণ স্বরে বললে, "পুলিসের চোখে ধুলো দেওয়া এত সোজা নয়, আমাদের চর আপনার পিছনে লেগে আছে ছায়ার মত!"

দ্বিজেন সকাতরে বললে, "আমাকে ভুল বুঝবেন না মশাই। আমি পালাবার জন্যে এখানে আসি নি।"

—"তবে কি করতে এসেছেন? ভেরেণ্ডা ভাজতে?"

জয়ন্ত বললে, "উঁহু, তাও না! উনি এসেছেন সলাপ্‌রামর্শ করতে!"

এইবারে জয়ন্ত ও আমাকে দেখতে পেয়ে সুজন বিস্মিত স্বরে বললে, "একি, আপনারাও এখানে?"

জয়ন্ত হাতজোড় ক'রে হাসতে হাসতে বললে, "অতি-বিনয়ের ভাষায় বলতে হয়, এটাই হচ্ছে অধীনের গোলামখানা!"

—"তাই নাকি, তাই নাকি? আমি এ কথা জানতুম না। কিন্তু খুনের মামলার আসামীর সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কি?"

—"আসামী! কে আসামী?"

নিজেকে শুধরে নিয়ে সুজন বললে, "না, না, এখনো ঠিক আসামী বলতে পারি না, তবে আসামী হ'তে আর বেশী দেরি নেই।"

—"কাকে লক্ষ্য ক'রে এ কথা বলছেন? দ্বিজেনবাবু?"

—"তা ছাড়া আবার কে?"

—"ওঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ?"

—"মশাই, আইনে 'সারকাম্‌স্‌ট্যান্‌শিয়াল্ এভিডেন্স' বা অবস্থা-ঘটিত প্রমাণ ব'লে একটা ব্যাপার আছে জানেন তো? যেমন বিনা আগুনে ধোঁয়ার জন্ম হয় না, তেমনি বিনা উদ্দেশ্যে খুন হওয়াও অসম্ভব! সত্যেনবাবুর কোন শত্রুর কথা শোনা যায় না। মূল্যবান্ দ্রব্যের লোভেও কেউ তাঁকে খুন করে নি। সুতরাং বাইরের হত্যাকারীর কথা এখানে ধর্ত্তব্য নয়। এক্ষেত্রে দেখতে হবে, সত্যেনবাবুর মৃত্যুর ফলে সব চেয়ে লাভবান হবে কোন্ ব্যক্তি?"

জয়ন্ত হাস্যমুখে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, এ যুক্তি জজে মানে। সত্যেনবাবুর মৃত্যু হ'লে দ্বিজেনবাবু একলাই সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করতে পারবেন বটে। ঠিক কথা, ঠিক কথা, আপনার অনুমানশক্তি কি প্রখর!"



সুজন উৎসাহিত হয়ে বললে, 'তারপর দেখুন, দ্বিজেনবাবুর 'অ্যালিবাই' সন্তোষজনক নয়। সত্যেনবাবু তাঁর মৃত্যুর দিনে সন্ধ্যার সময়ে যখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান, তখন উনি নাকি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার সাক্ষী কে? ওর মুখের কথা তো প্রমাণ ব'লে গ্রাহ্য হবে না?"

● বনসাই রহস্য

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

—"তাও কখনো হয়? তবে কিনা সিনেমা দেখে উনি রাত ন'টার সময়ে বাড়ীতে ফিরে আসেন।"

—"এলেই বা! সত্যেনবাবুও তো মারা পড়েছেন সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দশটার মধ্যেই!"

—"কি ক'রে জানলেন?"

—"ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা গিয়েছে।"

—"অতএব?"

—"অতএব দ্বিজেনবাবুকে আমাদের অতিথি হ'তে হবে। ভেবেছিলুম আপাতত ওঁকে বাড়ীর মধ্যেই নজরবন্দী ক'রে রাখব, কিন্তু উনি যখন তাতে রাজী নন, হটরহটর ক'রে হাটে-মাঠে ছুটোছুটি করতে চান, তখন তা ছাড়া আর উপায় নেই।"

দ্বিজেন সভয়ে ব'লে উঠল, "আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করছেন!"

জয়ন্ত বললে, "না দ্বিজেনবাবু, এটা ঠিক গ্রেপ্তার নয়। তবে আপাতত দু-চারদিন আপনাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও পুলিসের আতিথ্য স্বীকার করতে হবে।"

—"হা ভগবান! তাহ'লে আপনিও আমাকে রক্ষা করতে পারবেন না?"

—"পারব কিনা জানি না, তবে চেষ্টার ত্রুটি করব না।"

হো হো ক'রে হাসতে হাসতে সুজন বললে, "চেষ্টা ক'রে শেষটা কিছু ফল হবে কি জয়ন্তবাবু? ডিটেকটিভ নভেলের সখের গোয়েন্দারা পদে পদে সরকারি পুলিসের উপরে টেক্কা মারে বটে, কিন্তু আমরা হচ্ছি বাস্তব জগতের মানুষ। পেশাদারের কাছে সৌখিনের খাতির নেই—ব'লে রাখলুম এক কথা, বুঝলেন মশয়?"

—"যা বলেছেন, লাখ টাকার এক কথা! তাহ'লে দ্বিজেনবাবু, দুর্গা ব'লে আপনি এখন সুজনবাবুর সঙ্গে যাত্রা করুন। হ্যাঁ ভালো কথা, আপনার দাদার নামে 'ফোন' আছে নিশ্চয়ই।"

—"আছে।"

দ্বিজেনকে নিয়ে সুজন প্রস্থান করল। জয়ন্ত কিছুক্ষণ ব'সে রইল মৌনমুখে। তারপর আমার দিকে ফিরে বললে, "মাণিক, সত্যেনবাবুর বাড়ীতে ফোন ক'রে লতিকা দেবীকে আজকের ব্যাপারটা জানিয়ে দাও। আর এটাও ব'লে রেখো, বৈকালে আমরাও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। বিশেষ দরকার।"

সুজনের মুরুব্বিয়ানার বাড়াবাড়িটা জয়ন্ত গায়ে মাখল না বটে, কিন্তু আমার গা যেন জ্বলতে লাগল। তবে কথাতেই আছে অতি-বুদ্ধির গলায় দড়ি। এও বারবার দেখেছি যে, জয়ন্তের কাছে চাল মারতে গিয়ে অনেক চালিয়াতকেই শেষ পর্য্যন্ত ল্যাজে-গোবরে হ'তে হয়েছে, সুজনেরও ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল ব'লে মনে হচ্ছে না!

## লতিকা দেবী

বৈকালে যথাসময়ে আমরা মৃত সত্যেনবাবুর বাড়ীর দিকে যাত্রা করলুম।

স্বহস্তে মোটর চালিয়ে যথাস্থানে গাড়ী থামিয়ে জয়ন্ত বললে, "মাণিক, একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ কি?"

● বনসাই রহস্য
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

আমি সুধলুম, "কি?"

—"একখানা কালো রঙের সিডান গাড়ী সারা পথ আমাদের পিছু পিছু এসেছে। ঐ দেখ, গাড়ীখানা এখন আমাদের সামনে দিয়ে ছুটছে।"

—"হয়তো এইটেই ওর গন্তব্য পথ।"

—"হয়তো তাই। চল, নেমে পড়ি।"

প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা। ফটকে পাহারারত দ্বারবান। লতিকা দেবীর কাছে আমাদের আগমন সংবাদ পাঠালুম। অনতিবিলম্বে ভৃত্য এসে আমাদের একখানা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল।

লম্বা চওড়া হল-ঘর। বোধ করি বৈঠকখানা। সাজসজ্জা কেবল মালিকের রুচির পরিচায়ক নয়, রীতিমত অসাধারণ। বাঙালী ধনীদের অন্যান্য বৈঠকখানার সঙ্গে এর পার্থক্য যেখানে চোখে পড়ে সেইখানেই।

চার দেওয়াল চিত্রে চিত্রে চিত্রময়। প্রত্যেক ছবি হাতে আঁকা, এঁকেছেন নামজাদা চিত্রকররা। যেখানে সেখানে রয়েছে প্রাচীন ভাস্করদের হাতে গড়া পাথরের, পিতলের ও ব্রোঞ্জের দুর্ম্মূল্য মূর্ত্তি। মাঝে মাঝে 'সো-কেসে'র মধ্যে সাজানো আছে চৈনিক, জাপানী, মিশরীয়, ভারতীয় ও য়ুরোপীয় নানাশ্রেণীর শিল্পসম্ভার। বসবার আসনগুলিও বিশেষ ফরমাস দিয়ে নূতন পরিকল্পনায় প্রস্তুত। মেঝের উপরে বিছানো মহামূল্যবান্ পারস্যদেশীয় কার্পেট। প্রতিটি আসবাব—এমন কি ছাইদানগুলো পর্য্যন্ত শিল্পীসুলভ মনের পরিচয় দেয়।

জয়ন্ত একটি 'সো-কেসে'র সামনে দাঁড়িয়ে প্রাচীন চীনদেশে নির্ম্মিত পোর্সিলেনের বাসন পরীক্ষা করছে, এমন সময়ে ঘরের ভিতরে ধীরপদে এসে দাঁড়ালেন বিষাদের প্রতিমূর্ত্তির মত এক মহিলা। মুখে তাঁর নিরাশা ও যাতনার চিহ্ন ফুটে উঠেছে বটে, কিন্তু তিনি পরমা সুন্দরী। দেখলেই বোঝা যায় কেবল সৌন্দর্য্য নয়, তাঁর ব্যক্তিত্বও আছে।

জয়ন্ত নমস্কার ক'রে মৃদুস্বরে বললে, "আপনিই বোধ হয় লতিকা দেবী?"

প্রতি-নমস্কার ক'রে মহিলা বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনারা আসন গ্রহণ করুন।" তাঁর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট, কিন্তু ভারাক্রান্ত।

অল্পক্ষণের স্তব্ধতা। তারপর জয়ন্ত সঙ্কুচিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললে, "এই দারুণ দুর্ভাগ্যের দিনে আপনাকে বিরক্ত করতে আসা উচিত নয়। কিন্তু আপনার দেবর দ্বিজেনবাবু এই মামলায় আমাদের নিযুক্ত করেছেন। কোন কোন প্রশ্নের উত্তর আপনি ছাড়া আর কেউ দিতে পারবেন না ব'লে মনে করি। তাই নিরুপায় হয়েই এই দুঃসময়েও আমাদের আসতে হয়েছে, এজন্যে ক্ষমা করবেন।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে লতিকা দেবী বললেন, "ভগবান আমাকে দুর্ভাগ্যের আঘাত সহ্য করবার শক্তি দিয়েছেন। যা হবার তা হয়েছে, এখন আবার আমার দেবরও বিপন্ন—দুনিয়ায় আজ আমার আত্মীয় বলতে উনি ছাড়া আর কেউ নেই। ওঁকে এই বিপদ থেকে মুক্ত করবার আর আমার স্বামীর হত্যাকারীকে শাস্তি দেবার জন্যে আপনাদের আমি যে কোন সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।"

—"পুলিস আপনার দেবরকে কেন সন্দেহ করে জানেন তো?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। জিনিসটা কি, আমার কাছে তিনি ভাঙেন নি। তবে ব'লে গিয়েছিলেন, আমাকে সেটা দেখিয়ে অবাক ক'রে দেবেন। আমাদের এই বৈঠকখানাটি আপনারা দেখছেন। কেবল এখানেই নয়, আমাদের বাড়ীর ঘরে ঘরে এমনি সব 'কিউরিও' ছড়ানো আছে। এই সখের জন্যে তাঁর অজস্র টাকা খরচ হয়েছে। কোথাও যদি তিনি মনের মত 'কিউরিওর' সন্ধান পেতেন, তবে তা না পাওয়া পর্য্যন্ত আর স্থির থাকতে পারতেন না। ঐ জাপানী জিনিসটির সন্ধান দিয়েছিলেন একটি ভদ্রলোক।"

—"তার নাম জানেন?"

—"প্রাণধন বিশ্বাস। তিনি নিজে একখানা বেবি-ট্যাক্সি ক'রে আমাদের বাড়ীতে এসে আমার স্বামীকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন।"

—"লোকটিকে দেখেছেন?"

—"আজ্ঞে না, তিনি ট্যাক্সির বাইরে আসেন নি।"

—"ট্যাক্সির নম্বর?"

—"সন্ধ্যার সময়ে দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে ট্যাক্সিখানা দেখেছিলুম। নম্বর দেখবার কথা মনে হয় নি। পুলিসও নম্বরের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি বলতে পারি নি।"

জয়ন্ত আপসোস্ ক'রে বললে, "নম্বর দেখেন নি, ভুল করেছেন—বড়ই ভুল করেছেন!"

—"সন্ধ্যাবেলায় দূর থেকে নম্বর হয়তো ভালো ক'রে দেখতেও পেতুম না।"

—"ট্যাক্সির রং?"

—"খানিক সাদা, খানিক কালো।"

—"ভালো ক'রে ভেবে দেখুন, তার আর কোন বিশেষত্বই লক্ষ্য করেন নি?"

—"বিশেষত্ব—বিশেষত্ব, হ্যাঁ, একটা বিশেষত্বের কথা স্মরণ হচ্ছে।"

জয়ন্ত সাগ্রহে বললে, "কি?"

—"ট্যাক্সির পিছনের আলোর তলায় দেখেছিলুম, সাদা নম্বর-প্লেটের উপরদিকের ডান কোণের খানিকটা ভাঙা, বোধ হয় কোন দুর্ঘটনার ফল।"

—"পুলিসকেও এ কথা জানিয়েছেন?"

—"না, আগে আমার এ কথা মনে পড়ে নি।"

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে রূপোর নস্যদানী থেকে একটিপ নস্য নিয়ে বললে, "ধন্যবাদ লতিকা দেবী! এতেই হয়তো কাজ চলবে। আমার আর কিছু জানবার নেই—নমস্কার। এস মাণিক।"

## মেঘনাদের অস্ত্রত্যাগ

জয়ন্ত 'হুইল' ধরলে, পাশে গিয়ে বসলুম আমি।

জিজ্ঞাসা করলুম, "লতিকা দেবীর বর্ণনা শুনে তুমি কি ট্যাক্সি-চালককে সন্ধান করতে পারবে?"

মোটর চালাতে চালাতে জয়ন্ত বললে, "পারাই তো উচিত—অবশ্য ট্যাক্সি-চালক ইতিমধ্যে যদি নম্বর-প্লেট পাল্টে না ফেলে থাকে। এ ব্যাপারে আমি কোন পুলিস-বন্ধুর সাহায্য গ্রহণ করব। এ কাজ

পুলিসই তাড়াতাড়ি হাসিল করতে পারবে।"

—"ধর ট্যাক্সি-চালক সত্যেনবাবুকে যে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েছিল, তোমাকেও সেখানে নিয়ে যাবে। তাহ'লেও তুমি কি সেই বাড়ীর কোন লোককে অপরাধী ব'লে সাব্যস্ত করতে পারবে?"

—"উঁহু! কেউ যদি ব'লে বসে, সত্যনবাবু সেখানে কিছুক্ষণ থেকেই আবার একলা চ'লে এসেছিলেন, তাহ'লে তা মিথ্যাকথা ব'লে প্রমাণ করা চলবে না।"

—"তবে?"

—"তবে বাড়ীটার সন্ধান পেলে আমরা আর এক পা এগুতে পারব।"

—"অর্থাৎ শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্?"

—"হ্যাঁ। তারপর আমার হাতে আছে এক ব্রহ্মাস্ত্র। বাড়ীখানার খোঁজ পেলে হয়তো সেই চরম অস্ত্র প্রয়োগ করবার সুযোগ পাওয়া যাবে।"

—"কী সেই ব্রহ্মাস্ত্র?"

জয়ন্ত কোন জবাব না দিয়ে আচম্‌কা বিদ্যুৎ-বেগে গাড়ী চালিয়ে দিলে—

এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খুব কাছেই যেন কাণ ফাটিয়ে ও চারিদিক্ কাঁপিয়ে গড়াম্ ক'রে তোপের ভৈরব গর্জ্জন শোনা গেল!

চট ক'রে গাড়ী থামিয়ে জয়ন্ত বাইরে লাফিয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে আমিও!

রাজপথের উপরে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া! হৈ হৈ চীৎকার! জনতার ছুটাছুটি! হুলুস্থুল কাণ্ড!

একখানা বাড়ীর দেওয়ালে দেখা গেল গভীর ফাটল! কে কোথা থেকে বোমা ছুঁড়েছে! আশ্চর্য্য এই, কেউ আহত বা নিহত হয় নি!

জয়ন্ত বললে, "ঐ সরু গলিটার মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা লোক আমাদের দিকে কি একটা ছুঁড়তে উদ্যত হয়েছে দেখেই আমি প্রাণপণে গাড়ী চালিয়ে দিয়েছিলুম। সেইজন্যেই এ যাত্রা কোন গতিকে বেঁচে গিয়েছি!"

আমি সেই গলিটার দিকে ছোটবার উপক্রম করতেই জয়ন্ত আমার হাত চেপে ধ'রে বললে, "আর বৃথা চেষ্টা! এতক্ষণে সে পগার পার হয়েছে! ঐ পুলিস আসছে! এখন এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে চলবে না—আমাদের হাতে অনেক কাজ!"

আবার মোটরে উঠে বসলুম।

তখনও আমার মনের অবস্থা হতভম্বের মত। বললুম, "এ যে বিনা মেঘে বজ্রপাত!"

জয়ন্ত হুইল ধ'রে বললে, "না ভাই মাণিক, আগেই হয়েছিল মেঘোদয়! বাড়ী থেকে বেরিয়ে যখনি দেখেছিলুম একখানা সন্দেহজনক উটকো মোটর আমাদের পিছু ধরেছে, তখনি আমার ভয় হয়েছিল যে আজ হয়তো কোন একটা অঘটন ঘটবে! ভাগ্যিস্ সতর্ক ছিলুম, নইলে এতক্ষণে আমাদের দেহ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যেত!"

আমি বললুম, "তুমি কি মনে কর, ঐ বোমাটা আমাদের টিপ্ ক'রেই ছোঁড়া হয়েছিল?"

—"এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। এই মামলার সঙ্গে জড়িত কোন লোক বা কোন দল আমাদের

চেনে। খালি চেনে না, আমাদের ভয়ও করে। তারাই আমাদের অস্তিত্ব লোপ করতে চায়। আমি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করব বলছিলুম না? কিন্তু আমার আগে তারাই প্রয়োগ করেছিল ব্রহ্মাস্ত্র!"

—"কিন্তু তারা কারা?"

—"এখনো পর্য্যন্ত তুমি যে তিমিরে, আমিও সেই তিমিরে! অপরাধী অস্ত্রত্যাগ করছে আড়াল থেকে মেঘনাদের মত। কিন্তু যেমন ক'রেই হোক্ তাদের টেনে আনতে হবে সামনাসামনি। বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার!"

—"তবে আমরা দুটো নতুন নাম সংগ্রহ করতে পেরেছি।"

—"হ্যাঁ, রতিকান্ত মজুমদার আর প্রাণধন বিশ্বাস।"

—"কিন্তু এদের কারুকে অপরাধী ব'লে প্রমাণ করা কঠিন।"

—"কেবল কঠিন নয়, এখনো পর্য্যন্ত অসম্ভব। তবে আমার মন কি বলে জানো? এই দুইজনের মধ্যে কোন-না-কোন দিক দিয়ে একটা কিছু যোগাযোগ আছেই। কিন্তু এখন চুলোয় যাক্ মনের কথা! খেয়ালী মন তো অনেক কথাই বলে, কিন্তু সে-সব কাজে লাগে কৈ? আপাতত ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে ইনস্পেক্টর বন্ধু সুন্দরবাবুকে ফোন-যোগে স্মরণ করতে হবে। ট্যাক্সি-চালককে আবিষ্কারের ভার নিক্ষেপ করব তাঁরই উপরে।"

## যিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ

খুব সহজে এবং তাড়াতাড়ি একটা জরুরি কাজ সেরে ফেলা গেল। এবং তার পরের ঘটনাগুলোও ঘটতে লাগল আশাতীত, অভাবিত রূপে দ্রুততালে।

পরদিন সকালে বেলা দশটার ভিতরেই সুন্দরবাবুর নির্দ্দেশ অনুসারে জনৈক পাহারাওয়ালা সেই বেবি-ট্যাক্সির চালককে আমাদের কাছে এনে হাজির করলে।

সে দস্তুরমত ভড়কে গিয়েছে। হাতজোড় ক'রে বললে, "আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন হুজুর? আমি তো কোনই অপরাধ করি নি!"

—"সেটা বোঝা যাবে তুমি যদি সত্যকথা বল।"

—"মিথ্যা বলব কেন হুজুর?"

—"উত্তম। তুমি প্রাণধন বিশ্বাসকে চেনো?"

—"ও নাম কখনো শুনি নি।"

—"গত তেইশ তারিখে বৈকাল সাড়ে ছয়টার কিছু আগে বা পরে কে তোমার গাড়ী ভাড়া ক'রে বালিগঞ্জে গিয়েছিল?"

—"এক অচেনা বাবু।"

—"তারপর?"

—"বালিগঞ্জ থেকে আর এক বাবুকে তুলে নিয়ে যাই ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে। খাল পার হয়ে অল্প দূরে গিয়ে দুই বাবুই নেমে একখানা বাড়ীর ভিতর যান। আমি ভাড়া নিয়ে চ'লে আসি।"

—"সেই বাড়ীখানা আবার চিনতে পারবে?"

—"কেন পারব না?"

—"যে বাবু তোমার গাড়ী ভাড়া করেছিল, তাকে সনাক্ত করতে পারবে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর!"

—"আচ্ছা, আপাতত তুমি পুলিসের হেফাজতেই থাকো।"

ট্যাক্সি-চালককে নিয়ে পাহারাওয়ালার প্রস্থান।

জয়ন্ত বললে, "মাণিক এইবারে কাজের পালা তোমার। সুজনবাবুকে তোমার সাহায্যে একখানা পত্রাঘাত করব। আশা করি তারপর তিনি সদলবলে এখানে আসতে বিলম্ব করবেন না।"

* * * * * *

হ্যাঁ, সুজন এলো অনতিবিলম্বেই। 'পুলিস-ভ্যানে' সদলবলে। তখন বৈকাল।

সুজন প্রথমেই বললে, "জয়ন্তবাবু, আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনি আবার কি নতুন প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন? আমি তো এদিকে আরো কিছু অগ্রসর হয়েছি!"

—"কি রকম?"

—"সত্যেনবাবুর দেহের ভিতরে পাওয়া গিয়েছে একটা ৩৮-ক্যালিবারের রিভলভারের গুলি। খানাতল্লাস ক'রে দ্বিজেনের ঘরেও পেয়েছি একটা ৩৮-ক্যালিবারের রিভলভার।"

—"দ্বিজেনবাবুর লাইসেন্স আছে তো?"

—"তা আছে।"

—"কিন্তু ঐ রিভলভারই যে হত্যাকাণ্ডের সময়ে ব্যবহার করা হয়েছিল, তারা প্রমাণ কি?"

—"তাও প্রমাণিত হবে বৈকি! আমি তো কেতাবী সখের গোয়েন্দা নই, গোড়া না বেঁধে কাজ করি না। যাক্ ও কথা। এইবারে আপনার প্রমাণ দাখিল করুন।"

—"যে ট্যাক্সি ক'রে সত্যেনবাবু ঘটনার দিন বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেন, তার চালকের দেখা পেয়েছি।"

—"তাই নাকি, তাই নাকি?"

—"মৃত্যুর আগে সত্যেনবাবু যে বাড়ীতে গিয়েছিলেন, তারও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।"

—"বলেন কি, বলেন কি?"

—"প্রাণধন বিশ্বাসের নামও আপনি শুনেছেন নিশ্চয়?"

—"আলবৎ শুনেছি! সেই ব্যাটাই তো ভাঁওতা দিয়ে সত্যেনবাবুকে নিয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয় দ্বিজেনের চর।"

—"ট্যাক্সি-চালক ঐ বাড়ীতে গিয়ে তাকেও সনাক্ত করতে পারবে।"

—"তাহ'লে তো কেল্লা মার দিয়া! চলুন, চলুন—আর দেরি নয়!"

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। একখানা বাগানঘেরা মাঝারি আকারের বাড়ীর সুমুখে এসে সেই ট্যাক্সি-চালকের নির্দ্দেশে আমরা নেমে পড়লুম।

● বনসাই রহস্য
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

জনৈক ভৃত্য আমাদের আগমন-সংবাদ নিয়ে বাড়ীর ভিতরে গেল। একটি লোক বেরিয়ে এল। যুবক—বয়স সাতাশ-আটাশের বেশী নয়। সাজপোষাক ফিটফাট।

পুলিস দেখে তার চোখ চমকে উঠল—কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যে। ভাবহীন মুখে সহজ স্বরে সে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনারা কাকে চান?"

সুজন মাতব্বরি চালে এগিয়ে গিয়ে বললে, "প্রাণধন বিশ্বাসকে।"

—"আপনারা বাড়ী ভুল করেছেন।"

—"মানে?"

—"প্রাণধন বিশ্বাস ব'লে কেউ এ বাড়ীতে থাকে না।"

ট্যাক্সি-চালকের দিকে ফিরে সুজন বললে, "এই ড্রাইভার!"

—"হুজুর!"

—"এই বাবুকে চেনো?"

—"হ্যাঁ হুজুর! গেল তেইশ তারিখে এই বাবু আমার ট্যাক্সি ভাড়া নিয়ে বালিগঞ্জে গিয়েছিলেন।"

—"সন্ধ্যার একটু আগে?"

—"হ্যাঁ হুজুর! বালিগঞ্জ থেকে আর এক বাবুকে তুলে নি। তারপর দুই বাবুই এই বাড়ীতে এসে নামেন, আমিও ভাড়া নিয়ে চ'লে যাই।"

লোকটি কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়েই বললে,—"হ্যাঁ, ঠিক কথা।"

একেবারে কবুল জবাব পেয়ে সুজন প্রথমটা হক্‌চকিয়ে গেল। তারপর বললে, "বটে, বটে? কিন্তু আপনার সঙ্গের বাবুটি ছিলেন কে?"

—"তাঁর নাম সত্যেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।"

—"তিনি কেন এখানে এসেছিলেন?"

—"একটি জাপানী গাছ কিনতে।"

—"জাপানী গাছ?"

—"হ্যাঁ, দুর্লভ জাপানী গাছ।"

—"তারপর?"

—"দরে বনিবনাও হ'ল না, তিনি আবার ফিরে গেলেন।"

সুজন এবারে বেগোছে প'ড়ে আর কোন প্রশ্ন না ক'রে জয়ন্তের দিকে তাকালে অসহায়ের মত।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে এগিয়ে গিয়ে বললে, "আমি এই ওজরই শুনব ব'লে মনে করেছিলুম। হ্যাঁ মশাই, আপনি তো প্রাণধন নন, কিন্তু আপনার নামটি কি শুনতে পাই না?"

—"শ্রীরতিকান্ত মজুমদার।"

আমি চমকে উঠলুম।

জয়ন্ত বললে, "পরমহংসদেব বলতেন—যিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ। আপনিও কি তাই? প্রাণধন, রতিকান্ত—দুইয়ে এক?"

● বনসাই রহস্য
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

গরুড় দেখলেন, নীচে এক বিরাট সরোবরে…

রতিকান্ত বিরক্ত কণ্ঠে বললে, "আপনার কথার অর্থ কি?"

—"অর্থটা অনর্থজনক—অর্থাৎ বিপদজনক, শুনলে আপনার রাগ হবে। কিন্তু প্রথমেই রাগারাগি ক'রে লাভ নেই। থাক্ ও কথা। কিন্তু মশাই, আপনার দুর্লভ জাপানী গাছটি কি পদার্থ? একটিবার দেখে কি চক্ষু সার্থক করতে পারি না?"

রতিকান্ত বললে, "আপত্তি নেই। আমার সঙ্গে আসুন।"

রতিকান্তের পিছনে পিছনে জয়ন্ত ও সুজনের সঙ্গে আমিও বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলুম। একেবারে বৈঠকখানায়।

সেকেলে ধাঁজে সাজানো বৈঠকখানা। দেওয়ালে টাঙানো চটা-ওঠা সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো পুরানো বিলাতী 'ওলিয়োগ্রাফ' বা মুদ্রিত তৈল-চিত্র; এদিকে-ওদিকে বহু-ব্যবহৃত বিমলিন সোফা, কৌচ, টেবিল, চেয়ার; মেঝের উপরে রং-জ্বলে-যাওয়া কার্পেট। মনে হয় ঘরখানা একসময়ে সুদিন দেখেছিল।

ঘরের এককোণে চীনে মাটির টবের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে একটি অদ্ভুত গাছ। দেখতে ঠিক দেবদারু গাছের মত। কিন্তু দেবদারু হচ্ছে মহামহীরুহ; অর্থাৎ অতি প্রকাণ্ড বৃক্ষ, কিন্তু এটি হচ্ছে আকারে অতি ক্ষুদ্র—উচ্চতায় হয়তো এক ফুটের বেশী হবে না। একে বামন দেবদারু গাছ বলা চলে। তবে বামন হয় কুগঠন ও বিকলাঙ্গ, এর আকার কিন্তু নিখুঁত ও স্বাভাবিক। যেমন 'সো-কেসে' সাজিয়ে রাখা হয় বিরাট তাজমহলের একরত্তি 'মডেল', একেও তেমনি মস্ত দেবদারুর ছোট্ট 'মডেল' ব'লেই মনে হয়। 'মডেল' মনে হ'লেও এ হচ্ছে জীবন্ত গাছ! গুঁড়ি, ডালপালা ও পাতা সবই সজীব ও স্বাভাবিক।

সেই অদ্ভুত গাছের কাছে গিয়ে রতিকান্ত বললে, "ঐ দেখুন।"

জয়ন্ত বললে, "বন্-সাই, বন্-সাই!"

সুজন বিস্মিত স্বরে বললে, "বন্-সাই? সেদিনও শুনেছিলুম, আজও আপনার মুখে আবার শুনছি ঐ বেয়াড়া কথাটা। বন্-সাই কি মশাই? মাথামুণ্ডু নেই, যা তা একটা বললেই হ'ল?"

জয়ন্ত একটু হেসে বললে, "বন্-সাই হচ্ছে জাপানী কথা। বন্-সাই বলতে বোঝায় টবে পালন করা বামন গাছ। শিল্পী বিশেষ কৌশলে এমন ভাবে গাছের বাড় বন্ধ ক'রে দেয়, যার ফলে মস্ত মস্ত বনস্পতিকেও দেখতে হয় শিশুদের ক্রীড়নকের মত ছোট ছোট। ঠিকভাবে পালন করতে পারলে এই সব বামন গাছ পাঁচ-সাতশো বা হাজার বৎসরও বেঁচে থাকে। বামনে পরিণত করা যায় নানাশ্রেণীর বৃক্ষকেই—এমন কি বাঁশঝাড়-কে-বাঁশঝাড় পর্য্যন্ত। এ হচ্ছে জাপানের একটি নিজস্ব প্রাচীন আর্ট। সেখানকার ধনী আর সম্ভ্রান্ত সমাজ থেকে জনসাধারণেরও মধ্যে এই শ্রেণীর গাছের চাহিদা আছে অত্যন্ত। এখন কেবল জাপানে নয়, য়ুরোপ-আমেরিকাতেও জাপানী বামন গাছকে গৃহসজ্জার একট প্রধান ভূষণের মত ব্যবহার করা হয়। যে বামন গাছের বয়স যত বেশী, তার দামও হয় তত চড়া।"

সুজন বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে গাছটা দেখতে দেখতে বললে, "এর খানিকটা ভাঙা দেখছি যে!"

জয়ন্ত বললে, "ঘটনাস্থলে মৃতদেহের হাতের মুঠোয় গাছের যে ভাঙা অংশটা পাওয়া গেছে, সেটা সঙ্গে ক'রে এনেছেন কি?"

—"চিঠিতে আনতে বলেছেন, আনব না?"

—"এই গাছের ভাঙা জায়গায় সেটা একবার জুড়ে দিয়ে দেখুন তো!"

সচমকে সুজন বললে, "কি বলতে চান আপনি? তবে কি—তবে কি—"

সেই ভাঙা ডালটা যথাস্থানে যুক্ত ক'রেই নিশ্চিতভাবে বোঝা গেল, সেটা এই বামন গাছেরই অংশবিশেষ ছাড়া আর কিছুই নয়!

সুজন দুই চোখ পাকিয়ে ব'লে উঠল, "তাহ'লে সত্যেনবাবুকে হত্যা করা হয়েছে এই ঘরেই?"

জয়ন্ত কোন জবাব না দিয়েই বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল রতিকান্তের উপরে এবং দুই হাতসুদ্ধ তার দেহটাকে নিজের দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে বললে, "মাণিক, এ হঠাৎ পকেটের মধ্যে ডানহাত চালিয়ে দিয়েছে কেন দেখ তো!"

তার পকেটের ভিতর থেকে টেনে বার করলুম একটা রিভলভার!

জয়ন্ত বললে, "যা ভেবেছি তাই! রতিকান্ত মরিয়া হয়ে আমাদেরও বধ করতে চেয়েছিল! সুজনবাবু, চট্ ক'রে এই সর্ব্বনেশের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিন!"

সুজন তৎক্ষণাৎ কথামত কাজ ক'রে বললে, "বাপরে বাপ, এতটা আমি তো ভাবতে পারি নি!"

জয়ন্ত বললে, "এই রতিকান্তই নাম ভাঁড়িয়ে সত্যেনবাবুকে এখানে ভুলিয়ে এনে হত্যা করেছে!"

—"আর দ্বিজেন?"

—"নির্দ্দোষ। সুজনবাবু, আপনি যদি আরো একটু তলিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন, তবে লতিকা দেবীর মুখ থেকেই রতিকান্তের অস্তিত্ব জানতে পারতেন। মরণোন্মুখ ধনী পিতার সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী লতিকা দেবী, সে ছিল তাঁরই পাণিপ্রার্থী, বিবাহের দিন পর্য্যন্ত ধার্য্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লতিকা দেবী তার কবল থেকে ফস্কে গিয়ে পড়েন সত্যেনবাবুর হাতে, আর সেইজন্যে বেচারা সত্যেনবাবু হন রতিকান্তের দু'চক্ষের বিষ, তার প্রাণে জ্বলে মারাত্মক হিংসার আগুন। দেড় বছর ধ'রে ওত পেতে সে সুযোগ খুঁজতে থাকে। তারপর চরম সুযোগ পায় হতভাগ্য সত্যেনবাবুর 'কিউরিও' সংগ্রহের বাতিকের জন্যে। তিনি যখন বামন গাছটার উপর হাত রেখে সেটা মন দিয়ে পরীক্ষা করছিলেন, খুব সম্ভব সেই সময়েই সে তাঁকে হত্যা করে, কিন্তু গাছের একটা টুকরো যে ভেঙে তাঁর হাতের মুঠোর ভিতরে থেকে যায়, এতটা লক্ষ্য করে নি। তারপর পুলিসকে ভোলাবার জন্যে গভীর রাতে মৃতদেহ দূরে ফেলে দিয়ে আসে। আমি কিন্তু ভুলি নি, মৃতের হাতে সেই গাছের টুক্‌রো দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম, হত্যাকাণ্ডটা হয়েছে এমন কোন ঘরের মধ্যে, যেখানে সাজানো আছে একটা জাপানী বামন গাছ। এমন গাছ মাঠে-জঙ্গলে নয়, থাকে সাধারণতঃ সৌখিন বাবুদের বৈঠকখানাতেই। এই জাপানী 'কিউরিও'র জন্যেই হয়েছে হত্যা, আবার এই জাপানী 'কিউরিও'ই ধরিয়ে দিলে হত্যাকারীকে! আপাতত আমার কথা ফুরুলো, এইবার আমরা বিদায় নিতে পারি সুজনবাবু? কিন্তু দয়া ক'রে স্মরণ রাখবেন, সখের গোয়েন্দা মাত্রই 'হবুচন্দ্র' খেতাব লাভের যোগ্য নয়!"

সুজন নতমুখে জোড়হাতে বললে, "মনে রাখব। মাপ করবেন।"

---

# নীলসায়রের বিভীষিকা

শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়

দল বেঁধে চলেছে ওরা!

মাছেদের স্বভাবইতো ঝাঁকে ঝাঁকে, নিজেদের গোষ্ঠী নিয়ে থাকা।

এলোমেলো ভাবে, খেয়াল-খুসীমত যে যেখানে পারে।

কিন্তু পরীমাছদের অন্য ধরণ, যেমন রূপ, তেমনি স্বভাবটি!

যখন চলে পাশে পাশে গায়ে গা ঠেকিয়ে সারিবদ্ধ-ভাবে, দেখে মনে হয় ঠিক তাসের গোছাটি কে যেন টেবিলের ওপর ঢেলে দিয়েছে।

নীলসাগরের তল যেখানে,—যেখানে প্রবাল সৌধের সার বেঁধেছে, লাল আর সাদা রং-এর ঢেউ উঠেছে সূর্য্যের আলো এসে প'ড়ে,—সেখানেই থাকে ওরা। কোথাও স্পঞ্জের বন ঝাউ-এর মত সারবন্দী, হয়ত পাহাড়ের ছোট্ট একটা গুহা, থাকে সেখানে শামুক, কড়ি, তারা-মাছ আর কাঁকড়ার ঝাঁক, সারা

গায়ে তাদের কাঁটা, আরও সব ভয়ঙ্কর চেহারার কুৎসিত মাছের দল। তা হোক, তাদের এড়িয়ে পরীমাছেরা চলে। প্রবালের মণিকোঠার পাশে পাশে থাকে, রূপালী দেহে কালো ডোরাকাটা, লাল চোখে কাজল পরা। আলো পড়ে' গায়ে খেলে রামধনুর ঝিলিক্।

এত রূপ বলেই তো দেহ ভারি ভঙ্গুর! পিঠের ওপরে আর পেটের নীচে মস্ত দুই পাখ্না, একটু আঘাত লাগলেই পাছে ভেঙ্গে যায়, তাই গলার নীচ থেকে লম্বা দুটি শুঁড় রাত-দিন পাহারা দিচ্ছে—কোন কিছুতে দেহ ঠেকবার আগেই লম্বা শুঁড়ের স্পর্শে সাবধান হ'য়ে যায় ওরা।

তাই দল বেঁধে অত সন্তর্পণে চলে ওরা, বুড়ো পরীমাছটা ছোট ছোট ছানাদের পথ দেখিয়ে চলে। ছোটরা ছুটে চলতে চায়—ছুটেও যায় কেউ কেউ, আবার ভয় পেয়ে ছুটে চলে আসে, বলে—"ও বাবা।"

"সে কিরে?" জিজ্ঞেস করে বুড়ো পরীমাছটা।

বাচ্চা বলে—"জুজু!"

"কিসের জুজু রে?"

বাচ্চারা বলে,"দেখ্‌বে চল।"

বুড়ো হেসে বলে, "ও আমার দেখা আছে।"

শেষ পর্য্যন্ত যেতে হয় না আর—জুজুটা পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

বুড়ো হাঁক দিয়ে বলে—"দল বেঁধে থেকো না আর, ছড়িয়ে পর সব! ছড়িয়ে পড়।"

মুহূর্ত্তে—তীর বেগে ছড়িয়ে পড়ে সকলে।

বিরাট দেহটা তাচ্ছিল্য ভাবে এলিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে এক দলা আঁধার যেন পাশ দিয়ে চলে গেল। মুখে জ্বলন্ত আগুনের ফুলঝুরি!

"কী—ওটা?" ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে বাচ্চারা—

বুড়ো পরীমাছ আড় চোখে দেখে নিয়ে বলে—"ভূতো মাছ।"

"ভূতো মাছ, সে আবার কি?"

"দেখলে না কি বিশ্রী ভূতের মত কুচ্‌কুচে কালো—বেঢপ্ বেয়াড়া চেহারা! শুধু তাই নয়, ওরা থাকে সমুদ্রের গভীর তলে পাহাড়ের বড় বড় অন্ধকার গুহায়, যেখানে সূর্য্যের আলো একটুও পড়ে না। পেটে রাক্ষসের খিদে নিয়ে ফির্‌ছে—কি খাবে, কাকে খাবে তাই শুধু চিন্তা।"

বাচ্চারা অবাক হ'য়ে বলে—"তাই বুঝি?"

বুড়ো পরীমাছটা ওদের পিঠে আদর ক'রে শুঁড় বুলিয়ে বলে—"ও যে কী ক'রে এখানে এসে পড়্‌ল তাই ভেবে পাচ্ছি না—! অন্ধকারে ওই ভূতো মাছগুলো মিশিয়ে থাকে, দাঁতগুলো সজারুর কাঁটার মত লম্বা লম্বা আর তেমনি ধারালো—অন্ধকারে দাঁতগুলো দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলে—নিরীহ মাছরা কিছুই

● নীলসায়রের বিভীষিকা
শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখতে পায় না, জমাট অন্ধকারের মধ্যে অবাক হ'য়ে ছুটে যায় দাঁতগুলোর দিকে মোহগ্রস্তের মত কৌতূহলী হ'য়ে।"

"কি বিশ্রী ভূতের মত কুচ্‌কুচে কালো—বেঢপ্ বেয়াড়া চেহারা।" [পৃঃ ১৮০

"তারপর?" জিজ্ঞাসা করে বাচ্চারা।

"তারপর—টুপ করে গিলে খায়।"

"শুধু তাই নয়, নাকের ওপর লম্বা ছিপের মত একটা শুঁড়, দেখলে ত? তার ডগাতেও আলো জ্বলে,—তোমাদের মত বোকা ছেলেদের ভুলিয়ে আনবার জন্যে।"

ভয় পেয়ে বাচ্চারা বলে—"তবে পালিয়ে যাই চ'ল। যদি আবার এসে আলো জ্বেলে আমাদের ভুলিয়ে নেয়!"

বুড়ো হেসে বলে, "কোথায় যাবি পালিয়ে? এখানে কোথাও পালাবার জায়গা নেই। সব জায়গায় ভয়, পদে পদে বিপদ।

● নীলসায়রের বিভীষিকা
শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়

এই সমুদ্র!—ওপরে অশান্তের তাণ্ডব নাচ, আর নীচে মৃত্যু-ফাঁদ। কে যে কখন কাকে ধরে খায়, কিছু ঠিক নেই! তবে শোন—বলি," গল্প বলতে বসে বুড়ো পরীমাছটা।

"ছোটবেলায় আমি বড্ড বেপরোয়া ছিলুম, কোন কিছুর বাধা মানতুম না; জ্ঞান হ'য়ে হঠাৎ আমাদের বিরাট রাজ্যের অস্তিত্বটা টের পেয়ে গেলুম। মনে হল দেখ্‌তে হবে ঘুরে ফিরে, আমার মনের ইচ্ছেটা বল্লুম একদিন মা'র কাছে। মা বল্লেন, 'ওটি কোরোনা বাপু, আমরা অত্যন্ত নিরীহ, আর ভাল মানুষের জাত। জলের রাজ্য বড় ভাল জায়গা নয়, পদে পদে আপদ বিপদ!'"

আমি বল্লুম, "আমার আর একার ভয় কি? দল বেঁধে থাক্‌লেই তো বেশী বিপদ। তুমিই তো একদিন বলেছ, দল বেঁধে থাক্‌লে ঐ রাক্ষুসে হাঙ্গর আর ভূতুড়ে মাছ, নয়ত কুকুরে মাছ, নয়ত তিমির একটা বিরাট হাঁ-এর মধ্যে দলকে-দল ঢুকে যাবে, একটা দুটো ছুট্‌কোকে কোনদিনই তাড়া করে না ওরা!"

মা বল্লেন, "তা হোক—কোথাও যেতে হবে না তোমাকে।" চুপ করে থাক্‌লুম। মা বুঝলেন আমি হয়ত তাঁর কথা মেনে নিলুম, কিন্তু আমার একগুঁয়ে স্বভাব, মনে মনে যা স্থির করলুম মুখে তা প্রকাশ করলুম না।

একদিন তাই বলা নেই কওয়া নেই, একা একা বেরিয়ে পড়েছি দেশ ঘুরতে—ওপরের দিকে উঠ্‌ছি—আমাদের পাতালপুরীর ঝলমলে প্রবালের রাজ্য পায়ের তলায় কোথায় পড়ে আছে কে জানে! হঠাৎ দেখি—বড় বড় অতিকায় সব রাক্ষসদের রাজ্যে এসে পড়েছি। আমাদের এই ভারত-মহাসাগরে যে এমন অদ্ভুত সব জানোয়ার থাকতে পারে আগে কে জানত!

আমি একটাকে অবাক হ'য়ে হাঁ করে দেখছি—এমন সময় ছোট্ট একটা চাঁদা মাছ আমার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বল্লে, "কী দেখছ বোকার মত, পালাও—"

তার সঙ্গে পালাতে পালাতে জিজ্ঞাসা করলুম, "ওটা কী ভাই?"

চাঁদা ভায়া বল্লে—"কোন দেশের ন্যাকা তুমি?—ও যে হাতুড়ি-মুখো হাঙ্গর।"

"হাঙ্গর?"

"হ্যাঁ—ওদের অনেক জাত, অনেক ধরণের হয় ওরা—এই অদ্ভুত জাতটা শুধু আমাদের দেশেই বাস করে; হাতুড়ির মত মুগুর দু'পাশে দুটো চোখ,—গায়ে যেমন শক্তি, তেমনি নাছোড়াবন্দা, জানকবুল করে তেড়ে ধরে।"

"বটে?" আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লুম।

আমার গা টিপে ইসারায় চাঁদা বল্লে—"ঐ দেখ—ঐ অদ্ভুত শঙ্কর মাছটা ঐ দিকে এগিয়ে চলেছে—আস্তে আস্তে এগিয়ে চল, একটা মজা দেখতে পাবে।"

"কীসের মজা?"

আমার মুখের কথা ফুরুবার সঙ্গে সঙ্গে হাতুড়ি-মুখো হাঙ্গরটা আমাদের দিকেই এসে হাজির!

- নীলসায়রের বিভীষিকা
  শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়

পেছন ফিরে আমরা তো দে ছুট্। ফিরে দেখি—সামনাসামনি শঙ্কর মাছ আর হাতুড়ি-মুখো হাঙ্গর! ওকে দেখেই শঙ্কর মাছ তার চাবুকের মত লেজটা তুলে দে দৌড়! অমনি পেছনে পেছনে হাতুড়ি-মুখো হাঙ্গরটাও ছুটেছে ধরবার জন্যে।—

"পেছনে পেছনে হাতুড়ি-মুখো হাঙ্গরটাও ছুটেছে...

● নীলসায়রের বিভীষিকা
শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়

চাঁদা বল্লে, "মজা দেখ্‌বে তো ছুটে চল, ভয় কি? ও আমাদের ধরবে না, হাতুড়ি-মুখোগুলো শঙ্কর মাছই শুধু খায়।"

দু'জনে ছুটে চলেছি প্রাণপণে, ততক্ষণ দু'জনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে। শঙ্কর মাছটা তার লেজের চাবুক দিয়ে সপাসপ হাঁকিয়ে চলেছে হাঙ্গরটার মুখে চোখে। মুখ কেটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে রাক্ষুসে হাঙ্গরটার।

দু'তিনটে ছোঁ দিয়ে শঙ্কর মাছটার চেপটা দেহের অনেকখানি খেয়ে ফেলেছে, শেষটায় দেহ এলিয়ে দিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল শঙ্কর মাছটা, আর একটা ছোঁ দিয়ে তাকে মুখে করে পালাবে হাতুড়ি-মুখোটা, এমনি সময় সেই জায়গায় যমদূতের মত এসে হাজির আর এক রাক্ষস! বল্লুম, "এ আবার কে?"

চাঁদা মাছ কানের কাছে মুখ এনে আস্তে আস্তে বল্লে—

"হাঙ্গরদের মাসতুতো ভাই—ওর নাম 'কুকুরে মাছ', এরা সকলেই সমুদ্রের ধাঙড় বল্লেই হয়, কিছুই পড়তে পায় না, যা কিছু পায় সবই খায়, হাতুড়ি-মুখোটার পেছনে পেছনে ঘুর্‌চে,—যদি ফাঁকতালে একটু পেসাদ পায়!"

আমার বুকের ভেতরটা তখন টিপ্‌ টিপ্‌ করছে,—আর অমনি মায়ের মুখখানা মনে পড়ে গেল, —কাঁদো-কাঁদো হয়ে বল্লুম, "বাড়ি যাব।"

চাঁদা হেসে বল্লে,—"ছেলেমানুষ! ভয় পেয়ে গেলে তো!" থেমে আবার বল্লে,—"বাগে পেলে নস্যির টিপের মত তোমাকে আমাকেও ধরে হয়ত খায়, কিন্তু আমরা ত' বেশ দূরেই আছি।"

চোখ বুজে বল্লুম—"চল পালাই, ওর সারা গায়ে গুলবাঘের মত কালো কালো টিপ, কি কুৎসিত মুখ!"

চাঁদা খিলখিল করে হেসে বল্লে—"আমাদের জাতের মধ্যে তোমরাই সুন্দর বলে এত অহঙ্কার?"

আবার আমরা ওপরের দিকে উঠতে সুরু করেছি। চাঁদা বল্লে—"এতো ঢের ভাল। পশ্চিম সাগরে আরো সব ভয়ানক ভয়ানক জীব আছে। আমাদের এদিকে যে সব 'এল্‌ মাছ' আছে দেখেছ, তারা রাক্ষস বটে, কিন্তু তাদের আর এক গোষ্ঠী পশ্চিম সাগরে ব্রেজিল দেশের কাছে বাস করে, তাদের নাম—'বিজলী এল্‌', যেমন লম্বা, তেমনি প্রকাণ্ড। গায়ের রং স্লেটের মত ধূসর, মাথার ওপরটা সিঁদুর ঢালা টুকটুকে লাল—রেগে গেলেই লেজ আর মাথা বাঁকিয়ে যেই ঠেকিয়ে দেয় অমনি তিনশো' ভোল্ট বিদ্যুৎ ছাড়ে চড়াক্‌ করে! মাথাটায় পজেটিভ্‌ আর ল্যাজটায় নেগেটিভ্‌ পোল হ'য়ে যায় বোধহয়। এই মনে ক'র তোমাকে কাবু করে ফেলে হয়ত খেতে হবে—অমনি—"

ভয়ে চাঁদার গা জড়িয়ে ধরি পেটের শুঁড় ঠেকিয়ে। বলি—"আর নয়—চল বাড়ি যাই—।"

চাঁদা ঠিক তেমনি হো হো করে হেসে বল্লে—"ছেলেমানুষ, ভয় পেয়ে গেলে তো!"

আমার ভারি বিশ্রী লাগছিল চাঁদার কথা শুনে,—এদিকে ভয়ে আমার গলা কাঠ হ'য়ে আসছে, আর চাঁদা কিনা রসিকতা করে চলেছে!

● নীলসায়রের বিভীষিকা
শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়

ওপরে—একদম ওপরে উঠে এসেছি। চাঁদাকে বল্লুম, "এখান থেকে আমাদের বাড়ি কতদূর নীচে হবে?"

চাঁদা বল্লে, "তা মাইল আড়াই তিনেকের তো কম নয়।"

গল্পে গল্পে কোথা থেকে কোথায় চলে এসেছি, খেয়ালই নেই। জল থেকে মুখ তুলে দেখি মাথার ওপর আর একটা সমুদ্র। চাঁদা বল্লে যে, ওটা আকাশের সমুদ্র, তাতে মেঘ—তার ওপর আবার রং ধরেছে, অস্তগামী সূর্য্যের নাকি সিঁদুর-ঢালা আভা, আমাদের লাল প্রবালের ফুলবাড়ির মত। তাতে আবার মাঝে মাঝে টুকরো কালো মেঘের পাশ দিয়ে সোনালী ছটার তুব্ড়ি বাজী ছুটে বার হচ্ছে। দেখে খুব মজা লাগছিল কিন্তু ঢেউ-এর যা মাতামাতি! চাঁদা বল্লে—"তোমার দেহের পাখনা ভারি নরম, ঢেউ-এর ঝাপ্টা খেলে আর বাড়ি ফির্তে পারবে না, অত উঁকিঝুকি দিয়ো না।"

ভয়ে ভয়ে একটু জলের তলায় থাকি—আমাদের নিয়ে ঢেউ নাগরদোলা খেলে চলেছে, ভারি মজা লাগচে—আমি হেসে চাঁদার গায়ে ঢলে পড়ি।

চাঁদা আবার বল্লে—"ছেলেমানুষ কিনা! অল্পেতেই হেসে কুটিপাটি।"

বুড়োর গল্প শুনতে শুনতে বাচ্চা পরীমাছরা একসঙ্গে বলে উঠ্ল—"তারপর কি হল বল!"

একটা বড় গোছের পরীমাছ বুদ্ধি খাটিয়ে বল্লে—"তারপর একটা 'বিজলী এল্' ছুটে না—এসে—"

বুড়ো পরীমাছটা চোখ পাকিয়ে বল্লে—"ঠাট্টা নয়! তারপর যা হল—তা অতি ভয়ঙ্কর! কোথায় বিজলী এল্? এটা তো ভারত মহাসাগর—তাদের ভয় তো এখানে নেই, এখানে সেই রাক্ষুসে হরেক রকমের হাঙ্গরগুলোর বিশ্রী উৎপাত!

আমরা ঢেউ-এর নাগরদোলায় দোল খাচ্ছি, কখনও চারতলা সমান ওপরে উঠ্ছি কখনও নামছি পাতালে। চাঁদা বল্লে—"এখানে কূলের দিকে জল কম, তাই ঢেউও বেশী। চ'ল, আর নয়,—এরচেয়ে ভেতরের দিকে যাই, সেখানে ঢেউ কম।"

পাতলা জলের চাদরের নীচ দিয়ে চলেছি মাঝ সমুদ্রের দিকে, মাথার ওপরে সামুদ্রিক পাখীগুলো উড়্ছে,—ছোঁ দিয়ে দিয়ে ছোট ছোট মাছ ধরে খাচ্ছে আর ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ করছে। আমার পাশেই ঝপ্ করে একটা উড়ে এসে জলে ব'সল,—চাঁদা আর আমি টুপ্ করে ভাগ্যিস্ ডুব দিয়েছি! কিন্তু পৃথিবীর আকাশটা আমার বড্ড ভাল লেগেছে, থাকতে পারলুম না ডুব দিয়ে, আবার ভেসে উঠে চলেছি আকাশের দিকে চেয়ে। হঠাৎ দেখি সাম্‌নে প্রলয় কাণ্ড, ও কিসের যুদ্ধ চলেছে, জলের তোলপাড় শব্দ কানে আস্ছে, থেমে গেলুম, চাঁদা বল্লে, "সাবধান!"

"কী ব্যাপার বলত?"

"হাঙ্গরে শিকার ধরেছে! কূলের দিকে এইসব বিপদ বড্ড বেশী।"

"তার মানে?"

চাঁদা বল্লে, "হয়ত কোন বিরাট এক মাছের ঝাঁক চলেছিল—তাদের পাকড়াও করেছে দুই হাঙ্গরে,—তাকিয়ে দেখ,—দেখতে পাচ্ছ না? জলের ওপরে ওদের লম্বা তলোয়ারের মত ল্যাজের পাখ্না, আর অসুরের মত দুই দানব ঘুরপাক খাচ্ছে মাছগুলোকে ঘিরে।"

"তা তো দেখছি।"

চাঁদা বল্লে, "মাছের দলটাকে ঐভাবে বন্দী করে ঘুরপাক দিচ্ছে তাদের চারিপাশে। মাছগুলো ভয়ে হতভম্বের মত দিশেহারা হ'য়ে পড়েছে।
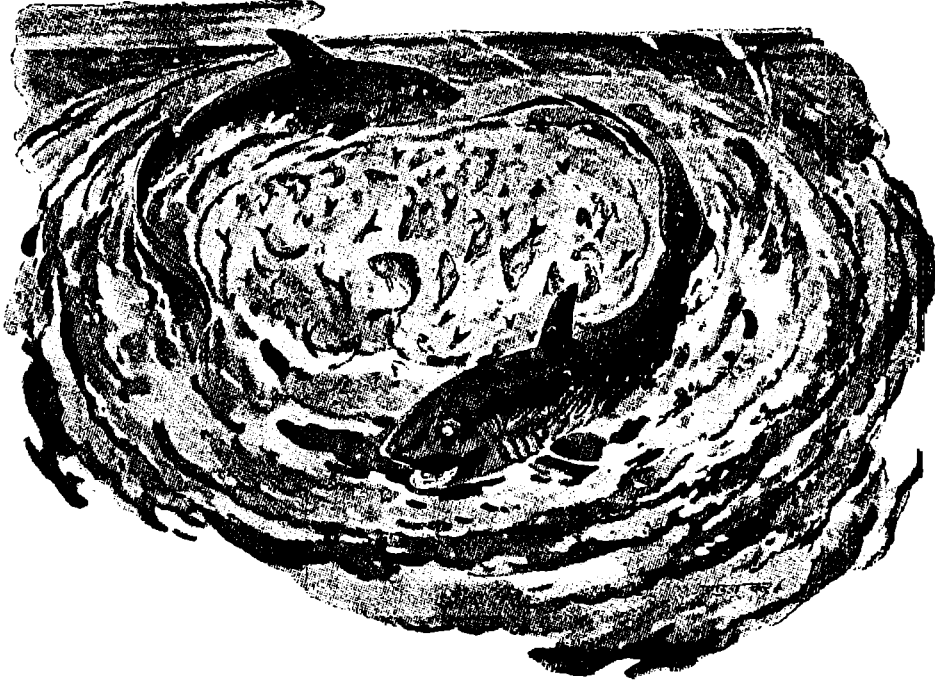
মাছের দলটাকে বন্দী করে ঘুরপাক দিচ্ছে চারিপাশে। [পৃঃ ১৮৫

ল্যাজের ঝাপটায়—আর আলোড়নে জলে পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনা ভেসে উঠেছে দেখতে পাচ্ছ ত?"

আমিও বোকার মত দেখছি অসুর দুটোর কাণ্ড। চাঁদা আস্তে আস্তে বল্লে—"ওরা কিছু বুঝবার আগেই দু'জনে ছুটে এসে টপাটপ গিলে খাবে।

এরা—'থাপ্পড়দার হাঙ্গর'—ল্যাজের এক একটা থাপ্পড় বড় সোজা নয়! বড় বড় তিমি মাছকেও তাড়া করে ঝাপটা মারে।"

● নীলসায়রের বিভীষিকা
শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়

মাছগুলোর শেষ পরিণতি দেখবার আর আমার ধৈর্য্য নেই—বল্লুম চাঁদাকে—"ভাই তুমি থাক আমি চল্লুম"—এই বলেই নীচমুখো দিলাম চোঁচা দৌড়। চাঁদাও ছুটে এসে আমায় ধরে ফেল্লে, বল্লে, "আমিও যাব—চল, কোথায় যাবে।"

"যাবো আমাদের এলাকায়,—সেই অতলতলে, যেখানে—জোলো ঘাস, শ্যাওলাধরা পাথরের নুড়ি আর প্রবালমালা স্বপনপুরীর মায়াকানন রচনা করেছে।" বল্লুম চাঁদাকে ছুট্‌তে ছুট্‌তে।

চাঁদা বল্লে, "তাহলে চল তোমাদের দেশেই যাই—আমার কোন বাড়ী-ঘর নেই, ভবঘুরের মত সারা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

বাড়ী ফিরে এসে দেখি,—অত্যন্ত ম্লানমুখে ঘোরাফেরা করছে সকলে, কেউই কথা বলে না। ব্যাপার কী—?

কড়ি ঝিনুক আর মুক্তোর শুক্তি এসে ঘিরে ধরে ইসারায় বল্লে, "এতদিন কোথায় ছিলে—? কী করে পথ চিনে বাড়ী ফিরলে?"

"কেন তাতে কী হয়েছে?" অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি।

ছোট্ট ঝিনুকটা বল্লে—"তোমার মা তোমার জন্যে কেঁদে কেঁদে মরে গেছে। বড্ড ভাবনা হ'ল তোমাকে না দেখে—তাই ছুটোছুটি করে খুঁজতে গিয়ে সেই যে পাখনাটায় চোট লাগল একদিন—। ...তারপর...তারপর কেঁদে কেঁদে মরে গেল—আর অমনি কোথায় যে ছিল একটা 'নেকড়ে মাছ'—মুখে করে নিয়ে পালিয়ে গেল।"

বাচ্চা পরীমাছরা ঘিরে ধরে বুড়ো পরীমাছকে জিজ্ঞাসা করে—"কোথায় গেল নেকড়ে মাছটা তোমার মাকে মুখে করে নিয়ে?"

বুড়ো পরীমাছটা তখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, যেন সে কথা সে শুনতেই পেল না, বোধহয় ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেল্‌লে—কয়েকটা ছোট্ট ভুড়ভুড়ি ওপরের দিকে উঠে গেল কাঁপতে কাঁপতে।

---

নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ
শুষ্কঃ কাষ্ঠশ্চ মূর্খশ্চ ভিদ্যতে ন চ নম্যতে।।
—প্রাচীন শ্লোক

# মনি ও মুক্তা

ফলবান বৃক্ষ আর গুণবান লোক আপনা থেকেই নত হয়। শুকনো কাঠ আর মূর্খ ভেঙ্গে দুমড়ে যায় কিন্তু নত হয় না।

# ॥ বৈশালী ॥

নরেন্দ্র দেব

ভাগীরথী তীরে ছিল বৈশালী জনপদ সুন্দর ;
হিরণ্যবাহু সঙ্গম পারে—নগরী সে মনোহর !
দক্ষিণে বাহে পূত সুরধুনী, পশ্চিমে গণ্ডক,
মহানন্দার আনন্দ রোলে উচ্ছল ছন্দক !

বৈশালী নহে শ্রীবিশালা পুরী মালবের মালভূম
নহে সে উজল উজ্জয়িনীর ললাটের কুঙ্কুম !
এর বহু পারে সিপ্রার তীরে অবন্তী উদ্ভব,
যেথা প্রলয়ের ডমরু বাজায় মহাকাল ভৈরব !

বৈশালী হ'ল জম্বু দ্বীপের সুপ্রাচীন এক দেশ,
কত কথা আর কত যে কাহিনী শুনি যার নাহি শেষ !
জানো কি এখানে কারা একদিন করেছিল সুখে বাস ?
বৈশালী দেশ গড়ে ওঠে কবে ? শোনো তার ইতিহাস।

বহুকাল আগে কাশীরাজ-পুরে মহারাণী একজন,
নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া সতত কাতর মন !
কত দেব দেবী করিয়া মানত পূজা দিয়া বার বার,
হতাশ-হৃদয়ে রাণী ভাবিছেন—আশা কিছু নেই আর !

এমন সময় শোনা গেল-নাকি—সন্তান হবে তাঁর,
রাজপ্রাসাদের মহলে মহলে রটিল এ সমাচার !
যথাকালে রাণী করেন প্রসব—পুত্র কন্যা নয়,
ডিম্বাকৃতি-বস্তু বিশেষ,—মাংসপিণ্ডময় !

মহারাণী বড় দুঃখে দিলেন আপনারে ধিক্কার ;
না-জানি কি পাপে—কার অভিশাপে—ঘটিল এদশা তাঁর !
ডাকিলেন রাণী রাজপুরোহিতে, শুধালেন উপদেশ,
তিনি কহিলেন, হায় মা রাজ্ঞী, শোনো বলি সবিশেষ—

কোনো প্রেতযোনী-প্রভাবে ঘটেছে এ ঘটনা অদ্ভুত !
গঙ্গা গর্ভে দাও মা ভাসায়ে—নিয়ে যাক যমদূত।
অশুচি পিণ্ড গৃহে যদি থাকে ঘটিবে অমঙ্গল !
যা কিছু অশুভ সব ধুয়ে দেবে গণ্ডকী নদী জল।

● বৈশালী
নরেন্দ্র দেব

মহারাণী শুনি' অশ্রুসজল ছল-ছল দুটি চোখ,
দিলেন ভাসায়ে নদীজলে সেটি, চাপিয়া পুত্রশোক।

কী যেন ভাসিয়া চলিয়াছে স্রোতে...

সোনার পাত্রে দিন ও রাত্রে
মাংসপিণ্ড চলে
ভাসিতে ভাসিতে নদনদী স্রোতে,
ঘাটে ঘাটে, সাঁকো তলে!

পুণ্য প্রভাতে মহামুনি এক
নদীতে করিতে স্নান
কী যেন ভাসিয়া চলিয়াছে স্রোতে,
সহসা দেখিতে পান।
যত্নে কুড়ায়ে আনিলেন তাহা,
ঋষির ব্যাকুল মন,
স্বর্ণপাত্রে কি আছে কে জানে?
আলো কার তপোবন!

তারপর গেছে কেটে কতদিন,
একদা না-হ'তে ভোর!
চকিতে ঋষির ঘুম ভেঙে যায়—
শুনিয়া শব্দ জোর!
সেই শেষ রাতে মাংসপিণ্ড ফেটে হ'ল চৌচির!
দুটি শিশু যেন উঠিল কাঁদিয়া— মুনি শুনি অস্থির!
একটি বালক—একটি বালিকা! ঋষি ভাবে হায় হায়!
এ যে আশ্রম, নবজাত শিশু এখানে কি রাখা যায়?

● বৈশালী
নরেন্দ্র দেব

আহা মরি মরি ! রূপের সাগরে—যেন দুটি বুদ্বুদ,—
কেমনে এদের পালিব এ বনে ?—কোথায় স্তন্য-দুধ ?
কাঁদিছে শিশুরা ; ঋষি স্নেহভরে তাদের ভোলাতে যান,
দু'জনার মুখে আঙুল ছোঁয়ায়ে বলেন, বাছারা টান !
ঋষির আঙুল চুষিয়া
তাহারা স্তন্য পীযূষ পায়,
মুনি ভাবে, এ কি বিধাতার কৃপা ;
রহস্য বোঝা দায় !
ছেলে মেয়ে দুটি ক্রমে বেড়ে ওঠে,
মুখরিত আশ্রম,
আকৃতি প্রকৃতি এক উভয়ের,—
রূপে গুণে অনুপম !
কুমার-কুমারী—চেনাও কঠিন,
অনুরূপ অবিকল,
মুনি রাখিলেন নাম—'লিচ্ছবি'
অর্থাৎ—'একদল'!
কেবা পিতামাতা কেহ নাহি জানে,
নাহি জানে কোন্ জাত ?
শুধু বোঝে এরা সদ্বংশের,
স্বভাবে রাজার ধাত !
কিন্তু, যখন কুলশীল হীন অজ্ঞাত পরিচয়—
গ্রামবাসী কেউ ওদের দুটিকে স্থান দিতে রাজি নয় ।

দু'জনার মুখে আঙুল ছোঁয়ায়ে...

থাকে তারা দূরে ; কথাটি বলে না, কুণ্ঠিত সদা মন,
সবাই সমাজে করেছে তাদের কৌশলে বর্জন !

● বৈশালী
নরেন্দ্র দেব

'বৃজি' নাম তাই রটে গেছে, কেউ দেখে না ওদের মুখ,
গ্রামের লোকের হীন ব্যবহারে মুনি পান মনে দুখ।

—কর মন্ত্র উচ্চারণ,...

পুত্রে অধিক ভালবাসে
তিনি নিলেন শিক্ষাভার,
জ্ঞানে গুণে তারা উঠিল বাড়িয়া—
মেধাবী চমৎকার!
শৈশব শেষে কৈশোর এল,
এল ক্রমে যৌবন,
ছেলে মেয়ে হ'ল যুবক যুবতী,
এক প্রাণ এক মন!

অনেক চেষ্টা করিলেন ঋষি
বিবাহ যাহাতে হয়,
কুল শীল হীন পাত্র পাত্রী
নিতে কেহ রাজি নয়।
ঋষি ভাবে এই কুলের বিচার
কোথা ছিল সেই দিন—
মানুষ প্রথম এসেছিল যবে
ধরায় গোত্র হীন?

মুনি অবশেষে নিরুপায় হ'য়ে দু'জনারে ডেকে কন—
তোমাদের দেব পরিণয়, কর মন্ত্র উচ্চারণ,
আজ হ'তে দোঁহে দম্পতি রূপে করিবে হেথায় বাস,
আশিস করুন প্রজাপতি যেন সুখে থাকো বারোমাস!

● বৈশালী
নরেন্দ্র দেব

সেদিন হইতে পতি ও পত্নী হ'ল তারা দুইজন,
পুত্র কন্যা ক্রমে ক্রমে ঘরে এল কত অগণন।
তারা বড় হ'ল, তাদের আবার হ'ল বহু সন্তান,
এমনি করিয়া বাড়িতে লাগিল 'লিচ্ছবি' কুল মান!

রচিল নগর অরণ্য কাটি, গড়িল নূতন দেশ,
বিশাল হইতে হ'ল সুবিশাল—বৈশালী ভূমি শেষ।
বুদ্ধ যেদিন করেন প্রথম বৈশালী দর্শন,
সেদিন এদেশ অতি সমৃদ্ধ, গৃহ ভরা ধনজন।

লিচ্ছবি যত গণশাসনের সহায়ে শাসিছে দেশ
রাজা নাই কেহ, রাজ পরিষদে প্রজাদেরই সমাবেশ!
ব্যক্তি বিশেষ বড় নহে কেহ, সবার সমান মান
সমাজ-তন্ত্র ভারতের বুকে এঁদেরই প্রথম দান।
সুখেই চলেছে জনগণরাজ, নেই সেথা ব্রাহ্মণ,
বৈশ্য, শূদ্র নেই ভেদাভেদ, নেই ধনী, নির্ধন!
কারে চাষবাস ব্যবসা যা-কিছু যৌথ সে কারবার,
সমবায় প্রথা,—সবাই যেখানে সমান অংশীদার!

সহসা সেখানে কি জানি কি দোষে মহামারী লেগে যায়;
হাজারে হাজারে মরিছে মানুষ, লিচ্ছবি নিরুপায়!
আনি তীর্থিক সাধুগণে তারা, দোবারে করি জয়
চেয়েছিল দেশে মহামারী রোগ নিবারণ যাতে হয়।

কত হ'ল যাগ—তন্ত্র-মন্ত্র—পূজা-হোম বার বার,
মহামারী তবু কমিল না কিছু, চারিদিকে হাহাকার!



● বৈশালী
নরেন্দ্র দেব

কত ধূপ ধুনা, জ্বালে হোম শিখা, ছিটায় গঙ্গাবারি,
তবুও কমেনা রোগের প্রকোপ, বেড়ে চলে মহামারী।

বুদ্ধের খ্যাতি শুনেছিল তারা, শুনেছে পুণ্য নাম ;
ছুটে গেল কাছে, শরণ লইয়া বলে, এস গুণধাম !
বাঁচাও মোদের বৈশালী প্রভু ; মহামারী করে শেষ,
মৃতের সংখ্যা যায়না যে গোনা ! নিঃশেষ হ'ল দেশ !

কত যাগ যোগ, পূজা অর্চনা, সাধু সেবা করিলাম,
কিছু কমিল না বিধাতার রোষ। ভগবান দেখি বাম !
বুদ্ধ স্নিগ্ধ মধুর হাস্যে কহেন, বন্ধুগণ !
দেব-অর্চনা ছেড়ে দিয়ে খোঁজো—মারী এল কি কারণ ?

সোজা পথে গেলে ফল পাবে সোজা—এ কথাটা বোঝা ভুল,
তন্ত্র মন্ত্র পারে না সারাতে না-পেলে রোগের মূল।
নির্মূল হবে ব্যাধি, যদি পারো ধরিতে কারণ তার,
জীবকে ডাকিয়া কহিলেন,—তুমি লবে কি এ গুরুভার ?

যাও দেখে এস, কেমনে এসেছে সংক্রমণের বীজ,
ভিক্ষু শ্রমণ হেথা বড় বেশি করিতেছে গিজগিজ্ !
তাদের সঙ্গে নিয়ে যাও তুমি ; রোগীর সেবার কাজ
তোমার আদেশ উপদেশ মেনে শুরু করে দিক আজ।

জীবক ছিলেন ওষধি-সিদ্ধ মহান চিকিৎসক,
গুরুর আদেশে গেলেন চলিয়া, পার হয়ে গণ্ডক,

● বৈশালী
নরেন্দ্র দেব

বুদ্ধ নিজেও চলিলেন মানি লিচ্ছবি অনুরোধ—
বিপন্ন এই রাষ্ট্র তাঁহার জাগালো মমতা বোধ !

জম্বু দ্বীপের নাহি যে কোথাও লোকায়ত হেন রাজ ;
মান্য যেথায়—ধনমান হ'তে—মানুষের বড় কাজ !
শ্রমিকের হেথা মর্যাদা নহে ধনিকের চেয়ে কম,
সমাজের শুধু লোক-কল্যাণই—আদর্শ অনুপম !

বৈশালীপুরে বৌদ্ধ যেদিন
কারেন পদার্পণ,
সেদিন পারিল জানিতে জীবক
মহামারী কি কারণ ?
রোগের যেথায় মূল ছিল সেটা
সমূলে করিয়া নাশ
দূর করিলেন বৈশালী হতে
করাল কালের গ্রাস !

ওঠে দিকে দিকে—'জয়তু
জীবক !' জীবক ভাগ্যবান !
কহে সে বিনয়ে—আমি নহি,
কারো বুদ্ধের জয়গান !
বৈশালী হতে তাঁহারই কৃপায় মুছে যাবে সব রোগ,
লিচ্ছবি দিল আনন্দে সবে বৌদ্ধশাসনে যোগ !

—তুমি লবে কি এ গুরুভার?

# চৌতরী গ্রামের রঘুয়া

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বেনারস থেকে গিয়েছিলুম আলমোড়ায় বেড়াতে। হঠাৎ ধরণীর সঙ্গে দেখা। ছেলেবেলার বন্ধু, বহুদিন ছাড়াছাড়ি। এমনি অভাবিত ভাবে দেখা হয়ে যাওয়ায় দু'জনেরই মনে ভারি আনন্দ হল এবং ঠিক করলুম ছুটির বাকি কটা দিন একসঙ্গে কোথাও বেড়িয়ে আসব।

ধরণী বল্লে—চলো না এখান থেকে মায়াবতী যাওয়া যাক। পাঁচ দিনের হাঁটা পথ—মন্দ লাগবে না।

আমি তো সঙ্গে সঙ্গে রাজি। দিল্লীর কোন কলেজে যেন ধরণী ভূগোলের শিক্ষক। সঙ্গে ম্যাপ নিয়ে বেরিয়েছে। আমাকে দেখিয়ে দিলে জায়গাটা কোথায়। ঘাড়োয়াল পার্ব্বত্য প্রদেশের সভ্যতা বিবর্জ্জিত চমৎকার একটি কোণ। না আছে রেল, না আছে মোটর বাস, না আছে সহর।

পরদিন আমরা কুলি ঠিক করতে গেলুম। বিশ্বাসী কুলি না হলে এ-সব অঞ্চলে মাল নিয়ে যাওয়াই মুস্কিল। বাজার ছাড়িয়ে সরকারি কুলির আপিস, সেইখানেই গেলুম খোঁজে। কিন্তু আমাদের কপাল মন্দ। গিয়ে শুনলুম গত দু'দিনে সরকারি দপ্তরের কর্ত্তারা যেখানে যত কুলি ছিল সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে নিজেদের কাজে চলে গেছেন।

কি করা যায়? উৎসাহ আশা বড় উঁচুতে উঠেছে। এখন কুলির অভাবে এমন একটা সফর মাটি হয়ে গেলে দুঃখের অন্ত থাকবে না। দুজনে শুকনো মুখে কুলি-আপিস থেকে বেরিয়ে আসছি, দেখি ফটকের এক কোণে জড়সড় হয়ে একদল লোক দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে থেকে দুজন এগিয়ে এসে আমাদের সেলাম করে বল্লে—বাবু আপনাদের কুলি দরকার হবে? আমরা আপনাদের মাল বইতে রাজি আছি।

আমরা বল্লুম—তোমরা কারা?

—আমরা চৌতরী গ্রামের লোক। এখানে মাটি কাটতে, পাথর বইতে এসেছিলুম। কাজ শেষ হয়ে গেছে, এখন গ্রামে ফিরব। তবে মাল বওয়ার কাজ পেলে নিতে পারি। কোথায় যাবেন আপনারা?

—আমরা যাবো মায়াবতী। কিন্তু তোমাদের জামিন কে? তোমরা তো কুলি-আপিসের কুলি নও?

—হুজুর না। এখানকার সর্দ্দার আমাদের জামিন হবে না। আমাদের কেউ জামিন নেই।

আমি বল্লুম—তাহলে তো হল না বাপু।

কিন্তু ধরণী দেখলুম এদের ছেড়ে দিতে দ্বিধা বোধ করছে। ধরণী আপিসের মধ্যে আর একবার ঢুকলো। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

ইতিমধ্যে ফটকের কোণ থেকে আরো কয়েকজন এগিয়ে এসে আমায় ঘিরে দাঁড়ালো। তারা বল্লে, চৌতরী থেকে মায়াবতী একদিনের পথ। এতগুলি লোক—তারা সবাই মায়াবতী হয়ে তবে চৌতরীতে ফিরবে। অনেকে মিলে যদি মালগুলি ভাগাভাগি করে নেয় তাহলে কারুরই কষ্ট হবে না। আমাদের অবশ্য দু'জন কুলির বেশী ভাড়া দিতে হবে না।

প্রস্তাব অতি চমৎকার ; কিন্তু কালই শুনেছিলুম এখানে অচেনা কুলির হাতে মাল ছেড়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। দু'জন কুলির জায়গায় পঁচিশজন কুলি হলে কি চিন্তা কমবে না বাড়বে?

এমন সময় ধরণী বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে বল্লে—ব্যাপারটা বোঝা গেছে। আমি এদের রীতিনীতি জানি। সর্দ্দারদের কিছু ঘুস না দিলে সর্দ্দাররা কিছুতেই কারুর জামিন হতে চায় না। এই চৌতরীর লোকদের সর্দ্দাররা বেশ চেনে। লোকগুলোও বোধ হয় ভালো, আর সেই কারণেই সর্দ্দাররা তাদের কাছ থেকে আজ অবধি ঘুস আদায় করতে পারে নি।

আমি বল্লুম—তবে তো ভালই হল। এর চেয়ে বেশী সততার পরিচয় আর কি থাকতে পারে? তা ছাড়া দু'জন কুলি ভাড়া করে আমরা পঁচিশজন লোক পাচ্ছি, মায়াবতীর কাছেই যাদের বাড়ী। চলো কাল বেরিয়ে পড়া যাক।

আর অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে তার পরদিনই বেরিয়ে পড়লুম আমরা মায়াবতীর উদ্দেশে।

অপূর্ব্ব রাস্তা। আলমোড়া ছাড়িয়ে গভীর খদের মধ্যে নেমে গেছে পথ, তারপরই আবার এঁকে বেঁকে উঠেছে খাড়া দেয়ালের মতো। সামনে হিমালয়ের বরফ-ঢাকা চুড়ো পশ্চিম প্রান্ত থেকে পুবের সীমা পর্য্যন্ত একটানা চলে গিয়েছে। আমরা চলেছি, সঙ্গে চলেছে আমাদের দল, চৌতরীর গ্রামীলরা গল্পে কথায় পর্ব্বত কন্দর মুখর করে।

ধরণী আর আমি একটা করে ঝুলি কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছি। একটি ছেলে, বয়েস হবে বছর পনের-ষোলো, এগিয়ে এসে বল্লে—আপনাদের ঝুলি দুটো দিন না, বই। আপনাদের কষ্ট হচ্ছে।

আমি বল্লুম—কষ্ট হবে কেন? এইটুকু তো ঝুলি, এতে কিই বা আছে?

ছেলেটি বল্লে—আপনারা সুখী লোক, কেন বইবেন এ সব? আমি ঝুলি বয়ে আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে যাই।



আমাদের আসল আপত্তি অন্য জায়গায়। ঝুলির মধ্যেই আমাদের যত কিছু অস্থাবর সম্পত্তি—পয়সার ব্যাগ, ক্যামেরা ইত্যাদি। এগুলি হাতছাড়া করতে আমরা রাজি নই।

বল্লুম—আরে তা কি হয়? তুই চল্ বরং আমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে। তোর নাম কি?

● চৌতরী গ্রামের রঘুয়া
শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

—রঘুয়া আমার নাম।

—কি কাজ করতে এসেছিলি সহরে?

—পাথর বইতে। মাটি কাটতে আমার ভাল লাগে না, কিন্তু ভারি মাল খুব বইতে পারি।

—তবে যে আমাদের ঝুলি বইতে চাইছিলি? ঝুলির মধ্যে কি ভারি ভারি পাথর আছে নাকি?

রঘুয়া হেসে বল্লে—না হুজুর, আপনারা বাবু লোক, মাল নেবেন কেন, তাই বলছিলুম।

—আপনাদের ঝুলি দুটো দিন না, বই। [পৃঃ ১৯৭

এইভাবে রঘুয়ার সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গেল। রঘুয়া অনেক কথা বল্লে। নেপালের রাজধানী কাটমুণ্ডুতে সে দুবার গেছে। ভারি সহর। সেখানে মন্দির যা আছে, অমন মন্দির সারা দুনিয়াতে কোথাও নেই। এ ছাড়া সে নৈনিতালে গেছে, সেও ভারি সহর। সেখানে সে সিনেমা দেখেছে। সিনেমার মতো অমন আমোদের জিনিস নাকি আর হয় না। তার ইচ্ছে আরো বড় হলে নৈনিতালে গিয়ে সে সিনেমায় কিছু কাজ নেয়।

—সিনেমায় তুমি কি কাজ করবে রঘুয়া?

রঘুয়া খুব উৎসাহের সঙ্গে বল্লে—কিছু ভারি মাল বইব।

আমরা দুজনেই হেসে উঠলুম। বল্লুম—রঘুয়া, তুমি কি মাল বওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ জানো না?

রঘুয়া এবারে কিছু নিরুৎসাহ হয়ে বল্লে—না হুজুর।

এমন সময় এক বুড়ো এসে বল্লে—রঘুয়া কি বলছে আপনাদের?

আমি বল্লুম—রঘুয়া সিনেমায় কাজ নিতে চায়। কিন্তু সিনেমায় তো হালকা হালকা ছায়া আর ছবি। সেখানে ভারি ভারি মাল তোলার কাজ কে তাকে দেবে, এই হয়েছে মুস্কিল।

বুড়ো হাঃ হাঃ করে হেসে বল্লে—রঘুয়াকে নিয়ে আমাদের বড় ভাবনা হুজুর। রঘুয়া বলে সে গাঁ ছেড়ে সহরে যাবে, কলকাত্তায় যাবে, বিলাত যাবে। রঘুয়ার মা তো ভয়েই সারা।

● চৌতরী গ্রামের রঘুয়া
শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বুড়ো হরিয়া শুনলুম রঘুয়ার ঠাকুর্দ্দা।

ভূগোলের মাষ্টার ধরণী বল্লে—কেন, এ তো ভাল কথা। দুনিয়া দেখবে, কত কি শিখবে, সোনা-দানা রোজগারও করবে তো?

হরিয়া বুড়ো গলা খাটো করে বল্লে—হুজুররা জানেন না, কিন্তু চৌতরীর বাসিন্দাদের ঐসব করা উচিত নয়, করার উপায়ও নেই!

ধরণী ভারি আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—সে কি কথা হরিয়া?

—হাঁ হুজুর, সে অনেক কথা। শোনেন তো বলি। এই যে চৌতরীর কুলিদের আপনারা জামিন খুঁজছিলেন, কিন্তু আমাদের মতো বিশ্বাসী লোক আপনি সারা দুনিয়াতে পাবেন না।

পাহাড়ের একটা বাঁক ঘুরে আমরা একটা ঝরণার ধারে এসে পড়েছি। সূর্য্য মাথার উপর উঠেছেন। আমি প্রস্তাব করলুম এইখানে জলের ধারে বসে কিছু খাওয়ার আয়োজন করা যাক, আর বুড়ো হরিয়ার কথা-ও সেই সঙ্গে শুনতে বেশ লাগবে।

ঘাসের উপরে বসে হরিয়া বলতে সুরু করলে—আমার ঠাকুর্দ্দার মুখে শুনেছি ঠাকুর্দ্দা যখন খুব ছোট ছিলেন, রঘুয়ার ছোট ভাইয়ের চেয়েও ছোট, তখন চৌতরীর লোকেরা ছিল অন্যরকম। তারা ছিল সব ডাকাত। দুর্দ্দান্ত বিকট চেহারা। গায়ে অসুরের মতো জোর। যেমন লাফাই-ঝাঁপাই, তেমনি কষ্টসহিষ্ণু, তেমনি মনের বল। চৌতরীর ডাকাতরা কখনও ধরা পড়ত না। দূর দূর দেশে তারা ডাকাতি করতে যেত, সেখানে কেউ তাদের চিনতে পারত না। যারা হয় তো চিনত তাদের সাহসেই কুলোতো না এই দুর্দ্ধর্ষ দলকে ধরিয়ে দিতে। তা ছাড়া ধরিয়েই বা দেবে কার কাছে? ইংরেজ রাজ্যের প্রভাব তখন ঘাড়োয়ালের এদিকে ছিল না বল্লেই চলে। ডাকাতদের ছিল একাধিপত্য। ডাকাতির দৌলতে চৌতরী গ্রামে কোনো অভাব ছিল না।

তারপর হঠাৎ একবার এক কাণ্ড হল। ঠাকুর্দ্দার বাবা, আমার দাদাঠাকুর ছিলেন গ্রামের মাতব্বরদের একজন। দলের দলপতি হয়ে তিনি প্রায়ই ডাকাতি করতে যেতেন। এইরকম এক রাতে বেরিয়েছেন দলবল নিয়ে, সঙ্গে নানারকম হাতিয়ার, খাঁড়া, তরোয়াল, বর্শা, বল্লম, সড়কি, ছোরা, লাঠি, তীর-ধনুক পর্য্যন্ত। খবর পেয়েছেন পাহাড়তলী থেকে বহু লোক যাচ্ছে সোনা-দানা, হীরে-জহরৎ নিয়ে পছিমপুরের রাজার কাছে ভেট দিতে। পাহাড় অঞ্চলের ছোট-খাটো রাজা, কিন্তু তাঁর অনেক বড়লোক প্রজা। তাদের লুট করতে পারলে বেশ মোটা রকম কিছু মিলবে। গভীর পাহাড়ের কোলে চৌতরী থেকে ষাট মাইল দূরে পছিমপুর। কিন্তু চৌতরীর ডাকাতদের কাছে ষাট-সত্তর মাইল পাহাড়ে পথ কিছুই নয়। তারা ঠিক সময়টিতে পথের ধারে লুকিয়ে রইল ঘাপটি মেরে বাঘের মতো।

রাত দু'পহর কেটে গেছে। ফুটফুটে চাঁদনীর আলো। রাস্তার দু-পাশে সারি সারি গাছ, গাছের মাথায় রূপোলি চাদর, কিন্তু ঠিক তার নীচে কালো ছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি করে ডাকাত। যাত্রীর দল নিশ্চিন্ত মনে চলেছে। সারা দিন-রাত পথ চলায় শরীর তাদের ক্লান্ত, কিন্তু মনে বড় আনন্দ। ভোরের আলো-ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে তারা পছিমপুরে পৌঁছে যাবে। সেখানে সারা সহরের

● চৌতরী গ্রামের রঘুয়া
শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

লোক তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। কারণ তারা তো শুধু সোনা-রূপো আর হীরে-মানিক নিয়ে যাচ্ছে না, তারা নিয়ে যাচ্ছে স্বপ্নে পাওয়া এক বিষ্ণুমূর্ত্তিকে। পছিমপুরে এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হবে, তারই বিরাট আয়োজন হয়েছে। পছিমরাজ গত বছর পাহাড়তলীতে তাঁর এক পরগণায় গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। পরিত্যক্ত এক পুকুরের ধারে বুড়ো পাঁকুড় তলায় দাঁড়িয়ে এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজার দেহ সোনা হয়ে গেল।

সেদিন পছিমপুরে ফেরবার পথে রাজার চোখে পড়ল এক পোড়ো পুকুর আর তার ধারে পাঁকুড় গাছ, ঠিক যেমন স্বপ্নে দেখেছিলেন। একটু খুঁজতে একটু খুঁড়তে পাঁকুড় তলায় এক পাথরের বিষ্ণুমূর্ত্তি পাওয়া গেল। রাজা ভক্তিতে গলে পড়লেন। পছিমপুরে ফিরে গিয়ে মস্ত মন্দির গড়ালেন। তারপর আয়োজন করলেন সে বিষ্ণুমূর্ত্তিকে পছিমপুরে নিয়ে আসার। পাহাড়তলীর ধনী প্রজারা তাই মহাসমারোহে মূর্ত্তি নিয়ে চলেছে পছিমপুরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে।

আনন্দে গান গাইতে গাইতে চলেছে তারা, এমন সময় অন্ধকারের আড়াল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডাকাতের দল। মেরে কেটে ছিন্ন ভিন্ন করে যা কিছু পেল লুটে পুটে ডাকাতের দল আবার মিলিয়ে গেল অন্ধকার। পাহাড়তলীর প্রজারা যারা সড়কী আর বল্লম খেয়ে মরল, তারা রইল রাস্তায় পড়ে, বাকি সব যে যেদিকে পারল ছুটে পালালো।

ডাকাতের দল আড়ালে আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ফিরে চল্লো চৌতরী গ্রামে। রাত পোহালো, সকাল হল, দুপুরের রোদ হয়ে উঠল চড়চড়ে। তারপর বিকেলের দিকে মেঘ করে আকাশ অন্ধকার হয়ে এল। ঠাণ্ডা হাওয়া উঠল শনশন করে। ডাকাতের দল তখনও চলেছে লুটের মাল কাঁধে নিয়ে। হঠাৎ আকাশের এক কোণ থেকে আর এক কোণ চিরে কালো মেঘের গায়ে বিদ্যুৎ চিড়িক দিয়ে উঠল। পাহাড় কাঁপিয়ে বাজ পড়ল কড়কড় করে। তারপরই মুষলধারে বৃষ্টি। ঝিলিকের আলোয় লোকের চোখ গিয়েছিল প্রায় কানা হয়ে, বাজের শব্দে কানে তালা। সবাই যখন সম্বিৎ ফিরে পেল, দেখল আমার দাদাঠাকুর দলের দলপতি মাটির উপর মড়ার মতন পড়ে রয়েছেন। বজ্রাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর দেহ কাঁধে তুলে নিয়ে ফিরল সকলে চৌতরী গ্রামে। সেখানে গিয়ে আমাদের বাড়ির দাওয়ায় তাঁকে যখন নামিয়ে রাখা হল, দেখা গেল তাঁর দেহ বেশ গরম রয়েছে। সন্ধ্যা কাটল, সারা রাত কেটে গেল, কিন্তু তবু দাদাঠাকুরের মৃতদেহ ঠাণ্ডা হল না। খবর পেয়ে গ্রামশুদ্ধ সবাই দেখতে গেল। দেখে নাকে নিঃশ্বাস নেই, চোখে দৃষ্টি নেই, দেহে সাড়া নেই, অথচ গা রয়েছে গরম। এমন ব্যাপার কেউ কখনো দেখেনি। সকলেরই কেমন একটা ভয় হল। বলাবলি হতে লাগল, এর মধ্যে অলৌকিক কিছু আছে।

এতক্ষণ দাদাঠাকুরকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত ছিল, দাদাঠাকুরের কাঁধে যে থলি ছিল তা খুলে আর দেখা হয়নি। অন্য সকলের থলির মালপত্রের ভাগ-বাটোয়ারা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে, কাজেই দাদাঠাকুরের থলিও খোলা হল। খুলে কিন্তু সবাই তটস্থ হয়ে গেল।

দাদাঠাকুরের থলি থেকে সোনাও বেরল না, দানাও বেরল না, বেরল এক পাথরে কোঁদা বিষ্ণুমূর্ত্তি।

- চৌতরী গ্রামের রঘুয়া
  শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

দাদাঠাকুরের ঘাড়ে চেপে এ কোন্ দেবতা গ্রামে এলেন? বজ্রাঘাতে মরণ হয়েও মরণ হল না, সে কি এই দেবতারই মায়া নাকি?

আজ যায় কাল যায়, দাদাঠাকুরের দেহ্ আর ঠাণ্ডা হয় না। কেউ তাঁকে আর দাহ্ করতে সাহস করলে না। তিনি আমাদের দাওয়ায় যেমন শুয়ে ছিলেন তেমনি শুয়ে রইলেন। আর তাঁর মাথার কাছে রইলো সেই বিষ্ণুমূর্ত্তি। গ্রামের লোক ভয়ে ভক্তিতে রইলো হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে।

দিন যায়, মাস যায়, বছরও গেল। দাদাঠাকুরের দেহ্ যেমন গরম ছিল তেমনি গরম রইল।

এরই মধ্যে চৌতরী গ্রামে একটা মস্ত অদলবদল এসে গেল। মাতব্বররা ঠিক করলেন, যতদিন না দাদাঠাকুরের দাহ্ হয় ততদিন তাঁরা ডাকাতি করতে বেরবেন না। চাষবাস, ভেড়া চরানো, হাতের কাজ নিয়ে রইলো ডাকাতের দল। মাঝে মাঝে হাত নিস্পিস্ করলেও দস্যুবৃত্তির দিকে এগতে কেউ সাহস করলে না।

পুরো দশ বছর পরে হঠাৎ একদিন দাদাঠাকুর চোখ মেলে উঠে বসলেন। ততদিনে গ্রামের চেহারা বদলে গেছে। গ্রামের মাটি হয়েছে সুজলা সুফলা। আমাদের বাড়িতে বিষ্ণুর মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে, পূজো হয় সকাল-সন্ধ্যা। এমনি একদিন মহাধুমে পূজো হচ্ছে, দাদাঠাকুর ঠাকুরের সামনে যেমন শুয়ে থাকতেন তেমনি শুয়ে আছেন, হঠাৎ দেখা গেল তিনি উঠে বসেছেন। এই দৃশ্য দেখে পুরুতের হাত কেঁপে প্রদীপ পড়ে গেল। আবার প্রদীপ জ্বেলে পুরুত যখন উঠে দাঁড়িয়েছেন, তখন দেখা গেল দাদাঠাকুরের দেহ ঢলে পড়েছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখা গেল, দেহ্ বরফের মতো হিম।

এতদিনে দাদাঠাকুরের মৃত্যু হল। গ্রামের লোকেরা সমারোহ্ করে তাঁর শেষকৃত্য করে ফিরে এল বটে কিন্তু ডাকাতিতে তারা আর ফিরে গেল না। অতি সজ্জন হয়ে তারা রইল। ঠাকুর্দ্দা ডাকাতের বংশে জন্মালেন, কিন্তু ডাকাত হতে পারলেন না। তাঁরই সময় থেকে চৌতরীর হাওয়া সেই যে ঘুরে গেছে, আজও একটুও তার বদল হয়নি।

হরিয়া গল্প শেষ করল। আমরা বল্লুম—বাঃ এমন চমৎকার লোক তোমরা আগে তো একটুও বোঝা যায়নি।

হরিয়া বল্লে—দেখুন মিথ্যে বলব না। আমাদের মধ্যে কোনও দিনই যে কেউ অসৎ কাজ করেনি তা নয়। কিন্তু দেবতার শাপ না বর জানি না, তাকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি পেতে হয়েছে। গ্রামের কামার কাকে একবার ঠকিয়েছিল। বেশী দিন গেল না, তার পা হয়ে গেল খোঁড়া। ঠিক কি করে যে খোঁড়া হল সে নিজেও ভাল করে বলতে পারলে না। আমরা অসৎ পথে যেতে কেউ সাহসই করি না।

আমাদের চলা আবার সুরু হল। চৌতরীর গ্রামীলদের সঙ্গে বেশ জমে উঠল আমাদের আলাপ। কি চমৎকার লোক সব! তাদের সম্বন্ধে যে-টুকু সন্দেহ আমাদের ছিল তার আর কোনো চিহ্নই রইল না।

● চৌতরী গ্রামের রঘুয়া
শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

দু'দিনে আমরা লামগড়, মৌরনলী পার হয়ে গেলুম। তৃতীয় দিন এসে পৌঁছলুম দেবীধুরা। রাত্রে ধরণী আর আমি থাকতুম ডাকবাংলোয়। কুলিরা গ্রামে নিজেদের জায়গা করে নিত। আমরা হরিয়া আর রঘুয়ার হাতে আমাদের রাত্রের খাবারের জন্যে আটা, ঘি, ডাল, তরকারী কেনবার পয়সা দিতুম। কুলিরা চমৎকার রান্না করে রঘুয়ার হাতে গরম গরম পাঠিয়ে দিত। আমরা ডাকবাংলোর তক্তপোষে বসে তেলের আলোয় রঘুয়ার সঙ্গে গল্প করতে করতে পরিতোষ করে খেতুম। জায়গাগুলোয় বাঘের বড় উৎপাত। গল্প করতে করতে রাত হয়ে যেতো বলে রঘুয়া আর একা গ্রামে ফিরে যেত না। ডাকবাংলোর মেঝেতেই কাপড় বিছিয়ে ঘুমিয়ে রাতটা কাটিয়ে দিত।

দেবীধুরার ডাকবাংলোয় আমরা পাওনা চুকিয়ে সেদিন সকালে বেরতে যাবো, হঠাৎ আবিষ্কার করলুম ঝুলির মধ্যে আমার টাকার ব্যাগটা নেই। এখানে ওখানে খুঁজলুম যদি কোথাও ব্যাগটা পড়ে গিয়ে থাকে, কিন্তু পেলুম না। অন্য সময় হলে সন্দেহ হত রঘুয়াই সরিয়েছে, অথবা অন্য কোনো কুলি, যারা আমাদের মাল নিয়ে ঘরে এসেছিল। কিন্তু চৌতরীর লোকেরা যে সন্দেহের বাইরে। হয়তো রাস্তায় কোথাও পড়ে গেছে, কে জানে? কিন্তু নাঃ, কাল রাত্রেই তো আমার ব্যাগ থেকে পয়সা বার করে আটা, ঘি কেনবার খরচ দিয়েছি। মনটা খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল। তাছাড়া বিদেশে নিঃস্ব হওয়ার অস্বস্তি এবং বিপদ। তবু ভাল সঙ্গে ধরণী আছে, এ ক'দিন ধরণীকে একাই খরচ চালাতে হবে।

দেবীধুরা থেকে বেরিয়ে পড়লুম আমরা। হরিয়াকে বল্লুম ঘটনাটা। হরিয়া কেমন অদ্ভুত ভাবে আমার দিকে তাকালো। বল্লে—আপনি কি হুজুর আমাদের কাউকে সন্দেহ করছেন?

—সন্দেহ কাউকেই হচ্ছে না। কিন্তু কাল রাত থেকে আজ সকালের মধ্যে কি করে ব্যাগটা হারালুম তাই ভাবছি।

বুড়ো ঘাড় নাড়তে নাড়তে চলে গেল। বল্লে—ভয় হচ্ছে হুজুর। এর ফল ভালো হবে বলে আমার মনে হয় না।

সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের পৌঁছবার কথা ধূনাঘাট। তারপর দিন দুপুরে মায়াবতী। কিন্তু বেলা দুটো থেকে টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি সুরু হল। মালপত্রগুলো সামলানোই মুস্কিল হয়ে উঠল। কুলিরা চেষ্টা করতে লাগল গাছের আড়ালে আড়ালে যেতে, আমরাও চেষ্টা করতে লাগলুম বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার। বিকেলের দিকে বৃষ্টির তেজ উঠল বেড়ে। আকাশ অন্ধকার করে মুষলধারে বৃষ্টি সুরু হয়ে গেল। পায়ের তলায় ফাটলে ফাটলে ঝরণা জেগে উঠল। গাছের পাতায় পাতায় বৃষ্টি ঝরার অক্লান্ত শব্দ, আর তার মাঝে থেকে থেকে বজ্রের গর্জ্জন, পাহাড়ে পাহাড়ে তার প্রতিধ্বনি। আমাদের কুচকাওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে। প্রত্যেকে এক একটি গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছি। কে যে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে দেখতেও পাচ্ছি না। বৃষ্টির ছাঁটে চারিদিক ঝাপসা। কয়েক হাত দূরেও দৃষ্টি চলে না।



এইভাবে এক ঘণ্টা টানা চলবার পর পাহাড় দেশে যেমন হয়ে থাকে, হঠাৎ বৃষ্টি থেমে গেল। আকাশে ছিঁড়ে গেল মেঘ। অস্তগামী সূর্য্যের রশ্মি এসে পড়ল গিরিচূড়ায়। একটি দু'টি করে লোক

- চৌতরী গ্রামের রঘুয়া
শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

এ-ধার ও-ধার থেকে বেরিয়ে জড় হতে লাগল এক জায়গায়।

ধরণী আর আমি গায়ের জামা খুলে জল নিংড়িয়ে আবার গায়ে পরতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি হরিয়া আর দুটি-তিনটি লোক আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হরিয়া মুখ নীচু করে বল্লে—একবার দেখে যান হুজুররা।

বেশ খানিকটা এগিয়ে একটা গাছের কাছে এসে আমরা পৌঁছলুম। সেখানে গাছতলায় রঘুয়া কেমন নেতিয়ে পড়ে রয়েছে।

—কি হয়েছে রঘুয়ার? আমরা অত্যন্ত অবাক হয়ে গেলুম।

হরিয়া চোখ মুছে বল্লে—বাজ পড়েছিল, রঘুয়া শেষ হয়ে গেছে। তারপর হাতের মুঠো খুলে আমার হারানো ব্যাগটা বার করে বল্লে—রঘুয়ার পকেটে এটা পাওয়া গিয়েছিল। ফিরে নিন্।

আমি মন্ত্রচালিতের মতো ব্যাগটা তুলে নিলুম। অনেকক্ষণ

আমার মুখে কথা সরল না। তারপর ব্যস্ত হয়ে বল্লুম—দেখ তো রঘুয়ার গা এখনও গরম আছে কি না?

হরিয়া ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে রঘুয়ার গায়ে হাত রাখল, তারপর আস্তে আস্তে বল্লে—হুজুর, বিলকুল ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বলে সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

—কি হয়েছে রঘুয়ার?

তার পরদিন মায়াবতীর পথে চলতে চলতে বার বার এই কথাটাই আমার মনে হতে লাগল—চৌতরী গ্রামের উপর এটা কি দেবতার অভিশাপ না দেবতার বর!

---

# সে কী কাণ্ড!

মনোজ বসু

কম বয়স তখন আমার। তোমাদেরই মতন। শহরে থেকে পড়াশুনো করি। বড়-দিনের ছুটিতে বাড়ি গিয়েছি।

আমাদের ওদিকে বিস্তর খেজুর-বাগান। খেজুর গাছের মাথায় ডালপাতা—তারই নিচে সামান্য একটুখানি কেটে ভাঁড় ঝুলিয়ে দেয়। দেখ নি? বিকেলবেলা গাছ কাটে, সারা রাত্তির টপ টপ করে খেজুর-রস পড়ে, গাছিরা ভাঁড় নামিয়ে আনে; রস জ্বাল দিয়ে গুড়-পাটালি বানায়। খাও নি খেজুর-পাটালি?

তখন অনেক রাত। যাত্রাগান হচ্ছে উঠানে, মগ্ন হয়ে শুনছি। ভানু পিছন দিক দিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত দিল। ঘাড় ফেরাতে চুপি চুপি বলে, উঠে আয়—

আমার চেয়ে অনেক বড় ভানু। আর বড্ড চালাক। গাঁয়ে থাকে, গাঁয়ের ছেলেদের মাতব্বর। আমায় বলে, মজা আছে, চলে আয় শিগগির।

আসরে বাইরে লিচুতলার আবছা আঁধারে এলাম। আরও চারটে ছেলে আছে। ভানু বলে, রাতের রস খাবি তো চল্ আমাদের সঙ্গে।

কোথায়?

আর ছেলেরা হি-হি করে হাসে ঃ গেলাসে রস ঢেলে তোর মুখে তুলে ধরব, তাই ভেবেছিস নাকি?

ভানু বুঝিয়ে বলে, শহরে থাকে, এখানকার হাল জানবে কি করে? খেজুর-গাছে চড়ে আমরা রস পেড়ে আনব। তোকে চড়তে হবে না, তুই নিচে দাঁড়িয়ে থাকবি।

গ্রামের নিচেই বিল। বর্ষাকালে জলে ভরে যায়। শুকনো বিল এখন খটখট করছে। জমিতে চাষ দিয়ে গেছে, চষা ক্ষেতের উপর দিয়ে যেতে হচ্ছে মাঝে মাঝে। পায়ে লাগছে। ওদের দৃকপাত নেই। চলেছে তো চলেইছে। কত খেজুরবন পার হয়ে গেলাম। ভানুর পছন্দ হয় না। বলে, এসব চারাগাছ। চারাগাছের রস পানসা। তার উপর শেয়ালে খায় বলে সেঁজির আঠা দেয় ভাঁড়ের মধ্যে। এগিয়ে চল্। খুব বড় বড় গাছ এক জায়গায়—বিকালবেলা ঘুরে ঘুরে আমি দেখে গিয়েছি। পাটকাঠি ভেঙে নাও এখান থেকে, আগে গিয়ে আর মিলবে না।

আঁধার রাত। কিন্তু ফাঁকা বিল বলে ঝাপসা ঝাপসা সমস্ত দেখা যাচ্ছে। খানাখন্দে পাট পচান দিয়েছিল, পাট কেচে নিয়ে গেছে, পাটকাঠি স্তূপাকার হয়ে আছে। তার মধ্য থেকে একহাত দেড়হাত টুকরো করে ভেঙে নিলাম কতকগুলো। পাটকাঠি ঘটির ভিতর ঢুকিয়ে টেনে টেনে রস খাওয়া হবে।

গেলাসে রস ঢেলে তোর মুখে তুলে ধরব তাই ভেবেছিস নাকি?

ভানুর সেই পছন্দ-করা খেজুরবনে এসে গেলাম অবশেষে। বিষম লম্বা গাছগুলো—ঐ উঁচু থেকে রসের ভাঁড় নামিয়ে আনবে, দেখেই তো আঁৎকে উঠতে হয়। তা ভারি এক বুদ্ধি বের করেছে—এই কর্ম করে থাকে প্রায়ই, কাজের ভিতর দিয়ে বুদ্ধি বেরিয়েছে। ছ'জন মোটমাট আমরা। ভানু উঠল সকলের উপরে। তার খানিকটা নিচে একজন। আর একজন তারও নিচে। এমনি চলল। আর আমি ভূঁইয়ের উপর দাঁড়িয়েছি বড় এক পিতলের ঘটি নিয়ে। ভানু রসের ভাঁড় খুলে কয়েক পা নেমে এসে কেষ্টর হাতে দিল। কেষ্ট সুনীলের হাতে। সুনীল সাতকড়ির হাতে। সর্বশেষে আমার কাছে পৌছল। ঘটিতে রস ঢেলে নিয়ে তুলে দিই ভাঁড় উপরে। হাতে হাতে আবার ভাঁড় উঠে যায়। যেমন ছিল,

● সে কী কাণ্ড!
মনোজ বসু

গাছের মাথায় ঠিক তেমনি ভাবে ভাঁড় বেঁধে দিয়ে ভানু নিচে নেমে আসে।

দুটো কি তিনটে গাছের রস পাড়া হয়েছে—এমনি সময় সে কী কাণ্ড! মনে পড়লে আজও বুকের মধ্যে কাঁপে। দমাদম ঢিল পড়ছে গাছের উপর। তাকিয়ে দেখি, পনেরো-বিশ জন ধেয়ে আসছে চারিদিক থেকে, পালাবার পথ নেই। আক্রোশবশে চষা ক্ষেত থেকে মাটির চাঁই ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। আর রক্ষা নেই। থরথর কাঁপছি ভয়ে ঃ ধরে ফেলল রে সাতু, মেরেই ফেলবে। হাতে যদি না-ই মারে, আমার ছোট কাকাকে বলে দিলে পিটিয়ে তিনিই শেষ করবেন।

দলসুদ্ধ ভয় পেয়েছে, তরতর করে নামছে। ঢিল পড়ছে অবিরাম। ভানু সকলের উপরে--তার পালাবার উপায় নেই কোন রকমে। নেমে নেমে এক-মানুষ সমান এসেছে, হঠাৎ পরিত্রাহি চিৎকার ঃ গেছি—গেছি—ওরে বাবা, মেরে ফেলেছে রে—

চেঁচাতে চেঁচাতে ঢপ করে ভূঁয়ে পড়ে গেল। পড়েই অজ্ঞান। আর সকলে হৈ-হৈ লাগিয়েছে, কান্নাকাটি করছে ভানুকে ঘিরে।

খুন, খুন! উঃ, একদম মেরে ফেলেছে। অত বড় ঢিল মাথায় পড়ল, মাথা ফেটে গেছে, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। হায় হায় রে, রস খেতে এসেছে, অমনি খুন করে ফেলল!

খানিক দূরে খালের দিক্ দিয়ে কারা ডিঙি বেয়ে আসছে। চেঁচামেচি কিসের গো?

খুন করেছে। রস খাচ্ছিল, মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।

কারা খুন করল?

এসো ভাই সকল। গড়ভাঙার মোড়লপাড়ার দল। পালাতে পারে নি এখনো। ছুটে এসো তোমরা, ধরে ফেলব।

লোকগুলো সেই ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে বেড় দিয়ে আসছিল আমাদের ধরে ফেলবার জন্যে—চেঁচামেচিতে তারা থমকে ছিল ; এই কথার উপর উঠি-কি-পড়ি দৌড় দিল। চষা ক্ষেত ও উলুবন ভেঙে ছুটেছে তীরের মতো। পড়ে গেল একটা লোক পা বেধে দড়াম করে, চক্ষের পলকে উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটতে লাগল। সাতকড়ি গলা ফাটিয়ে চেঁচায়, খুনেরা পালিয়ে যাচ্ছে। শিগগির এসো তোমরা—ওই যে গাঁয়ে উঠে পড়ল। নৌকোটা এগিয়ে আনো ভাই, একে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

ডিঙি থেমে ছিল, ঝপ-ঝপ করে বার কয়েক বৈঠে পড়ল। সাতকড়ি আর্তনাদ করে, চললে যে তোমরা! মাঠের মধ্যে লাস পড়ে লইল, তার কি করা যায়? তার উপর খুনের মামলা, সাক্ষিসাবুদের দরকার—

জলের উপর প্রবল আওয়াজ তুলে ঘন ঘন বৈঠে পড়তে লাগল। সাতকড়ি প্রায় কেঁদে ফেলে ঃ বেঘোরে ফেলে চলে যেও না ওরে ভাইসব—

ডাকাডাকিতে চলন্ত ডিঙি থেকে অবশেষে উত্তর আসে, পিছনে আরও নৌকো আসছে, তাদের ধরো। আমাদের বড্ড তাড়া, জোয়ার ধরতে হবে বড়-গাঙে পড়ে।

- সে কী কাণ্ড।
  মনোজ বসু

সুনীল শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, কী পাষণ্ড! খুনের মামলায় সাক্ষি দিতে হবে, সেই ভয়ে পালাল।

কেষ্ট বলে, আরে আরে —ওরাও যে ফাঁকতালে পাড়ার মধ্যে উঠে পড়েছে।

সাতকড়ি গর্জন করে ওঠে ঃ পাড়ায় গিয়ে বাঁচতে পারবে না। আঁস্তাকুড়ে গিয়ে বসলে যমে ছাড়বে না। দয়াল মোড়লকে চিনতে পারা গেছে। ঐ যে আছাড় খেয়েছিল, সে হল দয়াল। চলো আগে তার বাড়ি। আসামী ঠিক না হলে মামলা হবে কাদের নিয়ে? কেষ্ট, তুই এখানটা আগলে থাক। আর সবাই আমরা যাচ্ছি।

রাগে রাগে চলেছি মোড়ল-পাড়ায়। তেঁতুল-গাছ-ওয়ালা প্রথম বাড়িটা দয়ালের।

দয়াল বাড়ি আছ?

কয়েকবার হাঁক-ডাক করা হল। সাতকড়ি বলে, সাড়া-শব্দ নেই—কি হে, বিল থেকে অমনি ফেরার হয়েছে নাকি?

কাঁথার নিচে থেকে দয়ালের গলা পাওয়া গেল ঃ কারা গো? এত রাত্রে কি ব্যাপার?

সাতকড়ি চটে গিয়ে বলে, তোমার বাড়ির নিচে এত বড় কাণ্ড। এত চেঁচামেচি—একটা ছেলে খুন হয়ে গেল—কিচ্ছু জানো না তুমি?

চষা ক্ষেত ও উলুবন ভেঙে ছুটেছে তীরের মতো। [পৃঃ ২০৬

দয়াল উঠে এলো তাড়াতাড়ি। সাতকড়ি আমাদের সাক্ষি মানে ঃ যা বলছিলাম, ঠিক তাই কিনা বলো এবারে।

কি বলেছিল, আমরা মনে করতে পারি নে। সাতকড়ি বলে, দেখি, দেখি—পায়ের উপরটা ছড়ে গিয়েছে তোমার। আ'লের উপর আছাড় খেয়ে হয়েছে। ঠিক কথা বলেছিলাম কি না, বোঝ এবার সকলে।

দয়াল কাঁপছে। শীতের কারণে এত কাঁপুনি, মনে হয় না। বলে, কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছি, দেখলে তো এসে। বিলেই যাই নি, তা আ'ল বেধে আছাড় খাব কি করে?

সাতকড়ি কঠিন কণ্ঠে বলে, বিলে যাও নি, পায়ে এত ধুলোমাটি কেন তবে? ঢিল মেরে মাথা ফাটিয়েছ—ফাঁসি না হয় কালাপানির জন্যে তৈরি হও। আমরা থানায় এজাহার দিতে যাচ্ছি।

● সে কী কাণ্ড!
মনোজ বসু

দয়াল কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, সত্যি বলছি, আমি ওর মধ্যে নেই। আমি ঘুমুচ্ছিলাম। ধুলোমাটির কথা যদি বলো—সারা দিনমান লাঙল চষেছি। তারপরে এমন অবস্থা হল, পা ধোবার আর সবুর সয় না, দুটো ভাত মুখে দিয়ে শুয়ে পড়েছি। যে দিব্যি করতে বলো করছি, আমি ঐ খুনোখুনির মধ্যে নেই।

কাকুতি-মিনতিতে সাতকড়ি দেখলাম দোমনা হল কেমন।—আচ্ছা, গোকুলের বাড়ি গিয়ে দেখি। গোকুল, গোকুল কোথা রে?

গোকুলের হাতে টেমি। গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বলে, মশা হয়েছে, গরুগুলো ছটফট করছিল—মালসায় তুষ দিয়ে সাজাল ধরিয়ে এলাম। এত রাতে কোথায় চলেছ তোমরা? কি হয়েছে?

সাতকড়ি বলে, ভানু খুন হয়েছে।

কি সর্বনাশ! একেবারে খুন?

একটুখানি ধুকপুক করছে, হাসপাতালে যেতে যেতে হয়ে যাবে ওটুকু।

অতি সংক্ষেপে ঘটনাটা শুনিয়ে সাতকড়ি বলল, তুমিও ঐ দলের মধ্যে ছিলে গোকুল। তোমার নাম পড়ে যাচ্ছে।

গোকুল বলে, গাঁ-ময় আমার শত্রু। শত্রুতা করে নাম জড়াচ্ছে। আমায় তো এই দেখে যাচ্ছ বাপধনেরা। গাছের রস গাঁয়ের ছেলেরা খাবে একটু, সেজন্য তাড়া করতে যায়—ছি-ছি-ছি!

আরও তিন-চার বাড়ি যাওয়া হল। সকলের ঐ কথা। রাতের রস খাবার জন্যে মাথা ফাটায়—যেমন করে হোক, বের করতে হবে সেই দুর্জনদের। কোন রকমে নিষ্কৃতি না পায়।

আবার বিলমুখো ফিরে চলেছি। সাতকড়ি বলে, যাদের বাড়ি গিয়েছিলাম ওরাই সব পাণ্ডা। লাঠিসোটা নিয়ে গিয়েছিল, ঢিল ছুঁড়েছিল। এখন দেখলে তো, কেমন ভিজে বেড়াল!

ছেড়ে দিয়ে এলে যে তবে এক কথায়?

কি করা যাবে, বেকবুল যেতে লাগল। ভয় পেয়েছে বড্ড, দেখলে না?

ইতিমধ্যে অকুস্থানে এসে পড়েছি। ভানু যেখানে পড়েছিল, নেই তো সে জায়গায়। কেষ্টও নেই। শীতকালে কেঁদোবাঘ বেরোয় আবার। কেষ্ট হয় তো পালিয়েছে ভয়ে, আহত ছেলেটাকে কেঁদোবাঘ টানতে টানতে জঙ্গলে নিয়ে গেল নাকি?

সহসা যেন স্বর্গলোক থেকে ভানু কথা বলে উঠল। দীর্ঘ এক খেজুরগাছের মাথায় সে। বলে, রসের ঘটিটা রয়েছে গাছের তলায়। পাটকাঠি ঢুকিয়ে খেতে লাগ। আমরাও নেমে আসছি এই গাছটা ঝেড়ে নিয়ে।

কেষ্টও দেখছি মাঝামাঝি উঠে পড়েছে সেই গাছের। ভানু ভাঁড় খুলছে। অনতিপরে তারা নেমে এলো। হি-হি করে হাসছে ঃ তাড়া করে এসেছিল, উল্টে তাদেরই তাড়িয়ে বাড়ি তুলে দিলাম।

মজাটা মালুম হল তখন। ভানুর চালাকি। ঢিল তার গায়ে লাগে নি। সকলে মিলে এত কান্নাকাটি—আগাগোড়া সাজানো ব্যাপার। কিন্তু বাড়ি উঠেও তাদের নিশ্চিন্ত হতে দিল না। সাতকড়ি পাড়ায় ঢুকে ডেকে ডেকে বেড়াতে লাগল।

সাতকড়ি হাসতে হাসতে বলে, ঠিক বাড়িতেই ঢুকেছে না বাইরে ঘুরছে—চোখে দেখে পরখ করে এলাম। যা খবর শুনিয়েছি, মরে গেলেও এই রাত্রে আর বেরুচ্ছে না। হৈ-হল্লা করে রস পেড়ে খেলেও আর ভাবনা নেই।

---

## নীহাররঞ্জন গুপ্ত

এম, এ পরীক্ষার ফলাফলটা জানাবার জন্য প্রফেসার তাঁর প্রিয় ছাত্র রজতশুভ্রকে নিজেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন। প্রফেসার তাঁর বসবার নিয়মিত স্থান লাইব্রেরী ঘরেই ছিলেন।

রজতশুভ্রকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে হাতের বইটা সামনের টেবিলে বন্ধ করে রেখে সহাস্য প্রীতির চোখে প্রিয় ছাত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, এসো রজত, তুমিই এবার ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছ। আই কংগ্রাচুলেট্ ইউ মাই বয়।

প্রফেসারকে প্রণাম করে রজতের যেন আর তর সইছিল না। দিদিকে সংবাদটা দেবার জন্য প্রফেসারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তখুনি ছুটলো বাসার দিকে।

পিতা মাতা ভাই বোন আত্মীয় বা আপনার জন বলতে রজতের ঐ দিদিই সব। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মাকে হারিয়েছিল। দিদির বয়স তখন আঠার বছর মাত্র। আই, এ পাস করে দিদি সবে তখন বি, এ ক্লাশে নাকি ভর্তি হয়েছিল, পরে একদিন দিদির মুখেই কথাটা শুনেছিল। সেই দিন থেকেই দিদি

তাকে বুকে তুলে নেয়। তারপর ছয়টা মাসও যায়নি, বাবাও মারা যান। বাধ্য হয়েই তখন দিদিকে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে সামান্য মাইনায় কোন্ একটা স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর চাকরি নিতে হয়। সন্তানের মতই দিদি তাকে পালন করেছে। দিদিই তার মা বাবা সব।

এমন কি ও যখন স্কুলের ছাত্র, ম্যাট্রিক দেবার বছর তিনেক বাকী আছে তখন একদিন জেনেছিল, আজকের বিখ্যাত ব্যারিস্টার সুধীন রায়, তার দিদিকে বিবাহ করবার ইচ্ছায় দীর্ঘকাল অপেক্ষা করার পর শেষবারের মত যখন তাঁর শেষ মিনতি জানিয়েছিলেন, উত্তরে দিদি বলেছিলো, তুমি বিয়ে কর সুধীন! রজতকে ফেলে ত আমি বিবাহ করতে পারি না। তারই কয়েক মাস পরে সুধীন রায় বিবাহ করেন। একমাত্র তারই জন্য সেদিন দিদি তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাকেও হাসি মুখে ত্যাগ করেছিল। তারপর দিনের পর দিন ক্রমে বড় হয়ে দেখেছে দিদির সংগ্রাম, তাকে মানুষ করে তোলবার জন্য। সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বিসর্জন দিয়ে একমাত্র তারই কথা ভেবেছে দিদি। কোন দিনের জন্য কোন ভাবনা তাকে ভাবতে দেয়নি। তাই আজ শেষ পরীক্ষার কৃতকার্যতার সংবাদ তাকেই সর্বাগ্রে দেবার জন্য ছুটে চলল রজতশুভ্র।

কিন্তু দিদির ঘরে প্রবেশ করে থম্‌কে দাঁড়াল।

বিছানার উপরে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে দিদি চোখ বুঁজে শুয়েছিল। এতদিন পরে যেন প্রথম সে তার দিদির মুখের দিকে তাকাল। এতদিন সেও যেমন দিদির দিকে তাকাবার সুযোগ পায়নি, দিদিও যেন তেমনি তাকে তার প্রতি তাকাবার সুযোগ দেয়নি।

রুক্ষ চুলগুলো বালিশের উপর ছড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে শুভ্রতার ছোপ লেগেছে। সমস্ত মুখখানা জুড়ে যেন একটা ক্লান্ত অবসন্নতা।

দিদি!

ভাইয়ের ডাকে মণিকা চোখ মেলে তাকালো, চোখ দুটো লাল, ছল ছল করছে যেন।

কে! শুভ্র, আয়! প্রফেসার তোকে ডেকেছিলেন কেন রে!

পরীক্ষায় আমি ফার্ষ্ট হয়েছি দিদি!

হয়েছিস! আমি জানতাম, তুই প্রথমই হবি! বলে দিদি চোখ বুজলো।

শিয়রের কাছে এসে বসতে বসতে শুভ্র শুধায়, শরীর কি তোমার ভাল নেই দিদি!

না। ভালই ত আছি।

তবে—বলতে বলতে দিদির কপালে হাত রেখে রজতশুভ্র যেন চম্‌কে ওঠে ঃ এ কি, তোমার যে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

ও কিছু না, সামান্য বোধ হয় একটু জ্বর হয়েছে। কয়েক মাস ধরেই অমনি একটু একটু জ্বর হচ্ছে। ও কিছু না।

কয়েক মাস ধরে এমনি জ্বর হচ্ছে তোমার আর আমাকে কথাটা একবার জানাওনি পর্যন্ত!

● দিদি
নীহাররঞ্জন গুপ্ত

সামান্য জ্বর!

না। এখুনি আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। বলে উঠে দাঁড়ায় রজত।

মণিকা বাধা দেয়, শোন! শোন—রজত!

রজত কিন্তু দিদির কথায় কান দেয় না। তখুনি বের হয়ে গিয়ে পাড়ার বংকিম ডাক্তারকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো।

বংকিম ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে মণিকাকে প্রশ্ন করে, পরীক্ষা করে বের হয়ে এসে রজতকে বললেন, রজতবাবু কাল একবার চেষ্ট্ স্পেশালিষ্ট ডাঃ চৌধুরীকে ডেকে এনে দেখান আপনার দিদিকে।

কেন! কেন ডাক্তারবাবু! আপনি কি কিছু—

হাঁ, খুব ভাল মনে হলো না। একবার দেখান তাঁকে।

দিদির কোন নিষেধই শুনল না রজত, পরের দিনই ৩২্ টাকা ভিজিট্ দিয়ে ডাঃ চৌধুরীকে নিয়ে এলো। তিনিও মণিকাকে পরীক্ষা করে বংকিম ডাক্তারকেই সমর্থন করে এক্স-রে তোলাবার কথা বলে গেলেন।

পরের দিনই এক্স-রে তোলান হলো এবং তখন নিঃসন্দেহেই জানা গেল, একটা নয় মণিকার দু'টা ফুসফুসই ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়েছে। আর রোগটা বিনা চিকিৎসা ও অবহেলায় বেশ ভালো ভাবেই মণিকার ফুসফুসের বায়ুকোষে কোষে আধিপত্য বিস্তার করে বসেছে।

ছোট্ট শিশুর মতই দু'হাতে দিদিকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললো রজত, বললে, এ তুমি কি করেছো দিদি!

এমনি করে দিনের পর দিন নিজেকে তুমি আমার জন্য ক্ষয় করে ফেলেছো অথচ একবারও আমায় জানতে দাওনি! কেন? কেন তুমি এমন করলে দিদি!

অশ্রুসজল চোখে ছোট ভাইয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে মণিকা বলে, দুঃখ করছিস্ কেন ভাই! বাবার মৃত্যু সময় তাঁর কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তোকে যেমন করে হোক আমি মানুষ করে তুলবোই। সে প্রতিজ্ঞা আমার পূর্ণ হয়েছে, এবারে ত আমার ছুটি।

না। না—তুমি ছাড়া যে এ সংসারে আমার আর কেউ নেই দিদি!

প্রসঙ্গটাকে অন্যদিকে নিয়ে যাবার জন্য মণিকা বলে, হ্যাঁরে! তোর বন্ধুদের এবারে খাওয়াবি না। একদিন তাদের নেমন্তন্ন কর!

রজত ততক্ষণে আবার সোজা হয়ে বসেছে। বলে, তুমি ভাবছো তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে। বেশ! আমিও দেখছি, তুমি যেমন একদিন এতটুকু ছোট্ট শিশু আমাকে মায়ের মত বাঁচিয়ে তুলেছিলে, আজ আমিও তোমাকে বাঁচিয়ে তুলবোই!

● দিদি
নীহাররঞ্জন গুপ্ত

## দুই

রজত সেই দিনই সন্ধ্যার সময় ডাঃ চৌধুরীর চেম্বারে গিয়ে দেখা করলো।

ডাঃ চৌধুরী বললেন, আজকাল এ রোগের অনেক আশ্চর্য ঔষধই বাজারে বের হয়েছে রজতবাবু। চেষ্টার ত্রুটি যাতে না হয় সে আমি দেখবো। তবে একটা কথা আপনাকে মনে রাখতে হবে, এ রোগে চিকিৎসা শুধু ঔষধই নয়, মানসিক ও দৈহিক বিশ্রাম, কমপ্লিট্ রেষ্ট্ ও পুষ্টিকর খাদ্য।

আপনি যেমন যেমন বলবেন সব ব্যবস্থাই আমি করবো, কেবল আপনি কথা দিন আপনি আমার দিদিকে সুস্থ করে দেবেন।

ডাঃ চৌধুরী সব কিছুর একটা ফিরিস্তি লিখে দিলেন।

ব্যবস্থাপত্র দেখে কিন্তু রজতের মাথা ঘুরে গেল। ঐ ব্যবস্থামত চলতে হলে যে অর্থের প্রয়োজন সে অর্থ তার কোথায়! এম, এ পাসই সে করেছে। তাও এখনো রেজাল্ট্ বের হয়নি। একটি পয়সা তার ইনকাম নেই! এতদিন চলে এসেছে দিদির উপার্জিত অর্থে। কিন্তু এখন দিদির সে অর্থাগমের পথটুকুও বন্ধ করতে হবে।

চাকরি। যেমন করে যে উপায়ে হোক তার এখনি একটা চাকরির দরকার। রোজগার তাকে করতেই হবে এবং আজ থেকে হলে কাল থেকে নয়।

কিন্তু কোথায় চাকরি, কে দেবে তাকে চাকরি এই মুহূর্তে!

ভাবতে ভাবতে রজতের প্রফেসারের কথাই মনে পড়লো। সে তখনি চলে গেল সোজা বাসে চেপে প্রফেসারের গৃহে। প্রফেসার গৃহে ছিলেন না, সে অপেক্ষা করতে লাগলো।

রাত আটটা নাগাদ প্রফেসার ফিরে এলেন এবং রজতকে বসে থাকতে দেখে বলে উঠ্লেন, এই যে রজত, তোমার কথাই ভাবছিলাম, বিলাতে গিয়ে হায়ার ষ্টাডির জন্য একটা ফরেন স্কলারশিপ দেওয়া হবে দুজন ছাত্রকে। সিলেকশন বোর্ডে আমি আছি। তুমি এ্যাপ্লাই করে দাও কালই! তোমার যাতে হয় সে চেষ্টা আমি করবো। আর আমার ধারণা তোমার হয়ে যাবেই।

স্কলারশিপের প্রস্তাবে রজত কিন্তু কোন উৎসাহই দেখায় না। মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়, এখন আমার বিলেত যাওয়া অসম্ভব, স্যার!

সে কি! কেন! এমন একটা চান্স্!

উপায় নেই স্যার।

উপায় নেই! কেন!

রজত তখন ধীরে ধীরে তার দিদির সব কথা বলে, তার অসুখের কথাটাও বলে ঃ দিদিকে আজ এই অবস্থায় ফেলে স্বর্গেও আমার যাওয়া সম্ভব নয় স্যার। যে আমার জন্য তার সারাটা জীবন দিয়ে এত বড় নিঃস্বার্থ ত্যাগ করলো, আজ যে ভাবে যে উপায়েই হোক সর্বাগ্রে যে আমায় তাকেই সুস্থ করে তুলতে হবে স্যার।

- দিদি
  নীহাররঞ্জন গুপ্ত

আই সি!...প্রফেসারও যেন এবারে চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

তাই আপনার কাছে এসেছি স্যার। যেখানে যে মাইনায় হোক আমাকে একটা—

তাইত! ভেরি স্যাড্! কি করি! প্রফেসার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। তারপর একসময় পায়চারি থামিয়ে রজতের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপাততঃ ত কোন কিছুই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি না রজত। তবে এক কাজ করো। আমার এক বন্ধুর ছেলেকে পড়ানোর জন্য একজন ভাল প্রফেসারের খোঁজ করছিল, তাকে একটা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি, নিয়ে যাও। সে চাকরিটা হয়ে যাবে। তারপর দেখছি যদি অন্য কোন ব্যবস্থা তোমার জন্যে করতে পারি ইতিমধ্যে।

প্রফেসার সত্যিই রজতকে নিজের সন্তানের মতই ভালবাসতেন। তখনি একটা চিঠি লিখে রজতকে দিলেন।

এই টাকা ক'টা রাখো।

রজত বের হয়ে যাচ্ছিল চিঠিটা নিয়ে, ডাকলেন, রজত, শোন।

রজত সামনে এসে দাঁড়াল।

নিজের পকেট থেকে পার্স বের করে, তা থেকে দশটাকার পাঁচখানা নোট বের করে রজতের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, এই টাকা ক'টা রাখো।

● দিদি
নীহাররঞ্জন গুপ্ত

না। না—স্যার।

লজ্জিত হবার কিছু নেই এতে রজত। মনে করো এটা তোমাকে দান নয়, ধার দিচ্ছি। সময় মত শোধ করে দিও, কেমন? যাও!

রজত আর না করতে পারল না। টাকাগুলো হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বের হয়ে গেল।

প্রফেসার যেখানে চিঠি দিয়েছিলেন সোজা সেখানেই গেল রজত।

এবং যে ভদ্রলোকের নামে চিঠি ছিল তিনি প্রফেসারের চিঠি পেয়ে বলে দিলেন পরদিন থেকেই রজতকে কাজে লাগতে। আর মাইনেও বলে দিলেন প্রফেসারের কথামত ৭০্ টাকা করেই দেবেন। সপ্তাহে চার দিন সে পড়াবে।

প্রফেসারের দেওয়া টাকা থেকেই ঔষধ-পত্র নিয়ে রাত্রি দশটায় ফিরে এলো রজত।

এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলি রজত! তোর হাতে ওসব কি?

কোন প্রশ্ন নয় আর! এবার থেকে তোমার ছুটি, বিশ্রাম। লক্ষ্মী মেয়ের মত যা আমি বলবো ঠিক সেই ভাবে চলবে, বুঝলে! এসব হচ্ছে তোমার ঔষধ।

তা যেন হলো। কিন্তু টাকা পেলি কোথায়!

কেন? ভাইকে তোমার লেখাপড়া শিখিয়েছো।

এর মধ্যেই চাকরি পেয়েচিস?

নিশ্চয়ই!

মণিকার চোখের তারা দুটো আনন্দে চক্ চক্ করে ওঠে!

তোমার আর চাকরি করা নয়, কালই একটা রেজিগনেশন লেটার লিখে দেবে, আমি নিজে গিয়ে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসবো, বুঝেচো?

সত্যি চাকরি পেয়েচিস রজত! কত মাইনা হলো?

তাও জানতে পাবে না। তুমি যতদিন আমার দেখাশুনা করেছো, আমি কোনদিন তোমার মাইনার কথা জানতে চেয়েছি যে তুমি জানতে চাইছো।

বেশ। তা নয় হলো, কিন্তু ফট্ করে চাকরিটা ছেড়ে দেওয়া কি ঠিক হবে রে! তার চাইতে ২/৩ মাস ছুটির একটা দরখাস্ত করে দিই।

তা দিতে পারো, তবে জেনে রেখো আর তোমাকে আমি জয়েন করতে দিচ্ছি না।

আচ্ছা! আচ্ছা—তাই হবে। মণিকা হাসতে হাসতে বলে।

## তিন

কিন্তু তিন মাসের মাথাতেই রজত বুঝতে পারলো টি. বি. রোগটার সঙ্গে যুদ্ধ করা তার মত

● দিদি
নীহাররঞ্জন গুপ্ত

একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে অত সহজ নয়। ইতিমধ্যে অনন্যোপায় হয়েই মণিকাকে চাকরিতে ইস্তফা দিতে হয়েছে এবং রজতও আরো দুটো, একটা ৫০৲ ও একটা ৪০৲ টাকার টিউশনি যোগাড় করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যান্য সব দিক সামলে দিদির রোগের সর্বতোভাবে মনোমত ব্যবস্থা করে উঠতে পারছে না।

তার উপরে দিদির রোগটাও বিশেষ তেমন উপশমের দিকে যাচ্ছে না। একজন রাতদিনের লোকও রাখতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। ভাল কোন চাকরিরও কোন আশা পাওয়া যাচ্ছে না। যত অসুবিধাই হোক রজত কিন্তু জানতে দেয় না দিদিকে কিছুই! সর্বদা হাসি মুখে দিদিকে কেবল আশাই দেয়।

তার খরচার বহর দেখে মণিকা শুধায়, এত খরচ করচিস! কত টাকা পাসরে রজত?

অনেক! অনেক—দু'হাত মেলে দেখায় রজত ঃ এত কষ্ট করে তবে এতগুলো পাস কি আমাকে বৃথাই করালে দিদি!

বেঁচে থাক ভাই! সুখে থাক! অনেক রোজগার কর। মা লক্ষ্মী তোকে দু'হাতে উজাড় করে দিন।

কোন কোন দিন আবার মণিকা বলে, দুটি সাধ আমার মনে ছিল রজত।

কি দিদি।

তুই রোজগার যখন করবি অনেক টাকা, তখন মনের মত করে একটা ছোট বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ি করবো কোন নির্জন জায়গায় আর—

আর কি দিদি?

না থাক!

বলোই না?

বোলবো রে বোলবো! আজ নয় আর একদিন।

বেশ ত! তুমি একটা প্ল্যান ভাবো কেমন করে বাড়িটি তৈরি করবে। কোথায় জায়গা কিনবে!

সত্যি বলচিস্ তুই এখুনি জায়গা কিনতে পারবি!

নিশ্চয়ই!

রবিবারের পত্রিকায় অনেক জায়গা জমির কথা বের হয়। শুয়ে শুয়ে পড়েই আমি পছন্দ করে তোকে বলবো। তারপর তুই নিজে গিয়ে দেখে আসবি।

বেশ ত!

দক্ষিণ খোলা, সামনে অন্ততঃ চল্লিশ ফুট চওড়া রাস্তার কর্ণার প্লট হওয়া চাই। নিজেদের বাড়ির দক্ষিণই যদি খোলা না থাকে ত কি হলো।

সে ত নিশ্চয়ই।

বেশী নয়, কাঠা চারেক হলেই হবে। দু' কাঠায় বাড়ি আর দু' কাঠায় থাকবে ছোট একটি ফুলের বাগান। বাগানের মধ্যে একটা ফোয়ারা থাকবে কি বলিস?

● দিদি
নীহাররঞ্জন গুপ্ত

সে তুমি যেমন বলবে তাই হবে।

তারপর থেকে কয়দিন কেবলই দুই ভাই-বোনের মধ্যে ঐ আলোচনা! বাড়ি আর জায়গা! কেমন হবে বাড়িটা। একতলা না দোতলা, ক'টা ঘর থাকবে সব সমেত।

মাস পাঁচেক বাদে একদিন ৭০্ টাকা করে যেখানে মাইনে পাচ্ছিল সেখানে গিয়ে রজত শুনলো, ছেলেটি আর পড়বে না সামনের মাস থেকে। কারণ তার বাবা দিল্লীতে বদলি হয়ে দিন পাঁচেকের মধ্যেই চলে যাচ্ছেন।

শুনে ত রজতের মাথায় যেন বাজ ভেঙ্গে পড়লো।

ছাত্রের বাবা মোহিতবাবু কিন্তু রজতের ব্যবহারে তার প্রতি বিশেষ ভাবেই মুগ্ধ ছিলেন। তিনি বললেন, দিল্লীতে বড় পোষ্টে আমি যাচ্ছি রজতবাবু, দেখি এবারে যদি আপনার সেই চাকরিটার কোন সুবিধা করতে পারি।

মোহিতবাবু রজতকে বাধ্য হয়েই ছাড়িয়ে দিলেন বটে তবে এক মাসের মাইনা বেশী দিয়ে দিলেন।

রজত পথে নেমে অনির্দিষ্ট ভাবে হাঁটতে লাগলো।

ডাঃ চৌধুরী গত পরশু বলেছেন, আপনার দিদিকে যদি কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় নিয়ে গিয়ে মাস দুই-তিন রাখতে পারেন ত তাই দেখুন রজতবাবু! অনেক সময় স্বাস্থ্যকর জায়গায় খোলা হাওয়ায়— যেমন ধরুন হিলি প্লেস বা সমুদ্রের ধারে এ রোগে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়।

সেই কথাটাই আজ দুদিন ধরে ভাবছিল রজত। কিন্তু সে সঙ্গতি তার কোথায়। এত টাকা সে কোথায় পাবে। ইতিমধ্যে অর্থ উপায়ের আর একটা গোপন প্রচেষ্টা সে করছিল। খান দুই উপন্যাস সে গত দু' মাস রাত জেগে জেগে রচনা করেছে। ইতিপূর্বে মধ্যে মধ্যে সে কাগজে কিছু গল্প প্রকাশ করেছিল এবং তাতে সুখ্যাতিও পেয়েছিল, এবং দু' একজন নতুন পাবলিশার তাকে উপন্যাস লেখার জন্য উৎসাহও দিয়েছে। গল্প না লিখে উপন্যাস লিখুন রজতবাবু, যা কাটবে। আপনিও দু' পয়সা পাবেন। উপন্যাস দুটি লিখে সে একজন পাবলিশারকে দিয়েছে, তারা ছাপাতেও সম্মত হয়েছে। কিন্তু সেখান থেকেও কবে টাকা পাওয়া যাবে তার স্থিরতা নেই। বই বেরুবে, বিক্রি হবে, খরচ উঠবে তবে প্রাপ্তির আশা।

রাত্রে রজত যখন বাড়ি ফিরে এলো—দেখলো দিদির জ্বর আবার বেড়েছে।

মাঝ রাত্রে কাশতে কাশতে রক্ত বেরুলো মণিকার গলা থেকে।

রজতের মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে।

ভোর হতেই সে ছুটে যায় ডাঃ চৌধুরীর চেম্বারে। বলে, ডাক্তারবাবু দিদির গলা দিয়ে রক্ত পড়েছে।

ডাঃ চৌধুরী বললেন, তার জন্য অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? এ রোগে রক্ত পড়েই! আপনি বরং

যত তাড়াতাড়ি পারেন কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় ওকে রিমুভ করবার চেষ্টা করুন। আপনি বাসায় যান, দুপুরের দিকে যাবোখন একবার। রাস্তায় নেমে রজত ভাবতে ভাবতে চলে, যেমন করেই হোক দিদিকে তার কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় নিয়ে যেতেই হবে। কিন্তু টাকা! টাকা কোথায়!

হঠাৎ মনে পড়ে একটা কথা। ঠিক্—পাবলিশার ত ব'লেছিল, বইয়ের কপিরাইট বিক্রি করে দিলে এখুনি কিছু টাকা পেতে পারে, কিন্তু সেদিন সে রাজী হতে পারেনি তার প্রস্তাবে। কপিরাইটই সে বিক্রি করে দেবে। সেই টাকাতেই দিদিকে নিয়ে সে পুরী যাবে। পাবলিশারের কাছেই রজত চলল। পাবলিশার মহেন্দ্রবাবু দোকানেই ছিলেন। রজতকে দেখে বললেন, আসুন রজতবাবু! আপনার কনট্রাক্ট্টা আমি কম্‌প্লিট করে রেখেছি। সই করে দিয়ে যান। বই তাহলে দু'এক দিনের মধ্যেই প্রেসে দেবো।

আমি ভাবছি আপনাকে কপিরাইটই বিক্রি করে দেবো, আমার কিছু টাকার অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন।

বেশ! তাতে আমার আর আপত্তি কি! তা এক পক্ষে ভালই! কবে বই বিক্রি হবে কবে টাকা পাবেন, আর নতুন লেখক আপনি, বই আপনার আদৌ কাটবে কিনা তারও কোন গ্যারাণ্টি নেই। এতে বরং কিছু নগদা-নগদি আপনি পেয়ে যাবেন, আর আমার আশা-ভরসা তো সব সেই ভবিষ্যতের গর্ভে। তা কি রকম চান বলুন!

আপনিই বলুন না।

দেখুন নতুন লেখক আপনি! আপনার বইয়ের সেলের কোন গ্যারাণ্টিই নেই। তা আমিও আপনাকে ঠকাতে চাই না। দুখানা বইয়ে পঞ্চাশ করে একশা দেবো!

একশ!

হ্যাঁ, বুঝতেই ত পারছেন, আজকালকার কষ্ট্ অফ্ প্রোডাকসন কত বেড়ে গেছে, বেশ, আর না-হয় পঁচিশ ক'রে ধরে দিচ্ছি—ঐ দেড়শতই নিন।

আর কিছু বাড়িয়ে দিন।

শেষ পর্যন্ত মহেন্দ্রবাবুর কাছে দুইশত টাকায় দুখানা বইয়ের কপিরাইট বিক্রি করে টাকা নিয়ে সই করে দিল রজত।

বাড়িতে ফিরে এলো যখন বেশ উৎফুল্ল সে।

দিদি কোন প্রশ্ন করবার আগেই রজত বললে, সমুদ্র দেখবে দিদি?

সমুদ্র! দিদির চোখের মণি দুটো জ্বল্ জ্বল্ করে ওঠে।

হ্যাঁ, তোমাকে নিয়ে ভাবছি পুরীতে যাবো।

সত্যি বলচিস রজত?

হ্যাঁ।

তোকে সেদিন বলিনি ভাই! আমার মনের মধ্যে দ্বিতীয় সাধটি ছিল সমুদ্র দেখা। তুই আমার

কোন সাধই অপূর্ণ রাখবি না দেখছি। কিন্তু আগে বাড়ির জন্য জায়গাটা কিনে নিলে হতো না।

সে জন্য তুমি ভেবো না। তোমার পছন্দ মত সেই জায়গাটাই আমি যাবার আগে বায়না করে যাবো। তারপর পুরী থেকে ফিরে এসে বাড়ি শুরু করা যাবে। কি বল!

বেশ, তাই চল, আয় আমার কাছে আয়।

রজত দিদির সামনে এসে বসলো। রজতের একখানা হাত নিজে শীর্ণ হাতের মধ্যে নিয়ে মণিকা বলে, জন্মে জন্মে তোকেই যেন ভাই পাই রজত! আর আমার কোন কামনা নেই! আজ আমার কত আনন্দের দিন। বাবা-মা বেঁচে থাকলে কত খুশি হতেন। বাবা-মার নামে কিন্তু বাড়ির নাম দিস 'সতেন্দ্র-বিমলা কুটীর'।

নিশ্চয়ই, তুমি যেমন বলবে, তা হবে।

## চার

সব গোছ-গাছ করে পুরী রওনা হতে হতেও দিন সাতেক লেগে গেল।

পুরীতে সাগরের কাছেই একটা ছোট বাড়ির একতলাটা ভাড়া নিয়ে রজত তার দিদিকে নিয়ে এসে উঠলো।

পুরীতে এসে মণিকা যেন তার নব যৌবন ফিরে পেয়েছে। শিশুর মতই আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠে এবং দিন পনের বেশ ভালই থাকে।

তারপরই আবার একদিন জ্বর দেখা দেয় প্রবলভাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কাশিও।

রজত চিন্তিত হয়ে পড়ে।

স্থানীয় একজন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসে। তিনি পরীক্ষা করে যাবার সময় বলে যান রজতকে আড়ালে ডেকে, করবার আর কিছুই নেই রজতবাবু! যে কয়দিন টিকে থাকেন। ঔষধ আগেও যা চলছিল তাই চলুক।

জ্বর আর ছাড়ে না মণিকার। গায়ে সর্বদাই জ্বর থাকে, আর কাশিও চলে। তবে রক্ত পড়েনি একদিনও। কিন্তু রজত বুঝতে পারে তার দিদি ক্রমেই আরো দুর্বল হয়ে পড়ছে, বিছানা থেকে আজকাল আর উঠতেই পারে না।

হাতের অর্থও ক্রমে ফুরিয়ে আসে। রজত যেন চারিদিকে অন্ধকার দেখে।

শেষ পর্যন্ত কি সত্যি সত্যিই দিদির কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিতে হবে!

এমনি সময় একদিন একটা পার্শ্বেল এলো।

পার্শ্বেল খুলে দেখা গেল রজতের বই 'স্বপ্নসম্ভব' দু'কপি প্রকাশক পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে একটা চিঠিও দিয়েছেন, রজতবাবু আশাতীতভাবেই আপনার বই বিক্রি হচ্ছে। আরো বই লিখুন।

মণিকা ত বই দেখে এত উৎফুল্ল হয়ে ওঠে যে বলাই যায় না। চার ঘণ্টার মধ্যে বইটা শেষ

করে ফেলে হঠাৎ গোড়া থেকে বইটা উল্টাতে গিয়ে টাইটেল পেজের পরের পৃষ্ঠায় লক্ষ্য পড়ে। সেখানে বড় বড় অক্ষরে ছাপা ঃ পুস্তকের সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।

রজত বাড়িতে ছিল না। ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। সে ফিরে আসতেই মণিকা বলে, এ তুই কি করেচিস রজত! এমন একটা বইয়ের সমস্ত স্বত্ব তুই বিক্রি করে দিয়েছিস! কেন? তোর কিসের অভাব! এত টাকা তুই রোজগার করিস, তবে বইটা বিক্রি করতে গেলি কেন?

তুমি ত জান না দিদি, এদেশের প্রকাশকদের, নতুন লেখকের বই কপিরাইট ছাড়া কেউ নিতেই চায় না।

কেন? নিজের টাকা দিয়ে ছাপালেই পারতিস।

সে অনেক হাঙ্গামা। তাছাড়া আর ত বই বিক্রি করছি না, পরে আরো লিখবো।

কত টাকায় বিক্রি করলি?

সে অনেক টাকা। বলত কত পেয়েছি।

হাজার দশেক নিশ্চয়ই।

হুঁ হুঁ! বলতে পারলে না-ত! আরো বেশী!

পনের!

না, কুড়ি হাজার।

সত্যি বলছিস!

হাঁ। সেই টাকায়ই ত জায়গা কিনছি।

হাঁ তাই করিস, টাকাটা নষ্ট করিস না।

না-না ব্যাংকে জমা আছে।

সত্যি রজত! ভ্রাতৃগর্বে আমার বুকটা ফুলে উঠছে। আজ বাবা বেঁচে থাকলে দেখতেন তাঁর সৃষ্টি তাঁর কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। জানিস ভাই! ছোটবেলা এতটুকু তোকে রেখে যখন মা-বাবা দুজনেই মারা গেলেন, কত দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে তোকে আমি মানুষ করে গড়ে তুলবার স্বপ্ন দেখেছি—

বেশী কথা বলো না দিদি। সব আমার মনে আছে।

না ভাই! বলতে দে। কোনদিন কোন কথাই তোকে জানতে দিইনি। কিন্তু আজ আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে, আজ তোকে বলছি, সব কষ্টের মূল্যই আমি পেয়েছি ভাই! তুই নিজেও সার্থক হয়েচিস, আমাকেও সার্থক করেচিস!

চুপ করো দিদি! চুপ করো!

না রে না! আর চুপ করে থাকবার দিন নয় আমার, আজ যে আমার চেঁচিয়ে কথা বলবার দিন।

দিদি!

● দিদি
নীহাররঞ্জন গুপ্ত

আমি বুঝতে পারচি ভাই, আর আমার দেরি নেই। যাবার সময় এসেছে। এখানে আর নয়। এবারে চল কলকাতায় ফিরে যাই আমরা। তাড়াতাড়ি বাড়িটা এবারে শেষ করতে হবে তোকে। আমি তোর—তোর বাড়িতেই শেষে নিঃশ্বাস নিতে চাই ভাই! পারবি না তাড়াতাড়ি বাড়িটা শেষ করতে?

পারবো, নিশ্চয়ই পারবো।

আমি জানি তুই পারবি।...

শেষ রাত্রের দিক থেকে মণিকার জ্বর আরো বৃদ্ধি পায়। সে জ্বরের ঘোরে ভুল বকতে শুরু করে।

এখানে নয় রজত, এখানে নয়। তোর বাড়িতে আমাকে নিয়ে চল!...

এবং সকাল আটটা নাগাদ জ্বরের ঘোরেই কাশতে কাশতে আবার দীর্ঘ দেড়মাস বাদে মণিকার গলা দিয়ে এক ঝলক রক্ত বের হয়ে আসে।

এবং রক্ত বমনের সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ যেন কেমন নিস্তেজ হয়ে এলিয়ে পড়ে মণিকা। চিৎকার করে ডেকে ওঠে রজত, দিদি! দিদি!

অতি কষ্টে মণিকা যেন চোখ মেলে একবার ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করে, তারপরই দু'চোখের পাতা তার বুজে যায়। মাথাটা বালিশ থেকে গড়িয়ে পড়ে।

চিৎকার করে ওঠে রজত দিদির প্রাণহীন দেহটা আঁকড়ে, দিদি! দিদি! শুনে যাও! শুনে যাও! তুমি যা জেনেছো সব মিথ্যে, সব ভুল! কিছু আমার নেই! তোমার কোন আশাই সফল হয়নি। কিছু আমি চাই না, কিছু না। কেবল তুমি আমাকে ফেলে চলে যেও না দিদি! তুমি আমার থাকো!

আরো ঘণ্টা দুই বাদ।

দিদির মৃতদেহটার পাশে মুহ্যমানের মতই বসে ছিল রজত। বাইরে টেলিগ্রাম পিওনের সাইকেলের ঘণ্টির শব্দ ও গলা শোনা গেল ঃ তার আছে!

দু-তিনবার ডাকবার পর রজত উঠে গিয়ে সই করে টেলিগ্রামটা নিল।

খামটা ছিঁড়ে দেখলো রজত, দিল্লী থেকে তার ৫০০্—১০০০্ টাকা গ্রেডের চাকরিটা হয়েছে। মোহিতবাবুই তার করে জানিয়েছেন।

কংগ্র্যাচুলেশন রজত! তোমারই চাকরিটা হয়েছে। এপয়েন্ট্‌মেণ্ট লেটারও ইসু হয়েছে। ইতি, শুভাকাঙ্ক্ষী মোহিত মৈত্র।

তারটা হাতে করে রজত পায়ে পায়ে নিঃশব্দে মৃতা দিদির শিয়রের সামনে এসে দাঁড়াল। এত কষ্ট পেয়ে মারা গিয়েছে মণিকা, তবু তার ওষ্ঠ-প্রান্তে জেগে আছে এখনো একটুকরো হাসি। দিদি যেন হাসছে।

---

# মহারাজা মিহিরভোজ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

[এক সময়ে রাষ্ট্রকূট এবং প্রতিহার সাম্রাজ্যের রাজারা দক্ষিণ ভারতে ছিলেন বিশেষ বিখ্যাত। উত্তর ভারত পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। একদিকে যেমন ছিল তাঁহাদের বীরত্ব, শৌর্য ও রণ-নৈপুণ্য—অন্য দিকে ছিলেন তাঁহারা বিদ্যানুরাগী, দাতা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের উৎসাহদাতা। গুর্জ্জর প্রতিহার বংশের একজন নৃপতি ছিলেন মিহিরভোজ। সেকালে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাশালী রাজা কেহ ছিলেন না। (৮৩৬—৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) নবম শতাব্দীতে তিনি রাজত্ব করেন।]

**এক**

সম্রাট রামভদ্রের মৃত্যু হইয়াছে।

তিনি ছিলেন ভীরু ও দুর্ব্বল, রাজ্যশাসনে ও শত্রু-দমনে ছিলেন অযোগ্য। ধ্যান-ধারণা, দান, যাগ-যজ্ঞ এই সব ছিল তাঁহার নিত্যকার কাজ। তাঁহার অক্ষমতার সুযোগে চারিদিকে বিজিত রাজারা করিয়াছিলেন বিদ্রোহ। তাঁহারা মানিতেন না নৃপতি রামভদ্রের শাসন। ঘোষণা করিলেন সমস্ত বিজিত রাজারা স্বাধীন। এমনি দুর্দ্দিনে—রাজ্যে যখন চলিতেছিল, দিকে দিকে বিপ্লব ও বিদ্রোহ, সে সময়ে সিংহাসনে বসিলেন মিহিরভোজ—তরুণ যুবক, রণদক্ষ ও বলে-বীর্য্যে ও সাহসে সুনিপুণ; সিংহাসনে

বসিয়াই তিনি পণ করিলেন রাজ্যের পূর্ব্ব গৌরব আবার ফিরাইয়া আনিবেন, তাঁহার অভিষেককালে মন্ত্রী ও পণ্ডিতেরা যখন রাজ্যাভিষেক মন্ত্র পড়িতেছিলেন, সেই সময়ে রাজা ভোজ কোষবদ্ধ তরবারি মুক্ত করিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে পণ করিয়াছিলেন—"যত দিন আমি রাজ্যের বিদ্রোহ, বিপ্লব এবং শত্রুসৈন্য বিনাশ করতে না পারবো, ততদিন আমার এই তরবারি কোষবদ্ধ করবো না—এই আমার পণ।"

রাজার বাক্যে—এই পণে চারিদিকে জাগিয়া উঠিল জয়ধ্বনি।

—এ প্রসঙ্গে পূর্ব্বতন রাজাদের কথা একটু বলিতেছি।

এ বংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা প্রথম নাগভট ছিলেন বীরযোদ্ধা। পরবর্ত্তী রাজা কক্কুক ছিলেন সুরসিক, পরে বৎসরাজ ধীর, স্থির, শান্ত ও চরিত্রবান্, মহানুভব ব্যক্তি। দ্বিতীয় নাগভট ছিলেন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা, বহু যাগ-যজ্ঞ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী, তাঁহাকে বলা হইত—"আত্মবৈভব সম্পন্ন"। ইঁহার পুত্র রামভদ্রের কথা প্রথমেই বলিয়াছি। এই রামভদ্রের পুত্র ভোজ, যিনি ছিলেন, প্রতিহার বংশের মিহির—সূর্য্য। আমরা সেই বীর সম্রাট মিহিরভোজের কথাই বলিতেছি।

মিহিরভোজ যখন সিংহাসনে বসিলেন, তখন রাজ্যে ছিল না কোন শান্তি। রাজা চিন্তিত হইলেন। এক সময়ে যাহারা অধীনতা মানিয়াছিল আজ তাহারা বিদ্রোহী, শত্রু; নানাদিক্ দিয়া রাজ্যমধ্যে অশান্তির আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে। আশেপাশের ছোট রাজারা উৎপাত করে, আক্রমণ করে—লুঠ করে—প্রজাদের শস্য, অর্থ, ঘর-বাড়ী। একদিকে যেমন চারিদিকে গৃহশত্রু, অন্যদিকে আবার বাঙ্গলার পালরাজারা বীরত্বে অগ্রণী। সে সময়ে বিখ্যাত পালরাজা দেবপাল ছিলেন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। পালরাজা দেবপালকে ভারতের অন্যান্য দেশের রাজারা তখন ভয় করিত।

তিনি একদিন সভা আহ্বান করিলেন। আহ্বান করিলেন রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ও বিচক্ষণ ব্রাহ্মণদের। কেননা কনোজে ব্রাহ্মণদের সম্মান ও আধিপত্য ছিল প্রচুর। ব্রাহ্মণেরা এই বংশের রাজাদের ছিলেন হিতৈষী। দেব-দ্বিজে ভক্ত ও অনুরাগী যেমন ছিলেন এ বংশের নৃপতিগণ তেমনি ছিলেন ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধাবান।

ব্রাহ্মণেরা সভায় আসিলে ভোজরাজ তাঁহাদের সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন,—আপনারা আমার হিতৈষী, মন্ত্রণাদাতা। আপনাদের আদেশ ও উপদেশ আমার পিতা, পিতামহ এবং পূর্বপুরুষেরা মেনে চলেছেন, বলুন এ অবস্থায় আমার কি কর্ত্তব্য। রাজ্য বিপন্ন, চারিদিকে শত্রু মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, —আমি চাই তাদের দমন করে রাজ্যে শান্তি স্থাপন করতে! শত্রু যখন চায় যুদ্ধ, আমাকেও যুদ্ধে নামতে হবে। জানি যুদ্ধে লোকক্ষয়, মৃত্যু, চারিদিকে হাহাকার, মহামারী ও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা, তবু আমার এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য বলুন। আপনারা—

ব্রাহ্মণদের মুখপাত্ররূপে মন্ত্রী বালাদিত্য বলিলেন ঃ

মহারাজ! আপনি হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক। জাতি ও সমাজের কল্যাণকামী। একদিন স্বর্গীয় মহারাজারা

● মহারাজা মিহিরভোজ
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

যে শক্তিবলে সমুদয় রাজাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন, সেই প্রভুত্ব আপনি আবার বাহুবলে রক্ষা করুন। যেখানে যুদ্ধ অনিবার্য্য, সেখানে যুদ্ধ করাই আবশ্যক, কাজেই আমাদের সকলের অভিপ্রায়, যুদ্ধে ব্রতী হউন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন কুরুক্ষেত্রে কৌরব-পাণ্ডবের যুদ্ধ সমর্থন করেছিলেন, তেমনি আমরা চাই ন্যায়যুদ্ধ; ব্রতী হন ন্যায়যুদ্ধে শত্রু দমনে। শত্রুর আস্ফালন অবশ্য দমন করবেন।

মহারাজা অবনত মস্তকে বলিলেন—আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য। হাঁ, আমি বীরের সন্তান, বীরের মতই প্রবৃত্ত হব ন্যায় যুদ্ধে! আমি অভিষেককালে আপনাদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, রক্ষা করবো সে পণ!

রাজসভায় উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ সকলে সাধু! সাধু! বলিয়া রাজাকে করিলেন আশীর্ব্বাদ। রণদামামার নির্ঘোষ ধ্বনিত হইল চারিদিকে, রাজা ভোজের জয়ধ্বনি করিল চারণগণ!

## দুই

প্রত্যন্ত প্রদেশের একটি পল্লী। ক্ষুদ্র পল্লী। নাম তার রামভদ্রপুর। সেখানে কৃষকশ্রেণীর লোকেরা বাস করে। মধ্যভারতের গ্রাম। প্রতিহার রাজাদের রাজ্যে এই পল্লী। কিন্তু বিপন্ন প্রজারা কাঁদে, হাহাকার করে, আজ তাদের গোধন গেল চুরি, কাল গেল মহিষপাল, ঘরবাড়ী গেল, গেল তৈজসপত্র। ক্ষেতে চাষ করিতে গেলে পাশের রাজ্যের লোকেরা লাঙ্গল যোয়াল কাড়িয়া নেয়। এই ভাবে চলিতেছিল প্রতিহার রাজ্যের অবস্থা। স্ত্রী-পুরুষ ভাবনায় কাটায়। কবে সুদিন ফিরিয়া আসিবে। গ্রামের মোড়ল বলেন চাষীদের,—ভাই আমি কি করবো, রাজা যদি প্রজাদের না দেখেন তবে কে দেখবে? রাজদরবারে যাব? কি হবে গিয়ে? কে শুনবে আমার কথা! রাজা-দেবতার সঙ্গে কি গরীব চাষার সাক্ষাৎ মিলেরে ভাই! ঈশ্বরকে ডাক, তিনি মুখ তুলে চাইবেন একদিন।

নিরুপায় প্রজারা চাষীরা কাঁদিয়া ঘরে ফিরে। ইহাদের মুখে নাই ভাষা, হৃদয়ে নাই বল, শুধু কাঁদিতেই জানে। শুধু কাঁদে আর হাহাকার করে।

একদিন সেই নির্জ্জন পল্লীতে ঠিক সন্ধ্যার সময় আসিলেন একদল তীর্থযাত্রী। তাঁহারা চলিয়াছেন রামেশ্বরম্ তীর্থে। গ্রামের মোড়ল নারায়ণ বিষণ্ন মনে তার কুঁড়েঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানিতেছিল। ঘরের পাশে গোয়াল। গোয়ালের গোরু-মোষরা হাম্বা আম্মা করিতেছিল। নারায়ণের ছোট নাতিটি তাহাদের দিতেছিল বিচালি খাবার জন্য। অতি সামান্য বিচালি—!

নারায়ণ বলিতেছিল,—ওরে রামু, দেখ ত গুণে, সব গোরু-মোষ ঘরে ফিরে এসেছে কিনা!

রামু বলিল,—দাদাজী দু'টো গোরু, দু'টো মোষ নেই।

নারায়ণ বলিল,—হায়রে কপাল! এদেশে কি রাজা নেই, রাজা থাকলে কি এমন দশা হয়? যে রাজা প্রজাদের দেখে না, তেমন রাজা থেকে কি লাভ রে দাদাজী! কি খাব আমরা! কপালে করাঘাত করে নারায়ণ।

● মহারাজা মিহিরভোজ
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

হুঁ দাদু!

এমন সময় তীর্থযাত্রীর দল আসিয়া দাঁড়াইল নারায়ণের কুটিরের পাশে।

নারায়ণ হাতের হুঁকো রাখিয়া ভয়ে থতমত খাইয়া বলিল,—আপনারা—তোমরা কারা? আপনাদের পায়ে পড়ি, আমরা বড় গরীব চাষা, আমাদের কিছু নেই, লুঠ করবেন না—আমাদের কিছু নেই! কাঁদিয়া পায়ে লোটাইয়া পড়িল বৃদ্ধ মণ্ডল—তীর্থযাত্রীদের প্রধানের কাছে।

প্রধান বলিলেন,—ভাই, আমরা লুঠতরাজ করতে আসিনি। যাচ্ছি রামেশ্বরম্ তীর্থ দর্শন করতে, আজ রাত্রের মত ঠাঁই দেবে আমাদের? আমরা ঐ তেঁতুল গাছের তলে রাত কাটাব।

নারায়ণ একটু বল সঞ্চয় করিয়া বলিল, তা—তা—থাকতে পার—কিন্তু জান প্রত্যেক দিন রাত্রিতে এগাঁয়ে পাশের গাঁয়ের দস্যু-ডাকাতরা এসে মেরে ধরে সব নিয়ে যায়। ঘরে ঘরে লাগায় আগুন। বালবাচ্চাদের ধরে নিয়ে পালায়! তোমরা এসেছ আমাদের গাঁয়ের অতিথি হয়ে, যদি তোমাদের প্রাণ যায়, আমরা ত বাঁচাতে পারব না ভাই তোমাদের। আমরা যে অক্ষম, আমরা যে দুর্ব্বল!

তীর্থযাত্রীদের নেতা বলিলেন,—সে ভয় করো না। কার সাধ্য আমাদের আক্রমণ করে,—দেব না তাদের মাথা ভেঙ্গে!

বলে ত' অনেকেই ভাই, কিন্তু তারা যখন আসে তখন সবাই দেয় চম্পট।

তীর্থযাত্রীদের প্রধান হাসিলেন।

সে ভয় করো না মোড়ল।

তাঁহার ইঙ্গিতে তাঁহার সঙ্গীদল বিশাল প্রান্তরের মধ্যে বট, অশ্বত্থ ও তেঁতুল গাছের নীচে আড্ডা গাড়িল। শীতের রাত্রি, আগুন জ্বালিল চারিদিকে। তারপর লোটা কম্বল গুছাইয়া বসিল।

নারায়ণ বলিল প্রধানকে—ভাই আমাদের সাধ্য নেই যে তোমাদের খাদ্য যোগাই। তবে গরীবের যা কিছু আছে ক্ষুদ-কুঁড়ো, তাই এনে দিচ্ছি। দয়া করে তাই নিয়ে রেঁধে বেড়ে খাও!

প্রধান বলিল,—কিছুই করতে হবে না। আমাদের সঙ্গে ঐ যে সব গোরুর গাড়ী দেখছ তাতে আছে আমাদের খাদ্যসামগ্রী। তুমি কোন কষ্ট করো না ভাই!

নারায়ণ বলিল—সে ত হয়না দাদা। আপনারা হলেন গ্রামের অতিথি—ওরে শোন্ সব, যার ঘরে যা কিছু আছে সব নিয়ে আয়। শুনিল না তারা কোন মানা। কৃষাণেরা নিজ নিজ ঘর হইতে আনিয়া দিল খাদ্য-সম্ভার—যার যা কিছু ছিল। চাল, ডাল, ঘৃত, নুন, সবজি।

বিস্মিত প্রধান বলিলেন,—বিষ্ণুদেব তোমাদের মঙ্গল করুন। গ্রহণ করিলেন তীর্থযাত্রীদের প্রধান সাদরে সে দান।

সেদিন গভীর নিশীথে একদল দস্যু আসিয়া আক্রমণ করিল সেই পল্লী। তাহাদের আক্রমণে গ্রামবাসী হইল সচকিত—সে কি চীৎকার, সে কি স্ত্রী-পুরুষের করুণ ক্রন্দন—ভয়ে কিন্তু নিমেষে পলাইল দস্যুগণ!

● মহারাজা মিহিরভোজ
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
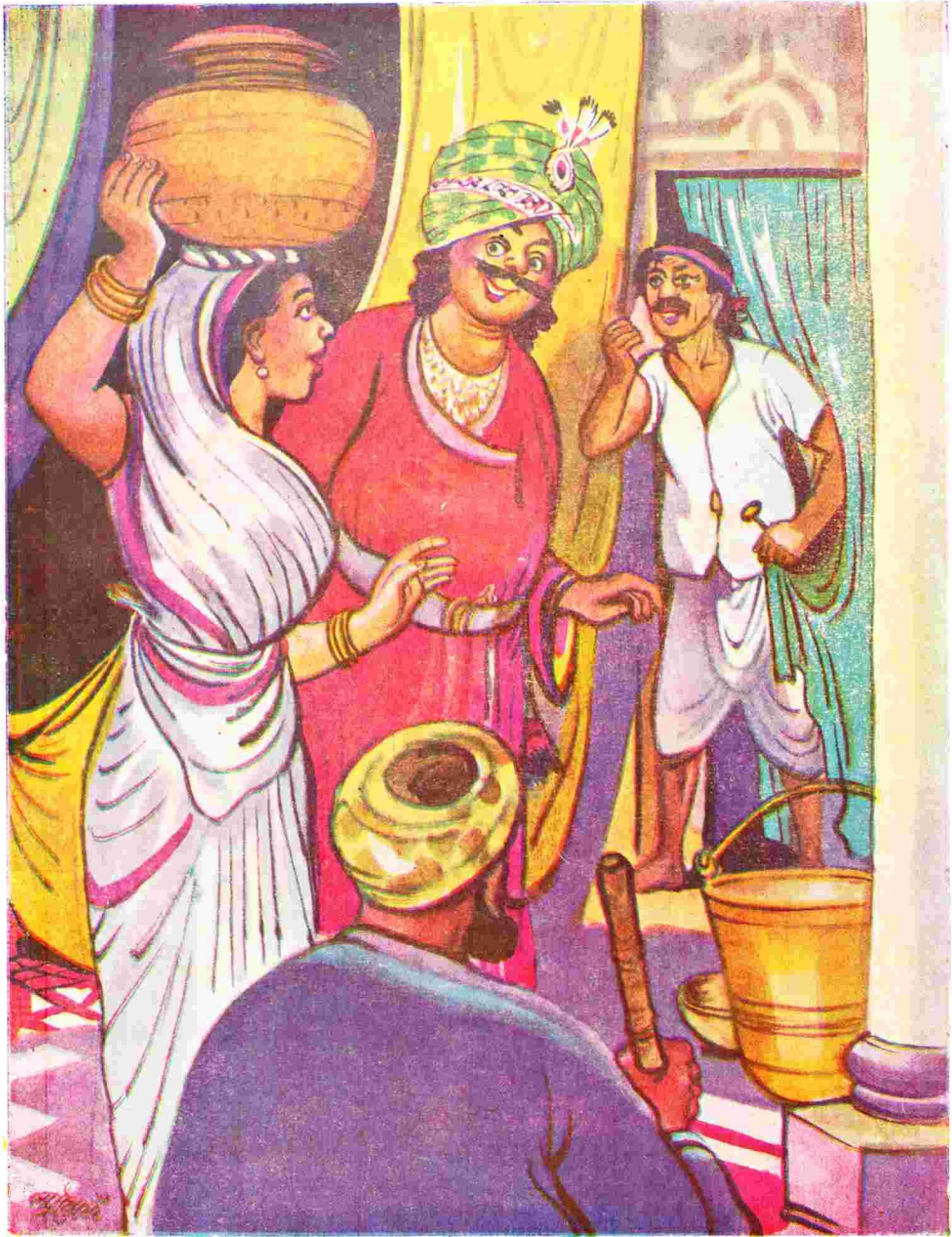
খানশামা নিয়ে এলো বোলউলি-সাজা স্যাকরাণীকে।

86
LAWSON WOOD
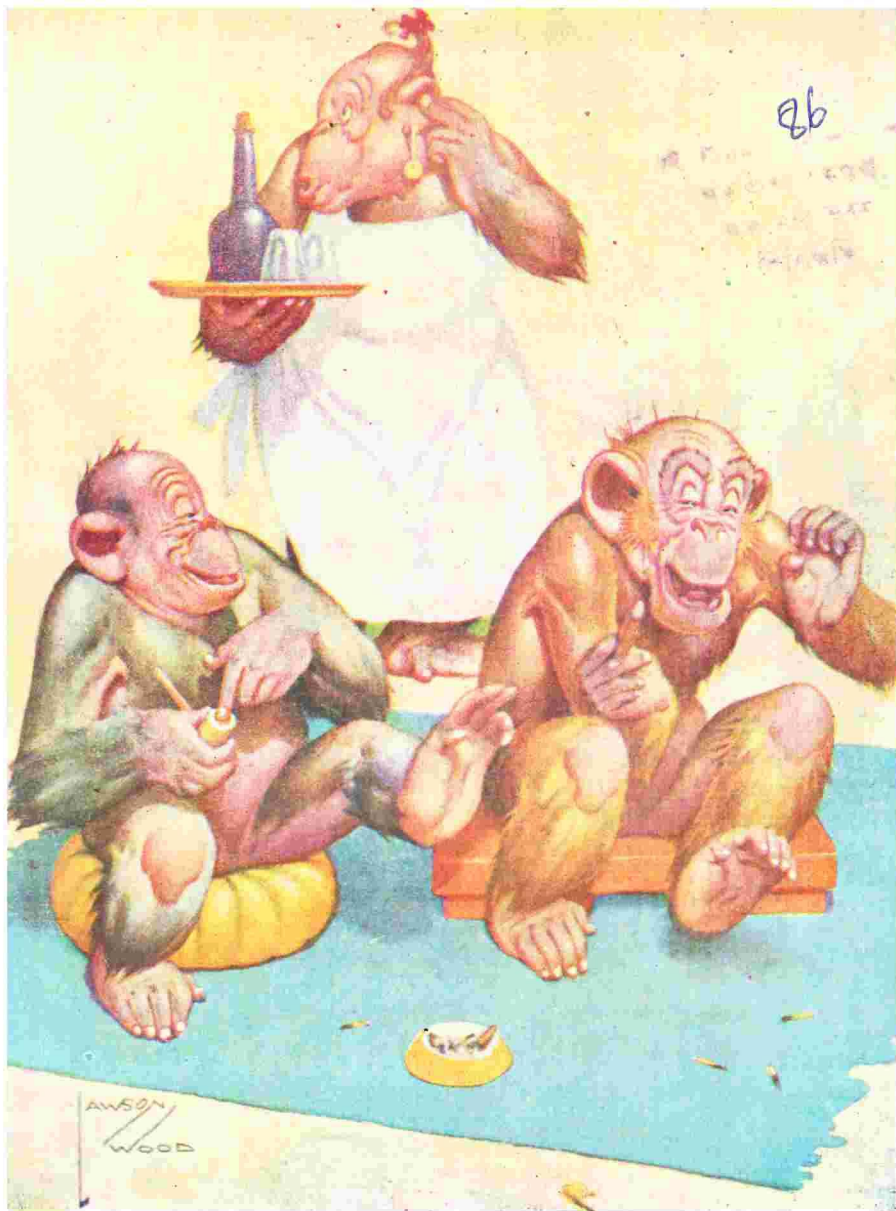
গ্রামবাসী দেখিল, সেই যে তীর্থযাত্রীদল তাহারা অস্ত্র ধরিয়া আক্রমণ করিল সেই দস্যুদলকে। দস্যুদের অনেকে মরিল, অনেকে আহত হইল,—কেহ পলাইয়া বাঁচিল। আবার গ্রাম নীরব হইল। লোকজনেরা আনন্দে ঘুমাইয়া পড়িল। কেহ জানিল না এই তীর্থযাত্রীদের পরিচয়। কে-ই বা দলের নায়ক।

পরদিন সকালে নারায়ণের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরা আসিয়া দেখিল একটি প্রাণীও সেখানে নাই—তেপান্তরের মাঠ তেমনি খালি পড়িয়া আছে, সেখানে পোড়াকাঠ ও সারি সারি উনুন শুধু। গ্রামবাসীরা হইল বিস্মিত। সেদিন হইতে সেই প্রান্তদেশের পল্লীতে আর কোনদিন কোন দস্যু-ডাকাতের উপদ্রব হয় নাই।

তীর্থযাত্রীদল অস্ত্র ধরিয়া আক্রমণ করিল সেই দস্যুদলকে...

## তিন

রাজ্যের পূর্ব্বগৌরব রক্ষার জন্য ভোজরাজার প্রচেষ্টা ছিল অতীব প্রশংসার। শাস্ত্রে বলে ধর্ম্ম রক্ষাই রাজার শ্রেষ্ঠ কার্য্য। মিহিরভোজ ছিলেন দেবী ভগবতীর উপাসক; অন্যান্য দেবদেবীর মধ্যে শিব ও বিষ্ণুর প্রতিও ছিলেন ভক্তিমান্। তেজস্বী নৃপতি রাজ্যে শান্তিরক্ষার জন্য, সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা বিধানের জন্য হইলেন মনোযোগী। দেশের পর দেশে ধ্বনিত হইল ভোজরাজের রথ-চক্র রব, অশ্বের ধ্বনি। যুদ্ধের পর যুদ্ধ চলিতে লাগিল, এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই হইলেন রাজা ভোজ বিজয়ী। রাজ্যের যে গৌরবরবি তিমিরে ডুবিয়াছিল, আবার তাহা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মী আসিয়া বসিলেন রাজধানীর গোপন রত্নভাণ্ডারের রত্নসিংহাসনে। এইরূপ বিজয়ের মধ্যে আমরা কয়েকজন বিশ্বস্ত সামন্ত রাজার নাম পাই, তাঁহাদের মধ্যে গুহিলোটের রাজা হর্ষরাজ এবং একজন ক্ষুদ্র সামন্ত নৃপতি, তাঁর নাম জানা যায় না।

উত্তরভারতে যখন যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন রাজা ভোজ, তখন হর্ষরাজ তাঁহাকে অনেক যুদ্ধের অশ্ব দিয়া সাহায্য করেন। বিজয়ী ভোজরাজের মনে এই ভাবে জয়ের পর জয়ে হইল এই বিশ্বাস যে তাঁহার পক্ষে উত্তরভারত ও দক্ষিণভারত বিজয়ও অসম্ভব নয়। কিন্তু এই সময়ে প্রথম বাধা পাইলেন— গৌড়বঙ্গের অধিপতি পাল-বংশের রাজা দেবপালের কাছে।

সে কথা এইবার শোন।

সেকালে গৌড়বঙ্গের পাল-রাজারা ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর। ভোজরাজার সময়ে বীররাজা ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপাল ছিলেন গৌড়বঙ্গের সিংহাসনে। দেবপালও পিতার ন্যায় ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর। সে সময়ে বাঙ্গালীর বীরত্ব ও সাহস দেশে দেশে ছিল ব্যাপ্ত। কত না রাজ্য, কত না দেশ জয় করিয়াছিলেন ধর্ম্মপাল ও দেবপাল। গুর্জ্জর ও প্রতিহার রাজাদের সঙ্গে নিয়তই হইত তাঁহার যুদ্ধ-বিগ্রহ। ভোজরাজ উত্তরভারত বিজয়ে আসিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন দেবপালের সঙ্গে—দেবপাল ছিলেন অসামান্য রণকৌশলী বীররাজা। তাঁহার বিজয়-বাহিনী লইয়া একদিকে তিব্বত, অন্য দিকে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। পরাজিত করিয়াছিলেন দুর্দ্দান্ত হুনদের। হুনেরা তাঁহার আক্রমণে শুধু যে পরাজয় মানিয়াই ছিল তাহা নয়, তাহারা প্রাণ লইয়া পলাইয়া বাঁচিয়াছিল। দেবপাল জীবিত থাকিতে আর তাহারা হানা দিতে সাহসী হয় নাই। তাঁহার ছিল বিশাল নৌ-বাহিনী, অসংখ্য নৌ-সেনা,—এই নৌ-বাহিনী ব্রহ্মপুত্রের তরঙ্গভঙ্গে নাচিতে নাচিতে সহজেই করিয়াছিল কামরূপ বিজয়—এই নৌ-বাহিনী সমুদ্র-তরঙ্গে ফেনিলোচ্ছল নীলবর্ণ সুষমায় বাঙ্গলার রাজার গৌরব পতাকা উড়াইয়া সুমাত্রা, যবদ্বীপে ও মালয়ে যে বিশাল হিন্দুরাজ্য 'শ্রীবিজয়' নামে গড়িয়া উঠিয়াছিল—তাহার ছিল সহায়ক। এহেন বীর রাজার কাছে দূত পাঠাইলেন ভোজরাজ! বলিয়া পাঠাইলেন—আপনি আমার নতি স্বীকার করুন, নতুবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হউন।

হাসিলেন দেবপাল! ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিল—সভাপদ ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ! গর্জ্জিয়া উঠিলেন—লাউসেন—গুর্জ্জররাজের এই ঔদ্ধত্যে! বিজয়বাহিনী প্রস্তুত হইল যুদ্ধের জন্য,—উত্তর গেল গুর্জ্জররাজের কাছে—রণক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। হইলও তাহা। আরম্ভ হইল—ভোজরাজা ও গৌড়বঙ্গের দিগ্বিজয়ী সম্রাট দেবপালের ভীষণ যুদ্ধ।

গঙ্গার তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে আসিয়াছিল শত শত নৌ-বাহিনী। বাঙ্গলার গৌরব বাঙ্গলার নৌ-সৈন্য ও নৌবহর। ভোজরাজা মিহিরভোজেরও ছিল নৌ-বাহিনী। প্রথমে যুদ্ধ হইল নৌ-বাহিনীর সহিত নৌ-বাহিনীর, কলা কলা কল কলাৎ ছলাৎ ছলাৎ ছলা। জল-তরঙ্গে, দুই পক্ষে কাছাকাছি, হইল যুদ্ধ। তীর নিক্ষেপ, বর্শা! ঝাঁপাঝাঁপি লাফালাফি আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলিল, শেষে বিজয়ী হইলেন দেবপাল। গৌড়বঙ্গের সেনাদের বিজয়ধ্বনিতে পূর্ণ হইল আকাশ বাতাস—পলায়ন করিল মিহিরভোজের নৌ-বহর। ভগ্ন তরী, বিধ্বস্ত সেনা। লালে লাল হইয়া গিয়াছিল গঙ্গার তরঙ্গমালা।—

তবু ফিরিলেন না মিহিরভোজ। আরম্ভ হইল স্থলযুদ্ধ। গৌড়বঙ্গের সম্রাট দেবপাল নিজে তাঁহার রণকুঞ্জরে আরোহণ করিলেন। মাথায় পরিলেন স্বর্ণমুকুট, রাজছত্রধারী চলিল সঙ্গে সঙ্গে, হস্তে তাঁহার

● মহারাজা মিহিরভোজ
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

তীক্ষ্ণ তরবারি, বর্শা! হস্তীর পর হস্তীযূথ চলিল রণাঙ্গনে। নানা মদমত্ত মাতঙ্গ ধরণীতল পদবিক্ষেপে করিল ধূলিমণ্ডলে আচ্ছন্ন! অশ্বারোহী, পদাতিক, তীরন্দাজ চলিল সাথে সাথে, সঙ্গে সঙ্গে বাজিতে লাগিল—ঘন নির্ঘোষে রণবাদ্য! সেনাপতি লবসেন বা লাউসেন চলিলেন সৈন্য পরিচালনা করিতে করিতে—বীর গৌরবে।

আর ঐদিকে প্রতিহার রাজাও বীরদর্পে অগ্রসর হইলেন রণক্ষেত্রে।

মিহিরভোজও আরোহণ করিয়াছিলেন তাঁহার রাজহস্তীতে। সৈন্যদল পরিবৃত হইয়া আসিলেন গৌড়বঙ্গের রাজার সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিতে—বীর গৌরবে।

দেবপাল বলিলেন সেনাপতি লাউসেনকে,—আমি নিজে আক্রমণ করিব—রাজা ভোজকে, তুমি প্রতিহার রাজার চারিদিকে ব্যূহ রচনা কর—যেন সাধ্য হয় না তার পলায়ন করিতে। কৌশলী সেনাপতি অপূর্ব্ব কৌশলে রচনা করিলেন এক বিরাট ব্যূহ!

তারপর আরম্ভ হইল—মিহিরভোজ ও দেবপালের মহাসংগ্রাম। দুই রণকুঞ্জরে শুঁড়ে শুঁড়ে পরস্পরকে আক্রমণ করিল, হানিতে লাগিল পরস্পর পরস্পরকে! একদিকে হস্তীতে হস্তীতে প্রবল আকর্ষণ, অপর দিকে রাজাতে রাজাতে উভয়ের প্রতি উভয়ের বর্শা ও তীর নিক্ষেপ, কখনও বা তরবারিতে তরবারিতে ভীষণ সংঘাত, খেলিতে লাগিল বিজলীর ছটা।

এমন সময় ঘটিল মহাবিপদ!

মিহিরভোজের আরোহিত রণকুঞ্জর তাহার প্রকাণ্ড দুই দন্ত দ্বারা এবং শুঁড় দ্বারা প্রবল আকর্ষণে—দেবপালের হস্তীকে পর্যুদস্ত করিয়া ফেলিল!

রণক্ষেত্রে হাঃ হাঃ হাঃ ধ্বনি জাগিয়া উঠিল!

বুঝি রাজার প্রাণ যায়।

দেবপাল কি করিলেন? অদ্ভুত কৌশলে—স্বীয় রণকুঞ্জরের শিরের কাছে আসিয়া—বিপুল বিক্রমে তরোয়ালের আঘাত হানিলেন প্রতিহাররাজের কুঞ্জরের শুঁড়ে—বিদীর্ণ হইয়া গেল—দ্বিখণ্ডিত হইল শুঁড়। বিকট চীৎকারে—প্রতিহাররাজের হস্তী তীব্রবেগে রাজাকে লইয়া ছুটিতে লাগিল! রক্তস্রোতে প্লাবিত হইল রণক্ষেত্র। রাজার সৈন্যেরা 'কি হইল! কি হইল! বুঝি রাজা প্রাণ হারাইয়াছেন, যদি রাজা না বাঁচিয়া থাকেন, তবে কিসের যুদ্ধ, কাহার জন্য যুদ্ধ!' বলিয়া রণে ভঙ্গ দিল।

এইভাবে গৌড়বঙ্গের অধীশ্বর দেবপাল মিহিরভোজ রাজাকে পরাজিত করিয়া হইলেন দিগ্বিজয়ী!—ভোজরাজার "ত্রিভুবন জয়" করিবার আশার প্রদীপখানি হইল নির্ব্বাণ!

মন্ত্রী দর্ভপাণি—নৃপতি দেবপালের গৌরব-প্রশস্তিতে বলিয়াছেন :

'অরিনৃপতিমুকুটস্থাপিত চরণঃ সকল ভুবনবন্দিত শৌর্য্যঃ।'

● মহারাজা মিহিরভোজ
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

## চার

যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসানে রাজ্যে ফিরিয়া আসিল শান্তি।

গৌড়বঙ্গের রাজার কাছে পরাজয়ে ভোজরাজার মন হইয়াছিল বিষণ্ণ! ভাবিলেন কাজ কি আর যুদ্ধ-বিগ্রহে,—কাজ কি অযথা রক্তপাতে!

সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব গৌরব ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল।

একদিন যে রাজ্যে চলিতেছিল নানা বিদেশীর হাতের অত্যাচার ও উৎপীড়ন,—তাহা দূর করিবার জন্য রাজা ছদ্মবেশে গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। রাজ্যের সর্ব্বত্র ছিল তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। এমনি এক ছদ্মবেশে তীর্থযাত্রীরূপে ভ্রমণকালে গিয়াছিলেন—নারায়ণ মণ্ডলের গ্রামে।

মন্ত্রী বালাদিত্যকে একদিন সম্রাট বলিলেন ঃ

আপনি রামভদ্রপুরের নারায়ণ মণ্ডলকে একবার দরবারে আহ্বান করুন।

কোন্ পথে কি ভাবে সে পল্লীতে দূত পাঠাইতে হইবে, সেই পথের পরিচয় দিলেন।

তারপর একদিন নারায়ণ মণ্ডল রাজার হুকুমে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিল রাজধানীতে। সঙ্গে আসিল দল বাঁধিয়া গ্রামবাসীরা সব। কি জানি কেন হঠাৎ তাঁদের মণ্ডলের রাজদরবারে তলব! সকলে শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত।

দরবারে উপস্থিত হইল নারায়ণ। রাজসভার অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া চোখ তাহার ঝলসাইয়া গেল। রাজসভার শোভা, সৌন্দর্য্য, জাঁক-জমক দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

রাজা আহ্বান করিলেন নারায়ণকে—এস বন্ধু, আমার কাছে এস!

এ কি স্বপ্ন! সম্রাট তাঁকে বন্ধু বলিলেন! এ কি ভুল!

নারায়ণের জীর্ণ-শীর্ণ কৃষ্ণ দেহ। কাশফুলের মত সাদা তার মাথার চুল। হাঁটু পর্য্যন্ত পরণে মোটা কাপড়, গায়ে একটি মলিন ছেঁড়া ফতুয়া, হাতে একখানা লাঠি শক্ত করিয়া ধরিয়াছিল। সে ভয়ে ও বিস্ময়ে কাঁপিতেছিল। তাহার সঙ্গীগণের অবস্থাও সেইরূপ।

ভোজরাজা নিজে নামিয়া আসিলেন সিংহাসন হইতে, তাহাকে লইয়া আসিলেন সিংহাসনের পাশে, তারপর বলিলেন,—অতীতের সে কথা, কেমন করিয়া দস্যুহস্তে নারায়ণ ও তাহার পল্লীবাসীরা নিত্য হইত উৎপীড়িত, নির্য্যাতিত, কেমন করিয়া সে ও তাহার গ্রামের লোকেরা সর্ব্বস্ব উজাড় করিয়া তাহাদের খাদ্য যোগাইয়াছিল। রাজা সেই দীনহীন কৃষককে করিলেন আলিঙ্গন। বন্ধু আমার, তোমার দয়া কোনদিন ভুলবো না। বলিলেন রাজা ভোজ।

সভাস্থ সকলে সাধু! সাধু! বলিয়া গাহিলেন রাজার জয়!

সম্রাট মিহিরভোজ বলিলেন,—শোন নারায়ণ, শোন তোমরা গ্রামবাসী সব—নারায়ণকে আমি দান করলাম তোমাদের বাস-গ্রামখানি! সে হবে গ্রামের প্রধান, তার কথা মেনে চলবে সকলে। আর তোমাদের সকলকে আমি দান করলাম পঁচিশখানা গ্রাম—চাষের জমি সব! আমার এ ভূদান-যজ্ঞ! তোমরা

● মহারাজা মিহিরভোজ
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সকলে তা ভোগ করবে, ভোগ করবে তোমাদের বংশের সকলে। বিলি-বন্দোবস্ত, সব ব্যবস্থা করতে যাবে রাজদরবারের তহশীলদার। সে তোমাদের মধ্যে ভাগ-বাঁটরা করে দিয়ে আসবে,—যেন কোন গোল না হয়। আমি এই যে ভূদান করলাম, রাজসরকারে সেজন্য তোমাদের কোন রাজস্ব, কোন কর দিতে হবে না!—সব—তোমাদের হবে।

প্রজারা সব কাঁদিয়া ফেলিল আনন্দে! তাহাদের কাহারো মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইতেছিল না। তাহারা ক্ষীণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—মহারাজার জয় হউক! এ কি দয়া! এ কি ভালবাসা!.

সভায় উঠিল আনন্দের কলরোল।

এইভাবে রাজা আরম্ভ করিলেন ভূ-দান। এ ইতিহাসের কথা, আমার কথা নয়। সেকালের হিন্দুরাজারা এমন করিয়াই করিতেন ভূ-দান।

*  *  *  *

ভোজরাজা দীর্ঘ ৪৬ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। গুর্জ্জররাজ ভোজ সম্বন্ধে সুলেমান নামে একজন আরবদেশীয় পর্য্যটক লিখিয়া গিয়াছেন—"গুর্জ্জর-রাজের ছিল অগণিত সৈন্য, তাঁহার যেমন অশ্বারোহী সৈন্য ছিল এমন আর ভারতবর্ষের কোন রাজার ছিল না। আরবের প্রতি তাঁর ছিল উদার ভাব। আরবদেশের সুলতানের তিনি সুখ্যাতি করিতেন। রাজা ছিলেন অতুল ধনৈশ্বর্য্যশালী। ধনরত্নে ছিল তাঁর ভাণ্ডার পূর্ণ, আবার এদিকে অশ্ব, গজ, উষ্ট্র ছিল অসংখ্য; সুশিক্ষিত সৈন্যাধ্যক্ষ, পদাতিক, অশ্বারোহী সেনানী রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিত নিয়ত। রাজ্যের ক্রয়-বিক্রয় চলিত সোনা-রূপায়। দেশে ছিল অনেক স্বর্ণখনি। রাজার সুশাসনে দেশে চোর-ডাকাত-দস্যু ছিল না। রাজ্য ছিল শান্তিপূর্ণ। ধন বা সম্পদে রাজ্য ছিল নানা দেশে খ্যাত।

রাজা সেই দীনহীন কৃষককে করিলেন আলিঙ্গন।

গুর্জ্জরেশ্বর মিহিরভোজ যদিও দেবী ভগবতীর উপাসক ছিলেন কিন্তু তিনি রাজধানীতে ও নানা

● মহারাজা মিহিরভোজ
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

স্থানে অনেক বিষ্ণু-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। সে সব মন্দির স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে ছিল অতুলনীয়। একখানি শিলালিপি হইতে এই মহানুভব সম্রাট সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়,—সে লিপিখানি 'গোয়ালিয়র প্রশস্তি' নামে পরিচিত। লিপিখানি রচনা করিয়াছিলেন—কবি বালাদিত্য। লিপির প্রথমে—সেই নরকাসুরকে যিনি পরাজিত করিয়াছিলেন, বিশ্বদেবতা বিষ্ণুর বর্ণনাও তাহাতে রহিয়াছে, কেননা মন্দিরটি ছিল বিষ্ণুদেবতার প্রতিষ্ঠার জন্যই নির্ম্মিত। তারপর গুর্জ্জররাজাদের পূর্ব্বপুরুষদের কথা বলিয়া গুর্জ্জরশ্বের মিহিরভোজের কথা কবি বলিয়াছেন ঃ

বিখ্যাত সম্রাট ভোজ দিগ্বিজয়ী বীর রাজা! দুষ্ট দমনে ও শিষ্ট পালনে ছিলেন অতুলনীয়। স্বয়ং দেবী লক্ষ্মী নিজে আসিয়া তাঁহাকে সৌভাগ্যবান করিয়াছিলেন। জিতেন্দ্রিয়, শান্ত স্থির, ক্রোধজয়ী ছিলেন রাজা। মিষ্টভাষী প্রজাবৎসল, শাসনদক্ষ ন্যায়পরায়ণ সম্রাট মিহিরভোজের রাজ্যে ছিল সুখ-শান্তি বিরাজমান। দেবতা ব্রহ্মা এই রাজার সমতুল্য শ্রীরামচন্দ্র ব্যতীত আর কাহারও সন্ধান পান নাই।

* * * *

সাধু-সন্ন্যাসী, দীন-দরিদ্র, পুরুষ ও নারী সকলে প্রতিদিন প্রার্থনা করিতেন, মহারাজা ভোজ শতজীবী হউন। ভৃত্যগণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় অর্চ্চনা করিত, প্রাণ দিয়া তাঁহাকে ভালবাসিত।

* * * *

বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, সাধু ও সাহসী নৃপতি অমিতবলশালী, ধনসম্পদ প্রতিপত্তি-সম্পন্ন সম্রাট হইয়াও ছিলেন নিরহঙ্কারী, মহৎ,—এবং শত্রু-মিত্রে সমদর্শী উদার হৃদয় ও মহানুভব। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা মানিত তাঁহার শাসন। কোন বহির্শক্তির সাধ্য ছিল না সমুদ্র-পথে আসে। অসীম ছিল তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যম।

* * * *

কবি বালাদিত্য শেষ পংক্তিতে লিখিয়াছেন—'আমি মহারাজা মিহিরভোজের যে প্রশস্তি রচনা করিলাম, তাহা অনন্তকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তির সাক্ষী-স্বরূপ বিরাজমান থাকিবে।'

মিহিরভোজ যে শুধু দিগ্বিজয়ী সম্রাট ছিলেন তাই নয়। তাঁহার ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের জন্য তাঁহাকে বলা হইত—"স্বধর্ম্মরক্ষক মহাপুরুষ"। তাঁর রাজ্য ছিল সুশাসিত, সূর্য্যদেবের বরে হইয়াছিল তাঁহার জন্ম—এজন্য নাম দেওয়া হইয়াছিল "মিহিরভোজ", আবার বলা হইত তাঁহাকে "আদি বরাহ"!

মিহিরভোজের বীরত্বপ্রভাবে সিন্ধু দেশের সুলতান ইমারন্ ইবন্ মুসা পরাজয় মানিয়া নিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—সিন্ধুরাজ্যের অনেক অংশ পুনরায় তিনি অধিকার করেন। বিদেশী রাজাদের ছিলেন তিনি কৃতান্ত স্বরূপ।

তাঁহার অমর কীর্ত্তি এখনও দিগ্দিগন্তে বিস্তৃত। উজ্জ্বল সে মিহিরজ্যোতিঃ ভোজরাজ মিহিরের দক্ষিণ ভারতের অতীত ইতিহাসকে করিয়াছে গৌরববিমণ্ডিত।

---

**নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়**

আমি সগর্বে ঘোষণা করলাম, জানিস, আমার ছোট কাকা দাঁত বাঁধিয়েছে।

ক্যাব্‌লা একটা গুল্‌তি নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে একটা নেড়ী কুকুরের ল্যাজকে তাক করছিল। কুকুরটা বেশ বসে ছিল, হঠাৎ কী মনে করে ঘোঁক শব্দে পিঠের একটা এঁটুলিকে কামড়ে দিলে—তারপর পাঁই পাঁই করে ছুট্ লাগালো। ক্যাব্‌লা ব্যাজার হয়ে বললে, দ্যুৎ! কতক্ষণ ধরে টার্গেট করছি—ব্যাটা পালিয়ে গেল!—আমার দিকে ফিরে বললে, তোর ছোট কাকা দাঁত বাঁধিয়েছে—এ আর বেশি কথা কী! আমার বড় কাকা, মেজ কাকা, রাঙা কাকা সবাই দাঁত বাঁধিয়েছে। আচ্ছা, কাকারা সক্কলে দাঁত বাঁধায় কেন বল্‌তো? এর মানে কী?

হাবুল সেন বললে, হঃ! এইটা বোঝোস্ নাই? কাকা গো কামই হইল দাঁত খিঁচানি। অত দাঁত খিঁচালে দাঁত খারাপ হইবো না তো কী?

টেনিদা বসে বসে এক মনে একটা দেশলাইয়ের কাঠি চিবুচ্ছিল। টেনিদার ওই একটা অভ্যেস—কিছুতেই মুখ বন্ধ রাখতে পারে না। একটা কিছু-না-কিছু তার চিবোনো চাই-ই চাই। রসগোল্লা, কাটলেট্, ডালমুট, পকৌড়ী, কাজু বাদাম—কোনটায় অরুচি নেই। যখন কিছু জোটে না, তখন চুয়িং গাম থেকে শুকনো কাঠি—যা পায় তাই চিবোয়। একবার ট্রেনে যেতে যেতে মনের ভুলে পাশের ভদ্রলোকের

লম্বা দাড়ির ডগাটা খানিক চিবিয়ে দিয়েছিল—সে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড! ভদ্রলোক রেগে গিয়ে টেনিদাকে ছাগল-টাগল কী সব যেন বলেছিলেন।

হঠাৎ কাঠি চিবুনো বন্ধ করে টেনিদা বললে, দাঁতের কথা কী হচ্ছিল র‍্যা? কী বলছিলি দাঁত নিয়ে?

আমি বললাম, আমার ছোট কাকা দাঁত বাঁধিয়েছে।

ক্যাব্‌লা বললে, ঈস্—ভারী একটা খবর শোনাচ্ছেন ঢাকঢোল বাজিয়ে! আমার বড় কাকা, মেজ কাকা, ফুলু মাসী—

টেনিদা বাধা দিয়ে বললে, থাম্-থাম্ বেশি ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করিসনি। দাঁত বাঁধানোর কী জানিস তোরা? হুঁঃ—জানে বটে আমার কুট্টি মামা গজগোবিন্দ হালদার। সায়েবরা তাকে আদর করে ডাকে মিষ্টার গাঁজা-গাবিণ্ডে! সে-ও দাঁত বাঁধিয়েছিল। কিন্তু সে দাঁত এখন আর তার মুখে নেই—আছে ডুয়ার্সের জঙ্গলে।

—পড়ে গেছে বুঝি?

—পড়েই গেছে বটে!—টেনিদা তার খাঁড়ার মতো নাকটাকে খাড়া করে একটা উঁচু দরের হাসি হাসল—যাকে বাংলায় বলে হাই ক্লাস! তারপর বললে, সে দাঁত কেড়ে নিয়ে গেছে।

—দাঁত কেড়ে নিয়েছে? সে আবার কী?—আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, এত জিনিস থাকতে দাঁত কাড়তে যাবে কেন?

—কেন?—টেনিদা আবার হাসল ঃ দরকার থাকলেই কাড়ে। কে নিয়েছে বল্ দেখি?

ক্যাব্‌লা অনেক ভেবে-চিন্তে বললে, যার দাঁত নেই।

—ইঃ—কী পণ্ডিত!—টেনিদা ভেংচি কেটে বললে, দিলে বলে! অত সোজা নয়—বুঝলি? আমার কুট্টি মামার দাঁত যে সে নয়—সে এক একটা মুলোর মতো। সে বাঘা দাঁতকে বাগানো যার-তার কাজ নয়।

—তবে বাগাইল কেডা? বাঘে?—হাবুলের জিজ্ঞাসা।

—এঁঃ—বাঘে! বলছি—দাঁড়া। ক্যাব্‌লা, তার আগে দু'আনার ডালমুট নিয়ে আয়—

হাঁড়ির মতো মুখ করে ক্যাব্‌লা ডালমুট আনতে গেল। মানে, যেতেই হল তাকে।

আমাদের জুলজুলে চোখের সামনে একাই ডালমুটের ঠোঙা সাবাড় করে টেনিদা বললে, আমার কুট্টি মামার কথা মনে আছে তো? সেই যে চা-বাগানে চাকরি করে আর একাই দশজনের মতো খেয়ে সাবাড় করে? আরে—সেই লোকটা—যে ভালুকের নাক পুড়িয়ে দিয়েছিল?

আমরা সমস্বরে বললাম, বিলক্ষণ! 'কুট্টি মামার হাতের কাজ' কি এত সহজেই ভোলবার?

টেনিদা বললে, সেই কুট্টি মামারই গল্প। জানিস তো—সায়েবরা ডেকে নিয়ে মামাকে চা-বাগানে

● কুট্টি মামার দন্ত কাহিনী
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চাকরি দিয়েছিল? মামা খাসা আছে সেখানে। খায়-দায় কাঁসি বাজায়। কিন্তু বেশি সুখ কি আর কপালে সয় রে? একদিন জুৎ করে একটা বন-মুরগীর রোস্টে যেই কামড় বসিয়েছে—অমনি ঝন্-ঝনাৎ! কুট্টি মামার একটা দাঁত খসে পড়ল প্লেটের ওপর—আর তিনটে গেল নড়ে।

হয়েছিল কী, জানিস? শিকার করে আনা হয়েছিল তো বন-মুরগী? মাংসের মধ্যে ছিল গোটা কয়েক ছর্‌রা। বেকায়দা কামড় পড়তেই অ্যাক্সিডেন্ট্—দাঁতের বারোটা বেজে গেল।

মাংস রইল মাথায়—ঝাড়া তিন ঘণ্টা নাচানাচি করলে কুট্টি মামা। কখনো কেঁদে বললে, পিসিমা গো—তুমি কোথায় গেলে?—কখনো ককিয়ে ককিয়ে বললে, ইঁ-হি-হি—আমি গেলুম!—আবার কখনো দাপিয়ে দাপিয়ে বললে, ওরে বন-মুরগী রে—তোর মনে এই ছিল রে! শেষকালে তুই আমায় এমন করে পথে বসিয়ে গেলি রে!

পাক্কা তিন দিন কুট্টি মামা কিচ্ছুটি চিবুতে পারলো না। শুধু রোজ সের পাঁচেক করে খাঁটি দুধ আর ডজন চারেক কমলা লেবুর রস খেয়ে কোনোমতে পিত্তি রক্ষা করতে লাগল।

দাঁতের ব্যথা-ট্যথা একটু কমলে সায়েবেরা কুট্টি মামাকে বললে, তোমাকে ডেন্‌টিস্টের ওখানে যেতে হবে।

—অ্যাঁ!

সায়েবরা বললে, দাঁত বাঁধিয়ে আনতে হবে।

কুট্টি মামার কথা মনে আছে তো?

ডেন্‌টিস্টের নাম শুনেই তো কুট্টি মামার চোখ তাল গাছে চড়ে গেল। কুট্টি মামার দাদু নাকি একবার দাঁত তুলতে গিয়েছিলেন। যে ডাক্তার দাঁত তুলছিলেন, তিনি চোখে কম দেখতেন। ডাক্তার

করলেন কী—দাঁত ভেবে কুট্টি মামার দাদুর নাকে সাঁড়াশি আটকে দিয়ে সেটাকেই টানতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন ঃ ইস্—কী প্রকাণ্ড গজদন্ত আর কী ভীষণ শক্ত! কিছুতেই নড়াতে পারছি না!

কুট্টি মামার দাদু তো হাঁই-মাই করে বলতে লাগলেন, ওঁটা-ওঁটা আঁমার আঁক্-আঁক্—! টানের চোটে নাক বেরুচ্ছিল না—বেরুচ্ছিল 'আঁক্'!

ডাক্তার রেগে বললেন, আর হাঁক-ডাক করতে হবে না—খুব হয়েছে!—আরো গোটা-কয়েক টান-ফান দিয়ে নাকটাকে যখন কিছুতেই কায়দা করতে পারলেন না—তখন বিরক্ত হয়ে বললেন ঃ নাঃ—হল না। এমন বিচ্ছিরি শক্ত দাঁত আমি কখনো দেখিনি! এরকম দাঁত কোনো ভদ্রলোকে তুলতে পারে না।

কুট্টি মামার দাদু বাড়ী ফিরে এসে বারো দিন নাকের ব্যথায় বিছানায় শুয়ে রইলেন। তের দিনের দিন উকিল ডাকিয়ে উইল করলেন ঃ 'আমার পুত্র বা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যে-কেহ দাঁত বাঁধাইতে যাইবে, তাহাকে আমার সমস্ত সম্পত্তি হইতে চিরতরে বঞ্চিত করিব—'

অবশ্যি কুট্টি মামার দাদুর সম্পত্তিতে কুট্টি মামার কোনো রাইট্ নেই—তবু দাদুর আদেশ তো! কুট্টি মামা গাঁই-গুঁই করতে লাগলেন। ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে 'মাই নোজ'-টোজও বলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সায়েবের গোঁ—জানিস তো? ঝড়াং করে বলে দিলে, নো ফোক্লা দাঁত উইল ডু! দাঁত বাঁধাতেই হবে।

কুট্টি মামা তো মনে মনে 'তনয়ে তারো তারিণী' বলে রামপ্রসাদী গান গাইতে গাইতে, বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে ডেন্‌টিস্টের কাছে হাজির। ডেন্‌টিস্ট প্রথমেই তাঁকে একটা চেয়ারে বসালে। তারপর দাঁতের ওপরে খুর্ খুর্ করে একটা ইলেকট্রিক বুরুশ বসিয়ে সেগুলোকে অর্ধেক ক্ষয় করে দিলে। একটা ছোট হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে বাকী সব ক'টা দাঁতকে নড়িয়ে ফেললে। শেষে বেজায় খুশি হয়ে বললে, এর দু'পাটি দাঁতই খারাপ। সব তুলে ফেলতে হবে।

শুনেই কুট্টি মামা প্রায় অজ্ঞান! গোটা-তিনেক খাবি খেয়ে বললেন, নাকটাও?

ডাক্তার ধমক দিয়ে বললেন, চোপ্‌রাও।

তারপর আর কী? একটা পেল্লায় সাঁড়াশি নিয়ে ডাক্তার কুরুৎ কুরুৎ করে কুট্টি মামার সব ক'টা দাঁত তুলে দিলে। কুট্টি মামা আয়নায় নিজের মূর্তি দেখে কেঁদে ফেললেন। কিচ্ছুটি নেই মুখের ভেতর—একদম গাঁয়ের পেছল রাস্তার মতো—মাঝে মাঝে গর্ত। ওঁকে ঠিক বাড়ীর বুড়ী ধাই রামধনিয়ার মতো দেখাচ্ছিল।

কুট্টি মামা কেঁদে ফ্যাক ফ্যাক করে বললেন, ওগো আমার কী হলো গো—

ডাক্তার আবার ধমক দিয়ে বললে, চোপ্‌রাও। সাত দিন পরে এসো—বাঁধানো দাঁত পাবে।

বাঁধানো দাঁত নিয়ে কুট্টি মামা ফিরলেন। দেখতে শুনতে দাঁতগুলো নেহাত খারাপ নয়। খাওয়াও যায় এক রকম। খালি একটা অসুবিধে হত। খাওয়ার অর্ধেক জিনিস জমে থাকত দাঁতের গোড়ায়। পরে আবার সেগুলোকে জাবর কাটতে হত।

● কুট্টি মামার দন্ত কাহিনী
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

তবু ওই দাঁত নিয়েই দুঃখে সুখে কুট্টি মামার দিন কাটছিল। কিন্তু সায়েবের কাণ্ড জানিস তো? ওদের সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়—কিছুতেই তিনটে দিন বসে থাকতে পারে না। একদিন বললে, মিষ্টার গাঁজা-গাবিণ্ডে, আমরা বাঘ শিকার করতে যাব। তোমাকেও যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।

বাঘ-টাঘের ব্যাপার কুট্টি মামার তেমন পছন্দ হয় না। কারণ বাঘ হরিণ নয়—তাকে খাওয়া যায় না, বরং সে উল্‌টে খেতে আসে। কুট্টি মামা খেতে ভালোবাসে, কিন্তু কুট্টি মামাকেই কেউ খেতে ভালোবাসে—এ-কথা ভাবলে তাঁর মন ব্যাজার হয়ে যায়। বাঘগুলো যেন কী! গায়ে যেমন বিট্‌কেল গন্ধ, স্বভাব-চরিত্তিরও তেমনি যাচ্ছেতাই।

কুট্টি মামা কান চুলকে বললে, বাঘ স্যার—ভেরি ব্যাড্‌ স্যার্‌—আই নট্‌ লাইক্‌ স্যার্‌—

কিন্তু সায়েবেরা সে-কথা শুনলে তো! গোঁ যখন ধরেছে তখন গেলই। আর কুট্টি মামাকেও প্রায় চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলে গেল।

গিয়ে ডুয়ার্সের জঙ্গলে এক ফরেস্ট-বাংলোয় উঠল।

কুরুৎ কুরুৎ করে সব ক'টা দাত তুলে দিল। [পৃঃ ২৩৪

চারদিকে ধুন্ধুমার বন। দেখলেই পিত্তি ঠাণ্ডা হয়ে আসে। রাত্তিরে হাতির ডাক শোনা যায়—বাঘ হুম্‌-হাম্‌ করতে থাকে। গাছের ওপর থেকে টুপ-টুপ করে জোঁক পড়ে গায়ে। বানর এসে খামোকা ভেংচি কাটে। সকালে কুট্টি মামা দাড়ি কামাচ্ছিলেন—একটা বানর এসে 'ইলিক্‌ চিলিক্‌' এই সব বলে তাঁর বুরুশটা নিয়ে গেল। আর সে কি মশা! দিন নেই—রাত্তির নেই—সমানে কামড়াচ্ছে! কামড়ানোও যাকে বলে! দু' তিন ঘণ্টার মধ্যেই হাতে পায়ে মুখে যেন চাষ করে ফেলল।

তার মধ্যে আবার সায়েবগুলো মোটর গাড়ি নিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঢুকল বাঘ মারতে।

—মিষ্টার গাঁজা-গাবিণ্ডে, তুমিও চলো।

কুট্টি মামা তক্ষুণি বিছানায় শুয়ে হাত-পা ছুড়তে আরম্ভ করে দিলে। চোখ দুটোকে আলুর মতো

● কুট্টি মামার দন্ত কাহিনী
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বড় বড় করে, মুখে গ্যাঁজ্‌লা তুলে বলতে লাগল ঃ বেলি পেইন স্যার—পেটে ব্যথা স্যার—অবস্থা সিরিয়াস্‌ স্যার্‌—

এক লাফে একেবারে মগ্‌ডালে। [পৃঃ ২৩৭

দেখে সায়েবেরা ঘোঁয়া-ঘোঁয়া—ঘ্যাঁয়োৎ-ঘ্যাঁয়োৎ করে বেশ খানিকটা হাসল। 'ইউ গাঁজা-গাবিণ্ডে, ভেরি নটি' বলে একজন কুট্টি মামার পেটে একটা চিমটি কাটলে— তারপর বন্দুক কাঁধে ফেলে শিকারে চলে গেল।

আর যেই সায়েবরা চলে যাওয়া—অম্‌নি তড়াক করে উঠে বসলেন কুট্টি মামা। তক্ষুণি এক ডজন কলা, দুটো পাঁউরুটি আর এক শিশি পেয়ারার জেলি খেয়ে, শরীর-টরীর ভালো করে ফেললেন।

বাংলোর পাশেই একটা ছোট পাহাড়ী ঝর্ণা! সেখানে একটা শিমুল গাছ। কুট্টিমামা একখানা পেল্লায় কালীসিঙ্গির মহাভারত নিয়ে সেখানে এসে বসলেন।

চারদিকে পাখি-টাখি ডাকছিল। মশা যে দু-চারটে না কামড়াচ্ছিল তা নয়, তবু কুট্টি মামার বেশ ভালোই লাগছিল। পেটটা ভরা ছিল, মিঠে মিঠে হাওয়া দিচ্ছিল—কুট্টি মামা খুশি হয়ে মহাভারতের সেই জায়গাটা পড়তে আরম্ভ করলেন—যেখানে ভীম বকরাক্ষসের খাবার-দাবারগুলো সব খেয়ে নিচ্ছে।

পড়তে পড়তে ভাবের আবেগে কুট্টি মামার চোখে জল এসেছে, এমন সময় ঃ গর্‌-র্‌—গর্‌-র্‌—

কুট্টি মামা চোখ তুলে তাকাতেই ঃ

কী সর্বনাশ! ঝর্ণার ওপারে বাঘ!

কী রূপ বাছার! দেখলেই পিলে-টিলে উল্‌টে যায়। হাঁড়ির মতো প্রকাণ্ড মাথা, আগুনের ভাঁটার মতো চোখ, হলদের ওপরে কালো কালো ডোরা, অজগরের মতো বিশাল ল্যাজ। মস্ত হাঁ করে, মুলোর মতো দাঁত বের ক'রে আবার বললে, গর্‌—র্‌—র্‌—

● কুট্টি মামার দন্ত কাহিনী
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

একেই বলে বরাত। যে-বাঘের ভয়ে কুট্টি মামা শিকারে গেল না—সে-বাঘ নিজে থেকেই দোরগোড়ায় হাজির। আর কেউ হলে তক্ষুণি অজ্ঞান হয়ে যেত, আর বাঘ তাকে সারিডন ট্যাব্‌লেটের মতো টপাং করে গিলে ফেলত। কিন্তু আমারই মামা তো—ভাঙে তবু মচকায় না। তক্ষুণি মহাভারত বগলদাবা করে এক লাফে একেবারে শিমুল গাছের মগ্‌ডালে!

বাঘ এসে গাছের নীচে থাবা পেতে বসল। দু-চারবার থাবা দিয়ে গাছের গুঁড়ি আঁচড়ায়—আর ওপর দিকে তাকিয়ে ডাকে ঃ ঘঁর্—র্—ঘুঁ—ঘুঁ। বোধ হয় বলতে চায়—তুমি তো দেখছি পয়লা নম্বরের ঘুঘু!

কিন্তু বাঘটা তখনো ঘুঘুই দেখেছে—ফাঁদ দেখেনি। দেখল একটু পরেই। কিছুক্ষণ পরে বাঘটা রেগে যেই ঘাঁক্ করে একটা হাঁক্ দিয়েছে—অম্‌নি দারুণ চম্‌কে উঠেছে কুট্টি মামা, আর বগল থেকে কালী-সিঙ্গির সেই জগঝম্প মহাভারত ধপাস্ ক'রে নীচে পড়েছে। আর পড়বি তো পড় সোজা বাঘের মুখে। সেই মহাভারতের ওজন কম্‌সে কম পাক্কা বারো সের—তার এক ঘায়ে মানুষ খুন হয়—বাঘও তার ঘা খেয়ে উল্‌টে পড়ে গেল। তারপর গোঁ—গোঁ—ঘেয়াং-ঘেয়াং বলে বার কয়েক ডেকেই—এক লাফে ঝর্ণা পার হয়ে জঙ্গলের মধ্যে হাওয়া!

কুট্টি মামা আরো আধ ঘণ্টা গাছের ডালে বসে ঠক ঠক করে কাঁপল। তারপর নীচে নেমে দেখল মহাভারত ঠিক তেমনি পড়ে আছে—তার গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। আর তার চারপাশে ছড়ানো আছে কেবল দাঁত—বাঘের দাঁত। একেবারে গোণা গুন্‌তি বত্রিশটা দাঁত—মহাভারতের ঘায়ে একটি দাঁতও আর বাঘের থাকেনি। দাঁতগুলো কুড়িয়ে নিয়ে, মহাভারতকে মাথায় ঠেকিয়ে, কুট্টি মামা এক দৌড়ে বাংলোতে। তারপর সায়েবেরা ফিরে আসতেই কুট্টি মামা সেগুলো তাদের দেখিয়ে বললে, টাইগার-টুথ।

ব্যাপার দেখে সায়েবরা তো থ!

—তাই তো—বাঘের দাঁতই তো বটে! পেলে কোথায়?

কুট্টি মামা ডাঁট দেখিয়ে বুক চিতিয়ে বললেন, আই গো টু ঝর্ণা। টাইগার কাম্। আই ডু বক্‌সিং—মানে ঘুষি মারলাম। অল্ টুথ ব্রেক্। টাইগার কাট ডাউন—মানে বাঘ কেটে পড়ল।

সায়েবরা বিশ্বাস করল কিনা কে জানে, কিন্তু কুট্টি মামার ভীষণ খাতির বেড়ে গেল। রিয়্যালি—গাঁজা-গাবিণ্ডে ইজ্ এ হিরো! দেখতে কাঁকলাসের মতো হলে কী হয়—হি ইজ্ এ গ্রেট্ হিরো! সেদিন খাওয়ার টেবিলে একখানা আস্তো হরিণের ঠ্যাং মেরে দিলেন কুট্টি মামা।

পরদিন আবার সায়েবেরা শিকারে যাওয়ার সময় ওঁকে ধরে টানাটানি ঃ আজ তোমাকে যেতেই হবে আমাদের সঙ্গে। ইউ আর এ বিগ্ পালোয়ান!

মহা ফ্যাসাদ! শেষকালে কুট্টি মামা অনেক করে বোঝালেন, বাঘের সঙ্গে বক্‌সিং করে ওঁর গায়ে খুব ব্যথা হয়েছে।

আজকের দিনটাও থাক। সায়েবেরা শুনে ভেবে চিন্তে বললে, অল্ রাইট্—অল্ রাইট্।

● কুট্টি মামার দন্ত কাহিনী
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আজকে কুট্টি মামা হুঁশিয়ার হয়ে গেছেন—বাংলোর বাইরে আর বেরুলেনই না। বাংলোর বারান্দায় একটা ইজি চেয়ারে আবার সেই কালী সিঙ্গির মহাভারত নিয়ে বসলেন।

—ঘেঁয়াও—ঘুঙ্—

কুট্টি মামা আঁতকে উঠলেন। বাংলোর সামনে তারের বেড়া—তার ওপারে সেই বাঘ। কেমন যেন জোড় হাত করে বসেছে। কুট্টি মামার মুখের দিকে তাকিয়ে করুণ স্বরে বললে, ঘেঁয়াং—কুঁই!

আর হাঁ করে মুখটা দেখাল!

ঠিক সেই রকম। দাঁতগুলো তোলবার পরে কুট্টি মামার মুখের যে চেহারা হয়েছিল, অবিকল তা-ই! একেবারে পরিষ্কার—একটা দাঁত নেই! নির্ঘাৎ রামধনিয়ার মুখ!

বাঘটা হুবহু কান্নার সুরে বললে, ঘ্যাং—ঘেঁয়াং—ভ্যাঁও!—ভাবটা এই, দাঁতগুলো তো সব গেল দাদা! আমার খাওয়া-দাওয়া সব বন্ধ! এখন কী করি?

কিন্তু তার আগেই এক লাফে কুট্টি মামা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছেন। বাঘটা আরো কিছুক্ষণ ঘ্যাং-ঘ্যাং ভ্যাঁও-ভ্যাঁও করে কেঁদে বনের মধ্যে চলে গেল।

পরদিন সকালে কুট্টি মামা জানলার পাশে দাঁড়িয়ে, বাঁধানো দাঁতের পাটি দুটো খুলে নিয়ে, বেশ করে মাজছিলেন। দিব্যি সকালের রোদ উঠেছে—সায়েবগুলো ভোঁস্ ভোঁস্ করে ঘুমুচ্ছে তখনো, আর কুট্টি মামা দাঁড়িয়ে দাঁত মাজতে মাজতে ফ্যাক্‌ফ্যাকে গলায় গান গাইছিলেন : 'এমন চাঁদের আলো মরি যদি সে-ও ভালো—'

সক্কাল বেলায় চাঁদের আলোর গান গাইতে গাইতে কুট্টি মামার বোধ হয় আর কোনদিকে খেয়ালই ছিল না! ওদিকে সেই ফোক্‌লা বাঘ এসে জানলার বাইরে বসে রয়েছে ঝোপের ভেতরে। কুট্টি মামার দাঁত খোলা—বুরুশ দিয়ে মাজা—সব দেখছে এক মনে। মাজা-টাজা শেষ করে যেই কুট্টি মামা দাঁত দু' পাটি মুখে পুরতে যাবেন—অম্‌নি : ঘোঁয়াৎ—ঘালুম!

অর্থাৎ তোফা—এই তো পেলুম!

জানলা দিয়ে এক লাফে বাঘ ঘরের মধ্যে।

—টা—টা টাইগার—পর্যন্ত বলেই কুট্টি মামা ফ্ল্যাট্!

বাঘ কিন্তু কিছুই করলে না। টপাৎ করে কুট্টি মামার দাঁত দু'পাটি নিজের মুখে পুরে নিলে! কুট্টি মামা তখনো অজ্ঞান হননি—জুলজুল করে দেখতে লাগলেন, সেই দাঁত বাঘের মুখে বেশ ফিট্ করেছে! দাঁত পরে বাঘ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকক্ষণ নিঃশব্দে বাঘা হাসি হাসল, তারপর টপ্ করে টেবিল থেকে টুথ ব্রাস আর টুথ পেস্টের টিউব মুখে তুলে নিয়ে জানলা গলিয়ে আবার—

কুট্টি মামার ভাষায় একেবারে উইণ্ড্! মানে—হাওয়া হয়ে গেল!

টেনিদা থামল। আমাদের দিকে তাকিয়ে গর্বিত ভাবে বললে, তাই বলছিলুম, দাঁত বাঁধানোর গল্প আমার কাছে করিস নি! হুঁঃ!

---

# = মিলে মিশে =

## ইন্দিরা দেবী

খেলাঘরের হাঁসটার হলো কি বলতো? পেটটা টিপলেই তো সে 'কোয়াক' 'কোয়াক' করে উঠতো,—আর দেখতেই বা কি চমৎকার, সাদা ধবধবে, বড় হলদে ঠোঁট আর বড় বড় চকচকে দু'টো পুঁতির চোখ, গলায় সিল্কের রিবণ বাঁধা। পাখা দু'খানা দেখলে জ্যান্ত ব'লে মনে হবে।

ফুলটুসির খেলাঘরে, এই হাঁসটাকে যে দেখতো সেই বলতো 'বাঃ চমৎকার তো'! আর ফুলটুসিও তাকে কোলে নিয়ে পেটটা টিপতেই ঠোঁটটা নেড়ে 'কোয়াক' 'কোয়াক' করে ডেকে উঠতো। চট করে মনে হবে ওটা একেবারে সত্যি।

অন্য পুতুলগুলোর মাঝে মাঝে রাগ হতো, কেননা ওরা তো আর পেট টিপলে কথা বলে না, কেউ কোলেও নেয় না। কিন্তু সেদিন দেখা গেল সে আর ডাকছে না।

আমাদের যখন রাত নামে তখন খেলাঘরে সকাল হয়, তা জানো তো? জোনাকী পোকা এসে খেলাঘরে আলো দেয়, সেই আলোতে সকাল হয় আর সেখানকার বাসিন্দারা জেগে উঠে নিজেদের কাজ সুরু করে। তার মানে আমরা যখন ঘুমে অচেতন হয়ে থাকি—কিংবা রাত জেগে পরীক্ষার পড়া করতে গিয়ে ঘুমে ঢুলে টেবিলে মাথা ঠোকাই। এমনি একদিন, খেলাঘরের ডলিপুতুল যে সেজেগুজে ফিট্‌ফাট্ থাকে, দেখতেও সুন্দর, তাকে গিয়ে হাঁস বল্লে ঃ শুনেছ, ফুলটুসির বন্ধুরা আমার সম্পর্কে কি বলছিল?

ডলি মুখ ঘুরিয়ে বল্লে ঃ ঐ একই কথা আর কত শুনবো বল? তোমার ডাক ভালো, সত্যিকারের মত দেখতে,—এই কথা তো?

খেলাঘরের বড় মোটর গাড়ীটা চড়ে ভালুকদাদা এসে নামলো; তার পিছনে প্লাষ্টিকের মোটর বাইক এসে দাঁড়ালো ভট ভট শব্দ করে, আর লাফ দিয়ে নামলো কালো কুচ্ছিত কাফ্রি পুতুল।

কাফ্রিকে নামতে দেখে মনোরমা বৌ-পুতুল বল্লে ঃ সক্কাল বেলাই তোর মুখ দেখলাম, জানিনা

দিনটা কেমন কাটবে।

ভালুকদাদা বল্লে ঃ আজকাল যার বাড়ী যাই, মানে যে সব খেলাঘরেই বেড়াতে যাই, একটা করে এই কাফ্রি পুতুল দেখি। তোরা সব কোথা থেকে এলি বলতো, জাহাজ ভর্ত্তি করে। আবার ইংরাজী নাম golliwog—বাবাঃ বাঁচিনা আর।

—কেন ভালুকদাদা, নাম কি খারাপ? আর যদি রাগ না করো বলি, আমাকে সবাই বলে কালো কুচ্ছিত কাফ্রি পুতুল, কিন্তু তুমি কি আমার চেয়ে খুব বেশী ভালো দেখতে?

কাঠের পুতুলটা খটখট করে এসে বল্লে ঃ কি বলছো কাফ্রিদাদা, দেখতে কেমন? তা যদি বল্লে তবে আমাদের এই খেলাঘরে—

বাধা দিয়ে উঠলো হাড়-গোড়-ভেঙ্গে-যাওয়া নড়বড়ে পুতুল ঃ কাকে সুন্দর বলছিস শুনি?

কথা বলতে বলতে নড়বড়ে পুতুল নড়বড় করে উঠলো আর শব্দ হলো। মুখ চ্যাপ্টা মাটীর গিন্নী পুতুল কানের মাকড়ীর সারি দুলিয়ে বল্লে ঃ যদি বলি তুই-ই সুন্দর—তাহলে।

কাঠের পুতুল খট খট করে আরো দু'পা এগিয়ে এসে বল্লে ঃ ঠিক বলেছ মাসী, আমি ভাবছিলাম ঐ কথা, তা তুমি ঠিক বলে দিয়েছ।

নড়বড় করে উঠলো পুতুলটা ঃ কাঠের শরীর তো খট খট করছে, একটু মিষ্টি কথাও নেই, সবই যেন কাঠ, কাঠ। ফুলটুসি ওটাকে বিদেয় করে দেয় না কেন তাই ভাবছি।

কাঠের পুতুলের কালো আঁকা ভুরু আরো কপালের ওপরে উঠলো ঃ বলিস কি, আমায় বিদেয় করবে? কে হাড়গোড় ভাঙ্গা 'দ' হয়ে পড়ে আছে? যাবার সময় কার হয়ে এলো সবাই তা বুঝতে পারছে।

মনোরমা বল্লে ঃ বাবাঃ খালি ঝগড়া, একটা ছোট্ট খেলাঘর, তারমধ্যে এত কাণ্ড। কেউ মিলে মিশে থাকতে জানে না!

হাঁস বল্লে ঃ তাই তো বলি, সুন্দর-অসুন্দর নিয়ে এত ঝগড়া আমি আর কোনো খেলাঘরে দেখিনি।

কাফ্রি ফিসফিসিয়ে বল্লে ঃ আরম্ভটা করলে কে?

গিন্নী পুতুল বল্লে ঃ বেশ যাও এখন যে যার কাজে, ঝগড়াঝাঁটি চলবে না।

নড়বড়ে তখনও গজরাচ্ছে। কাঠের পুতুল একটু টেরিয়ে তার দিকে চেয়ে খট খট করে চলে গেল।

হাঁস আবার এগিয়ে এলো নড়বড়ের দিকে, বল্লে ঃ বল্‌তো ভাই, আমাকে নিয়ে ফুলটুসি বন্ধুদের কাছে বলে না যে হাঁসটা আমার কি সুন্দর দেখতে, ডাকটা একেবারে সত্যিকারের মত?

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো নড়বড়ে ঃ বলিসনি আর, তোর এই কথা শুনতে শুনতে কান গেল, প্রাণও যাবার যোগাড়।

—আরে প্রাণ যাবার যোগাড় আমার জন্য নয়, ফুলটুসির ছোট্ট ভাইটা সেদিন খেলাঘরে এসে

● মিলেমিশে
ইন্দিরা দেবী

তোমায় তুলে যা আছাড় মারলো তাতেই তো হাড়গোড় ভেঙ্গে গেল। ভাগ্যি ডলি আর মনোরমা 'প্রাথমিক চিকিৎসা' কিছু জানতো, তাই প্রাণটা এ যাত্রা বেঁচেছে তবে 'ইন্‌ভ্যালিড' হয়ে—তারজন্য—আমাদের খুব দুঃখ, কিন্তু প্রাণ ভাই আমার জন্য যাচ্ছে না।

নড়বড়ে রাগে ছিটকে পড়লো ঃ নিজেকে সুন্দর, সুন্দর বলে তোর যা গর্ব্ব হয়েছে, তাতে আর বেশীদিন নয়। শব্দ করতে জানলেই সুন্দর হয় না। মনকে সুন্দর করতে হয়, কথা সুন্দর করে বলতে হয়।

হাঁস সব কথা না শুনে আবার চললো মনোরমার কাছে, বল্লে ঃ বলতো মনোরমা, আমি যে খুব সুন্দর ডাকি, সত্যি-হাঁসের মত তা ফুলটুসি আর তার বন্ধুরা বলে কিনা?

হুঙ্কার দিয়ে উঠলো হাতী ঃ বলি সকাল থেকে হচ্ছে কি সব? আর কাজকর্ম্ম নেই?

কিন্তু হাঁস তবু একবার গলার রিবণটা টেনে ঘাড় ফিরয়ে বল্লে ঃ সত্যি বল হাতীকাকা, আমার চেহারা আর ডাকটা কেমন?

এহেন হাঁসের ডাক হঠাৎ থেমে গেছে। অন্য পুতুলরা বলছে ঃ ঠিক হয়েছে, অহঙ্কারের চোটে দেখতে পাচ্ছিলেন না, এখন যাদু কি হয়?

ভালুক আর হাতী বলাবলি করছিল ঃ হাঁসটার পেটের কলটা খারাপ হয়েছে না কি?

আরে জানো না, ফুলটুসি সারা সকাল ওকে বাথটবে ভাসিয়ে খেলা করেছে। বেশী সর্দ্দি-টর্দ্দি জমে থাকবে হয়তো, তাতেই সব আটকে গেছে।

—কিন্তু তাহলে তো ডাক্তারকে খবর দিতে হয়—ভুরু কুঁচকে ভালুকদাদা বল্লে।

গিন্নী পুতুল বল্লে ঃ ডাক্তার? সর্দ্দি হলে ডাক্তার একথা পুতুলের চৌদ্দপুরুষে শুনিনি। আমার শাশুড়ী ছোটদের চিরকাল সর্দ্দি হলে তুলসীপাতার রস আর মধু খাইয়েছেন। দিদিমাকে বলতে শুনেছি, 'সর্দ্দি হলে নাবে, পেট ফাঁপলে খাবে'। ডাক্তার তো কখনও শুনিনি, এ কী অনাসৃষ্টি কাণ্ড মা।

থতমত খেয়ে ভালুকদাদা বল্লে ঃ তবে বাপু যা ভাল বোঝ কর।

এদিকে হাঁসটাকে নিয়ে কাফ্রি পুতুল আর কাঠের পুতুল যেখানে কাঁচের বড় জারে ফুলটুসির লাল মাছ লেজ তুলে তুলে খেলা করছিল সেখানে নিয়ে গিয়ে বল্লে ঃ শুনলি তো গিন্নী কি বললে? যে জলে তোর সর্দ্দি হয়েছে, সেই জলেই তোর অসুখ ভাল হবে, খানিক ডুবে থাক এখানে।

হাঁস তো কথা বলতে পারছে না, ওরা তাকে নিয়ে কাঁচের প্রকাণ্ড জারটায় ফেলে দিলে। ও জলে পড়বামাত্র চারদিক থেকে লালমাছগুলো এসে ওকে প্রথমে খাবার মনে করে ঠোকরাতে লাগলো। আর যন্ত্রণায় হাঁস চীৎকার করতে গেল কিন্তু পারলো না—ঠোঁটটা একটু ফাঁক হলো কিন্তু শব্দ বেরোলো না। এদিকে মাছেরা ক্রমাগত ঠোকরাচ্ছে তাকে। শেষে পা দিয়ে ওদের ঠেলতে ঠেলতে হাঁস জারের উপর দিকে মুখ তুলে ক্রমাগত হাঁ করতে লাগলো—কাফ্রি আর কাঠের পুতুল দাঁড়িয়েছিল সেখানেই—



● মিলেমিশে
ইন্দিরা দেবী

ব্যাপারটা বুঝে ওরা তাকে উঠিয়ে নিল। মাটিতে পড়ে হাঁফাতে লাগলো—উঃ কী ভীষণ লেগেছে তার—হাত পা যেন খুবলে খেয়েছে।

এর মধ্যে সবাই এসে জড় হয়েছে। ভয়ে, যন্ত্রণায় হাঁসের তো একশো দুই টেম্পারেচার উঠে গেল। তখন সকলে মিলে তাকে ডলি আর মনোরমার জিম্মায় রেখে খাটে শুইয়ে দিল।

নড়বড়ে দূর থেকে সব দেখছিল—মুখ মুচকে বল্লে ঃ ঠিক হয়েছে এবার অহঙ্কার ভাঙ্গবে।

এবার সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাকছ তো? [পৃঃ ২৪৩

দু'দিন পরে কিন্তু আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটলো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে হাঁস বোধহয় খুব প্রার্থনা করেছে—আর প্রতিজ্ঞা করেছে নিজেকে নিয়ে অত অহঙ্কার করবে না, সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিলে মিশে থাকবে, কাউকে ছোট ভাববে না।

ঘটনা ঘটলো কি তা বলি ঃ ফুলটুসি খেলাঘরে খেলতে এসে দেখলো, পালঙ্কে মশারী ফেলা, হাঁসটা শুয়ে আছে, গায়ে চাদর চাপা দেওয়া।

—হাঁসটাকে আবার খাটে তুললে কে? এখানে তো বড় কাঁচের পুতুলরা শোয়—এই বলে ফুলটুসি হাঁসটাকে নামিয়ে আনলে—কিন্তু খুব ভারী বোধ হলো বলে জোরে দু'চার বার পেটটা টিপতেই হাঁসের মুখ দিয়ে ছিটকে ছিটকে জল বেরোতে লাগলো।

—আরে বাসরে এত জল এর পেটে কি করে ঢুকলো? টিপে টিপে জলগুলো সব বার করে দিলে ফুলটুসি। তারপর মুখ মুছিয়ে তাকে খেলাঘরের জায়গায় বসিয়ে দিল। দু'একবার পেট টিপে দেখতেই হাঁসটা আগের মত 'কোয়াক' 'কোয়াক' করে ডেকে উঠলো।

● মিলেমিশে
ইন্দিরা দেবী

—আঃ বাঁচলুম! মনে মনে হাঁসটা বল্লে আর চোখ দু'টোয় অনেক কৃতজ্ঞতা মিশিয়ে ফুলটুসির দিকে তাকালো।

তারপর যথারীতি যখন খেলাঘরে সকাল হলো তখন সকলে মিলে হাঁসকে ঘিরে ধরলো—'ভাল হয়ে গেছিস তো আর কি!'

কিন্তু হাঁসের মনের ভয়ানক পরিবর্ত্তন হয়েছে তখন, বল্লে ঃ ধন্যবাদ ফুলটুসিকে—আর সকলকেও। কথা বন্ধ হয়ে গেলে আমি একদম বোবা হয়ে যেতাম—কি হতো বলো! ফুলটুসি আমাকে ভাঙ্গা খেলনার ঝুড়িতে ফেলে রাখতো—ভাবতে গা কাঁটা দিচ্ছে আমার। ভগবান আমায় বাঁচিয়েছেন—এই বলে সে চোখ বুঁজে মনে মনে প্রণাম জানালো।

কাফ্রি পুতুল বল্লে ঃ তাহলে এবার সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাকছো তো? সুন্দর-অসুন্দর বলছো না তো?

—না, না, আমি আর কই সুন্দর, তুই আমার চেয়ে অনেক সুন্দর, অনেক ভালো।

নড়বড়ে গলার আওয়াজ নামিয়ে বিড়বিড় করে উঠলো ঃ 'এযে দেখি ভূতের মুখে রাম নাম।'

সেদিন দেখলুম, লাল সিল্কের উপর জরি দিয়ে কাজকরা একটা চমৎকার টুপি আর চকোলেট রং সিল্কের ক্লোক গায়ে একটা বড় চেয়ারে হাঁসটা খেলাঘরে বসে আছে, গলায় আবার দু'গাছা বড় মুক্তোর মালা—গলার রিবণটাও নতুন।

শুনলাম, ওর পরিবর্ত্তনের জন্য আর ভালো ব্যবহারের জন্যে সকলে মিলে ওকে খেলাঘরের রাণী করে নিয়েছে। আর সকলে বেশ মিলে মিশে আছে।

হ্যাঁ, কিন্তু রাণী হলেও—হাঁস কিন্তু ভুলেও লালমাছের জারের কাছে যায় না।

---

বিদ্যা ভোগকরী যশঃ শুভকরী
বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।

—প্রাচীন কবি

বিদ্যাই হলো ভোগের বস্তু, বিদ্যাই এনে দেয় যশ, কল্যাণ; বিদ্যাই হলো গুরুর গুরু।

# এক সাংঘাতিক সন্ধ্যা

—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

বিদেশে চাকরী করতে এসে প্রথম দিনেই সুধীরের জীবনে যা ঘটলো তার তিক্ততা কম নয়।

প্রথম দিন, কাজকর্ম বুঝে নিয়ে আপিস থেকে ফিরতে তার সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। এক কাপ চা খেয়ে সবেমাত্র একখানি বই খুলে বসেছে, এমন সময় চাকর এসে ডাকলো—বাবুসা'ব!

—কি?

—নীচের ঘরে আলো জ্বলছে না বাবুসা'ব।

—আলো জ্বলছে না, তা আমি কি করব? মিস্ত্রীকে খবর দাও।

—আমি তাই যাচ্ছি বাবুসা'ব, আপনি বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিন, মিস্ত্রীবাড়ী অনেকটা পথ, আমার ফিরে আসতে দেরী হবে।

বিরক্ত হয়ে সুধীর উঠে দাঁড়ালো। বইখানি আজ রাত্রেই পড়ে শেষ করতে হবে, অফিসার দিয়েছেন, বইখানি পড়া থাকলে আপিসের কাজের সুবিধা হবে। কিন্তু ক'পাতা পড়তে না পড়তেই এই বাধা পেয়ে সুধীর বিরক্ত হোল। চাকর বেরিয়ে গেল, দরজা বন্ধ করে সুধীর উপরে উঠে এল।

উপরে এসে সুধীর বিস্মিত হলো—উপরের ঘরও অন্ধকার। বাড়ীর সব কটা আলোই বিগড়ে গেল নাকি? টেবিলের উপর টর্চটা ছিল, সুধীর অন্ধকারে টেবিলের উপর হাত বুলাতে লাগলো। এমন সময় সেই অন্ধকারের মধ্যেই সুধীরের মনে হোল, কে যেন তাকে পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রথমে সুধীর ভাবলো অন্ধকারে মনের ভুল হোল হয়তো, কিন্তু পরক্ষণেই বাইরের সিঁড়িতে সে পায়ের শব্দ শুনতে পেল। কে যেন তরতর করে নীচে নেমে গেল। এ ঘরে কে এল, সে তো এতক্ষণ ঘরে বসেই পড়ছিল। টর্চলাইটটি হাতে পেতেই সুধীর সেটি জ্বাললো, ঘরে কেউ কোথাও নেই। টর্চ হাতে নিয়ে সুধীর নীচে নেমে গেল। সদর দরজা খোলা, ভিতরে কেউ ঢুকেছিল, সে দরজা খুলে বেরিয়ে গেছে। সুধীর তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো, সামনে ছোট একটা বাগান, বাগানের ভিতর দিয়ে একটি লোকের ছায়া যেন সামনের পথে গিয়ে পড়লো। সুধীরের একবার মনে হোল লোকটির পিছনে তাড়া করে যায়, কিন্তু তখনই সে নিজেকে সংযত করলো। বিদেশে দূতাবাসের কর্মচারী সে, তার উপর নানা জাতির নানা চরের দৃষ্টি থাকা স্বাভাবিক, সামান্য অসাবধান হলেই বিপদ। ডেপুটি হাই কমিশনার বাড়ীতে আসার আগে সুধীরকে বলেছেন—এখানে কর্মচারীরা হোটেলে থাকে তা আমি

চাই না, সে জন্য আমি প্রত্যেকের কোয়ার্টার্সের ব্যবস্থা করেছি, বাইরের লোকের সঙ্গে বেশী মেলামেশা থাকলে, কখন কি বিপদ ঘটে বলা তো যায় না।

কথাটা সত্য। প্রতিটি দূতাবাস এক একটি রাজনীতির কেন্দ্র। নানা ধরণের স্বার্থ নানারকমের জটিলতার সৃষ্টি করেছে। সেইজন্যই সুধীরের থাকার আলাদা ব্যবস্থা হয়েছে।

সুধীর দরজা বন্ধ করে উপরে উঠে এল। জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো। সারা বাড়ী অন্ধকার, কখন ইলেক-ট্রিকের মিস্ত্রী আসবে, তখন আলো ঠিক হবে, সন্ধ্যাটা কোন কাজের হোল না।

সামনে একটুকরো বাগান, বাগানের সামনে দিয়ে পথ চলে গেছে। পথে লোক চলাচল কম, নগরের উপকণ্ঠে এ স্থানটি বেশ নিরিবিলি। নিরিবিলি বলে এখানে উপদ্রব হওয়াও সহজ। কিন্তু আত্মরক্ষা করার মত কিছুই সুধীরের নেই, এক গাছি লাঠিও পাওয়া যাবে না। তবে ভৃত্যটি পাঞ্জাবী, তার কাছে একখানি কৃপাণ আছে মাত্র।

সুধীর জানালার সামনে দাঁড়িয়ে কত কি ভাবছে, এমন সময় হঠাৎ তার মনে হোল, নীচের ঘরে কিসের যেন একটা শব্দ হচ্ছে। সুধীর কান খাড়া করে শুনলো, সত্যেই নীচেকার ঘরে কে যেন চলাফেরা করছে। কে? সে লোকটি তো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তাহলে এ আবার কে? মানুষ নয় নিশ্চয়, বিড়াল বোধ হয়।

খাবার টেবিলের পাশে একটি লোক সটান মেঝের উপর পড়ে আছে।

কিন্তু শব্দটি যেন পদশব্দের মত, সিঁড়ি দিয়ে কেউ যেন উঠে আসছে বলে মনে হয়। সুধীরের কেমন যেন কৌতূহল হোল। সিঁড়ির মুখে সে এগিয়ে গেল। অন্ধকার তখন তার চোখে সয়ে গেছে। সুধীরের মনে হোল, সিঁড়ি দিয়ে যেন একটা কালো ছায়া এগিয়ে আসছে, সুধীর চেঁচিয়ে উঠলো— কে?

দপ্ করে টর্চের আলো ফেললো সিঁড়ির উপর। সিঁড়িতে কাউকে দেখা গেল না, কিন্তু দুরদুর করে সিঁড়ি দিয়ে একজন নেমে গেল, এটা সে স্পষ্ট শুনতে পেল। সুধীরের রোখ চেপে গেল, আত্মরক্ষার

● এক সাংঘাতিক সন্ধ্যা
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

জন্য কোন হাতিয়ার নেই, হঠাৎ আক্রান্ত হলে কি করবে—একথা আর তার মনে রইল না। টর্চ হাতে নিয়ে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল।

নীচের ঘরে ঢুকেই সুধীর স্তব্ধ হয়ে গেল, খাবার টেবিলের পাশে একটি লোক সটান মেঝের উপর পড়ে আছে। সুধীর কয়েক মুহূর্ত এগুবে কি পিছুবে ভেবে পেল না। তারপর দু'পা এগিয়ে গিয়ে লোকটির উপর ভালভাবে টর্চের আলো ফেললো—লোকটি চীনাম্যান, কপালের পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়েছে মেঝের উপর। কে যেন তার মাথায় আঘাত করেছে। এইটুকু সময়ের মধ্যে, কে তাকে আঘাত করলো? কখন আঘাত করলো? এতটুকু শব্দ পাওয়া গেল না? এখনই তো পুলিশে খবর দেওয়া দরকার। কিন্তু এ জায়গায় তো সবে সে আজ এসেছে, কোথায় থানা তা তো জানে না, আর বাড়ীর দরজা খুলে রেখেই বা সে কোথায় যাবে? সুধীরের সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠলো, জীবনে কখনও যে এমন অবস্থায় পড়তে হবে, তা সে কখন কল্পনাও করে নি।

সুধীর কোন রকমে ঘর থেকে বেরিয়ে সদর দরজা খুলে বাইরের বাগানে গিয়ে দাঁড়ালো। বাইরের বাতাসে সে যেন একটু স্বস্তি পেল।

ছায়াচ্ছন্ন বাগানের গাছপালার পানে তাকিয়ে কেবলই তার মনে হতে লাগলো, ছায়ার মাঝে কে যেন নড়ছে, যে লোকটি ঘরের ভিতরের লোকটিকে আঘাত করে পালিয়েছে সে আশেপাশেই কোথাও ওই গাছের ছায়ায় লুকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে সে টর্চের আলো ফেলে, কিন্তু কোথাও কিছুই চোখে পড়ে না।

কিছুক্ষণ পরে পরতাপ সিং ফিরলো, বললো—বাবুসা'ব, বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন?

সুধীর সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বললো—মিস্ত্রীর কি হোল?

—মিস্ত্রী একটা কাজে গেছে, দোকানে বলে এসেছি, ফিরে এলেই পাঠিয়ে দেবে।

সুধীর বললো—তুমি একবার ঝট্ করে থানায় যাও, ভিতরে একটা লোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, কে তাকে আঘাত করেছে।

—আমাদের ঘরে লোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে? চলুন তো দেখি—

পরতাপ সুধীরকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো। ঘরে ঢুকেই সুধীর টর্চের আলো ফেললো। ঘর খালি, কোথাও কোন মানুষের চিহ্নমাত্র নেই। তবে মেঝের উপর কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়ে আছে। সুধীর তো অবাক, মুখে তার কোন কথা জোগালো না। পরতাপ বললো—কই বাবুসা'ব, কেউ তো নেই?

সুধীর বললো—একটু আগেই লোকটিকে দেখেছি; ওই দেখ, এখনও রক্তের দাগ রয়েছে। মানুষটা কি হাওয়ায় উবে গেল?

—আপনি ঠিক দেখেছিলেন এখানে একজন লোক পড়েছিল?

—আমি কি কানা? দেখছ না, এখনও রক্তের দাগ রয়েছে।

—আহত লোক এখান থেকে পালিয়ে গেল? আপনি তো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কেউ

● এক সাংঘাতিক সন্ধ্যা
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

বেরিয়ে গেলে তো আপনার সামনে দিয়েই যেত।

—বেরিয়ে সে যায়নি, তাহলে আমি দেখতে পেতাম, বাড়ীতেই কোথাও সে লুকিয়ে আছে।

—চলুন, তাহলে উপরে গিয়ে দেখি—

দুখানি ঘরের বাড়ী, উপরে একখানি ঘর আর নীচে একখানি ঘর, নীচের ঘর তো দেখা হয়ে গেছে, এখন উপরের ঘরটাই দেখতে বাকী। দুজনে অন্ধকারেই উপরে উঠে এল। পরতাপ বললো—আলোটা জ্বালবেন না, নিঃশব্দে আসুন।

নিঃশব্দে দুজনে দোতলায় উঠে এলো, ঘরে ঢুকেই সুধীর টর্চ জ্বাললো, জানালার সামনে একটি লোক দাঁড়িয়ে ছিল, আলো দেখেই সে চমকে উঠলো। পরতাপ সিং একলাফে এগিয়ে গিয়ে তার হাতখানি চেপে ধরলো।

লোকটি জানালার দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই ইংরাজীতে বললো—ছাড়ুন, ছাড়ুন।

সুধীর বললো—কেন ছাড়বো? তুমি কে? কেন আমার বাড়ীতে ঢুকেছ ?

—বলছি বলছি, সব বলছি...ওই সে এসেছে, ছাড়ুন ছাড়ুন।...

লোকটি হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না, সুধীর তাকে এক ঝট্‌কা মারলো, পরতাপ তাকে ধরে ফেলে দিল মেঝের উপর। মেঝেতে পড়ে লোকটি জ্ঞান হারালো। তার কপালে রক্তের দাগ দেখেই সুধীর চিনলো, বললো—এ সেই লোক, একেই আমি দেখেছিলাম, নীচের ঘরে পড়ে থাকতে।

ঠিক সেই সময় নীচের সদর দরজা বন্ধ করার শব্দ হোল।

পরতাপ জিজ্ঞাসা করলো—বাবুজী, নীচের দরজা কি বন্ধ করে দিয়ে এসেছেন?

—না, নীচের দরজা তো বন্ধ করা হয় নি, তুমি এখানে বস, আমি দেখে আসছি। টর্চ নিয়ে সুধীর নীচে নেমে গেল।

সদর দরজা বন্ধ। সুধীর ঘরের মধ্যে ঢুকলো।

ঘরের দরজার পাশেই এক চীনাম্যান দাঁড়িয়েছিল, বললো—হুঁশিয়ার!

সুধীর তখনই পাল্টা প্রশ্ন তুললো—কে? কে তুমি? কেন আমার ঘরে ঢুকেছ?

—চুপ! চেঁচামেচি করলেই মরবে।

—আমার বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করে আমাকেই চোখ রাঙাবে?

—চুপ!—চীনাটি একটি পিস্তল সুধীরের পানে তুলে ধরলো, বললো—দেখতে পাচ্ছ?

—তুমি দেখছি রীতিমত খুনী। তুমিই একটু আগে একটা লোককে এই ঘরে আহত করে গেছ?

—হ্যাঁ—বলে লোকটি ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে এসে দুম্ করে সুধীরের মুখে এক ঘুসি বসিয়ে দিল। সুধীরের হাত থেকে টর্চ লাইটটা ছিট্‌কে গেল, সুধীর টলে পড়ে গেল একখানি চেয়ারের উপরে। পরক্ষণেই লোকটি সুধীরের উপর লাফিয়ে পড়লো। সুধীরের মনে হোল অনেকগুলি টর্চের আলো যেন তার চারিপাশে ঝল্‌মল্ করে উঠলো তারপরেই সব অন্ধকার।

● এক সাংঘাতিক সন্ধ্যা
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

অতর্কিত আক্রমণের জন্য কয়েক মুহূর্ত সুধীর নিশ্চল হয়ে পড়েছিল, তারপর যখন সে উঠে পড়ার চেষ্টা করলো তখন বুঝতে পারলো লোকটি তাকে চেয়ারের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধছে, দড়ি ছিঁড়ে সুধীর উঠে পড়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। আক্রমণকারী হেসে বললো—সরু দড়ি, বেশী জোর ফলালে জামা ছিঁড়বে, গায়ের চামড়া কেটে বসে যাবে, ভাল ছেলের মত চুপ করে শান্ত হয়ে বসে থাক।

—তোমাকে আমি পুলিশে দোব—সুধী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো।

লোকটি হাসলো, বললো—আগে চেয়ার ছেড়ে ওঠো, তারপর তো পুলিশ!

রাগে সুধীর আরেকটা ঝট্‌কা দিল, কিন্তু দুটি হাত চেয়ারের দুই হাতলের সঙ্গে বাঁধা, সুধীর কিছুই করতে পারলো না।

—আচ্ছা, তুমি এখন বস, আমি উপর থেকে একবার ঘুরে আসি—বলে লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুধীর অন্ধকারে চুপ করে বসে রইল, এক একটি মুহূর্ত তার কাছে এক একটি ঘণ্টা বলে মনে হতে লাগলো। একবার মনে হোল উপরের ঘরে সে একটা মারামারির শব্দ পাবে, কিন্তু কোন শব্দই পেল না।

এমন সময় ঠক্ ঠক্ করে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হোল। ডাক শোনা গেল—বাবুসা'ব! বাবুসা'ব!

দুর দুর করে সিঁড়ি দিয়ে একটি লোক নেমে আসার শব্দ হোল, দুম করে সদর দরজাটা খুলে জিজ্ঞাসা করলো—কে?

—আমি ইলেকট্রিক সারাতে এসেছি।

—ভিতরে যাও।

টর্চ হাতে নিয়ে মিস্ত্রী ভিতরে ঢুকলো। বললো—কই, কি হয়েছে, বলুন তো?

কিন্তু যার সঙ্গে সে কথা বললো সে ততক্ষণে বাগান পার হয়ে গেছে। মিস্ত্রী তো অবাক্, বললো—কই, কে আছেন?

সুধীর এবার কথা বললো—এই যে ঘরে এসো—

মিস্ত্রী ঘরে ঢুকে টর্চের আলোয় সুধীরকে ওই অবস্থায় দেখে তো অবাক্ হয়ে গেল, বললো—ব্যাপার কি?

সুধীর বললো—ডাকাত পড়েছে, শীগ্‌গির বাঁধনটা কেটে দাও দিকি?

মিস্ত্রী ছেলেটি চট্‌পটে, প্রথমে সে একটু বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল, তারপর তাড়াতাড়ি হাতের ব্যাগ থেকে ছুরি বের করে সুধীরের বাঁধন কেটে ফেললো। সুধীর এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ঘরের কোণ থেকে টর্চ তুলে নিয়ে বললো—তুমি আলো সারাও, আমি উপর থেকে আসছি।

তর তর করে সুধীর ছুটলো উপর তলায়। উপরের ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ছিল, ঝনাৎ করে হাঁসকল খুলে সে দরজা খুলে ফেললো। যেই দরজা খোলা, অমনি একজন চীনাম্যান লাফিয়ে পড়লো তার সামনে, তার হাতের ছোরাখানি ঝক্‌ঝক্ করে উঠলো টর্চের আলোয়। সুধীর টর্চটা ফেলে

● এক সাংঘাতিক সন্ধ্যা
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

দিয়েই তার ছোরাশুদ্ধ হাতখানি চেপে ধরলো। চীনাম্যান হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলো, সুধীর চেষ্টা করতে লাগলো ছোরাখানি কেড়ে নিতে। অন্ধকারে দুজনের শক্তির পরীক্ষা চলতে লাগলো। চীনাম্যানটি শক্তিমান, সুধীরও ব্যায়াম করে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছে। কেউ কাউকে পেরে ওঠে না, কয়েক মুহূর্ত তো এই ভাবেই কাটলো। ঠেলাঠেলি করতে করতে দুজনে এসে পড়লো সিঁড়ির মুখে। আর একটু হলে দুজনে একসঙ্গে গড়িয়ে পড়বে নীচে। এমন সময় ঘর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এল, টর্চলাইটের কেসটা অস্ফুট ভাবে চিক্‌চিক্ করছিল, সে টর্চটি তুলে নিল, তারপর টর্চের আলো ফেললো দুজনের মুখের উপর। সুধীর এবার দেখতে পেল চীনাম্যানের মুখ—এ সেই কপাল-ফাটা চীনা যে নীচের ঘরে পড়েছিল, আর চীনাটিও দেখতে পেল সুধীরের মুখ। সুধীরকে ছেড়ে দিয়ে সে বললো—বাবুসা'ব, ভুল হয়ে গেছে। আপনার সঙ্গেই আমার দরকার।

সুধীর বললো—সেইজন্য বুঝি আমাকে ছোরা মারতে চেয়েছিলে?

—আমি ভেবেছিলাম আপনি অন্য লোক।

এমন সময় ইলেকট্রিক জ্বলে উঠলো। নীচে থেকে মিস্ত্রী হাঁকলো—বাবুসা'ব!

টর্চ হাতে নিয়ে পরতাপ সিং কৃপাণ খুলে দাঁড়িয়েছিল, সে-ই সাড়া দিল, বললো—কি বল?

—আলো ঠিক হয়ে গেল বাবুসা'ব। বিশেষ কিছুই হয়নি, নীচের ঘরের ডুমটা কে খুলে নিয়েছিল, আর 'মেন্' বন্ধ করে দিয়েছিল। ঠিক করে দিয়েছি আমার মজুরীটা দিন।

কৃপাণটা সুধীরের হাতে দিয়ে পরতাপ বললো—ধরুন, বাবুসা'ব, কাউকে বিশ্বাস করবেন না, আমি নীচে থেকে আসছি।

পরতাপ সিং তো নীচে চলে গেল, চীনাম্যানটি বললো—আপনার সঙ্গে আমার জরুরী কাজ আছে। ঘরে চলুন।

সুধীর বললো—না, ঘরে আমি যাব না, যা বলার আছে এখানেই বল।

—ভয় নেই বাবুসা'ব, আমি আপনার শত্রু নই, ভুল হয়ে গিয়েছিল।

—বেশ তো, কি বলার আছে এখানেই বল না?

—বেশ, এই খামটি আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি, এটি আপনি খুব সাবধানে রাখবেন, এইটি কাল সকালেই ভারতীয় হাই কমিশনারের হাতে দেবেন। মনে রাখবেন এটি একটি জরুরী দলিল। এইটির জন্যই আজ আমার এখানে মাথা ফেটেছে।

চীনাটি খামটি এগিয়ে দিল, সুধীর সাবধানে খামখানি হাত বাড়িয়ে নিল, বললো—কিসের দলিল জানতে পারি কি?

—বান্দুং-এ যে প্রাচ্যদেশগুলির প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলন হয়ে গেল, সেখান থেকে ফেরার পথে চীনা প্রতিনিধিদের নিয়ে আসার সময় একখানি ভারতীয় ডাকোটা প্লেন এখানে ধ্বংস হোল, সেই প্লেনখানি কাদের ষড়যন্ত্রে ধ্বংস হোল, এই কাগজপত্রে তার সূত্র পাওয়া যাবে।

—তুমি এই কাগজপত্র কোথায় পেলে?

—আমি কম্যুনিষ্ট চীনের লোক, এই দলিলটি আপনাদের হাতে পৌঁছে দেবার জন্যই আমি এখানে এসেছিলাম।

● এক সাংঘাতিক সন্ধ্যা
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

—আরেকজন যে তোমার সঙ্গে এসেছিল, সে কে?

—সে চিয়াংকাইসেকের দলের লোক, সে আমার সঙ্গে আসে নি, সে এই দলিলটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে এসেছিল, সেই আমার মাথা ফাটিয়েছে।

পরতাপ সিং উপরে এলো।

সুধীর বললো—পরতাপ সিং টিংচার আইডিন আছে, একটু এনে দাও তো?

চীনাটি বললো—আইডিন কি হবে?

—তোমার কপালে একটু আইডিন দেওয়া দরকার।

—ধন্যবাদ বাবুসা'ব, আমি বাড়ী গিয়েই আইডিন লাগাবো, এখানে আর আমি অপেক্ষা করবো না, অপেক্ষা করলেই বিপদ বাড়বে। শত্রুরা এখনই হয়তো আবার আসবে।

—আইডিন লাগতে আর কতক্ষণ লাগবে?

পরতাপ আইডিন আর তুলো নিয়ে এল, চীনাম্যানের কপালে আইডিন লাগিয়ে একখানি রুমাল বেঁধে দিল, বললো—অনেকখানি কেটে গেছে।

চীনা হেসে বললো—টেবিলের কোণটা মাথায় লেগেছিল।

—নমস্তে—বলে চীনাম্যানটি সুধীরের কাছ থেকে বিদায় নিল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সুধীর জিজ্ঞাসা করলো,—আপনার নাম?

—বলা নিষেধ বাবুসা'ব।

যাবার সময় চীনাটি আবার সাবধান করে গেল—আজ রাত্রে কাউকে দরজা খুলবেন না বাবুসা'ব, ওরা আবার আসতে পারে, দরজা খুললেই বিপদ।

দরজা বন্ধ করে দুজনে এসে ঘরে ঢুকলো, ঘরের চেয়ার টেবিল ঠিক করলো, তারপর পরতাপ সিং গেল রাঁধতে, সুধীর বসলো বই পড়তে। একবার মনে হোল খামখানিতে কিসের জরুরী দলিল আছে পড়ে দেখে, কিন্তু খামখানি হাই কমিশনারের নামে সাঁটা ছিল, খুলে না পড়াই ভাল। সুধীর আপিসের বইখানি পড়তে সুরু করলো।

কিছুক্ষণ পড়েছে, এমন সময় ঝনঝন করে বাইরের দরজায় ধাক্কা দেবার শব্দ হোল। জানালা দিয়ে সুধীর দেখলো, নীচে দরজার সামনে দু'তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, হাঁক দিল—কে? কি চাই?

—দরজা খুলুন।

—কে আপনারা?

—আমরা পুলিশ।

—পুলিশ তো এখন কি? সকালে এসো।

—আমরা এসেছি খানাতল্লাসী করতে।

—আমি এখন দরজা খুলবো না।

—আমরা দরজা ভেঙে ঢুকবো।

—বেশ, তাই ঢোকো!

● এক সাংঘাতিক সন্ধ্যা
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

দুম্ দুম্ করে দরজায় কয়েকটা লাথি পড়লো। পরতাপ সিং চীৎকার করে উঠলো—যে ভিতরে ঢুকবে তাকেই কেটে ফেলবো।

—দরজা খুলে দাও!

—খুলবো না।

আমার দুম্ দুম্ করে লাথি।

হঠাৎ বাগানের ওদিক্ থেকে একটা আলোর ঝলক এসে পড়লো দরজার উপর, হুড়মুড় করে কয়েকজন লোক ছুটে এলো সুধীরদের বাড়ীর দিকে। যারা সুধীরদের বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল তারা সচকিত হয়ে উঠলো। তারা ছিট্‌কে পড়ার জন্য বাগানের মধ্যে সরে পড়তে গেল, এমন সময় বাইরের লোকেরা এসে তাদের আক্রমণ করলো, দু'দলে রীতিমত মারামারি বেধে গেল। কারও মুখে কোন সাড়া নেই, কিন্তু ছুটোছুটি দাপাদাপিতে বাগান চঞ্চল হয়ে উঠলো। সুধীর ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলো না—কারা মারামারি করছে, কেন মারামারি করছে, সবই তার কাছে দুর্বোধ্য মনে হোল।

ইতিমধ্যে দুম্‌দুম্ করে কয়েকবার পিস্তলের শব্দ হোল, তারপরেই সব চুপচাপ। একসঙ্গে কয়েকটা টর্চলাইট জ্বলে উঠলো। পাগড়ীধারী কয়েকজন পাঞ্জাবী পুলিশ এলো দরজার সামনে। হাঁক দিল—বাবুসা'ব!

এবার পরতাপ সিং দরজা খুলে দিল।

একজন পাঞ্জাবী এগিয়ে এসে বললো—বাবুসা'ব, আপনার টেলিফোন পেয়েই আমরা এসেছি, ঠিক সময়েই এসে পড়েছি, চারজন বদমায়েসকে ধরেছি!

সুধীর নীচে নেমে এসেছিল, বললো—টেলিফোন তো আমার নেই। আমি তো টেলিফোন করিনি।

—আশেপাশের বাড়ী থেকে কেউ করে থাকবে, যাক, আপনি এখন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোন; কোন ভয় নেই, আমাদের লোক থাকবে এই বিটে।

চারজন চীনাকে ধরে নিয়ে তারা চলে গেল, সুধীর দেখলো তাদের মধ্যে সেই লোকটিও আছে যে তাকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধেছিল।

পুলিশ চলে গেল। সে রাত্রে আর কোন উপদ্রব হোল না।

পরদিন সকালে আপিসে গিয়ে সুধীর খামখানি হাই কমিশনারের হাতে দিল, বললো গত রাত্রির সব কথা। হাই কমিশনার খামখানি খুলে একখানি চিঠি পেলেন। চিঠিখানি পড়ে তাঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললেন—খুব মূল্যবান্ দলিল, ডাকোটা বিমানখানি কাদের ষড়যন্ত্রে ধ্বংস হোল এটা থেকে তার অনেক সূত্র পাওয়া যাবে, ব্যাপারটা অনুসন্ধান করার জন্য যে কমিটি হয়েছে, সেই কমিটিতে এই চিঠিখানির নকল আমি আজই পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর আত্মরক্ষার জন্য তোমাকে আজই একটা পিস্তল দেবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

দিন সাতেক পরে একদিন সকালে পিওন এসে একটি প্যাকেট দিল সুধীরকে, সঙ্গে একখানি চিঠি। চিঠিতে লিখেছে—

আপনি পিস্তল রাখার অনুমতি পেয়েছেন শুনে, এই পিস্তলটি আপনাকে উপহার পাঠালাম।

এটা কাছে কাছে রাখবেন, দুঃসময়ে বন্ধুর কাজ করবে। ইতি—আপনার কম্যুনিষ্ট বন্ধু। প্যাকেটটি খুলতেই একটি ছোট্ট ছ'ঘরার পিস্তল পাওয়া গেল।

---
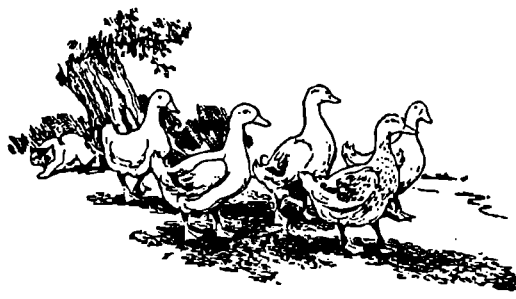
# ভিজে বেড়াল

[গা-দোলানো ছন্দ]

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

গা-দোলানো ছন্দে চলে
নন্দলালের হাঁসের দলে,
হেলে-দুলে কী কৌশলে
চল্‌ছে তারা...জলাতে,
ওরে...চল্‌ছে তারা...জলাতে;

চল্‌ছে তারা মাঠের ধারে,
ডাক্‌ছে পথে বারে বারে;
হ্যাংলো-হুলো চুপিসারে
দেখ্‌লো অশথ্‌-তলাতে,
ওরে... দেখ্‌লো অশথ্‌-তলাতে;

প্যাঁক্, প্যাঁক্, প্যাঁক্ শব্দ ওঠে,
চিন্তা কিছু নাইকো মোটে,
জলার পানে সবাই ছোটে
সাঁতার দিতে...বিজনে,
ওরে...সাঁতার দিতে...বিজনে;

চল্‌ছে মাঠের মধ্যে দিয়ে,
একটি ছানা যায় পিছিয়ে,
হ্যাংলা বেড়াল আস্তে গিয়ে
তাক্ করে তার...পিছনে।
ওরে...তাক্ করে তার...পিছনে।

নন্দলালের হাঁসের দলে
গা-দোলানো ছন্দে চলে,
সারাটা দিন জলার জলে
সাঁতার কাটে...সুখেতে,
ওরে...সাঁতার কাটে...সুখেতে;

সন্ধ্যা-বেলা বাড়ীর পানে
আবার ফেরে ফুল্ল-প্রাণে,
প্যাঁক্-প্যাঁক্-প্যাঁক্ আওয়াজ হানে
হাঁসরা তাদের....মুখেতে,
ওরে...হাঁসরা তাদের...মুখেতে।

কাছেই ছিল হুলোর বাসা
রোজই দেখে যাওয়া-আসা,
হাঁসগুলি যে বেজায় খাসা,
জল ঝরে তার....নোলাতে,
ওরে...জল ঝরে তার...নোলাতে;

চারটি ধাড়ি, একটি ছানা—
নিত্য চলে ঝাপ্‌টে ডানা,
মন্দ তো নয় কাণ্ডখানা;
যায় সমুখের...জলাতে,
ওরে...যায় সমুখের...জলাতে।

এক সঙ্গে সবাই চলে,
সাঁতার দিতে জলার জলে
যায় যে তারা সদলবলে,
সজাগ থাকে...সকলে,
ওরে...সজাগ থাকে...সকলে।

সুযোগ খোঁজে রোজই হুলো,
নধর বড় এ হাঁসগুলো—
রোজই চোখে দিচ্ছে ধুলো,
আস্‌ছে না তার...দখলে,
ওরে...আস্‌ছে না তার...দখলে।

ধর্‌তে গেলে ঠুক্‌রে দেবে,
শান্ত থাকে এ সব ভেবে,
একদিন এর শোধ সে নেবে,
চিন্তা করে...বসে সে,
ওরে...চিন্তা করে...বসে সে।

সুযোগ পেলে হঠাৎ এসে
একটাকে সে ধরবে ঠেসে
হংস মেরে অবশেষে,
মাংস খাবে...কসে সে,
ওরে...মাংস খাবে...কসে সে।

আজ তারা যায় সাঁতার দিতে—
বাচ্চা চলে পিছনটিতে—
ধরবে তারে অতর্কিতে,
আর কে তারে...পাবে রে,
ওরে...আর কে তারে পাবে রে;

এই না ভেবে বুদ্ধি এঁটে—
শয়তানি তার পেটে-পেটে,
বুদ্ধি করে' মগজ ঘেঁটে—
হাঁসের ছানা...খাবে রে,
ওরে...হাঁসের ছানা...খাবে রে।

এক্‌লা চলে বাচ্চা পাছে,
আর কি তাহার রক্ষা আছে,
বিল্লি এবার চল্লো কাছে,
ধরবে ঠেসে...সজোরে,
ওরে...ধরবে ঠেসে...সজোরে;

গা-দোলানো ছন্দে চলে
নন্দলালের হাঁসের দলে,—
বিড়ালটারে গাছের তলে
পড়লো না আর...নজরে;
ওরে...পড়লো না আর...নজরে।

● ভিজে বেড়াল
শ্রীসুনির্মল বসু

যেই এসেছে জলার ধারে
বিল্লি এবার একেবারে,
পিছন হতে ধরলো তারে
পুচ্ছটি তার...বলেতে,
ওরে...পুচ্ছটি তার...বলেতে;

বুঝতে নারে ব্যাপারখানা—
ভড়্‌কে তখন হাঁসের ছানা
সটান্ সোজা ঝাপ্‌টে ডানা
পড়্‌লো এবার...জলেতে,
ওরে...পড়্‌লো এবার...জলেতে।

সঙ্গে তাহার বিড়ালটা যে
হাবুডুবু জলের মাঝে,
মার্জার সে বুঝ্‌লো না-যে
ব্যাপার হোলো...কি জানো!
ওরে...ব্যাপার হোলো...কি জানো!

সমূহ এ বিপদ হেরে
প্রাণের দায়ে ছানায় ছেড়ে
ডাঙায় ওঠে বিড়াল যে-রে,—
শরীর জলে...ভিজানো,
ওরে...শরীর জলে...ভিজানো।

হাঁসের ছানা রক্ষা পেয়ে
অগাধ জলে সাঁত্‌রে যেয়ে—
প্যাঁক্-প্যাঁক্-প্যাঁক্ উঠলো গেয়ে
জলের উপর...ভাসিয়া
ওরে...জলের উপর...ভাসিয়া,

গা-দুলিয়ে মনের সাধে
সাঁতার কাটে নির্বিবাদে—
ভিজে বেড়াল এবার কাঁদে
অশথ-তলায়...আসিয়া,
ওরে...অশথ-তলায়...আসিয়া।

---

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি। বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি।
বলমসি বলং মরি ধেহি।

—বাজসনেয় সংহিতা

## মণি ও মুক্তা

তুমি সকল তেজের আধার, আমাকে কর তেজস্বী। তুমি সকল বীর্যের আধার, আমাকে কর বীর্যবান। তুমি সকল শক্তির আধার, আমাকে কর শক্তিমান।

# মনের মতন করে

## রাধারাণী দেবী

এক দেশে এক রাজা ছিলেন।

রাজার রাজ্যটি পাহাড়ে ঘেরা, নদীতে ভরা, গাছে পালায়, ফুলে ফলে সুন্দর।

প্রজারা সবাই মনের সুখে থাকে। কারুর কোনো অভাব নেই। দুঃখু নেই। সকলকারই আছে ক্ষেতভরা ধান-কলাই, পুকুরভরা মাছ-মাছালি, গোয়ালভরা গাই-বাছুর, গাছভরা ফলপাকুড়। তাদের আল্‌পনা আঁকা উঠোনে কচি কচি ছেলেমেয়েদের হাসিখুসির মেলা।

রাজারাণীর একটিমাত্র ছেলে। রাজকুমার যেমনি রূপবান্ তেমনি তাঁর সদ্‌গুণ। স্বভাবটি অন্যসব রাজপুত্রদের মতন নয় কিন্তু।

অন্য অন্য রাজকুমারেরা পাখী শিকার করতে খুব ভালোবাসেন। পাখী শিকার থেকে জীবজন্তু শিকার, জীবজন্তু শিকার থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ শিকার।

এ রাজকুমার কিন্তু পাখী শিকারের চেয়ে ভালোবাসেন পাখী পুষ্‌তে, জীবজন্তু শিকারের চেয়ে পছন্দ করেন জীবজন্তুকে পোষ মানাতে। রাজপুত্রের চিড়িয়াখানায় রং-বেরং-এর পাখী। জন্তুশালায় হাতী থেকে বাঘ সিংহী পর্যন্ত তাঁর অনুগত। তাঁর হুকুমে ওঠে বসে তারা।

অস্ত্র চালনার চেয়ে ছবি আঁকায়, গান শেখায় তাঁর ঝোঁক বেশি।

রাজামশাই হাসেন। বলেন—আমার রাজ্য রক্ষার জন্যে বিশ্বাসী সেনাপতিরা আছেন। না-ই বা শিখলো সে অস্ত্রবিদ্যা। নিজের খুশিমত আপন স্বভাবেই আমার ছেলে বড়ো হয়ে উঠবে।

রাজকুমার নিরহঙ্কার, নম্র, মিষ্টি স্বভাব, মাটির মানুষ। প্রজারা সকলে প্রাণের চেয়ে তাঁকে ভালোবাসে।

রাজকুমার দিনে দিনে বড়ো হয়ে উঠলেন। দেশ বিদেশ থেকে রাজার কাছে দূত আসে ভাট আসে—সুন্দরী রাজকন্যার খবর নিয়ে।

রাজকুমার বিয়ে করতে রাজী হন্‌না।

রাজা বোঝান রাণী বোঝান, মন্ত্রী বোঝান অমাত্য বোঝান, বন্ধুবান্ধব সখাসখী সকলে বোঝান—রাজপুত্র অটল।

সেই একমাত্র উত্তর—মনের মতন কনে না হোলে বিয়ে কোরতে পারবোনা।

সকলেই জিজ্ঞেস করে—কেমনধারা কনে হোলে তোমার মনের মতন হবে বলো।

রাজপুত্র জবাব দেন—তাতো ঠিক জানিনা।

দিন যায়—মাস যায়—বছরের পর বছর কেটে যায়।

রাজপুত্রের মনের মতন কনে আর মেলে না। সারা পৃথিবীর রাজকন্যাদের ছবি এনে পাহাড় প্রমাণ হোলো—কোনো ছবিই কুমারের পছন্দ হোলো না।

শেষকালে রাজ্যের প্রজারা অধৈর্য হয়ে উঠলো। তারা রাজামশাইয়ের কাছে ধর্ণা দিয়ে জানতে চাইলে কবে তাদের রাজকুমারের বিয়ের উৎসব হবে? রাজা বললেন—মন্ত্রীমশাইকে জিজ্ঞেস করো।

মন্ত্রীমশাইয়ের কাছে গেলে তিনি তাদেরকে নিয়ে নিচু গলায় চুপি চুপি কী যেন সব পরামর্শ করলেন। তারপর তারা হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে বললে—আমরা গিয়ে এবার রাজকুমারের বিয়ের মত আদায় করবো!

সত্যিই তো! কতদিন আর মানুষের একঘেয়ে একটানা জীবন ভালো লাগে? সেই—রাজামশাই রাণী-মা মন্ত্রীমশাই কোটালমশাই। একটুখানি নতুনত্ব না হোলে মনটা চান্‌কে ওঠে কি?

নতুন যুবরাণী এলে রাজ্যে বিরাট আনন্দ উৎসব হবে। যেমন উৎসব তারা হয়তো ইহ্জীবনে দেখেনি, পরজীবনেও হয়তো বা দেখবে না।

তাদের কতো ভালোবাসার কতো আদরের প্রিয় রাজকুমারের বিয়ে। এর চেয়ে আনন্দের আর আকাঙ্ক্ষার আর কিছু আছে নাকি?

প্রজারা এবার এসে রাজপুত্রের দরজায় ধর্ণা দিলে।

—যুবরাজ! সারারাজ্যির সমস্ত প্রজাদের হয়ে আমরা এসেছি আপনার কাছে দরবার করতে। আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করতে হবে।

রাজকুমার হেসে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলেন—বলো ভাই বলো। কী তোমাদের প্রার্থনা! আমার সাধ্য থাকলে নিশ্চয়ই তা দেবো বৈকি!

—যুবরাজ! আমাদের একটি যুবরাণী চাই। আর সব অন্য অন্য রাজ্যের প্রজাদের যুবরাজ-যুবরাণী দুই-ই আছে। আমাদেরই শুধু নেই। অন্যেরা ভাবে, আমাদের বুঝি যুবরাণী জোটেইনি। এ অপমান আমরা সইবোনা!

রাজপুত্র প্রমাদ গণলেন! মন্ত্রীমশাইয়ের পানে তাকিয়ে দেখেন—মন্ত্রীমশাই নির্বিকার মুখে বসে বসে একমনে পুঁথির পাতা ওল্‌টাচ্ছেন। কোনোদিকে নজর নেই।

রাজকুমার বললেন,—আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে এখন। এখন তোমরা বাড়ী যাও।

● মনের মতন কনে
রাধারাণী দেবী

প্রজারা বুঝতে পারলে রাজপুত্র তাদের ভুলিয়ে রাখতে চাইছেন। তাদের মধ্যে প্রধানেরা আরও এগিয়ে এসে জোড়হাত করে বললে—তা' হোলে আমরা কোন্ তারিখ থেকে রাজ্যে উৎসব শুরু করে দেবো বলুন। কোন্ মাসে যুবরাণী আমাদের রাজ্যে এসে সিংহাসন আলো করবেন?—

রাজকুমার বেগতিক দেখে মাথা চুলকে মন্ত্রীমশাইয়ের দিকে করুণ চোখে তাকালেন।

তার মানে—মন্ত্রীমশাই, রক্ষা করুন আপনি। এদের একটা ভালোমতন জবাব দিয়ে দিন্।

মন্ত্রীমশাই কিন্তু মুখ টিপে হেসে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর ক্ষুরের মতন বুদ্ধি দিয়ে জবাবের তরোয়ালে প্রজাদের প্রশ্ন কেটে টুক্‌রো করে ফেললেন না।

রাজপুত্র তখন কাতরভাবে বললেন—কিন্তু—মনের মতন কনে না পেলে কেমন করে আমি বিয়ে কোরবো, তোমরাই বুঝে দেখনা ভাই! যে আমার মনের মতন নয় তাকে কি বৌ করা চলে?

প্রজারা সবাই মিলে বলে উঠলো, মনের মতন কনের আবার ভাবনা? আপনি যেমনটি চান্ ঠিক তেমনিই আমরা পৃথিবী খুঁজে হাজির করে এনে দেবো। শুধু বলে দিন্, কেমনটি হলে আপনার মনের মতন হবে।

রাজপুত্র এর উত্তর জানেন না। তাঁর নিজেরই তো স্পষ্ট করে জানা নেই কেমনধারা কনে তাঁর ঠিক মনের মতনটি হবে।

আবার তিনি করুণভাবে মন্ত্রীমশাইয়ের পানে তাকালেন। এবার মন্ত্রীমশাইয়ের করুণা হোলো। তিনি হেসে প্রজাদের বললেন—তোমরা বাড়ী যাও। আগামী শুক্লপক্ষে যুবরাজ তোমাদের জানাবেন কেমনধারা কনে হলে তাঁর মনের মতন হবে।

প্রজারা মন্ত্রীমশাইয়ের জবাব শুনে আনন্দে হৈ হৈ করতে করতে বাড়ী ফিরে গেল।

মন্ত্রীমশাই গম্ভীরভাবে বললেন—যুবরাজ! আর তো পছন্দের বায়না নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। আগামী শুক্লপক্ষের মধ্যেই আপনাকে প্রজাদের জানিয়ে দিতে হবে, কেমনধারা কনে আপনার চাই। না হলে প্রজারা বিদ্রোহ করবে এবার। প্রজা-বিদ্রোহে রাজ্যের সর্বনাশ। রাজ্যের সর্বনাশে রাজার মহাসর্বনাশ। আর আপনি এমন ছেলেমানুষি করবেন না। যা হয় একটা মনঃস্থির করে ফেলুন এই কয়েকদিনের মধ্যেই।

রাজকুমার চিন্তিতমুখে মাথা হেঁট করে বসে রইলেন।

রাজামশাই আর মন্ত্রীমশাই প্রজাদের দিয়ে রাজপুত্রের উপরে বিয়ের চাপ দেওয়ালেন। ফলে হোলো কি, রাজপুত্র নাওয়া-খাওয়া ছাড়লেন, ছবি আঁকা ছাড়লেন, সেতার বাজানো ছাড়লেন। দিনরাত খালি ভাবেন আর ভাবেন, কেমনধারা কনে হলে তাঁর মনের মতন হবে।

রাজপুত্রের পক্ষীশালায় পাখীগুলো কাঁদে রাজপুত্রকে দেখতে না পেয়ে, সিংহ বাঘ ভালুকেরা খাওয়া-দাওয়া ছাড়ে তাদের প্রিয় প্রভুর দেখা না পেয়ে। রাজপুত্র ভেবে ভেবে আধখানা হয়ে গেলেন। এদিকে

কৃষ্ণপক্ষ শেষ হয়ে শুক্লপক্ষ এগিয়ে আসছে। প্রজারা আসবে জবাব নিতে। কেমনধারা কনে তাঁর চাই।

দেখতে পেলেন...বুলবুলি সেই ডালে বসে গান গাইছে।

একদিন ভোরবেলায় তিনি বাগানে বেড়াচ্ছেন, দেখতে পেলেন ডালিম গাছে অজস্র ফুল ফুটেছে। ঝিরঝিরে সবুজ পাতায় ভরা ডালিমগাছটি আলো হয়ে রয়েছে সেই ফুলের সুন্দর শোভায়। ঝুঁটিওলা বুলবুলি সেই ডালে বসে গান গাইছে।

রাজপুত্রের খু-উ-ব সুন্দর লাগলো। তার পরেই মনে হোলো, যদি কোনো মেয়ে এমনি ডালিমফুলের মতন সুন্দর হয় আর বুলবুল পাখীর মতন গাইতে পারে, তাকে আমি বিয়ে করতে পারি।

যেই না মনে হওয়া, অমনি তাঁর সমস্ত দুর্ভাবনা উবে গেল। মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটে উঠলো, সকালবেলার রোদ্দুরের মতন মিষ্টি। রাজপুত্র বাগান থেকে তাড়াতাড়ি প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

পরের দিনই শুক্লপক্ষ পড়লো। প্রজারা এসে দাঁড়ালো।—যুবরাজ! আমরা এসেছি।

রাজপুত্র হাসতে হাসতে বললেন, যদি কোনো মেয়ের ডালিম ফুলের মতন সুন্দর রং, আর গলার আওয়াজ বুলবুলির মতন মিষ্টি হয়, তাকে তোমাদের রাজ্যে যুবরাণী করতে পারি আমি।

প্রজারা বললে—আমরা চললুম ডালিমফুলী বুলবুলকণ্ঠী মেয়ে খুঁজে আনতে।

প্রজারা দিকে দিকে দলে দলে রওনা হয়ে গেল, তাদের যুবরাণীর সন্ধানে। এবার রাজপুত্র বললেন, তা হলে আমিই বা একলা রাজ্যে বসে থাকি কেন?—মন্ত্রীপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে তিনি স্বয়ং যাত্রা করলেন মনের মতন কনের খোঁজে। রাজারাণী মন্ত্রীমশাই নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন রাজপুত্রের সুমতি হয়েছে দেখে।

দিন যায়—মাস যায়—বছরের পর বছরও গড়িয়ে চলে যায়। প্রজারা একে একে দলে দলে ফিরে

- মনের মতন কনে
  রাধারাণী দেবী

এলো। ডালিমফুল রংয়ের মেয়ে পাওয়া গেল না। রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র কিন্তু মেয়ের সন্ধান থেকে ফেরেননা।

একদিন এক পাহাড়ী গাঁয়ে ঝরণার পাশে মন্ত্রীপুত্র এক পার্বতী মেয়েকে দেখতে পেলেন। মেয়েটি ঝরণার ধারে গান গাইছিলো আর কলসীতে জল ভরছিলো। গলার স্বরটি তার এমনিই মিষ্টি যে, কোথায় লাগে বুলবুলির মিঠে শিসের আওয়াজ। মন্ত্রীপুত্র গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এগিয়ে গিয়ে দেখেন পাথরে কোঁদা প্রতিমার মতন একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে ঝরণার ধারে গান গাইছে। মেয়েটির যেমনি চুলের রাশি, তেমনি নিখুঁত চোখ-মুখ, দেহের গড়ন যেন দেবীপ্রতিমার মতন। গায়ের রঙটি কিন্তু অপরাজিতা ফুলের মতন। ডালিম ফুলের মতন নয়।

চোখে পাঁচপুরু কাপড় জড়িয়ে ঝরণার কাছে নিয়ে গেলেন।

মন্ত্রীপুত্র সেখান থেকে সরে গেলেন। রাজপুত্রের কাছে গিয়ে বললেন—বন্ধু, তোমার 'মনের মতন' কনে পেয়েছি। মেয়েটির ডালিম ফুলের মতন রং আর গলার স্বর বুলবুলি পাখীর মতন। কিন্তু শুনলুম, মেয়েটির ভাগ্যলিপিতে জ্যোতিষীরা লিখে দিয়েছেন মেয়েটিকে যিনি বিয়ে ক'রবেন, তিনি যদি মেয়েটির রূপের দিকে তাকান্ তা'হলে ডালিমফুলী রং অপরাজিতা ফুলের মতন কালো হয়ে যাবে। সেইজন্য কোষ্ঠীতে লিখেছে তাঁর স্বামী যেন চোখে পাঁচপুরু কাপড় জড়িয়ে তাঁকে বিয়ে করেন। স্বামী যদি মেয়েটির দিকে না তাকান, তাহলে মেয়েটি বরাবরই ডালিমফুলী থাকবে। স্বামীর দৃষ্টি পড়লেই তার রং বদলে যাবে।

রাজপুত্র কনে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। বললেন—চলো তাহলে চোখে পাঁচপুরু কাপড় জড়িয়েই যাই। তুমি আমাকে বলে দিও তার রূপ।

● মনের মতন কনে
রাধারাণী দেবী

রাজপুত্রের চোখে পাঁচপুরু কাপড় জড়িয়ে মন্ত্রীপুত্র ঝরণার কাছাকাছি নিয়ে গেলেন।

পার্বতী মেয়ের গানের আওয়াজ শুনে রাজপুত্র মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কোথায় লাগে কোকিলের স্বর—কোথায় লাগে ঝরণার জলের কুলুকুলু ধ্বনি! এ যেন গুটিকয়েক বুলবুলির শিস একসঙ্গে জমাট্ বেঁধে মেয়েটির গলায় গানের সুর হয়ে উপছে পড়ছে।

গান থামলে রাজপুত্র আর মন্ত্রীপুত্র ঝরণার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। মেয়েটি ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলে—

—তোমরা কে? কি চাও এখানে?

রাজপুত্র জবাব দিলেন—তোমার গলার গান শুনতে পেয়ে আমাদের দারুণ গানের তেষ্টা পেয়েছে। সমস্ত মন শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে। তুমি গান গেয়ে একটু তেষ্টা মেটাও আমাদের!

মেয়েটি খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো ঝরণার জলের মতন। বললে—বেশ মজার কথা বলো তো তুমি। মানুষের তো শুধু জলেরই তেষ্টা পায়। আর তেষ্টা পেলে গলাই শুকিয়ে কাঠ হয়। গানের তেষ্টায় মন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় এমন তো কখনও শুনিনি।

রাজপুত্র বললেন—আহা-হা! কী সুন্দর তোমার হাসির আওয়াজ! ঠিক যেন স্ফটিক নুড়িভরা পাহাড়ী হালকা নদীতে স্রোতের আওয়াজ! তেমনি মিষ্টি, তেমনি পবিত্র। তুমি আর একটু হেসে উঠবে? তোমার হাসিতে আমার মনের ভেতরে যেন ঝাঁকে ঝাঁকে বেল জুঁই যুল ফুটে উঠলো। আনন্দের গন্ধে আমার হৃদয় ম' ম' করছে যেন!

মেয়েটি তো এবার হাসতে হাসতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তার হাতের কলসী ঝরণার নিচে পাহাড়ী নদীতে গড়িয়ে পড়ে গেল।

মন্ত্রীপুত্র এগিয়ে এসে বললে—তোমার কলসী নদীতে পড়ে গেল যে! আচ্ছা, আমি তুলে আনছি।

মেয়েটি বাধা দিয়ে বললে—না-না, ও-নদীতে নেমোনা কেউ। ওতে রাক্ষুসী স্রোত আছে। কোনও জীব ঐ নদীতে নামলে কখনো বাঁচেনা। কলসী স্রোতের টানে এগিয়ে গিয়ে আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি পাহাড়ের বাঁকে ঠেকে আট্‌কে যাবে, আমি সেখান থেকে উঠিয়ে নেবো।

মন্ত্রীপুত্র বললে—তা হোলে এখন একটি গান গাও।

মেয়েটি হেসে গান ধরলে। সন্ধ্যার রাঙা আলো আর নীল অন্ধকারে গানের সুরে আর ঝরণার জলের আওয়াজে মিশে এমন একটি সঙ্গীতের সৃষ্টি হোলো যে রাজপুত্র আর মন্ত্রীপুত্র বিভোর হয়ে গেলেন।

গান শেষ হলে মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে বললে—বাড়ী যাই। সন্ধ্যা হয়ে গেল। কলসী উঠিয়ে নিতে অনেকটা ঘুরে যেতে হবে আমায়।

তারপরেই একটু আমতা আমতা করে হেসে বললে—যদি কিছু মনে না করো তো একটা কথা জিজ্ঞেস করি।

মন্ত্রীপুত্র তাড়াতাড়ি বললে—তোমার যা'-খুশি তা-ই জিজ্ঞেস করতে পারো কন্যে! শুধু একটিমাত্র

● মনের মতন কনে
রাধারাণী দেবী

বিষয় জানতে চেয়োনা। তার উত্তর দেবার উপায় নেই আমাদের। আমার এই বন্ধুর চোখে কাপড় বাঁধা কেন, এই জিজ্ঞেসটি যেন কোরোনা। আমি আগে থেকেই বলে রাখছি, বন্ধুর দুই চক্ষু পদ্ম-পলাশের মতন সুন্দর। তাঁর দৃষ্টিশক্তি তোমার বা আমার চেয়েও অনেক বেশি।

মেয়েটি অপ্রস্তুত হয়ে মাথা নিচু ক'রে বললে—তা হলে আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই।

মন্ত্রীপুত্র বললে—একটি ব্রতপালনের জন্যে আমার বন্ধু তাঁর চোখ ঢেকে রেখেছেন এইটুকু শুধু জেনে রাখতে পারো, এর বেশি নয়।

রাজপুত্র বললেন—পার্বতীবালা! তোমার গান শুনে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। আমাদের রাজ্যে যুবরাণী নেই। রাজ্যশুদ্ধ প্রজা যুবরাণীর জন্যে ব্যস্ত হয়ে পৃথিবীর দেশে-দেশে খুঁজতে বেরিয়েছে। আমিও বেরিয়েছি আমার এই বন্ধুকে নিয়ে যুবরাণীরই খোঁজে। তুমি যদি অনুমতি কর, তোমার বাবা-মার অনুমতি নিয়ে তোমাকে আমরা আমাদের রাজ্যে যুবরাণী করতে নিয়ে যাই।

পার্বতীমেয়ে একটু ভেবে বললে—কিন্তু তোমাদের যুবরাজ কেমন তা' তো বললেনা।

মন্ত্রীপুত্র হেসে রাজকুমারকে দেখিয়ে বললেন—ইনিই আমাদের যুবরাজ। ছদ্মবেশে যুবরাণী খুঁজতে বেরিয়েছেন।

পার্বতীমেয়ে রাজপুত্রের পানে তাকিয়ে বুঝলে—সত্যিকথাই বটে। এমন কচি শালতরুর মতন দীর্ঘ আকৃতি, উজ্জ্বল সোনার বর্ণ, মহাভারতের বীরদের মতন বীরত্ব আর মহত্ত্ব মাখা মুখশ্রী, ধীর গম্ভীর সুন্দর কথাবার্তা—সাধারণ ঘরের নয়। তবুও একটু ভেবে মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বললে—আমার একটি বর-প্রার্থনা আছে। সে-বর এখন আমার দরকার নেই। ভবিষ্যতে যদি কখনও দরকার হয়, তখন আমি যা' প্রার্থনা করবো তাই দিতে হবে। এতে মত থাকলে, আমি আপনাদের রাজ্যে যুবরাণী হতে পারি।

রাজপুত্র বলে উঠলেন—তাই হবে। কথা দিলুম।

মন্ত্রীপুত্র রাজপুত্রের কানে কানে বললেন—বন্ধু! ভালো করলেনা কিন্তু। মহারাজা দশরথ এই বর দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে শেষকালে মনের দুঃখে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। কৈকেয়ী বর চাওয়ার ফলে বিধবা হয়েছিলেন, তাঁর ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিল।

রাজপুত্র হেসে বললেন—তা হোক্। ভাগ্যে থাকলে হবেই।

পার্বতী বললে—আমি তোমাদের রাজ্যে যাবো। আমার বাবা-মার কাছে বলবে চলো।

রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র পার্বতীকন্যার পিতা-মাতার অনুমতি নিয়ে তাকে নিজেদের রাজ্যে নিয়ে এলেন।

ঘেরা চৌদোলার ভিতরে কনে আছে। মন্ত্রীপুত্রের হুকুম কেউ এখন যুবরাণীকে দেখতে পাবে না। সন্ধ্যেবেলায় পশ্চিম-মহলের পদ্ম দীঘির ধারে শ্বেত পাথরের বেদীতে যুবরাণীকে সবাই দেখতে পাবে।

রাজ্যিশুদ্ধ লোক প্রাসাদের পশ্চিম-মহলের সামনে গিয়ে জড়ো হোলো।

মন্ত্রীপুত্র পশ্চিম-মহলের পদ্ম দীঘির ধারে পাথরের বেদীর তিনদিক টুকটুকে রাঙা বেনারসীর কানাত দিয়ে মুড়ে দিলেন। মাথায় দিলেন লাল কিংখাবের চাঁদোয়া। তার নিচে গন্ধ-দীপের ঝাড়লণ্ঠন জ্বেলে তারই নিচে যুবরাণীকে বসিয়ে দিলেন। যুবরাণীর মুখে এসে পড়লো পশ্চিম আকাশের পাটে বসা সূর্য্যির

● মনের মতন কনে
রাধারাণী দেবী

লাল আভা। বিকেলের যে আলোটিকে বলে কনে দেখা আলো। সেই আলোয় সোনার মুকুট পরা যুবরাণীর রং অবিকল ডালিমফুলের মতন দেখালো। দেশশুদ্ধ লোক আনন্দে জয়ধ্বনি করতে লাগলো। ধন্য ধন্য রব উঠলো।

—আশ্চর্য রূপ। অবিকল ডালিমফুলের মত রং। চোখ মুখ গড়ন যেন দেবীপ্রতিমা।

রাজপুত্র এত লোকের উল্লাসধ্বনি শুনে আনন্দে উত্তেজনায় তাড়াতাড়ি পশ্চিম-মহলের দিকে এসে পড়েছেন চোখে কাপড় না বেঁধেই। সামনে চেয়ে দেখেন—বেনারসী কানাতের তলায় গন্ধদীপের আলোয় ডালিমফুল রংয়ের কনে বসে আছে। রাজপুত্র মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছেন এমন সময় যুবরাণীরও চোখ পড়লো রাজপুত্রের দিকে। কী সুন্দর যুবরাজের চোখ দুটি। কাপড় ঢাকা ছিল বলে আগে দেখতে পাননি। রাজপুত্র তাহলে অন্ধ নন। কু-নয়ন নয়।

এমন সময়ে মন্ত্রীপুত্র এসে পড়ে রাজপুত্রের হাত ধরে টেনে নিয়ে বললেন—করলে কি বন্ধু! তুমি এমনভাবে তাকিয়ে দেখলে কনেকে, কাল তো আর ঐ সুন্দর ডালিমফুল রং ওর থাকবে না। অপরাজিতার মত কালো হয়ে যাবে যে! হায়! হায়! এতো করে বারণ করলুম, তুমি শুনলে না!

রাজপুত্র খুব লজ্জিত আর দুঃখিত হলেন। কী আর হবে, উপায় তো নেই। তিনি তখন বললেন— আমি গানের সুর আর গলার স্বর শুনেই খুশি হয়ে গেছি। যুবরাণীর চুলের রাশি, মুখের শ্রী, অঙ্গের গড়ন, দেহের লাবণ্য এতই ভালো যে রং যেমনই হোক্ এসে যাবে না। তবে প্রজাদের এ সম্বন্ধে তুমি বুঝিয়ে দিও।

পরদিন সকালে সবাই দেখলে ডালিমফুলের রংয়ের কনে অপরাজিতা ফুলের মত কালো রং হয়ে গেছে। সকলকার ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। রাজপুত্র কী বলবেন!

মন্ত্রীপুত্র এসে বললেন—রাজপুত্রেরই তাড়াহুড়োর দোষে এই বিপত্তি ঘটেছে। বিয়ের শুভদৃষ্টির আগে ভাবী স্বামীর দৃষ্টি পড়লে রং নষ্ট হয়ে যাবে এই কথা ওঁকে আমি জানিয়েছিলুম।

যাই হোক রাজপুত্র বলেছেন—ডালিমফুলের চেয়ে অপরাজিতার রঙই বেশি সুন্দর। তাতে লাবণ্য আরও সুন্দর হয়।

রাজ্যের লোক যুবরাজের পাশে যুবরাণী পেয়েই খুশি। সে ডালিমফুলই হোক্ আর অপরাজিতা ফুলই হোক্। যুবরাণীর আশ্চর্য মিষ্টি গলার গান তখন রাজপ্রাসাদের বাগানের পাখীর গানকে লজ্জা দিয়েছে।

রাজ্যের লোক যুবরাজের বিয়ে উপলক্ষ্যে তখন এমন এক উৎসব করলে—যে, বড় বড় পুকুর কেটে তাতে পরমান্ন রাখা হয়েছিল—দীঘি কাটিয়ে দই ভর্তি করতে হয়েছিল, মণ্ডা আর মিঠাই ঢালা হয়েছিল যা, তা বিন্ধ্যপর্বতের চেয়ে কিছু বেশি উঁচু বৈ কম নয়। আর—বাজনাবাদ্যি? উঃ, সে নাচ গান—বাজনার কথা ভাবতেই পারবেনা কেউ! সমস্ত দিন—আর সমস্ত রাত্তির ধরে—সমান একটানা— বাজনাবাদ্যি নাচ গান আর বাজী পোড়ানো! সে যে কী কাণ্ড, তা' ধারণা কোরতে হলে তোমাদের মাথায় যতোখানি ধারণাশক্তি মানে—বুদ্ধি আছে—তাকে অনেকটা—অ—নে—কটা বাড়িয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড়ো কোরতে হবে। নইলে তোমরা ধরণা কোরবে কেমন কোরে বলো?

আমার কথাটি ফুরলো।

আশা দেবী

খ্যাংরাপটি স্ট্রীট দিয়ে নূতন এক জোড়া নাগরা পায়ে দিয়ে ল্যাংড়াতে ল্যাংড়াতে ভূতো যাচ্ছিল নিমতলায় তার বিনিমাসীর বাড়ী। কিন্তু মামার বাড়ী যাবার ল্যাঠা অনেক। যদিও কিল চড় মামার বাড়ীতে নেই তবু জুতোর কামড় তো আছে। কাজেই কিল চড়ের শুন্যতার জন্য দুঃখ করবার কিছু নেই। তাই ভূতো মামার বাড়ী যাওয়াটাই বেশী পছন্দ করে না। তার ওপর ভূতোর ন্যাড়ামামাটা যেন কেমনতরো লোক। যেন খুনে ডাকাত—ছেলেপুলে দেখলেই যেন তার কান টানতে ইচ্ছে করে। কেন? এতই যদি কান টানবার ইচ্ছে তবে অন্যের ওপর নজর না দিয়ে নিজের কান টানলেই হয়! কারুর আপত্তি করবার কিছু নেই। তা নয়, খামখা অন্যকে ব্যস্ত করা! আর যদি কান টানবার সুযোগ না পায় তাহলেই অঙ্ক দিয়ে বসিয়ে দেবে। ভূতোর অত সব মোটেই পছন্দ হয় না। ন্যাড়ামামার মোটেই রস বোধ নেই। ভূতো ন্যাড়ামামাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। কিন্তু কথায় বলে 'দায় পড়ে রায় মশায়

হওয়া!' শেষ পর্য্যন্ত এক জোড়া নাগরার জন্যে ভূতোকে ন্যাড়ামামাকে পছন্দ করে ফেলতে হলো তার একটা প্রকাণ্ড বেলের মত নেড়া মাথা সত্ত্বেও, সেই কথাই বলছি।

ঘুটঘুটে কালো কম্বলের মত অন্ধকার রাস্তাটা। তারওপর কারা যেন কলা খেয়ে তার খোসা মানুষের আছাড় খাবার জন্যে ফেলে রেখেছে। দেখে মনে হবে এরা যেন ভূতোকে ফেলবার জন্যেই এই ব্যবস্থা করে রেখেছে। একটা দাড়িওয়ালা ছাগল গোলাপফুলের গন্ধ শোঁকার মত সেই কলার খোসা শুঁকে একেবারে মুগ্ধ হয়ে বসে আছে। ভূতোর মনও যেন কেমন উদাস হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে গান ধরলো, "মা আমায় এমনি করে, শিশুর মত করে রেখো।" বলা বাহুল্য মা কথাটা কান পেতে শুনলেন এবং প্রার্থনা পূরণ করার সঙ্গে সঙ্গে দামুর করিম মিঞার ঘাড়ে পড়বার মত ধড়াম্ করে একেবারে ছাগলটার ঘাড়ে। ছাগলটা হয়তো প্রথমে ভেবেছিল ঘাড়ে কলার কাঁদিই পড়েছে; শেষে ভূতোর "হ্যাঁচ্চো" করে হাঁচিতে একেবার নির্ভুল ভাবে ঘটনাটা অনুভব করে টিকির মত ল্যাজ তুলে ছুট দিলে। আর নাকের খানিকটা পচা গোবর যেই ভূতো মুছতে যাবে অমনি কে যেন এক ভীষণ হেঁচকা টানে তার পায়ের থেকে নাগরা জোড়া টেনে নিলে।—ভূতো 'চোর চোর' করে চেঁচিয়ে উঠে বসতেই অন্ধকারে ভাঙা হাঁড়ির ওপরে আঁকা ক্ষেতের কাকতাড়ুয়ার মত দাঁত খিঁচিয়ে চোর বললে "ভূতোর জুতো চোর"। বলেই নাকের কাছে আরশোলার দাঁড়ার মত কি যেন দিয়ে একটু সুড়সুড়ি দিয়ে একেবারে ছাগল যে পথে ছুট দিয়েছিল সেই পথ দিয়ে হাওয়া।

কোন রকমে একটা রিকসা চেপে বাড়ী ফিরে ভূতো বিনিমাসীকে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো ঃ

জানো বিনিমাসী, চোরটা একনম্বর বাজে লোক, ওর কান দিয়ে নিশ্চয় পুঁজ পড়ে—; ওর নাকটা নিশ্চয়ই আলুকাবলীর মত আর পায়ে নিশ্চয়ই গোদ আছে। পরের পায়ের চুরি করা জুতো কি কেউ পরতে পারে!

এতগুলো অসুখের নাম একসঙ্গে শুনে বিনিমাসী খানিকটা ভেবে বললে ঃ তা তো বটেই। তবে এত লোক থাকতে তোর পায়ের নাগরাই বা চোরে নিলো কেন? কত লোকের পায়ে তো কত ভালো ভালো দামী দামী জুতো আছে, এমনটাতো কারুর ঘটতে দেখিনি।

ঃ বিপদে পড়লে সবাই কথা শোনায়,—স্পষ্ট দেখলাম আমার পা থেকে আমার নাগরা জোড়া নিয়ে পালালো লাউ-এর বীচির মত দাঁতওয়ালা একটা ভূতের মত লোক। তা সত্ত্বেও তুমি উকিলের মত ভুরু কুঁচকে আমাকে জেরা করছো—কাঁদো-কাঁদো হয়ে ভূতো জবাব দিলে।

ঃ আমি তো কাঁদবার মতো কোনো কথাই বলিনি। তবে ভ্যাঁক করে কাঁদবার কি হলো শুনি? একটু গরম দুধ খা। খেয়ে ঘরে শুতে যা। ঘুমুলেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে। আজ একলা ঘরে শুতে পারবি, না ঘরে আমি শোব?

ঃ না কারুকে দরকার নেই—তোমরা সবাই সমান।—ভূতো রেগে বললে।

ন্যাড়ামামা ভূতোর ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। বিনিমাসী তাকে ডেকে বললে ঃ ভূতোকে একটু

● ভূতোর জুতো
আশা দেবী

দেখনা। ও ভীষণ ভাবে পড়ে গেছে আর ব্যথাও পেয়েছে—জুতো জোড়া তো গেছেই;—বিনিমাসী ন্যাড়ামামার একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলো। মুখে 'হুম' করে একটা আওয়াজ করে গরুর কান দিয়ে মাছি তাড়াবার মত শব্দ করতে করতে একটা বাটার চটি পায়ে দিয়ে ন্যাড়ামামা চলে গেল—যেন কিছুই হয়নি ব্যাপারটা।—তুচ্ছ কথা একেবারে এ সব।

ভূতোর আরো রাগ হলো। ন্যাড়ামামার কি বিচ্ছিরি তাকানো যেন! অন্যের কষ্ট দেখলে মোটেই তার মনে কষ্ট হয় না। না, মামার বাড়ীতে আর আসবে না। শুধু দাদু আর দিদিমার জন্যেই আসতে হয়, ওঁরা কত কাঁদেন—কিন্তু ন্যাড়ামামার ব্যবহার ভূতোর মনে গাঁথা থাকলো।

নিঝুম ঘুটঘুটে রাত। দাদু ঘুমিয়ে পড়েছেন, দিদিমা ভাঁড়ারে চাবি দিয়ে শুতে গেলেন। ভূতো একটু কাঁদতে আরম্ভ করেছে কিন্তু কান্না চোখেই লেগে রইলো—টুপ করে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ অন্ধকারে কে যেন এসে তার গায়ের চাদরটা একটু একটু করে টানতে লাগলো; তারপর খুট খুট করে ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। অন্ধকারেই। যেন ঘরটা তার কত পরিচিত!

ঃ কে? ভূতো বললে, ন্যাড়ামামা?—

ঃ ন্যাড়ামামা-টামা আমি নই—আমি ভূত!—ভূত উত্তর দিলো।

ঃ অ্যাঁ—করেই তো ভূতোর চোখ একেবারে ছানাবড়া।—

ন্যাড়ামামা চলে গেল—যেন কিছুই হয়নি ব্যাপারটা।

ঃ অ্যাঁ নয়, হ্যাঁ। ভূত হলেও আমি লোক ভালো, কারুর কোনো ক্ষতি করি না। মিথ্যে তুমি ভয়

পাচ্ছ। আমি বহুদিন বিলেতে ছিলাম। কাজেই খুব সভ্য ভূত—মাছ খেতে চাই না, ভয় দেখাই না—নাকে নাকে কথা বলতে পছন্দ করি না। বিশেষ অহিংস ভূত। মিথ্যে চেঁচিও না, চেঁচালে আমার ভারি রাগ হয়। ভূত ঘরের আলো জ্বাললো; তারপর ঘরের কোণায় দিদিমার স্টক একটিন ঝোলা গুড় ছিল তার ওপরই দুম্ করে বসে পড়লো।

ভূতো খাটের ওপর উঠে বসলো। বুকের মধ্যে তার যেন একখানা বালির চড়া পড়ে গেছে—শুকনো গলা দিয়ে আর কথা বেরুচ্ছে না। যতই মাই ডিয়ার লোক হোক—ভূত তো। দাঁত খিঁচোতে কতক্ষণ!

ফ্যাঁচ্ করে ভূতটা একটা হাঁচি দিলো, তারপর রুমালে মুখ মুছে বেশ মানুষের মত স্বাভাবিক গলায় বললেঃ বড্ড বর্ষা নেমেছে, তাই একটু ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাব হয়েছে। তারপর পকেট থেকে একটা কৌটো বার করে একটিপ নস্যি নিয়ে বললে ঃ—আঃ! তারপর কিছুক্ষণ ভূতোর মুখের দিকে প্যাট প্যাট করে প্যাঁচার মত গোল গোল চোখে তাকিয়ে বললে ঃ অমন কোলা ব্যাঙের মত তাকিয়ে দেখছ কী? গিলবে নাকি আমাকে?

ভূতোর গলার আওয়াজ যেন কেমন স্বাভাবিক ভাবেই বেরিয়ে এলো ঃ ও কৌটাটাতো আমার, ওতে আমার নাম লেখা আছে—

ঃ অঃ!—ভূত বললে আওরঙ্গজেবের মত সন্দিগ্ধ হাসি হেসে ঃ এ জুতো জোড়া কার বলতে পারো?

ঃ ওটাই তো আমার নাগরা—ভূতো বলে উঠলো ঃ তবে তুমি চোর ভূত!—বসে ভূতো যেই চেঁচাতে যাবে, অমনি ইঙ্গিতে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ভূত বললে, চুপ—চেঁচাবে কি গেছো। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এ নাগরা জোড়া তো তোমার ন্যাড়ামামার খুবই সখের। পনের দিন আগে এটা সে তোমাদের বাড়ী ফেলে এসেছিল, আর সেটা পরে তুমি কোন আক্কেলে বেড়াতে এসেছ শুনি? ভেবেছ মামা আই, এ পরীক্ষা দিয়ে শান্তিপুর বেড়াচ্ছে?—ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে।

ঃ তুমি এত কথা জানলে কি করে?—অবাক-বিস্ময়ে ভূতো জিজ্ঞাসা করলো।

ভূত হলে কি হয়—লোকটা রসিক। আর বেশ অমায়িক স্বভাবেরও বটে—মুলোর মতো দাঁত বের করে ভেঙচি কাটে না;—অন্য অভদ্র লোভী ভূতদের মত পথে মাছ চায় না;—পথে মানুষকে মিছামিছি ভয় দেখাবার জন্যে সড়াৎ করে গাছে উঠে পড়ে না। ভূতকে সৎ এবং মোটামুটি ভাল স্বভাবের বলেই ভূতোর মনে হলো। কিন্তু ভূতটা মরার আগে নিশ্চয়ই গোয়েন্দা ছিল, তা নইলে ন্যাড়ামামার নাগরার কথাটা জানলো কি করে?—ওর স্বভাবের দোষেই, যাক্‌গে। তাও ভাগ্যি ন্যাড়ামামা তার পায়ে এই সাধের নাগরা যদি দেখতো তা হলে পা দুটো তখুনি দাড়ি কাটার মত কেটে দিতো। তারপরও যদি তার রাগ না কমতো তা হলে পিটিয়ে একেবারে লাউঘণ্ট করে ছাড়তো—

টেবিল থেকে একটা দিশলাইয়ের কাঠি তুলে নিয়ে বেশ করে কান খোঁচাতে খোঁচাতে ভূত

- ভূতোর জুতো
  আশা দেবী

বললে ঃ কি ব্যাপার, একেবারে যে কাদা বনে গেলে! ভয়টয় দেখাব নাকি? তবে শরীরে আমার রাগ নাই, তাই এতোক্ষণ চটিনি।—তোমাকে আমি বলে রাখি—পরের জুতো পরা আমি মোটেই পছন্দ করি না, তার ওপর—মামা-টামার জুতো।

ঃ ওটাতো ন্যাড়ামামা ফেলে এসেছিল—আর আমি ওটা ঠিকই বিনিমাসীকে দিয়ে দিতাম—ভূতো বললো।

ঃ দেখ, বেশী গুল মেরো না। সবার মনের কথাই আমরা জানি। যদি মিথ্যে বলো তবে অন্য রাগী ভূতকে ডাকবো এখুনি। সবাই আমার মত ভালো ভূত নয়। তারপর তারা এসে যদি ভয়টয় দেখায় তখন বাপু আমাকে দোষ দিতে পারবে না—তা আগেই বলে রাখলাম।—এই না বলে ফ্যাঁচ-চো করে একটা কালী পূজোর পটকার মত আওয়াজ করে যেই উঠতে যাবে—অমনি ভূতো তাক্ বুঝে—"ওরে বাবারে—বিনিমাসীরে" বলেই চিৎকার।

"ওরে বাবারে—বিনিমাসীরে" বলেই চিৎকার।

আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো গেল ফুস্ করে নিভে এবং ভূতটা ঠিক মানুষের মতই ভয় পেয়ে দিল এক ভীষণ পঁচিশ-গজী লাফ! আর ভূত হলে কি হবে—এটা একটা সুটকো ভূত, কাজেই টাল সামলাতে না পেরে একেবারে দিদিমার বর্ষার সঞ্চিত ঝোলা গুড়ের টিনের ওপর গিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় শব্দ করে একেবারে ভূত কুপোকাৎ। যত রাজ্যের গুড় আর পিঁপড়ের মধ্যে মুড়কির মত মাখামাখি হয়ে গিয়ে কেমন বোকা বনে গেল! তারপর ব্লাডারের মত চুপসে যাওয়া

● ভূতোর জুতো
আশা দেবী

গলায় বললে ঃ ওরে ভূতো, আমার নাকে রাজ্যের পোকা আর পিঁপড়ে ঢুকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে—শীগ্‌গির আলোটা জ্বালা।

এ কি! এ যে নির্ভুল ন্যাড়ামামার গলা।

ঘরের বাইরে একেবারে যেন মেছোবাজার লাগিয়েছে—বিনিমাসী আর দাদু ঃ ওরে কি হলো, ও ভূতো, চোর নাকি? দরজা খোল—বমি করছিস নাকি? —কী আপদ! দরজা তো খোলে না, অসুখ হলো নাকি?

ঃ ভূত গুড়ের টিন উল্টে দিয়েছে বিনিমাসী—চিৎকার করে বললে ভূতো—

ঃ কি বললি, ঘুরে পড়ে গেছিস—ওরে ও দারোয়ান ও ছুছুন্দর সিং—সব গেলো কোথায়।—কী বললি—ভূত?—বলিস কী?

লাঠি হাতে ছুটে আসা ভোজপুরী দারোয়ানটা 'সিয়া-রাম সিয়া-রাম' বলেই লাঠি ফেলে দৌড়।

দাদু মাটিতে পড়া লাঠিটা তুলে নিয়ে নিজেই দরজায় ধাক্কা দিয়ে বিনিমাসীকে বললেন—ভাঙ্ দরজা—ছেলেটার কি হলো দেখতে হবে না? দারোয়ান হতভাগা কেবল বস্তা বস্তা কাঁঠাল খাচ্ছে আর হিং-এর কচুরী।—ধরে আনতো অকর্ম্মার কাঁঠালকে, ওর মাথায়ই আগে আমি লাঠিটা ভাঙবো!—পাশে দাঁড়ান চাকরটাকে হুকুম দিলেন।

ঃ দাদু আমি উঠতে পারছি না—ভূতো আবার হাঁক দিলো।

এবার দরজায় লাঠির ঘা পড়লো—দুম—দুম—

ভূতটা হুড়মুড় করে উঠতে চেষ্টা করেই, আর্ত্তনাদ করে উঠলো—এবার দু' নম্বর ড্যামেজ—কুঁজোটা ভাঙলো, সারা ঘর জলে থৈ থৈ করছে একেবারে!

ঃ ভূতো ও নাগরা আর আমি চাই না—তুই-ই নে।—আমায় একটু ধর—আমি বাথরুমের মধ্যে লুকোই। বাবা তো আমাকে আস্ত রাখবে না—ঠিক ন্যাড়ামামার মত তোতলানো গলায় ভূত মিনতি করলে।

ভূতো আশ্চর্য্য হয়ে বললে ঃ তাহলে তুমি ভূত নও সত্যি করে ন্যাড়ামামা—

ঃ হাঁ রে হাঁ, নিমতলায় থাকি বলেই কি ভূত হয়ে গেছি! আর্ত্ত স্বরে ন্যাড়ামামার গলা দিয়ে কথাটা বেরুতে না বেরুতে একেবারে হুড়মুড় করে দরজা ভেঙ্গে প্রবল স্রোতের মত বাইরের সবাই ঘরে ঢুকে পড়লো। বিনিমাসীর খুব সাহস। টুপ করে আলোটা জ্বালাতেই দাদু বললেন ঃ ভূত কো ঝুঁটি পাকড়ো, ব্যাটা ছিঁচকে চোর হ্যায়।

ঃ ভু-র-র—একটা রাম ছাগলের মত আওয়াজ। দেওয়াল ধরে দাঁড়ানো ন্যাড়ার গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো।

কিন্তু এবার আলোতে ভূতো দেখলো একটা বিকট মুখ। গায়ে কালো কম্বল আর গুড়ে সর্ব্বাঙ্গ বিবর্ণ। ন্যাড়ামামা কি সত্যিই এ? ভূতো যেন কেমন চমকে গেলো। ছুছুন্দর সিং কিন্তু একেবারে কাঠ

- ভূতোর জুতো
  আশা দেবী

হয়ে গেছে। বিনিমাসীও নীরব।

ঃ বাত বলো কোন হ্যায়—দাদুর গলা এবার যেন কেমন কেঁপে গেল ঃ ঘণ্টা সিং, চোরকে মুখে আলো ধর।

গুড়ের টিনের মধ্যে থেকে একটা আরশোলা এই অবকাশে গুট গুটি হেঁটে এসে দাদুর পায়ে বোধ হয় অকারণ গুড়ে পড়বার জন্য প্রণাম করে ক্ষমা চাইছিল কিন্তু দাদু তো তা বোঝেন নি! একে তিনি সামনে দাঁড়ানো ভূত দেখে বেশ ভয় পেয়েছেন তারপর এই ব্যাপার আর অত সহ্য হয়!—ওরে বাপ বলে একলাফ দিতেই গুড়ের ওপরে পিছলে গেলেন, আর পায়ের থেকে খড়ম ছুটে গিয়ে একেবারে ঘণ্টা সিং-এর কপালে!

ঃ ওরে বাপ জিন—বলেই ঘণ্টা সিং তিন লাফে একেবারে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলো। আর দাদু তো অজ্ঞান!

ঃ বাবা আমি ন্যাড়া, মুখে এটা মুখোস্—ন্যাড়া কেঁদে বললে।

ঃ দাদু, ও তো ন্যাড়ামামা।

ঘণ্টা সিং, চোরকে মুখে আলো ধর।

দাদুর মাথায় জল দেবার পর যখন জ্ঞান হলো, তিনি বললেন ঃ পিঠের ফোঁড়াটা এক আছাড়েই ফেটে গেছে। যাক্, যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচা গেল, নইলে কালই তো অপারেশন করতে হতো। আর নিয়ে আয় তো ওই হতভাগাকে, ওর নাকটা কেটে দি। ভুতো, নাগরা জোড়া আন, ওর গলায় ঝুলিয়ে দেব।

---

নবনীতা দেব

পাল্টুক্ নিয়ে এলো মেলা থেকে ময়না,
সব চেয়ে ভালো জাত, এমনটি হয় না ।
“হপ্তা না কাটতেই মিঠে বুলি ধরবে,”
বলে দেছে, “যা শেখাবে অনায়াসে পড়বে ।”
পাল্টুক্ মহাখুশী, হাসি তার ধরে না,
ময়না নিয়েই থাকে, পড়াশুনো করে না ।

হলঘরে একাকোণে ঝোলে ওর খাঁচাটা,
সব থেকে দরকারী সাবধানে বাঁচাটা ।
ঘরটার কাছে আছে নিমগাছ ঝাঁকড়া
দল বেঁধে ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে সেথা কাকরা ।

ময়নাটা দিন দুই চুপচাপ থাকলো,
ঘাড় কাত্ করে' করে' কিছু শুনে রাখ্লো।
হাত থেকে ছাতু খায়, হাত পেতে রাখ্লে,
'কুঁক্' করে' সাড়া দেয় নাম ধরে ডাকলে।

খোকাভাই একদিন লাল্টুক্ দিদিকে
বল্ছিলো ''ময়নাটা এ্যাদ্দিনে কী শিখে
বল্ দেখি কদ্দূর প্রগ্রেস কল্লে?''
''ডাকলেই সাড়া দেবে'' লাল্টুক্ বল্লে।

তারপর কাছে গিয়ে যেই তাকে ডাকা না,—
ময়নাও সাড়া দিলে চট্‌পট্—'কা-আ-কা'—
লজ্জায় লাল্টুক্ কেঁদে ফেলে ভ্যাঁ করে'
খোকাভাই বোকা হয়ে শোনে শুধু হাঁ করে।

''দিদা দিদা শুনে যাও'' মুনুদিদি হাঁকলে—
''ময়না কেমন করে' কাক হয়ে ডাকলে?''

● ময়না-মতি
নবনীতা দেব

দিদা এসে তাড়াতাড়ি যত ক'ন "ময়না,
'কৃষ্ণ-কৃষ্ণ' বলো"—কোনো ফল হয় না।

উৎসাহে ঘাড় তুলে কা-কা-রব করছে,—
প্যাল্টুক্ ড্যাবাচ্যাকা, চোখে জল ঝরছে।
"ময়না সাজিয়ে বুঝি কাকটাকে দিয়েছে?"
মনু বলে—"পাখীওলা কী ঠকিয়ে নিয়েছে!"

মন ভার সবার, খেলাধুলো বন্ধ।
দিদা শেষে দেখশুনে ঘোচালেন সন্দ'।
"ওমা দ্যাখ্ নিমগাছে কাকগুলো ডাকছে,
শুনে শুনে ময়নাটা তাই শিখে রেখেছে।
বদ্‌সঙ্গের দোষ একথা কি চাট্টি?"
বল্‌তে বল্‌তে দিদা হেসে কুটিপাটি।

মনের মতন কনে
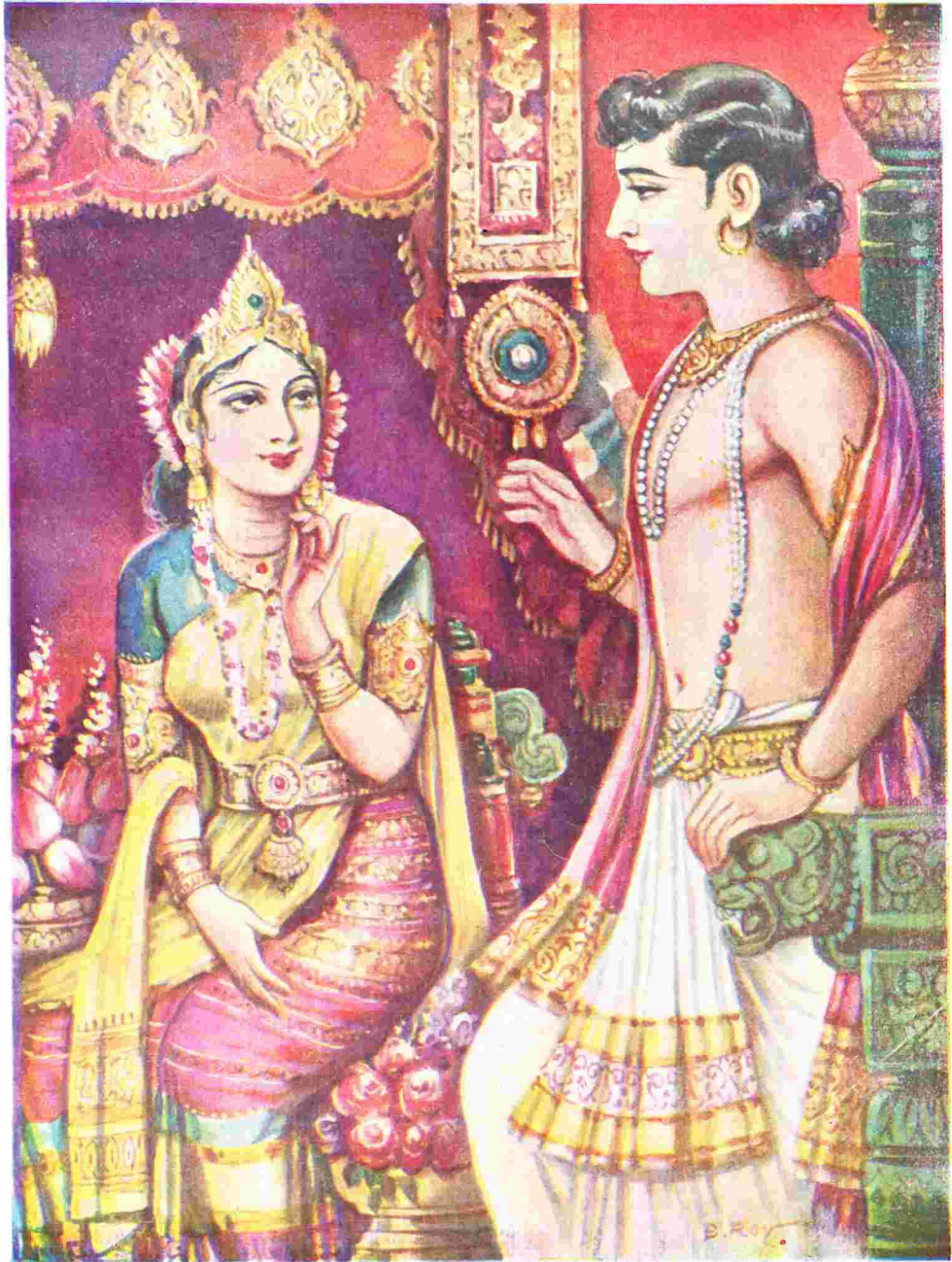
দু' একবার পেট টিপে দেখতেই হাঁসটা আগের মত 'কোয়াক' 'কোয়াক' করে

# অ্যাটম বোমা

## শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

হনুমান লেজের আগুন দিয়া স্বর্ণলঙ্কা ছারখার করিয়াছিলেন কিন্তু সে আর কতটুকু? অশোক-কাননে তাহার আঁচও লাগে নাই। আর রাবণ রাজা যে গোষ্ঠীসুদ্ধ বাঁচিয়াছিলেন তাহা কে না জানে? নহিলে রাম-লক্ষ্মণ বেকার হইয়া পড়িতেন। বাল্মীকিরও হাতে কাজ থাকিত না।

এযুগ হইলে তাহাই হইত। একটি অ্যাটম বোমাতেই সকল কার্য শেষ। তাহাতে সীতার উদ্ধার না হউক লঙ্কা গলিয়া এক তাল সোনায় পরিণত হইত। শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্ণসীতাটি আকারে আরও কিছু বড় এবং ওজনে আরও একটু ভারী হইতে পারিত।

দ্বাপরের যুদ্ধবিদ্যা এযুগে অচল। তাহার প্রধান কারণ এযুগের রাজাদের সীতা-উদ্ধারের চেয়ে স্বর্ণ-উদ্ধারের দিকে নজর বেশী। আর এর কারণ এযুগের হনুমানদের লেজও যথেষ্ট পরিমাণে দীর্ঘ নয়। কাজেই অ্যাটম বোমা অস্ত্র হিসাবে এযুগে বেশ জনপ্রিয় হইয়াছে। ভয় দেখাইয়া বন্ধুত্ব রক্ষার ইহা একটি অব্যর্থ মহৌষধ বলিয়া অনেকের ধারণা।

এত বড় একটা জিনিষের নামটাই আমরা জানি, তাহার পরিচয়টা জানাও উচিত। ভগবান করুন তাহার শক্তির পরিচয়টা যেন নিতান্ত ঘনিষ্ঠভাবে পাইতে না হয়।

অ্যাটম শব্দের বাংলা নাম দেওয়া যাক্ পরমাণু। কিন্তু তাহার পূর্বে আর দু'একটি কথা জানা দরকার। পৃথিবীতে পদার্থের অভাব নেই। অসংখ্য পদার্থের সমবায়ে ভগবান এই বিশ্ব রচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক পদার্থই কয়েকটি অণু দ্বারা গঠিত। পদার্থের অতি ক্ষুদ্র অংশকে অণু বলে, ইংরাজীতে যাহার নাম molecule.

পদার্থের অতি ক্ষুদ্র অংশকে অণু নাম দিয়াছি, কিন্তু অণুকেও আবার আরও ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায়। অণুকে বিভক্ত করিয়া যাহা পাই তাহার নাম পরমাণু, ইংরাজী নাম atom.

জলের একটি অণুকে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে ইহার মধ্যে তিনটি পরমাণু আছে।—একটি অক্সিজেন গ্যাসের আর দুইটি হাইড্রোজেন গ্যাসের। তাই জলের বৈজ্ঞানিক নাম $H_2O$ ; $H_2$ হাইড্রোজেনের দুই অ্যাটম, O অক্সিজেনের এক অ্যাটম। যে খড়িমাটি দিয়া মাষ্টার মহাশয় বোর্ডে অঙ্ক

কষেন তাহার একটি মলিকিউলে ৫টি অ্যাটম—ক্যালসিয়ামের এক, কার্বনের দুই এবং অক্সিজেনের তিন। তাই খড়িমাটির রাসায়নিক নাম $CaCO_3$.

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কত বিচিত্র রকমের পদার্থ আছে তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। ইহাদের মধ্যে যে সব পদার্থের অণু বিভিন্ন রকমের পরমাণুর সমবায়ে গঠিত তাহাদের বলা হয় compound, যৌগিক উপাদান। জল কম্পাউণ্ড, খড়িমাটি কম্পাউণ্ড, নুন কম্পাউণ্ড কারণ ইহাদের প্রতিটি অণুর মধ্যে দুই বা দুইয়ের অধিক উপাদানের পরমাণু মিশ্রিত আছে। কিন্তু অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, ক্যালসিয়াম, কার্বন ইহারা প্রত্যেকেই মৌলিক উপাদান। একটি অক্সিজেনের মলিকিউল বা অণু বিশ্লেষণ করিলে একটিমাত্র অক্সিজেনের অ্যাটম পাওয়া যাইবে। একটি হাইড্রোজেনের মলিকিউল ভাগ করিলেও একটি হাইড্রোজেনের অ্যাটম ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যাইবে না।

মৌলিক উপাদানের সংখ্যা প্রায় একশ'। সোনা, রূপা, লোহা, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন—এ সবই মৌলিক পদার্থ। যে সব ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে বিজ্ঞানের বই পড়ে এ সব নাম তাহাদের অপরিচিত নয়। আজকাল আমরা একটি নূতন মৌলিক পদার্থের নাম শুনিতেছি—সেটি হইল ইউরেনিয়াম। অ্যাটম বোমা তৈয়ারি করিতে হইলে এই ইউরেনিয়ামের দরকার হয়। ইউরেনিয়াম মৌলিক পদার্থ বলিয়া ইহার একটি অণুতে একটিমাত্র অ্যাটম বা পরমাণু আছে।

অ্যাটম শব্দটার মানে কি? শব্দটা আসিয়াছে গ্রীক হইতে। গ্রীক ভাষায় ইহার অর্থ 'যাহাকে কাটা যায় না'; বাংলায় ইহাকে যদি কেহ 'অকাট্য' বলিতে চায় তো বলিতে পারে। কেন না অ্যাটম বোমা যে অকাট্য অস্ত্র এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

অ্যাটম আমরা চোখে দেখিতে পাই না। একটা ছুঁচের ডগায় যে সিঁদুরের গুঁড়াটুকু ধরে তাহাও অ্যাটম নয়, বহু লক্ষ বহু কোটি অ্যাটমের সমষ্টি।

অ্যাটম কি?—ইহার উত্তর বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ। অন্ততঃ সেকালকার বৈজ্ঞানিকরা সেই ব্যাখ্যাই দিতেন। একালকার বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, অ্যাটমই বস্তুর ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য 'অকাট্য' অংশ নয়। ইহাকেও বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করা চলে। তখন এক পরমাণুর মধ্যে অনেক অতি পরমাণুর সন্ধান পাওয়া যাইবে। কি আর করা যায়, অতি পরমাণু নামটা বাধ্য হইয়াই দিলাম।

বিজ্ঞানীরা এক একটি অ্যাটমকে এক একটি সৌরমণ্ডলের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া গ্রহের দল অবিরত ঘুরপাক খাইতেছে। কেহ কাহারও গায়ে ঘেঁষিয়া নাই, এক গ্রহ হইতে আর এক গ্রহের দূরত্ব লক্ষ লক্ষ মাইল। আবার মণ্ডলের কেন্দ্রে যে জ্যোতিষ্কের অবস্থান সেই সূর্য হইতেও প্রতিটি গ্রহের দূরত্ব কম নয়। আমরা যে গ্রহে বাস করি তাহার নাম পৃথিবী। এই রকম আরও আটটি গ্রহ লইয়া সূর্যদেবের মণ্ডল। এ যেন ঠিক বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন আর কি! বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন কালিদাস। সূর্যদেবের নবগ্রহের মধ্যে আমাদের পৃথিবীই সর্বশ্রেষ্ঠ কিনা জানি না, তবে এটুকু জানি যে গ্রহ হিসাবে আমরা সূর্যের নিকটতম প্রতিবেশী। পৃথিবী

● অ্যাটম বোমা
শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

হইতে সূর্যের দূরত্ব ৩৬০ লক্ষ মাইল। দূরত্ব হিসাবে শুক্রের স্থান দ্বিতীয়। শুক্র ও সূর্যের ব্যবধান ৬৭০ লক্ষ মাইল। অন্যান্য গ্রহ সূর্য হইতে আরও বহু লক্ষ মাইল দূরে।

অ্যাটমগুলিকে সৌরমণ্ডলের সঙ্গে তুলনা করি কেন? কারণ অ্যাটমের মধ্যেও সূর্যের মত একটি কেন্দ্রক আছে। তাহার ইংরাজী নাম দিয়াছি nucleus। ইহাকে মাঝখানে রাখিয়া কতকগুলি পরমাণু অসম্ভব বেগে ঘুরিয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সূর্যকে মাঝখানে রাখিয়া নবগ্রহ যেমন অনন্তকাল ধরিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। কেন্দ্রক এবং পরমাণুর মধ্যে অনেক ব্যবধান। আবার পরমাণুদের পরস্পরের মধ্যেও ব্যবধান কম নয়। তফাৎ এই যে সৌরমণ্ডল খুব বড় আর এই পরমাণুমণ্ডল খুব ছোট। বড়টাও এত বড় যে আমরা সহজে ধারণা করিতে পারি না। তেমনি ছোটটাও এত ছোট যে সেও আমাদের ধারণার অতীত। ভাবিলে আশ্চর্য লাগিবার কথা যে একটি ছোট মেয়ের দুটি চোখে লাগাইবার জন্য যে পরিমাণ কাজলের প্রয়োজন কয়েক লক্ষ কাজলের অ্যাটম দিয়া তাহা তৈয়ারি।

নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রককে ঘিরিয়া যে অতি পরমাণুগুলি প্রচণ্ডবেগে ঘুরিতেছে তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে ইলেকট্রন। কেন্দ্রকের চারিদিকে যেমন ইলেকট্রন, তেমনি তাহার মধ্যে আছে প্রোটন। প্রোটনে থাকে পজিটিভ বিদ্যুৎ আর ইলেকট্রনে নেগেটিভ। পজিটিভ আর নেগেটিভ মিলিয়া পরস্পর পরস্পরকে নিষ্ক্রিয় করে। ইহা ছাড়াও অ্যাটমের মধ্যে আর এক রকমের অতি পরমাণু থাকে তাহার নাম নিউট্রন।

সব অ্যাটমে এই নিউট্রনের সংখ্যা কিন্তু এক রকম থাকে না। এই যে ইউরেনিয়ামের কথা একটু আগে বলিয়াছি, উহার অ্যাটম তিন রকমের। ইহাদের মধ্যে একটির নাম (U-235) ইউ-২৩৫। ইহার মধ্যে প্রোটন থাকে ৯২ আর ইলেকট্রন থাকে ৯২। সমান সমান পজিটিভ নেগেটিভে কাটাকাটি হইয়া যায়। বাকী থাকে নিউট্রন—ইহার সংখ্যা ১৪৩।

একটি অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণে যে প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হয় তাহার দ্বারা একটি সম্পূর্ণ নগর প্রায় এক মুহূর্তেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারে। এ শক্তি যোগায় নিউট্রন। বিস্ফোরণের প্রধান হাতিয়ারই হইল এই নিউটন। এই নিউট্রনের কাজ কি তাহাই বলি।

আগেই বলিয়াছি প্রতি অ্যাটমের একটি কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস আছে, ইহাকে পিষিয়া গুঁড়াইয়া ফেলিতে পারিলেই বিস্ফোরণ ঘটে। এই গুঁড়াইয়া ফেলার কাজ করে নিউট্রন।

বিজ্ঞানী কলে-কৌশলে একবার একটি নিউট্রন দিয়া একটি অ্যাটমের বিস্ফোরণ ঘটান। একবার বিস্ফোরণ হইলে সে এক অদ্ভুত কাণ্ড আরম্ভ হইয়া যায়। বিস্ফুরিত অ্যাটমের মধ্যকার নিউট্রনগুলো ভীষণবেগে ছুটাছুটি করিতে থাকে। তাহাদের দুই-দশটা গিয়া অন্যান্য অ্যাটমের কেন্দ্রকে পড়ে, ফলে তাহারাও বজ্ররবে বিদীর্ণ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও নিউট্রন মুক্তি পাইয়া আরও অধিকতর বেগে প্রলয় ঘটাইতে থাকে। বাজীর দোকানে একবার আগুন লাগিলে যেমন এক কণা বারুদ অবশিষ্ট থাকিতে আগুন কখনো নিভে না, অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণও তেমনি—একবার শুরু হইলে আর রক্ষা নাই।

বাজীর দোকান অনেক পুড়িয়াছে, অনেক নিভিয়াছে। কিন্তু এ আগুন সেই যে হিরোসিমায় জ্বলিয়াছিল এ আজও নিভিতেছে না। কোনোদিন নিভিবে কিনা তাহা বিধাতা বলিতে পারেন, আর পারেন রাজনীতিবিশারদেরা।

---

# গল্প চুরির মামলা

শিবরাম চক্রবর্তী

আমি নাকি কখনো হাওড়া পুলই পার হইনি, শুনে থাকি! যে-আমি নাকি কখনো কলকাতার বাইরে পা দিইনি, সেই আমিই একবার সমুদ্র ডিঙিয়ে জাপানে গেছলাম একথা যদি বলি, তাহলে আমার বন্ধু ভূপর্যটক রামনাথ থেকে সুরু করে কেউই সেকথা বিশ্বাস করবেন না। অবশ্যি, রামনাথবাবু অবিশ্বাস করার জন্যে এখানে বসে নেই, তিনি এখন স্বর্গপর্যটনে গেছেন, আর আমি, যদিও যাব যাব করছি, এই গল্প লেখার পর তাঁর ভয়ে স্বর্গের দিকে পা বাড়াতে সাহসী হব কি না সন্দেহ! জাপানে গিয়ে যে-ধাক্কা আমি খেয়েছি, তাঁর অভিজ্ঞতার সঙ্গে যদি তা না খাপ খায়? যদি তিনি খাপ্পা হন?

কিন্তু সত্যি বলতে, তাঁর সঙ্গে আমার ভূপর্যটনের অভিজ্ঞতা বেশ মিলে যায়। জাপানে যাওয়াটা আমার যত বড়ই ভ্রম হোক্‌না, সেখানে গিয়েই আমি পৃথিবী ভ্রমণের স্বাদ পেয়েছিলাম, পার্থিব সাধ আমার মিটেছিল। তার পরে আর হাওড়া পুলের পারে পা বাড়াবার ইচ্ছেই হয়নি।

না হোক, আমার জাপানী অভিজ্ঞতা তাঁর বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপানো। ভূপর্যটনে বেরুলে কী হয়? কী কী হয়ে থাকে? কপর্দকশূন্য হতে হয়, বাঘ ভাল্লুকের মুখে পড়তে হয়, সময়ে অসময়ে চোর ডাকাতের হাতেও যে না পড়তে হয় তা নয়। প্রাণ হারাতে হারাতে হঠাৎ দেখা যায় যে না, তা হাতেই আছে। প্রাণ হাতে করেই বেড়াচ্ছি। মরতে মরতে বেঁচে যাওয়া। খোয়ার হাত থেকে বাঁচা, বাঁচার জন্যে আবার খোয়ার! এ সবের মিঠেকড়া আস্বাদ আমিও এক-আধটু পেয়েছিলাম বই কি!

অবশ্যি, চোর ডাকাতের হাতে পড়বার সুযোগ আমার হয়নি, বাঘ ভাল্লুকের মোলাকাতও আমি পাইনি, তবে হ্যাঁ, কপর্দকশূন্য আমায় হতে হয়েছিল ঠিকই।

একেবারে কপর্দকশূন্য অবস্থায় আমি জাপানে গিয়ে পড়লাম।

বরাত ভালো, সেখানে এক বিহারী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ব্যবসাসূত্রে তিনি সেখানে ছিলেন। আমার কাছে তিনি বাঙলা শিখতে রাজী হলেন, এবং বিনিময়ে আমায় হিন্দি না শিখিয়ে বরং কিছু বেতন দিতে চাইলেন। আমার হোলো ডবোল লাভ, টাকার সঙ্গে হিন্দিও আসতে লাগলো অমনি। বিল্‌কুল্‌ মুফৎ! টাকাটা পেলাম মুখ্যতঃ, আর হিন্দি শিখলাম তাঁকে বাঙলা শেখাতে গিয়ে, মুখে মুখে।

হিন্দি শিখলাম........মুখে মুখে।

থাকতাম সেই ভদ্রলোকের বাসায়, আর খেতে যেতাম কাছাকাছি এক জাপানী হোটেলে।

এই হোটেলওয়ালা বাঙালীদের দু' চোখে দেখতে পারত না। আগে নাকি কোন্‌ এক বাঙালী তাঁর আকাশ চুরি করে পালিয়েছিল।

আকাশ চুরি? হ্যাঁ, আকাশ চুরি। শুনলে আকাশ থেকে পড়তে হয় বটে, কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয়।

জাপানে আগে নিয়ম ছিল...অবশ্যি সে নিয়ম এখন আর নেই। সেই বাঙালী কীর্তিমানের চৌর্যবৃত্তির পর—চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে তো?—সে কানুন এখন পালটে গেছে।

আগেকার আইনে জাপানে জমির মতো আকাশেরও একটা দাম ধরা হোতো। জমির সঙ্গে তার ওপরকার সমস্ত আকাশটা জমির মালিকের ইজারা নেওয়া থাকত, সেই মালিকানা তিনি জমির সঙ্গে বেচতে পারতেন। কেউ তাঁর কাছে বাড়ি ঘর বানাবার জন্যে জমি কিনতে এলে তাকে জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থের সঙ্গে উচ্চতাও কিনতে হোতো—জমির জ্যামিতির উপর সেটা উপ্‌রি লাভ। ধরো কেউ চার কাঠা বাই দু'কাঠা প্লটের ওপর একটা একতলা বাড়ি বানাবে—সেটা উঁচু হবে হাত দশেক; তাকে সেই চৌহদ্দির ভেতর আর উচ্চতায় দশ হাতের মধ্যে বাড়িটা শেষ করতে হবে।

জমিওয়ালার এতে ভারী মজা। একতলা মাপের জায়গা একজনকে গছাবার পর দোতলা মাপের আরেকজনকে, তেতলার মাপটা আবার অপর একজনকে। এই ভাবে একই চার কাঠা বাই দু'কাঠাকে সে বারম্বার বেচতে পারে—খদ্দের পরম্পরায়। জমিদারির একেবারে পরাকাষ্ঠা!

● গন্ধ চুরির মামলা
শিবরাম চক্রবর্তী

বাড়িওয়ালাদের বেশ অসুবিধে। মনে করো, তুমি একটি মনের মত একতলা গড়ে নিজের ঘরে আরাম করে বসেছো, কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ আরেকজন এসে তোমার বাড়ির ওপর ভারা বেঁধে দোতলা খাড়া করতে লাগলো। সুরু হয়ে গেল হৈ হল্লা। এলো তাদের মিস্ত্রি মজুর, ইঞ্জিনীয়ার ওভারসীয়ার। ইঁট সুরকি মজুদ হোলো—আরাম করবে কি, তোমার বাড়ির চারপাশে যো রইলো না পা ফেলবার। নড়বার চড়বারই ঠাঁই রইলো না কোথাও; কান-ফাটানো ঠাঁই ঠাঁই সুরু হয়ে গেল। জন-মজুরের কুচকাওয়াজের সঙ্গে ছাদ পেটানোর আওয়াজ। যেতে আসতে তাদের বালির পলস্তারা পড়ছে বাড়ির মাথায় আর খানিকটা তোমার মাথায়। চুনকামের কিছুটা বাড়ির দেয়ালে, কিছুটা তোমার গালে।

এখন সেই বঙ্গজ পাষণ্ডটি করেছিল কি, সেই হোটেলওয়ালার কিছু জমি কিনে একখানা একতলা বানিয়েছিল।

জমিটার দৈর্ঘ্যপ্রস্থ পুরোপুরিই সে কাজে লাগিয়েছিল, এক ইঞ্চিও ছাড়েনি, কেবল উচ্চতার দিকটায় হাত খানেক বাদ রেখেছিল। হোটেলওয়ালা যখন পরের ক্ষেপে বাড়ির ওপর-ভাগটা অপরের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলেন, আর সে লোকটা মিস্ত্রি মজুর ইঁট কাঠ চুন সুরকি নিয়ে এসে বাড়ি তুলতে লাগলো, তখন বাঙালীটি বলল, বাপু, বাড়ি তুলবে তোলো, আপত্তি নেই, কিন্তু উপরের আরো হাত খানেক জমির ওপর আমার স্বত্ব আছে, সেটা ছাড় দিয়ে। আকাশের খানিকটা সে ফাঁক রেখেছিল, সে জানত, সেই ফাঁকার ওপর আর যাই হোক্, ভিৎ গেড়ে ইমারৎ তোলা বাতাসে কেল্লা বানাবার মতই আকাশকুসুম হবে।

সেই ফাঁকে হোটেলওয়ালাকে সে এক হাত দেখালো বটে!

আকাশের ফাঁকিতে পড়ে হোটেলওয়ালা কিন্তু সহজে ছাড়লো না। এ নিয়ে হাঙ্গামা হয়েছিল বেশ, মামলাও বেধেছিল, তবে শেষ পর্যন্ত সেই বাঙালীটিরই জিত হোলো, দোতলা আর উঠলো না। আমার কেনা জমি যদি আমি ফেলে রাখি, কার কী! আর, আকাশের জমিন্ নেহাৎ শূন্য হলেও ন্যায্য মূল্য দিয়েই কেনা যখন!

সেই থেকে সেই হোটেলওয়ালা বাঙালীদের ওপর হাড়ে চটা। আমি খেতে যেতাম তারই হোটেলে।

হোটেলটা বেশ নামকরা। ফার্স্ট ক্লাস চীনে রাঁধুনীরা রাঁধতো সেখানে। নামজাদা হোটেলটার দাম ছিলো জেয়াদা। খানাপিনার দাম বেজায়। বড়লোকরাই সাধারণতঃ সেখানে খেতে যায়।

আমার কপর্দকশূন্যতার কথা বিবেচনা করে বেশি কিছু খাবার সাহস আমার ছিল না। আমি কেবল এক প্লেট ভাত নিতাম। আর বসতাম রান্নাঘরের ধার ঘেঁষে। ধারে পাওয়া যেত দেদার জিনিস।

রান্নাঘরের থেকে নানা রকমের খুশবু আসত। কত কি উপাদেয় রান্নার সৌরভ আসতো যে! ফ্রায়েড্ রাইস, মুর্গির কারি, চপ্ সুয়ে, আরো কতো কি-র। কি করে তার ফিরিস্তি দেব, চোখেও দেখিনি, চেখেও দেখা হয়নি কখনো। কেবল মাছ ভাজার গন্ধ থেকেই চেনা জিনিসের মালুম আসত, আঁচ পেতাম ফ্রায়েড্ ফিশের।

- গন্ধ চুরির মামলা
  শিবরাম চক্রবর্তী

না আঁচানো পর্যন্ত গন্ধগুলিই চাখতাম। ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে, জলের সঙ্গে মিকচার্ করে, খেতাম বসে তারিয়ে তারিয়ে। গন্ধের দৌলতে কোথা দিয়ে যে উড়ে যেতো প্লেটকে প্লেট!

দিনের পর দিন এই রকম। মাগ্‌না খেতাম নানান গন্ধ—নগ্‌দা ভাতের সঙ্গে। রান্নাঘরের ধারে।

যে বয়টা পরিবেশন করত সে একদিন কৌতূহলবশে আমায় শুধালো—খালি খালি ভাত খেয়ে তোমার পেট ভরে?

ভরবে না? ভাত খেলে পেট কখনো খালি থাকে নাকি?

না না, তা বলছি না। শুধু শুধু ভাত খেতে ভালো লাগে তোমার?

শুধু শুধু কেন? ভালো মন্দর টাক্‌না দিয়েই খাচ্ছি তো। ভালো ভালো খাবারের খোশবাই আসচে তোমাদের রান্নাঘরের থেকে! খোশবাই মিশিয়ে আমি খাই। অ্যাণ্ড আই হ্যাভ নো নীড্ টু বাই দেম্—দীজ্ খোশবাইজ্!

তা বটে! কিন্তু—

কিন্তু আবার কিসের! স্বাদের পনের আনাই তো গন্ধ আসলে। লোকে ঝোল মেখে মাছ মাংসের টুকরো দিয়ে ভাত তোলে, আমি গন্ধ মেখে খাই। আর গন্ধের জন্যে তো কোনো দাম লাগে না। আর বলব কি ভাই, তোমাদের গন্ধ এইসা তোফা! তার এমন খাসা তার্! আর গন্ধও এনতার! এবং বিলকুল ফ্রি অব্ চার্জ।

—আই হ্যাভ নো নীড্ টু বাই দেম্.....

তা বটে! তবুও—

জানো তো, আমার ট্যাঁক হিরোশিমার মাঠ—আমার পকেটের সীমান্তে যে জিরো, তা অকপটে ওকে জানিয়ে দিই—আমরা বিশ্বপর্যটকরা বিলকুল কপর্দকশূন্য। তাছাড়া, একটু গন্ধ পেলেই নাচব এটা কিছু নতুন নয় আমাদের। আমাদের হনুমানও একবার—হনুমান? ওয়ান্ অব আওয়ার গড্স উইথ্ এ বিগ্ টেইল্—গন্ধেগন্ধে গোটা গন্ধমাদনই নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন।

● গন্ধ চুরির মামলা
শিবরাম চক্রবর্ত্তী

তাই নাকি! বলে পরিবেশকটি অবাক হয়ে চলে গেল।

কিন্তু কথাটা কি করে গিয়ে কানে উঠলো হোটেলওয়ালার। সে তো রেগে কাঁই! তার পরদিনই আমাকে পাকড়ে তার সে কী চোটপাট! এতদিন ধরে যে বিনে পয়সায় আমি তার এত গন্ধ খেয়েছি তার দাম দিতে হবে আমায়!

তোমার গন্ধের দাম এই টাকার আওয়াজ দিয়ে শোধ হয়ে গেল। [পৃঃ ২৮১

আমাকে বেচলেও সে দাম উঠবে না—সাফ্ তাকে বলে দিলাম।

- গন্ধ চুরির মামলা
  শিবরাম চক্রবর্ত্তী

মামলা উঠলো আদালতে। তিন মাস ধরে তার যতো খাবারের গন্ধ আমি পয়সা না দিয়ে খেয়েছি,—তার খেসারতের দাবী।

অভিযোগ তার মিথ্যে নয়। মেনে নিতে হোলো আমায়।

দু' পক্ষের কথা শুনে হাকিম হাঁকলেন—ফরিয়াদীর যুক্তি টেঁকসই বটে! গন্ধ তার রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেছে বলেই যে তার ওপর তার অধিকার চলে গেছে তা কখনো হতে পারে না। খাদ্যের মত তার গন্ধের সর্বস্বত্বও মালিক কর্তৃক সংরক্ষিত। মনে করো, যদি কারো কুকুর শেকল ছিঁড়ে রাস্তা দিয়ে ছুট মারে তাহলে কি তার ওপর থেকে তার দাবীদাওয়া চলে যায়?

হাকিমের রায় শুনে হোটেলওয়ালা তো বেজায় খুসি।

'অতএব তার পাঁচশো টাকার খেসারতের দাবী পুরোপুরিই আমি মঞ্জুর করলাম।' বলে হাকিম আমার প্রতি কটাক্ষ করলেন, 'কতো টাকা আছে তোমার কাছে?'

'কতো নয়, কয়েক। কয়েক টাকা মাত্র আছে হুজুর।'

'টাকাগুলো বাজে?'

'বাজে কি আসল তা আমি বলতে পারব না। আমাদের ভারতীয় টাকা তো নয়। আপনাদের জাপানী ইয়েন।'

'মানে আমি বলছিলাম কি, টাকাগুলো বাজে তো?' বললেন হাকিম ঃ 'তাহলে টাকাগুলোকে ঠন ঠন করে বাজাও। পাঁচশোবার। গুণে গুণে পাঁচশো বার, তার বেশি নয় কিন্তু।'

এ পকেট ও পকেট হাতড়ে কুল্লে একটি মোটে টাকা বেরুলো। হাকিম বললেন—ওতেই হবে। বাজিয়ে যাও। পাঁচশোবার।

কথায় বলে, মানি টক্‌স্‌। টাকায় কথা বলে। আমি টকাৎ করে টাকাটা ট্যাঁক থেকে বার করেই না বাজাতে শুরু করলাম। ঠন্ ঠন্ ঠনাঠ্ঠন...

সেই একটি টাকাই! কিন্তু সেই একই অনেক। একাই এক শ। এক শ নয়, পাঁচ শো!

পাঁচশো বার বাজানো হলে হাকিম বললেন—বাস্, আর না। বলে তিনি হোটেলওলার দিকে ফিরলেন—তোমার গন্ধের দাম এই টাকার আওয়াজ দিয়ে শোধ হয়ে গেল। আদালতের চূড়ান্ত রায় হোলো এই। তোমার পুরো খেসারৎ তুমি পেয়ে গেলে। এখন খুসি হয়ে বাড়ি যাও।

আমিও খুসি হয়ে বাড়ি ফিরলাম। নাকে করে যা নিয়েছিলাম—ওর কান ধরে'—না না, ওর কানে ধরে দিলাম।

গন্ধ চুরির খেসারৎ এইভাবে ঠনৎকারে শুধে জাপানের মাটির মায়া কাটালাম। ফিরে এলাম আমার কলকাতায়। আমার ঠন্ঠনেয়।

আমার নাকে খৎ! আমার ভূপর্যটনের সেই প্রথম আর সেই শেষ। তারপর আর হাওড়া পুলের ওপার হইনি।

আবার নাকাল হতে যায়?

---

# ॥ দর্পহরণ ॥

শ্রীসজনীকান্ত দাস

দীনু পণ্ডিতের পাঠশালা—
মহানন্দা নদীপাড়ে শহরের একধারে,
তবু শহর করে আলা।
"বৃদ্ধ পণ্ডিতের কাছে জ্ঞানার্জন-মন্ত্র আছে,
তাঁর বশীভূতা সরস্বতী"—
রটে বার্তা দেশে দেশে দলে দলে ছাত্র এসে
পণ্ডিতমশায়ে করে নতি ;
স্মরিয়া শ্রীভগবানে সযতনে শিক্ষাদানে
মানুষ করেন দীন-গুরু।
একদল যায় চলে নিয়ে নব ছাত্রদলে
বৃদ্ধের সাধনা পুনঃ শুরু।
দীনু পণ্ডিতের পাঠশালা
বর্ষে বর্ষে এই ভাবে বেড়ে যায় খ্যাতি লাভে,
গেঁথে যায় কৃতীদের মালা॥

সে বছর সুদর্শন দাস
সব কটি পরীক্ষায় প্রায় পুরা 'মার্ক' পায়
বৃত্তি পাবে—চিত্তে মহোল্লাস।
গর্ব স্ফীত তার প্রাণ ধরা দেখে সরাখান,
দেখে মুগ্ধ হলেন পণ্ডিত।
দর্পহারী ভগবানে বৃদ্ধ যে সদাই মানে,
চাহিলেন করিতে বিহিত।

* * *

একদা বিকাল বেলা করিতে করিতে খেলা
সতীনাথ পড়ে নদীজলে;
সাঁতার জানে না, হায়, ওই বুঝি ডুবে যায়—
দীনবন্ধু ডেকে ছাত্রদলে
কহে, "শুন বৎসগণ, সত্য পরীক্ষার ক্ষণ
এল, যাও বিপন্নে বাঁচাও।
সুদর্শন, শ্রেষ্ঠ তুমি নামো জলে, ত্যজ ভূমি—
দেখি আজ নম্বর কি পাও!"
হেঁট মুখে সুদর্শন দাস
বলে, "পারিব না স্যর্, বহিতে অন্যের ভার
মরিতে নাহিক অভিলাষ॥"

কপট ক্রোধেতে গুরু কন,
"এত শিক্ষা দিনু তোরে সে কি হায়, শুধু ওরে,
নিজভার করিতে বহন?

● দর্পহরণ
শ্রীসজনীকান্ত দাস

পরার্থে না দিলে প্রাণ বৃথা জ্ঞান-অভিমান,
থাকো পুঁথিগত বিদ্যা লয়ে ।
বাঁচাতে নিমজ্জমানে শক্তি আছে কার প্রাণে
কর ত্বরা, কাল যায় বয়ে ।”
ডানপিটে হরিদাস তীরে ফেলি গাত্রবাস,
ঝাঁপ দিয়ে পড়ে স্রোতোজলে
সতীনাথে কেশে ধরি নিয়ে এল তীরোপরি—
সবে তারে ‘ধন্য ধন্য’ বলে ।
প্রশংসা-অধীর গুরু কন
হরিদাসে বুকে টানি, “কঠোর পরীক্ষা দানি’
তুমি যশ করিলে অর্জন ॥”

সুদর্শন বসি অধোমুখে
পাঠশালে একধারে কাঁদিছে অঝোর ধারে
পরদিন ঘৃণা লজ্জা দুখে ।
গুরু তারে কাছে ডাকি কহিলেন, “জানো না কি
দর্পহারী শ্রীমধুসূদন—
নিজে ভক্তাধীন বটে; যদি অহঙ্কার ঘটে
ভক্তজনে করেন লাঞ্ছন ।
কৃষ্ণা কৃষ্ণগতপ্রাণ হল তার অভিমান—
শোন কহি প্রাচীন কাহিনী ঃ
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তার ভাঙিলেন অহঙ্কার,
হৃতগর্ব দ্রুপদ-নন্দিনী ।
ত্যজ শোক সুদর্শন, লভ শিক্ষা পুরাতন,
যাহারা উদ্ধত আত্মপর,

● দর্পহরণ
শ্রীসজনীকান্ত দাস

তাহাদের অপমান বিধাতারই সে বিধান—
শোন, কি ঘটিল তার পর।
সুদর্শন শোনে অধোমুখে ঃ
বনপর্বে কাশীদাস করিলেন সুপ্রকাশ
সে বৃত্তান্ত কহি সকৌতুকে॥

অজ্ঞাতবাসের ঠিক আগে—
পাণ্ডবেরা কাম্যবনে অনুগামী দ্বিজগণে
বিদায় করিয়া অনুরাগে
এল কাম্য সরোবর সঙ্গী নিজে গদাধর—
কহেন, 'এ সর্বতীর্থসার—
করিলে তর্পণ-স্নান পিতৃকুল মুক্তি পান
মৃত্যুও হারায় অধিকার।'
স্নান দান হলে সারা আনন্দেতে আত্মহারা
দ্রৌপদী ভাবেন মনে মনে,
'মোর তুল্য সুখী কেবা, মুনিজনে করি সেবা,
বাঁধিয়াছি প্রেমে নারায়ণে।
ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠা সতী তাই লভি এই গতি'—
কৃষ্ণা মত্ত মহা-অহঙ্কারে।
অন্তর্যামী হৃষীকেশ মনে জানি পান ক্লেশ,
চিন্তেন শাসিতে দর্পিতারে।
অজ্ঞাতবাসের ঠিক আগে—
পরদিন প্রাতঃকালে সবে দেখে আম্রডালে
অকালের আম এক জাগে॥

● দর্পহরণ
শ্রীসজনীকান্ত দাস

ইষ্টপূজা সবার কামনা,
পুষ্পমাল্য বিরচিয়া কেহ ফলমূল দিয়া
দেবতার করে আরাধনা।
দ্রৌপদী অর্জুন পাশে নিবেদিল কলভাষে,
'অকালের আম দেহ পাড়ি,
ইষ্টেরে এ ফলদানে বড় শান্তি পাব প্রাণে,
গাণ্ডীবী, ব্যবস্থা কর তারি।'
পার্থ দিব্য শর হানি মুহূর্তে দিল আনি,
আম পেয়ে কৃষ্ণা হরষিতা।
শ্রীহরি সুযোগ খুঁজি এলেন সময় বুঝি
পার্থে কন, 'করেছ কি মিতা!
মুনিভোগ্য আম পাড়ি অনর্থ ঘটালে ভারি,
কাল পূর্ণ বুঝি ধনঞ্জয়,
তব মতিচ্ছন্ন হেন নহিলে ঘটিবে কেন
সবংশে মজিবে মনে লয়।'
ইহা শুনি যুধিষ্ঠির চিত্ত তার নহে স্থির,
ব্যগ্র হয়ে কহে নারায়ণে,
'তুমি যদি পাও ভয়, পাণ্ডবেরা কোথা রয়,
রক্ষা কর তব ভক্তজনে।
কোন্ মুনি, কার ফল হল এ অনর্থ-মূল,
কুড়াব কাহার অভিশাপ,
তুমি কহ বিস্তারিয়া বাঁচাও সুযুক্তি দিয়া
কিসে হব মুক্ত এই পাপ।
প্রায়শ্চিত্ত করি যে কামনা

● দর্পহরণ
শ্রীসজনীকান্ত দাস

তুমি বুদ্ধি দাও হরি, যেন না সকালে মরি,
বল কার করিব ভজনা ॥'

কপট-আতঙ্কে কৃষ্ণ কন,
'মহামুনি সন্দীপন, তাঁরি এই কাম্যবন
ভয়ে তাঁর কাঁপে ত্রিভুবন।
তপস্যা-প্রভাবে তাঁর এই বন তীর্থসার,
তাঁরি পুণ্যে হ'ল পুণ্যময়—
প্রত্যূষে গহনে পশি কঠোর তপেতে বসি,
ফেরে মুনি সন্ধ্যার সময়।
কাটে দিন অনশনে; এদিকে এ আম্রবনে
প্রত্যহ একটি ধরে ফল,
সারা দিন বেড়ে থাকে ঠিক সন্ধ্যাকালে পাকে,
মুনির অপূর্ব তপোবল!
দিনান্তে তপস্যা-শেষে পারণ করেন এসে
সেই মাত্র আম মুনিবর।
না পাইলে ফল, জানি, ব্রহ্ম-অভিশাপ হানি
আনে বা বিপদ ঘোরতর।'

যুধিষ্ঠির করজোড়ে একান্ত মিনতি ক'রে
শ্রীকৃষ্ণেরে কহিল বচন—
'তুমি রক্ষা কর প্রভু, তোমা ছাড়া মোরা কভু
লই নাই কাহারও শরণ।'
কপট-আতঙ্কে কৃষ্ণ কন,
'এক পথ আছে বটে, তরিবারে এ সঙ্কটে
শুন তাহা করি নিবেদন ॥

● দর্পহরণ
শ্রীসজনীকান্ত দাস

আম্র যদি লাগে যথাস্থানে
মুনি না জানিতে পারে বিপদ কাটিয়া যাবে
সকলে বাঁচিবে মানে মানে।
সুকঠিন সেই কাজ তাই ভয়, কেবা আজ
এই ঘোর সঙ্কটে নিবারে।'
যুধিষ্ঠির সকাতরে কহিলেন পীতাম্বরে,
'তোমার অসাধ্য কি সংসারে!
মৃতে পার বাঁচাইতে কাটা আম জোড়া দিতে
ইচ্ছা মাত্র তোমাতে সম্ভবে।'
ক্ষণেক নীরব থাকি সবারে একান্তে ডাকি
ধীরভাবে কহেন কেশব,
'এক আছে প্রতীকার এ বিপদে হতে পার,
পঞ্চভ্রাতা এবং দ্রৌপদী
অকপটে নিবেদিবে মনে বাঞ্ছা যা উদিবে
সত্য যাহা সবে কহ যদি
দৈবের নির্দেশ আছে আম সে লাগিবে গাছে
তোমরাও হইবে নির্ভয়।'
হৃষ্ট যুধিষ্ঠির কহে 'এ কিছু কঠিন নহে,
জনার্দন, হোক তব জয়।
আম্রেরে তুলিতে যথাস্থানে
এস মোরা একে একে কিছু নাহি রেখে ঢেকে
বলি যার যাহা আছে প্রাণে।।'

পরে পরে কহে পাঁচ ভাই,
প্রকাশ্যে সবার কাছে মনে যাহা উদিয়াছে
কৌতুকে শ্রীহরি শোনে তাই।

● দর্পহরণ
শ্রীসজনীকান্ত দাস

ধর্মপুত্র কহে আগে, 'সদা মোর মনে জাগে
যাগ-যজ্ঞে তুষি দেবদ্বিজে।'
বলিতে বলিতে ফল ওঠে ত্যজি ভূমিতল
দেখিতে আশ্চর্য লাগে কি যে!
ভীম বলে, 'আমি চাই দুঃশাসন-রক্ত খাই
রক্তে বাঁধি পাঞ্চালীর চুল।'
বাড়িল বিস্ময় অতি আম হ'ল ঊর্ধ্বগতি
আরো কিছু, তাতে নাহি ভুল।
কহে তবে অর্জুন, 'গাণ্ডীবে টানিয়া গুণ
দুষ্ট কর্ণে করিব নিপাত
এই ইচ্ছা মোর মনে।' এ বাঞ্ছা সকলে শোনে
আম আরো ওঠে এক হাত।
নকুলের মন-সাধ মিটিলে গৃহবিবাদ
ধর্মরাজ্যে হবে যুবরাজ;
পরে সহদেব কয়, 'এ বাসনা মোর হয়
চামর ঢুলাব সভামাঝে।'
বোঁটা ছোঁয়-ছোঁয় আম খুশি দেখে পরিণাম
বিপন্ন পাণ্ডব পঞ্চজন।
মনেতে কৌতুক মানি হেসে কন চক্রপাণি,
'এবে শুনি দ্রৌপদীর মন।'
পাঞ্চালী কহেন শেষে, 'ধরিয়া আমার কেশে
অপমান করিল যাহারা
তাহারা কাঁদিবে দুখে এই আশা পুষি বুকে
বেঁচে আছি পাগলের পারা।'
শুনিতে বিচিত্র অতি আম হ'ল অধোগতি
ভীমার্জুন ক্রোধে কম্পমান,

● দর্পহরণ
শ্রীসজনীকান্ত দাস

অতি ভীত যুধিষ্ঠির কহে, 'এ কী যদুবীর !'
কৃষ্ণ কহে, 'কর অবধান
দ্রৌপদীর মিথ্যাভাষে ঊর্ধ্বফল নেমে আসে
মনে এক মুখে আর তার ।'
কোপে ভীম কয়, 'নারী, হইয়া কপটাচারী
ডাকিয়া আনিবি সর্বনাশ ?
এখনো সময় আছে 'আম না লাগিলে গাছে
বুঝিব মৃত্যুই তুই চাস ।'
কৃষ্ণ ভীমে বাধা দিয়ে কহেন কৃষ্ণারে গিয়ে,
'এখনও কহ সত্য কথা ।
কেবল তোমার লাগি হবে মৃত্যুদণ্ডভাগী
এই পাঁচজন কি অযথা ?'
যাজ্ঞসেনী কিছুক্ষণ রহিয়া অধোবদন
বলে, 'রাজসূয়-যজ্ঞস্থলে
কর্ণেরে দেখিয়া মনে ভেবেছিনু সঙ্গোপনে
ইনিও কুন্তীর পুত্র হ'লে
হ'ত মোর ছয় পতি । শোন অগতির গতি,
কি বিচিত্র তোমার বিধান
সেদিনের কথা কেন অন্তরে জাগিল হেন
তুমি জানো তাহার সন্ধান ।'
মর্মান্তিক কথা শুনে পার্থ হাত দিল তূণে,
ভীম গদা তুলে নেয় হাতে ।
কৃষ্ণ নিবারিল ত্বরা বচনেতে মধুভরা
প্রাচীন বৃত্তান্ত কহি' সাথে ।
বলে, 'কৃষ্ণা পতিব্রতা অতি সত্য এই কথা,
শুধু দর্প হয়েছিল তার;

● দর্পহরণ
শ্রীসজনীকান্ত দাস

মানুষ সে দৈবাধীন আজ পরীক্ষার দিন
এল তার—শোন সমাচার ।"
শ্রীকৃষ্ণ বচনে পাঁচ ভাই,
বৃক্ষশাখ দেখে আম জানায় তাঁরে প্রণাম
শান্ত হয়ে বসিল সবাই ॥"
আসিলেন গুরু মহাশয় ।
তত্ত্ব শুনি গল্পচ্ছলে ভাসিয়া চোখের জলে
বুদ্ধিমান সুদর্শন কয়—
"মোরে ক্ষমা কর গুরু, নূতন জীবন শুরু
আজ হতে হইল আমার ।
বিনীত যে নয় তার বিফল বিদ্যার ভার
এই শিক্ষা লভিলাম সার ।
পরার্থে না দিলে প্রাণ বৃথা বিদ্যা-অভিমান
ধিক্কৃত যে আত্মসুখীজন ।
ক্ষমা কর অপরাধ কর গুরু আশীর্বাদ,
সত্যে যেন নিত্য রয় মন ।"
আনন্দিত গুরু মহাশয়
বলেন, "তোমরা সবে লক্ষ্যভ্রষ্ট নাহি হবে,
লক্ষ্য এক সত্য সনাতন ॥"

দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্।
মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষে।

—শুক্ল যজুর্ব্বেদ

## মনি ও মুক্তা

হে ভগবান, আমাকে এমন দৃঢ় কর যাতে সকল প্রাণী আমাকে মিত্রভাবে দেখে, আমিও যেন সকল প্রাণীকে মিত্রভাবে দেখি।

# খামখেয়ালী নবাব

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাঁর মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে খুব যুদ্ধ-বিগ্রহ করেন। তাঁর মামাতো ভাই ছিলেন পূর্ণিয়ার নবাব, নাম—সকৎজঙ্গ। এঁরা ভাই ভাই হলে কি হয়, খুব ঝগড়া বিবাদ ছিল দু'জনে।

সকৎজঙ্গ বসেছিলেন নবাবের সিংহাসনে, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনা যা ছিল, তা এক বোকা-আনাড়ীকেও হার মানাতো। নবাবটি একেবারে নিরক্ষর। কাগজ-পত্রে দস্তখত করা নিয়ে মহা বিভ্রাট বাধতো। ওমরাহ্ কাগজ ধরতেন সামনে, আর বলে-বলে দিতেন, কোন্ অক্ষরটা বসাতে হবে কি ক'রে। এখানে একটা নোক্তা দিন; আর এই রেখাটা একটু বাঁকা হবে, তা না হলে যে ভুল হবে।

দস্তখতের সময় নবাব একদিন বলছেন ওমরাহ্‌কে,—দেখ, তুমি কি আমার ওস্তাদ্ যে আমার নাম লেখা নিয়ে এত মাথা ঘামাও! যাও যাও ও-সব হবে না! দস্তখত করবো, তো নবাবী করবো কখন? এই ব'লে নেশা করতে বসে গেলেন।

কোন কোন সময় বা আবার তাঁর মত বদলে যেতো। ওমরাহ্‌কে আদর করে বলতেন, দেখ, আমায় সত্যি কিছু লেখাপড়া শেখাও না। না শেখালে চলে কখনো! তুমি চুপ করে থাক কেন? বুঝলে, শেখাও আমায়।

সকৎজঙ্গ ছিলেন এই ধরণের খেয়ালী মানুষ। নেশা ক'রে ক'রে তাঁর মাথায় কিছু ছিল না। তিনি বুঝতেন না কিছুই, অথচ দেখাতে চাইতেন যে, সবই তিনি বোঝেন। সিরাজের সঙ্গে যুদ্ধের কথা হচ্ছে, উজীর তাঁকে সুপরামর্শ দিচ্ছেন। তিনি বসে বসে শুনছেন। শুনতে শুনতে হঠাৎ বলে বসলেন,—তোমার কোন পরামর্শ শুনতে চাই না। ও কি একটা যুদ্ধ-রীতি! দেখ, আমি এ পর্যন্ত তিন শ' যুদ্ধে দক্ষতা দেখিয়েছি। আমায় আবার যুদ্ধ শেখাবে কি?

সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে যুদ্ধ বাধলো কেন? সে এক ঘোরালো ব্যাপার। দু'টা পরগণার কর্তৃত্ব নিয়ে

সিরাজ তাঁর এক উজীরের হাতে এক চিঠি পাঠান সকৎজঙ্গের কাছে। চিঠিখানি খুব ভদ্রভাবে লেখা, কিন্তু তাতে রাজনৈতিক চাল ছিল। সকৎজঙ্গ তার বুঝবে কি! তাঁর উজীর তো বুঝতে পেরে বেশ মাথা ঘামিয়ে, এক জবাব তৈরী করলেন, অর্থাৎ তিনি দিন চাইলেন। চিঠি শোনানো হোলো সকৎজঙ্গকে। সকৎজঙ্গ বুঝলেন যে বেশ লেখা হয়েছে চিঠিখানি। বুঝলেন তা, বুঝে তারিফ্ করলেন সভার মাঝে। নবাবের মুখে তারিফ্ শুনে সভাসদ্‌রাও খুব তারিফ্ আরম্ভ করলেন চিঠির। সেই শুনে আবার নবাবের মাথা গেল বিগ্‌ড়ে। রেগে বলে উঠলেন, আরে, ও কি একটা জবাব! কিছুই হয় নি। লেখ জবাব। আমি বলে যাই। লেখ,—আমি তিন জায়গার সনন্দ পেয়েছি দিল্লীর বাদশার কাছ থেকে। সনন্দ অনুযায়ী আমি বঙ্গ বিহার এবং উড়িষ্যা এই তিন জায়গার মালিক। আমিই মালিক—আর কেউই নয়। আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে। তাই বল্‌ছি, আপনি আমার এই চিঠি পেয়েই গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী এক জায়গীর নিয়ে ওখান থেকে চলে যান। যেখানে ইচ্ছা যান, কিন্তু মুর্শিদাবাদের রাজ-ভাণ্ডার থেকে একটি কপর্দ্দকও নেবেন না। আমি ঘোড়ার পাদানিতে পা দিয়ে রইলুম—যুদ্ধের জন্য। কেবল আপনার জবাবের অপেক্ষা।

সত্যিই এরকম ঘটেছিল। তাঁর কতকগুলি নির্বুদ্ধি আমীর-ওমরাহ্‌দের পরামর্শে দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার মালিকানির সনন্দ আনানো হয়। সর্ত এই, এক কোটি টাকা রাজস্ব প্রতি বছর দিতে হবে বাদশাহকে।

এই সনন্দ পেয়ে সকৎজঙ্গের যা অবস্থা হোল, তিনি যেন চন্দ্রলোক থেকে একেবারে চলে গেলেন সূর্যলোকে। এমনি তাঁর আনন্দ। আমীর-ওমরাহ্‌দের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন, কি করে রাজ্য শাসন করা হবে। তারপর শেষে বললেন,—দেখ, আমি এ মুলুকেই থাকবো না। এখানের জল-হাওয়া কি আমার সহ্য হয়! চলে যাব, লাহোর-কাবুল হয়ে একেবারে কান্দাহার আর খোরাসানে। সেইখানেই গিয়ে থাকবো। বুঝলে?

একবার এক ফৌজদার তাঁকে দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন, তাতে লেখা ছিল,—"জগতের একমাত্র আশ্রয়"। এই উপাধিটি তাঁর এত ভাল লাগলো যে, সকল দলিলপত্রে এই উপাধি ব্যবহারের হুকুম দিলেন।

এই রকম নানা আজগুবি চিন্তায় আর নেশার খেয়ালে তাঁর পূর্ণিয়ার রাজত্ব ছারখার হয়ে গেল। যুদ্ধ বাধলো বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে। সিরাজউদ্দৌলার উজীর মিরজাফর এঁকে লোভ দেখিয়ে চিঠি লিখলেন,—আপনি বাংলাদেশ আক্রমণ করুন, আমি আপনাকে সাহায্য করবো। কোন ভাবনা নেই। যুদ্ধে আপনি জিতবেন নিশ্চয়।

যুদ্ধে চললেন নবাব সকৎজঙ্গ বাহাদুর। ঘোরতর নেশা করে টলতে টলতে হাতীর পিঠে উঠতেই পারেন না। মাহুতের কাঁধে ভর করে উঠলেন। তারপর যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর গুলি এসে যখন তাঁর সেই আজগুবি মাথায় লাগলো, তখন তাতে বোধশক্তি কোনরকম কি ছিল? মাথাটা গেল উড়ে, রাজ্য গেল ছারখার হয়ে। খামখেয়ালী নবাবের মাথার সঙ্গে সব গেল।

---

## যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার

এবারের স্বাধীনতা উৎসবের দিন যখন একজন বন্ধুর বাড়ী বেড়াইতে যাই তখন অনুরুদ্ধ হইয়া আমার এই খেলাটি তাহাদ্গিকে দেখাইয়াছিলাম। আমি দুইটি বড় বড় খাম দেখাইলাম, দুইটিই আমার নামে আসিয়াছে—দুইটিতেই একই প্রকার শিরোনামা টাইপ করা আছে—তবে একটিতে ভারতের এবং অপরটিতে পাকিস্থানের ডাক-টিকিট লাগান আছে অর্থাৎ একটি যেন ভারত হইতে পোষ্ট করা হইবে এবং অপরটি পাকিস্থান হইতে। তারপর আমি আমার পকেট হইতে দুইটি ছোট ছোট সিল্কের রুমাল বাহির করিলাম—একটি পাকিস্থানের অপরটি অশোকচক্রলাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ভারতীয় জাতীয় পতাকা। তারপর ভারতীয় পতাকাটি পাকিস্থানের

ডাক-টিকিটযুক্ত খামে প্রবিষ্ট করিলাম এবং পাকিস্থানের পতাকাটি ভারতীয় ডাক-টিকিটযুক্ত খামে রাখিলাম। তারপর "যার যথা স্থান" সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া—'ই-ন্দ্র-জা-ল' কথাটি উচ্চারণ করিয়া যাদুদণ্ড স্পর্শ করাইবামাত্র দেখা গেল যে হেরফের ঘুচিয়া গিয়াছে অর্থাৎ পাকিস্থানের খামে পাকিস্থান পতাকা এবং ভারতীয় খামে ভারতীয় পতাকা চলিয়া গিয়াছে। সকলেই ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। ইচ্ছা করিলে আবার উক্ত খেলাটিকে উল্টাইয়া দেখান যাইতে পারে। সকলেই মনে করিবেন যে দুই সেট রুমাল দিয়া এই খেলাটি দেখান হইতেছে—কিন্তু আসলে তাহা নহে। একটি পাকিস্থানী এবং একটিমাত্র ভারতীয় পতাকা দিয়াই এই খেলাটি দেখান হয়।

খাম দুইটিতেও কোন-প্রকার কৌশল করা নাই—উহা এক প্রকারের দুইটি খাম মাত্র, যাহার ভিতরে সিল্কের জাতীয় পতাকা অনায়াসে রাখা যাইতে পারে। দুইটি খাম লইয়া উহার উপর নাম ঠিকানা সাধারণভাবে টাইপ করিয়া লইতে হইবে এবং ডানদিকের কোণে ডাক-টিকিট লাগাইতে হইবে। এই ডাক-টিকিট লাগাইবার উপরই এই খেলাটি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। যদিও প্রথম খামে একটি পাকিস্থানী ও দ্বিতীয় খামে একটি ভারতীয় ডাক-টিকিট লাগান আছে অর্থাৎ একটি একটি মোট দুইটি ডাক-টিকিট দেখা যাইতেছে, আসলে কিন্তু মোট চারিটি ডাক-টিকিট দিয়া এই খেলা করিতে হয়। ইহাতে একই ধরণের দুইটি ভারতীয় ডাক-টিকিট এবং সেই একই মাপের দুইটি পাকিস্থানের টিকিটের প্রয়োজন

● ইন্দ্রজাল
যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার

হইবে। দ্বিতীয় চিত্রে উহা ভালভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে একটি ভারতীয় ডাক-টিকিট লইয়া উহার মধ্যস্থল ভাঁজ করিতে হইবে, তারপর একটি পাকিস্থানের ডাক-টিকিটকে অনুরূপভাবে মধ্যস্থলে
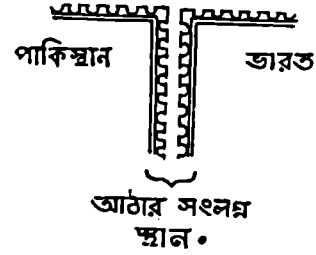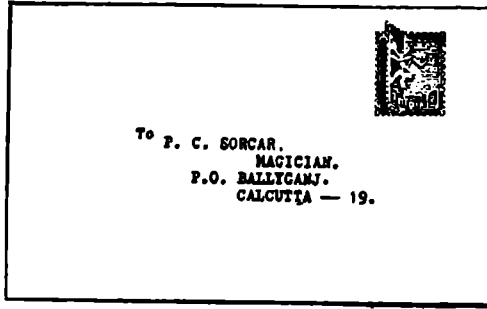
ভাঁজ করিয়া লইয়া এর অর্দ্ধেক অপরটির অর্দ্ধেকের সঙ্গে পিঠাপিঠি করিয়া আঠা দিয়া আটকাইয়া লইতে হইবে। চিত্রে দেখান হইয়াছে A O C পাকিস্থানী ডাক-টিকিট এবং B O C ভারতের ডাক-টিকিট উহার O C অংশ পিঠাপিঠিভাবে আঠা দিয়া লাগান হইয়াছে। এক্ষণে যদি A O B অংশ আঠা দিয়া খামের কোণে লাগান হয় তবে O C উহার উপর লম্বভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে। এক্ষণে যদি O C অংশ O B-র দিকে লওয়া যায় তবে A O C অর্থাৎ পাকিস্থানী ডাক-টিকিট দেখা যাইবে আবার O C যদি O A-র দিকে লওয়া যায় তবে B O C অর্থাৎ ভারতীয় ডাক-টিকিট দেখা যাইবে। চিত্রে উহা তীর চিহ্ন দিয়া ভালভাবে দেখান হইয়াছে—যদি 1-এর দিকে যায় তবে ভারতীয় ডাক-টিকিট দেখা যাইবে এবং যদি 2-র দিকে যায় তবে পাকিস্থানী ডাক-টিকিট দেখা যাইবে। বাকী অংশ অতিশয় সহজ। খেলা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে খামের একটির ডাক-টিকিট ভারতীয় ডাক-টিকিট দেখাইবে এবং এইটির মধ্যে সর্ব্বসমক্ষে পাকিস্থানের পতাকা ভরিয়া খামের মুখ বন্ধ করিতে হইবে, তারপর পাকিস্থানী টিকিটযুক্ত খামের মধ্যে ভারতীয় জাতীয় পতাকা রাখিয়া বন্ধ করিতে হইবে। যাদুকর বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন যে পাকিস্থানী খামে ভারতীয় পতাকা এবং ভারতীয় খামে পাকিস্থানী পতাকা এইরূপ হেরফের ভাবে পতাকা রাখা হইয়াছে। এক্ষণে উভয় খামই উপুড় করিয়া মিশাইয়া দেওয়া হইবে এবং কৌশলে নীচে অঙ্গুলি দিয়া টিকিটের 'ফ্লাপ' দুইটি উল্টাইয়া দিতে হইবে। তবেই খেলা সুসম্পন্ন হইল। এইবার যাদুকর দেখাইবেন ভারতীয় খামে ভারতীয় পতাকা ও পাকিস্থানের খামে পাকিস্থানের পতাকা চলিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ যাহার যথাস্থান সেইখানেই গিয়াছে। একটু কাঁচা মোম দিয়া টিকিটে ফ্লাপ আটকাইয়া রাখিলে

● ইন্দ্রজাল
যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার

উহা আরও সুন্দর হইবে। যাঁহারা দুই দেশের ডাক-টিকিট সংগ্রহ করা অসুবিধাজনক মনে করিবেন তাঁহারা শুধু এক দেশের ডাক-টিকিটই দুই রং-এর যথা নীল ও লাল টিকিট দিয়া এই খেলা দেখাইতে পারেন। নীল টিকিটযুক্ত খামে লাল রুমাল এবং লাল টিকিটযুক্ত খামে নীল রুমাল লইয়া ইহা দেখান চলিবে। লাল-নীল রং-এর ভারতীয় টিকিট সংগ্রহ করা কঠিন নয়—আর দুইটি পাতলা সিল্কের রুমাল কিনিয়া লইলেই হইল। লাল-নীল রং দোয়াতের কালি বা নীল ও আলতা দিয়াও করিয়া লওয়া যাইবে।

## গ্লাস ও যাদুযষ্টির খেলা

গ্লাস ও যাদুযষ্টির খেলাটি খুবই বিস্ময়কর। এই খেলাটি আমি জীবনে বহুবার সাফল্যের সহিত প্রদর্শন করিয়াছি। ইহাতে যাদুকর একটি সাধারণ যাদুযষ্টি বা ম্যাজিকওয়াণ্ড আনিয়া উহা একটি কাঁচের
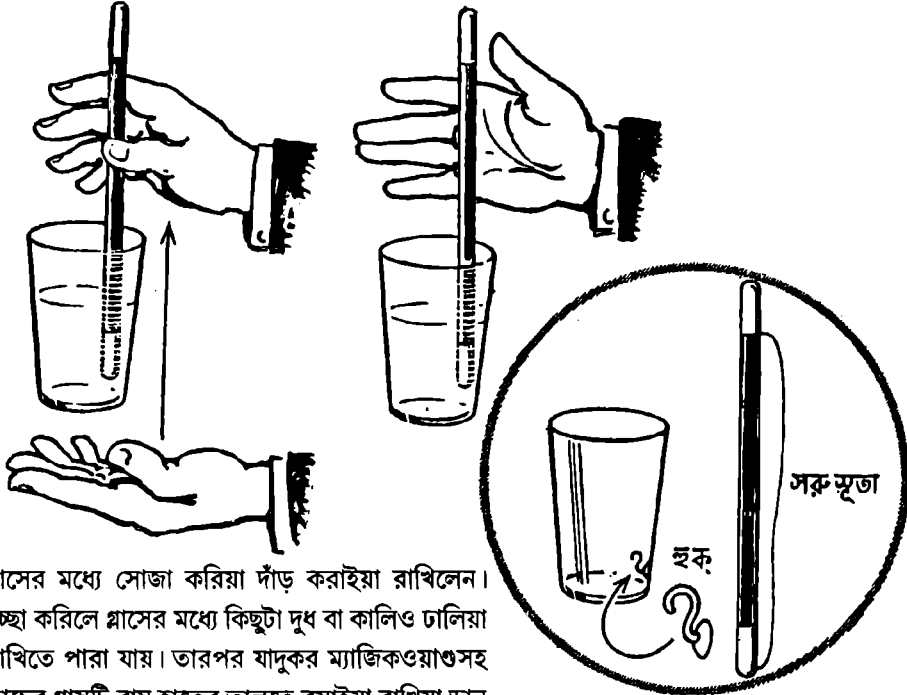
গ্লাসের মধ্যে সোজা করিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিলেন। ইচ্ছা করিলে গ্লাসের মধ্যে কিছুটা দুধ বা কালিও ঢালিয়া রাখিতে পারা যায়। তারপর যাদুকর ম্যাজিকওয়াণ্ডসহ কাঁচের গ্লাসটি বাম হাতের তালুতে বসাইয়া রাখিয়া ডান হাত দিয়া প্রদত্ত চিত্রের মত করিয়া ম্যাজিকওয়াণ্ডটি উপরের দিকে উঠাইবেন। তখন শুধুমাত্র ওয়াণ্ডটি না উঠিয়া উহার সঙ্গে সঙ্গে কাঁচের গ্লাসটিও উপরের দিকে উঠিতে আরম্ভ করিবে। চিত্রে উহা তীর চিহ্ন দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দর্শকগণ কাঁচের গ্লাসটিকে ঐরূপ বিস্ময়কর ভাবে ঝুলিতে দেখিয়া

● ইন্দ্রজাল
যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার

স্বভাবতঃই অবাক হইয়া যাইবেন। কিন্তু এখানেই খেলা শেষ হইল না, যাদুকর পরক্ষণে তাঁহার ডানহাতের অঙ্গুলি খুলিয়া ফেলিলেন এবং হাত মেলিয়া ধরিলেন। কি আশ্চর্য্য! যাদুযষ্টি ও কাঁচের গ্লাস সমস্তই যাদুমন্ত্র প্রভাবে শূন্যে ঝুলিতে থাকিবে। কাঁচের গ্লাস ও মায়াযষ্টির এই খেলা দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া যাইবেন। কিন্তু খেলাটা দেখিতে বা শুনিতে যতই আশ্চর্য্যজনক হউক না কেন উহার মূল কৌশল অতিশয় সহজ। পূর্ব পৃষ্ঠায় চিত্রের গোল অংশের ভিতর উহা ভালভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যাদুদণ্ডের মধ্য দিয়া একটি সরু কাল শক্ত সূতা গোলভাবে ঘুরিয়া আসিয়াছে—চিত্রে উহা ভালভাবে দেখান হইয়াছে। গ্লাসটি কাঁচের নহে উহা সেলুলয়েড বা স্বচ্ছ প্লাষ্টিকের তৈয়ারী। বাজারে ঐরূপ গ্লাস অনেক কিনিতে পাওয়া যায়। অবশ্য খুব পাতলা কাঁচের গ্লাস দিয়াও এই খেলা ঠিকমত ভাবে দেখান যাইতে পারে। কাঁচের গ্লাসের তলায় একটি সরু হুক লাগান আছে। উহা খুব ছোট এবং Durofix বা Bostic রবার সিমেন্ট আঠা দিয়া লাগাইতে হয়। ময়দা জলে ধুইয়া শিরিষের আঠা তৈয়ার করিয়াও ঐটি লাগান যাইতে পারে। 'প্লাষ্টিক' জুড়িবার আঠা দিয়া অনেকে প্লাষ্টিকের হুক ঐভাবে গ্লাসে জুড়িবার পক্ষপাতী। একটু দূর হইতে উহা কখনও নজরে পড়ে না। তদুপরি গ্লাসের মধ্যে দুধ বা রঙ্গিন জল ঢালিয়া দিলে উহা আরও নজরে পড়িবে না। লোক মনে করে যে গ্লাসে তরল পদার্থ ঢালিয়া গ্লাসটিকে অপেক্ষাকৃত ভারী করা হইয়াছে। যাদুকর কাঁচের গ্লাসের মধ্যে যাদুদণ্ড প্রবিষ্ট করিবার সময় উহার নীচের সূতাটি কৌশলে ঐ গ্লাসের 'হুকে' পরাইয়া দেন এবং নিজের হাতের অঙ্গুলিগুলিও চিত্রের ন্যায় যাদুদণ্ডের উপরিভাগে সূতার লুপের (loop) মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। এক্ষণে নীচের হাত ছাড়িলেও ঐ হুকে সূতাদ্বারা ঝুলানভাবে গ্লাস ঝুলিতেই থাকিবে, আবার যাদুকরের হাত সূতায় লুপের (loop) মধ্য দিয়া গিয়াছে কাজেই আঙ্গুল ফাঁক করিলেও গ্লাস ঝুলিতেই থাকিবে এবং যাদুদণ্ডও ঝুলিতে থাকিবে। দর্শকগণ সকলেই ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া যাইবেন।

## মনঃ সমীক্ষণের খেলা

আমি এই খেলাটি বন্ধুবান্ধব মহলে বহুবার দেখাইয়া সকলকে অবাক করিয়া দিয়াছি। আমি প্রথমতঃ ১৬টি সাদা পোষ্টকার্ড আনিয়া দর্শকদের নিকটে দেই এবং ঐ সমস্ত কার্ডে শুধু কতকগুলি জ্যামিতিক চিহ্ন আঁকা আছে—যেরূপ পাশের চিত্রে দেখান হইয়াছে। চারিটি কার্ডে প্রথম চিত্রের ন্যায় ত্রিভুজ ও স্বস্তিকা চিহ্ন আছে। দ্বিতীয় চারিটিতে দুইটি বড় বৃত্ত ও একটি বড় বিন্দু, তৃতীয় চারিটিতে তারকা চিহ্ন ও বিয়োগ চিহ্ন, শেষ চারিটিতে একটি বিশেষ
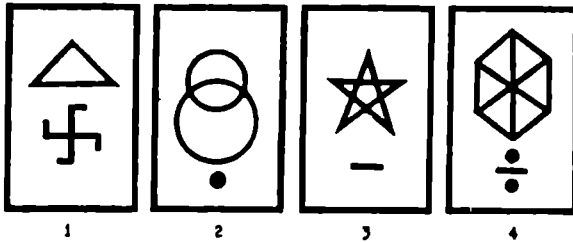
● ইন্দ্রজাল
যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার

ষড়্‌ভুজ ও ভাগ চিহ্ন অঙ্কিত আছে। এই কার্ডগুলি একটি টুপীর মধ্যে ফেলিয়া উহাকে ঝাঁকাইয়া ঝাঁকাইয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইল। তারপর দর্শকদের মধ্যে একজন ঐগুলি হইতে যে কোনও একটি কার্ড বাছিয়া লইয়া সকলকে দেখাইয়া একটি খামের মধ্যে ভর্ত্তি করিয়া কাঁচের গ্লাসের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। আমার সহকারী দেওয়ালের ওপারে পেছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহার এঘরে কাঁচের গ্লাসে কোন্ জ্যামিতিক চিহ্ন খামের মধ্যে ভর্ত্তি করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা জানিবার মোটেই উপায় নাই। আমি একটি সাদা কাগজের প্যাড, লাল-নীল পেন্সিল তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলাম, সহকারী

তৎক্ষণাৎ মনঃ সমীক্ষণের সাহায্যে ঐ জ্যামিতিক চিহ্নের অনুরূপ প্রতিকৃতি এ দিকে লিখিয়া পাঠাইলেন। এতদ্দর্শনে সকলেই অবাক হইয়া যাইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু খেলাটি দেখিতে যত আশ্চর্য্যজনকই হউক না কেন উহার মূল-কৌশল খুবই সহজ। সহকারী মনঃ সমীক্ষণের কিছুই জানে না—আমাকেই কৌশলে

● ইন্দ্রজাল
যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার

সমস্ত কথা কোনও গোপন উপায়ে তাহাকে জানাইয়া দিতে হয়। যদি কোনও ভাবে তাহাকে ১, ২, ৩, ৪ এই চারিটি সংখ্যার যে কোনও একটি জানাইয়া দেওয়া যায় তবেই সে অনায়াসে ঐ জ্যামিতিক চিত্রটি আঁকিয়া দিতে পারিবে, কাজেই তাহাকে যে কোনও সুন্দর উপায়ে এই ১, ২, ৩, ৪ এই চারি হইতে মনোনীত সংখ্যা জানাইতেই হইবে। আমি এজন্য একটি খুবই সহজ অথচ সুন্দর সঙ্কেতের
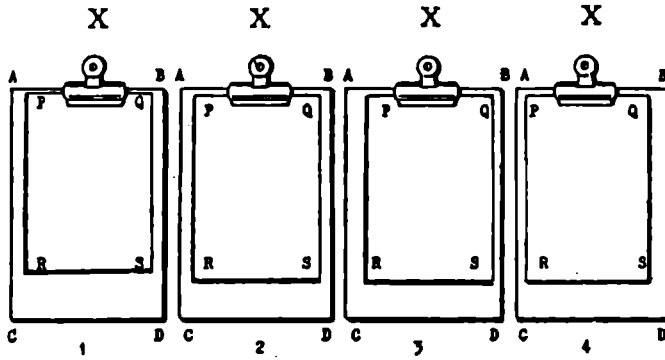
সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকি। পাশের চিত্র দিয়া উহা ভালভাবে বুঝান যাইতেছে। দর্শকগণ যখন ঐ ১৬টি কার্ড হইতে যে কোনও একটি বাছিয়া লইয়া সকলকে দেখান আমিও তখন দেখিয়া লই যে কোন্ নম্বর কার্ড লওয়া হইয়াছে। তারপর উহা জানিয়া লইয়া যখন আমি কাগজের প্যাড ও লাল-নীল পেন্সিল আমার সহকারীর নিকট পাঠাইয়া দিই—সেই প্যাড দেওয়ার কায়দার উপর নম্বর জানাইবার কৌশল নির্ভর করে। পাশের চিত্র ভালভাবে লক্ষ্য করিলে এই খেলার মূল-কৌশল সহজে বুঝা যাইবে। ABDC একটি চতুষ্কোণ বোর্ড এবং উহাতে X একটি লোহার "ক্লিপ" (Clip) লাগান আছে। PQSR চতুষ্কোণ কাগজের প্যাড। এই PQSR প্যাডটি ABDC বোর্ডের সহিত সংলগ্ন করিবার কৌশলের উপরই এই খেলা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। চিত্রে দেখান হইয়াছে ABDC বোর্ডের ঠিক মধ্যস্থলে যদি প্যাডটি থাকে, যদি AB এবং PQ লাইন সমান একসঙ্গে ধার ঘেঁসিয়া থাকে তবে ১ নম্বর। ঠিক ঐ ভাবেই অথচ প্যাডটি যদি একটু নীচে থাকে তবে ২ নম্বর, যদি প্যাডটি একটু ডানদিকে ঘেঁসিয়া থাকে অর্থাৎ যদি বাম দিকে বোর্ডের খালি অংশ অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে তবে ৩ নম্বর এবং ঐভাবে বোর্ডের ডান দিকে বেশী খালি জায়গা থাকিলে ৪ নম্বর কার্ড গৃহীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। খেলাটি আপাতদৃষ্টিতে কঠিন মনে হইলেও মাত্র কয়েকবার অভ্যাস করিলেই ইহা অনায়াসে আয়ত্ত করা যাইবে। যাদুকর ও সহকারীর মধ্যে কয়েকবার ভাল করিয়া 'রিহার্স্যাল' দিয়া লইলেই এই খেলা সহজে দেখান যায়।

---

# স্বপ্ন? না, সত্য?

শ্রীনীলরতন দাশ

রাজা জয়মল পরমভক্ত, ধার্ম্মিক, ন্যায়বান্,
তাঁর সুশাসনে শান্তি ও সুখ রাজ্যে বিরাজমান ।
মন্দিরে তাঁর গৃহদেবতার বিগ্রহ মনোহর,
অষ্টধাতুর গঠিত মূর্ত্তি প্রভু শ্যামসুন্দর ।
ললাটে বিরাজে অলকাতিলকা, শিখিপাখা শোভে মাথে
চরণযুগলে সোনার নূপুর, মোহন বাঁশরী হাতে ।
দেবতার শ্যামশোভায় রাজার মুগ্ধ হৃদয়মন,
সহস্র রাজকার্য্যের মাঝে তাঁরই ধ্যান অনুখন !

প্রত্যূষে উঠি' স্নান সমাপন করি' পবিত্র জলে,
মন্দিরে রাজা প্রাণের দেবতা পূজেন পুষ্পদলে ।

চন্দনে তাঁরে চর্চ্চিত করি' সারা মনপ্রাণ ঢালি'
ঘন্টা নিনাদে আরতি করেন পঞ্চপ্রদীপ জ্বালি'।
তন্ময় হ'য়ে দেবতার ধ্যানে বসেন অতঃপর,—
লুপ্ত তখন বহির্জগৎ, শ্যামময় অন্তর।
সারাটি সকাল এই ভাবে কাটে প্রতিদিন বারো মাস,
তবুও রাজার মনে হয় যেন মিটে না প্রাণের আশ!

প্রতিবেশী এক রাজার দৃষ্টি ছিল এ রাজ্য 'পরে,
জয় ক'রে নিতে সুযোগ খুঁজেছে বহু বৎসর ধ'রে।
একদিন আসি' সংবাদ দিল সে রাজার কিঙ্কর,—
"গুপ্ত খবর আনিয়াছে প্রভু, অধম গুপ্তচর।
রাজা জয়মল মন্দির মাঝে রুদ্ধ করিয়া দ্বার
ঊষাকাল থেকে সারাটি সকাল ধ্যান করে দেবতার।
রাজ্য অথবা রাজত্ব তা'র যায় যদি রসাতলে,
তবুও তাহার ভাঙেনা সে ধ্যান বাহিরের কোলাহলে!"

একদা ঊষায় পূর্ব্বগগন রক্ত-রঙীন যবে,
রাজা জয়মল মন্দিরে পূজা-আসনে বসেন সবে।
হেনকালে তাঁর দুর্গ-দুয়ারে শত্রুরা দেয় হানা,
রাজ-সেনানীরা মন্দিরে ধায়, মানে না কাহারো মানা।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে যুদ্ধে যাবার অনুমতি তারা চায়,
দেবার্চ্চনায় তন্ময় রাজা, কে দিবে আদেশ হায়!
রাজমাতা আসি' দেবালয়দ্বারে করিলেন করাঘাত,
কহিলেন, "বাছা, দ্বার খোলো ত্বরা, রাজ্যে বিপদ্‌পাত।"

● স্বপ্ন? না, সত্য?
শ্রীনীলরতন দাশ

রাজমহিষীর কঙ্কণধ্বনি বাজিল দেউল-দ্বারে,
সজল-নেত্রে প্রার্থনা তিনি করিলেন বারে বারে।
মাতার কাতর আহ্বান আর রানীর অশ্রুধারা
আত্মভোলা সে পূজারীর প্রাণে জাগালো না কোন সাড়া।
সেনাপতিগণ রহিল দাঁড়ায়ে অধীর প্রতীক্ষায়,—
শত্রু-সেনার রণ-কোলাহল ক্রমশঃ থামিয়া যায়!

যথারীতি পূজা করি' সমাপন বাহিরে আসেন রাজা,
ভালে চন্দন, কণ্ঠে প্রসাদী পুষ্পমাল্য তাজা।
হেরিয়া রাজারে সৈন্যেরা করে হর্ষে জয়ধ্বনি,
অন্তরে জাগে সাহস, হস্তে অস্ত্রের ঝন্-ঝনি।
রাজা কহিলেন, "আমার অশ্ব ত্বরায় আনিতে বলো,
সৈনিকগণ! প্রস্তুত হ'য়ে যুদ্ধে এখনি চলো।"

সহসা সকলে হ্রেষারব শুনি সেই দিকে যবে চায়,
বিস্ময়ে দেখে রাজার অশ্ব বাঁধা মন্দির-গা'য়।
যুদ্ধের সাজে সজ্জিত ঘোড়া, ফেন ঝরে মুখে তার,
সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্মসিক্ত, হ্রেষা করে বার বার।
বিস্মিত রাজা কহিলেন, 'এ কি! আমার অশ্ব হেন,
রণসজ্জায় সজ্জিত আর এত বা ক্লান্ত কেন?"
কেহ ত জানে না কারণ ইহার, নির্ব্বাক্ সবে তাই;
অন্য ঘোড়ায় চড়িলেন রাজা, সময় যে বেশী নাই।
যুদ্ধক্ষেত্রে চলিলেন তিনি লড়িতে শত্রুসাথে,
বীর বিক্রমে সৈনিকগণ ধায় তাঁর পশ্চাতে।

● স্বপ্ন? না, সত্য?
শ্রীনীলরতন দাশ

মহাবিস্ময়ে দেখে তা'রা সবে সমরাঙ্গন মাঝে
শত্রুসৈন্য অচৈতন্য মাটিতে পড়িয়া আছে !

শুধু তাহাদের নৃপতি সেথায়
একা দণ্ডায়মান;
জয়মলে হেরি' তাঁর পানে তিনি
হইলেন আগুয়ান।
তাঁর দুটি কর জড়ায়ে ধরিয়া
কহিলেন,—"শুন, ভাই,
তোমার শ্যামল সিপাহীকে পুনঃ
দেখিবারে আমি চাই।
লও তুমি মোর সব সম্পদ্,
যতেক রাজ্য ভূমি,
শুধু সে শ্যামল সিপাহীকে ফের
আমারে দেখাও তুমি।"
শুনি' তাঁর কথা বিমূঢ়ের মত
জয়মল বলিলেন,
"আমি ত কিছুই বুঝিতে পারি না,
আপনি কি কহিলেন !"

নৃপতি কহেন,—"তোমার শ্যামলসিপাহি অশ্বে চড়ি'
যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন সমর-সজ্জা পরি'।
তাঁহারে দেখিয়া সৈন্যেরা মোর হয়ে গেল অচেতন,
আমি তাঁর রূপ দু'চোখ ভরিয়া করিনু নিরীক্ষণ।
কিবা অপরূপ শ্যামল অঙ্গ ! দেখে' সাধ মিটে নাই,
হে ভাগ্যবান্ ! দয়া ক'রে তাঁরে বারেক দেখাও ভাই !"

● স্বপ্ন? না, সত্য?
শ্রীনীলরতন দাশ

শুনি' এ বারতা জয়মল-চোখে আনন্দাশ্রু ধারা,
অরিরে করেন প্রেমালিঙ্গন হইয়া পাগলপারা।

কহেন, "জীবন ধন্য তোমার,
পুণ্য ভাগ্য-লেখা,
সিপাহীর বেশে শ্যামসুন্দর
তোমারে দিলেন দেখা।
তুমি ভাই মোরে দেখাও তাঁহারে,
আমি যে ভাগ্যহত,
সশরীরে তাঁরে কভু দেখিবারে
পাই নি তোমার মত!"
তখন দু'জনে মন্দিরে গিয়ে
নানাবিধ উপচারে
পূজিলেন সেই শ্যামসুন্দর
দয়াময় দেবতারে।
ভগবৎ-প্রেমে হলো উভয়ের
অন্তর ভরপুর,
পরস্পারের মিত্রতা হ'লো,
শত্রুতা হলো দূর!

---

পুস্তকস্থা চ যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্।
কার্য্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্।।
—চাণক্য

## মণি ও মুক্তা

পুঁথিতে যা বিদ্যা থাকে, আর পরের হাতে যে ধন থাকে, দুই-ই সমান। দরকারের সময় সে বিদ্যা বিদ্যা নয়, সে-ধন ধন নয়।

# সোনার হাতী

শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়

রাজকার্য্য শেষ হয়েছে....পাত্র-মিত্র-অমাত্যের দল যে যার বাড়ী গিয়েছে, সভায় শুধু রাজা আর মন্ত্রী।

রাজা বললেন মন্ত্রীকে—শুনতে পাই, স্যাকরাদের যত সোনাই দাও গহনা গড়াতে তা থেকে কিছু সোনা তারা সরাবেই,—তা সে সিকি ভরি দাও আর পাঁচশো-সাতশো ভরিই দাও...এ কথা সত্য?

মন্ত্রী বললেন—কথাটা চিরকাল শুনে আসছি, মহারাজ, তবে চক্ষে কখনো দেখিনি।

রাজা বললেন—আমি পরখ করতে চাই মন্ত্রী, কথাটা সত্য, না, বাজে। তুমি এক কাজ করো—সহর-কোতোয়ালকে বলে দাও, আমার হুকুম, রাজ্যে যত বড় বড় পাকা স্যাকরা আছে, কাল সকালে যেন তাদের সকলকে কোতোয়াল সভায় এনে হাজির রাখে।

মন্ত্রী বললেন—তাই হবে, মহারাজ।

পরের দিন সভায় রাজ্যের ক'জন পাকা স্যাকরা হাজির...রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমাদের সোনা দিয়ে রাজপুরীতে বসিয়ে যদি গহনা গড়াই—আলাদা ঘর দেবো, সে-ঘরের দরজায় পাহারা মোতায়েন থাকবে, যে-স্যাকরা গহনা গড়বে, সে একলা শুধু সে ঘরে থাকবে। পুরীতে আসতে যেতে তার তল্লাশী নেওয়া হবে...যে-গহনা তৈরী করবে, সে-গহনা বাড়ী নিয়ে যেতে পাবে না। এমন কড়াক্কড়ির মধ্যে কাজ...পারবে এর মধ্যে থেকে আমার দেওয়া সোনা থেকে সোনা সরাতে?

স্যাকরারা সকলেই বললে—আজ্ঞে, পারবো মহারাজ।

রাজা বললেন—কতখানি সোনা সরাতে পারবে? ধরো, যদি একশো ভরি সোনা দিই? আর জিনিষ তৈরী হলে ওজনে ঠিক একশো ভরি তোমাদের বুঝিয়ে দিতে হয়?

এ কথার জবাবে কোন স্যাকরা বললে—আজ্ঞে মহারাজ, আমি ঐ একশো ভরি থেকে পঁচিশ ভরি সোনা ঠিক সরাবো।...কেউ বললে পঞ্চাশ ভরি সরাবো...কেউ বললে পঁচাত্তর ভরি সরাবো...আবার একজন বললে—আমি ঐ একশো ভরির সব সরাবো মহারাজ...সরিয়ে আপনাকে একশো ভরির জিনিষ বুঝিয়ে দেবো। জিনিষ যা তৈরী করে দেবো, দেখে কারো সন্দেহ হবে না!

শেষের স্যাকরার কথা শুনে রাজা অবাক! তিনি তাকে বললেন—বটে! তাহলে দেরী নয়। কালই আমার এখানে এসে কাজ শুরু করো। আমি নিজে ওজন করে তোমাকে দেবো একশো ভরি সোনা—তাতে আমার জন্য একটা সোনার হাতী তৈরী করে দেবে। যা যা বলেছি...ঘরে তুমি একা কাজ করবে...আসতে-যেতে তল্লাশী নেওয়া হবে...ঘরের দরজায় পাহারা মোতায়েন থাকবে—আর তোমার যন্ত্রপাতি, হাপর—মানে, সব সরঞ্জাম এখানে থাকবে, যতদিন না হাতী তৈরী হয়...সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে না। যে-ঘরে বসে কাজ করবে, সে-ঘরের বাইরে নিজের জামা-কাপড় ছেড়ে আমাদের দেওয়া জামা-কাপড় পরে ঢুকবে, ঘর থেকে বেরুবার সময় আমাদের জামা-কাপড় ছেড়ে নিজের জামা-কাপড় পরে বাড়ী যাবে! দ্যাখো বাপু—পারো যদি, বখশিশ মিলবে মজুরি ছাড়া। আর যদি ধরা পড়ো, কি, না পারো সোনা সরাতে, তাহলে গারদ!...পারবে?

শেষের স্যাকরার কথা শুনে রাজা অবাক!

স্যাকরা বললে—পারবো মহারাজ।

পরের দিন স্নান করে খাওয়া-দাওয়া সেরে স্যাকরা এলো রাজপুরীতে। সান্ত্রীরা নিলে তার তল্লাশী। তারপর বাড়ীর জামা-কাপড়-জুতা ছেড়ে রাজার খানসামার দেওয়া জামা-কাপড় পরে স্যাকরা ঢুকলো

● সোনার হাতী
শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়

রাজার খাস-কামরায়। রাজা ছিলেন সে কামরায় বসে...তাঁর কাছে খাজাঞ্চি...খাজাঞ্চির হাতে একশো ভরি খাঁটী সোনা, ওজনের পাল্লা বাটখারা আর কষ্টি-পাথর।

স্যাকরা রাখলো তার যন্ত্রপাতি, উনুন, লোহার ফুঁ-কাঠি, হাপর। সোনা ওজন করা হলো,—কষ্টিপাথরে ঘষে কষে দেখা হলো—একশো ভরি খাঁটী সোনা! স্যাকরা জানালো, সাত দিনে সে তৈরী করে দেবে সোনার হাতী!

কামরা থেকে রাজা চলে এলেন খাজাঞ্চিকে নিয়ে...দরজার সামনে টানা পর্দা—বাহিরে সান্ত্রী.... স্যাকরা বসলো কাজ করতে।

সারা দিন সে কাজ করলো...সন্ধ্যার আগে সোনা আর জিনিষপত্র রাজার দেওয়া লোহার সিন্দুকে বন্ধ করে সিন্দুকে চাবি দিয়ে স্যাকরা এসে দাঁড়ালো কামরার বাহিরে। খানসামা দিলে স্যাকরার জামা-কাপড়-জুতা। রাজপুরীর জামা-কাপড় ছেড়ে, নিজের জামা-কাপড়-জুতা পরে স্যাকরা বললে—সিন্দুকের চাবি?

রাজা এলেন। বললেন—ঘরে তালা বন্ধ করো, করে ঘরের তালার চাবি আর সিন্দুকের চাবি তুমি নিয়ে যাও...শেষে যে তুমি বলবে, আমার লোকজন সিন্দুক খুলে সোনা সরিয়েছে, সেটি হবে না!

স্যাকরা বাড়ী ফিরলো। ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে বাতি জ্বেলে ঘরে বসলো আর এক সেট যন্ত্রপাতি নিয়ে। ঘরের দরজা বন্ধ করলো, কাজ করবে।

স্যাকরা বসলো একশো ভরি পিতল নিয়ে। সেই পিতল নিয়ে তৈরী করবে একশো ভরি ওজনের পিতলের হাতী। রাজপুরীতে সোনার যে-হাতী তৈরী শুরু করেছে, অবিকল সেই মাপে, সেই ছাঁচে, সেই ছাঁদে!

এমনি করে স্যাকরার কাজ চলেছে...দিনের পর দিন—রাতের পর রাত...দিনের বেলায় রাজপুরীতে সোনা দিয়ে আর রাতের বেলায় নিজের ঘরে বসে পিতল দিয়ে হাতী তৈরীর কাজ। একদণ্ড কাজের বিরাম নেই।

রাজপুরীতে এসে নিত্যদিন তল্লাশী দেয়...নিজের জামা-কাপড়-জুতা ছেড়ে রেখে খানসামার দেওয়া জামা-কাপড় পরে কামরায় ঢোকে...ঢুকে সন্ধ্যার আগে পর্য্যন্ত কাজ করে। তারপর সিন্দুকে জিনিষপত্র আর তৈরী কাজ রেখে সিন্দুকে চাবি দেয়, দিয়ে ঘরের দরজা তালাবন্ধ করে সিন্দুক আর ঘরের তালার চাবি নিয়ে জামা-কাপড় বদলে বাড়ী ফেরে। ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত্রে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে পিতলের হাতী তৈরী করে। এর এতটুকু নড়চড় নেই!

সাত দিনের দিন হাতীর কাজ শেষ হবে, আর সন্ধ্যার সময় রাজসভায় রাজাকে আর মন্ত্রী-পাত্র-মিত্র-অমাত্য সকলকে, ওজন বুঝিয়ে কষ্টিতে হাতীর সোনা কষে দেখাবার কথা। ছ'দিনের দিন রাত্রে

● সোনার হাতী
শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়

বাড়ীতে বসে পিতলের হাতী তৈরী হয়ে গেল। স্যাকরা বললে স্যাকরাণীকে ডেকে—পাঁচ সের ঘোল তৈরী করতে হবে স্যাকরাণী...কাল বেলা বারোটার মধ্যে। তারপর বেলা দু'টোয় ঘোলউলি সেজে তুই বেরুবি সেই ঘোল নিয়ে...বেরিয়ে চুপচাপ যাবি রাজপুরী পর্য্যন্ত, তারপর রাজপুরীর সামনে গিয়ে হাঁকবি, ঘোল চাই...ঘোল! তোর ঘোলের হাণ্ডার মধ্যে আমার এই পিতলের হাতীটা আগাগোড়া চুবিয়ে নিয়ে যাবি। খুব সাবধান...উপর থেকে হাতীর এতটুকু না দেখা যায়। তারপর তোকে আমার কামরায় ডেকে নিয়ে যাবে রাজার খানসামারা...সে ব্যবস্থা আমি করবো! তারপর যা করবো—বুঝলি কি না, ভারী আশ্চয্যি ব্যাপার!

পরের দিন...সাত দিনের দিন স্যাকরা এলো রাজপুরীতে, এবং যথারীতি রাজপুরীর জামাকাপড় পরে কামরায় ঢুকলো...ঢুকে কাজ সুরু...এ যন্ত্র নিয়ে ঠুকঠাক শব্দ করে...হাপর চেপে উনুনে দেয় হাওয়া...এমনি এটা ওটা পাঁচটা কাজ...

বেলা একটা বাজলো দেউড়ির ঘণ্টায়। স্যাকরা বললে সান্ত্রীকে ডেকে—মহারাজকে খবর দাও, ঘোল চাই...পাঁচ সের ঘোল।

শুনে রাজা এলেন কামরার দরজায়। স্যাকরাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—কিগো, ঘোল চেয়েছো কেন?

স্যাকরা বললে—হ্যাঁ মহারাজ, ঘোল চাই...এখনি...পাঁচ সের ঘোল দেবেন। সোনার হাতী তৈরী...এখন চব্বিশ ঘণ্টা হাতীকে ঘোলে ডুবিয়ে রাখতে হবে—তবেই সোনার রঙ হবে পাকা।

রাজা চিন্তিতকণ্ঠে বললেন—তাই তো, এত দেরী করে এ-কথা বললে! রাজপুরীতে সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছে...দই নেই, ঘোল নেই। তার উপর গোরু দোওয়া হবে সেই বেলা চারটে-পাঁচটা নাগাদ। বাজার এখন বন্ধ...এত বেলায় ঘোল পাই কি করে?

স্যাকরা বললে—আজ্ঞে মহারাজ, যেমন করে হোক, পাওয়া চাইই...নাহলে হাতীকে যদি এক ঘণ্টার মধ্যে ঘোলে না ডুবিয়ে দিই, তাহলে সব মাটী! এই দেখুন হাতী।

রাজা দেখলেন, সোনার হাতী...খাসা তৈরী করেছে। শুঁড়ের ঘের...গজদন্ত—কোথাও এতটুকু খুঁৎ নেই। হাতীর ল্যাজ...মায় সে-ল্যাজে রোঁয়াগুলি পর্য্যন্ত। রাজা ভাবতে লাগলেন, তাই তো পাঁচ সের ঘোলের জন্য এমন হাতী মাটী হবে! কোথায় পাওয়া যাবে ঘোল? রাজা ভাবছেন, কোথায়...কোথায় পাওয়া যায় পাঁচ সের ঘোল? এমন সময় শোনা গেল, পথে হাঁকছে এক ঘোলউলি—ঘোল চাই...ঘোল?

রাজা আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন! বললেন—ঐ যে ঐ পথে ঘোলউলি হাঁকছে! খুব বরাত হে স্যাকরা! খানসামাদের বলি, কিনে আনুক...ঘড়া নিয়ে গিয়ে।

স্যাকরা বললে—না, মহারাজ! ঘোল বললেই হবে না। খাঁটী ঘোল হওয়া চাই...এ তো খাবার জন্য নয়...সোনার জন্য ঘোল। আমি পরখ করে দেখবো, তবে নেওয়া, না নেওয়া।

● সোনার হাতী
শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়

রাজা বললেন—বেশ, খানসামাদের বলি ঘোলউলিকে এখানে ডেকে আনুক, তুমি স্বচক্ষে দ্যাখো, এ ঘোলে কাজ চলে যদি।

রাজার হুকুমে খানসামা ছুটলো পথে ঘোলউলিকে ডেকে আনতে! স্যাকরা বললে রাজাকে—বড় বালতি ভরে সের আষ্টেক পরিষ্কার জল আমাকে আনিয়ে দেবেন, মহারাজ।

রাজা বললেন—জল কি হবে?

স্যাকরা বললে—ঘোলে এ হাতী ভিজিয়ে রেখে দণ্ডে দণ্ডে আমাকে দেখতে হবে, মহারাজ! যখন বুঝবো, রঙ ঠিক ধরেছে কায়েমি হয়ে, তখন ঐ বালতির আট সের জলে আরক মিশিয়ে তার মধ্যে রাখতে হবে হাতীকে...সারা রাত আরকের জলে হাতী ভিজানো থাকবে! তারপর কাল বেলা ঠিক দু'টোর সময় এসে হাতীকে জল থেকে তুলবো।

খানসামা নিয়ে এলো ঘোলউলি-সাজা স্যাকরাণীকে। স্যাকরা বললে—তোমার হাণ্ডায় কত ঘোল আছে ঘোলউলি?

ঘোলউলি বললে—পাঁচ সের। আট সের নিয়ে বেরিয়েছিলুম, তিন সের বিক্রী হয়ে গেছে। আপনাদের ক' সের চাই?

স্যাকরা বললে—আমাদের সবটুকুই চাই। তাও খাবার জন্য নয়। এই সোনার হাতীকে ভিজিয়ে রাখবো...দু-ঘণ্টা—বড় জোর তিন-ঘণ্টা। তারপর তোমার ঘোল তুমি নিয়ে গিয়ে বিক্রী করতে পারো। দ্যাখো, কত দাম দিতে হবে? তোমার ঘোল তুমি ফিরে পাবে কিন্তু।

স্যাকরার স্যাকরাণী সে...তার বুদ্ধিও কম যায় না। সে বললে—বিকেলে কে আর ঘোল খাবে যে কিনবে, মশাই! তবু—সে যাক্, তাই হবে। তা দু'তিন ঘণ্টার কাজ...আমাকে পাঁচ মোহর দেবেন।

স্যাকরা চাইলো রাজার দিকে। রাজা বললেন—বেশ, পাঁচ মোহরই পাবে...তিন ঘণ্টা পরে তোমার ঘোল ফেরত নিয়ে যেয়ো।

স্যাকরাণী হাণ্ডা নামালো। স্যাকরা বললে—এ কামরায় আপনারা কেউ থাকবেন না, মহারাজ! এ কাজ হলো আমাদের একেবারে যাকে বলে, গুপ্তমন্ত্র। তুমিও বাহিরে যাও ঘোলউলি। ভয় নেই। তোমার ঘোল তুমি পুরোপুরি ফেরত পাবে...ওজন করে নিয়ো। যাও!

সকলে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন। কামরায় স্যাকরা শুধু একা।

যন্ত্রপাতি নিয়ে স্যাকরা খানিকক্ষণ ঠুকঠাক শব্দ করলো; তারপর দরজার কাছে এসে সে হাঁকলো—বালতি...আট সের জলভরা বালতি।

দুজন খানসামা ধরাধরি করে জলভরা বালতি নিয়ে এলো। কামরার মধ্যে বালতি রেখে তারা গেল বেরিয়ে। তখন দরজার পর্দাটা ভালো করে টেনে চারিদিকে ভালো করে চেয়ে দেখে স্যাকরা নিঃশব্দে ঘোলের হাণ্ডা থেকে তার বাড়ীতে তৈরী সেই পিতলের হাতীটা বার করে বালতির জলে রাখলো। রেখে সোনার হাতীটাকে রাখলো হাণ্ডার মধ্যে... রেখে যন্ত্রপাতি নিয়ে আবার খানিকক্ষণ ঠুকঠাক ঠকঠক শব্দ।

দু-ঘণ্টা ধরে এমনি আওয়াজ। তারপর একরাশ চুন ছিল তার থলির মধ্যে যন্ত্রপাতির সঙ্গে—

● সোনার হাতী
শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়

সেই চুন ঢাললো বালতির জলে। বালতির জল বেশ ঘোলাটে হয়ে উঠলো...তখন হাপর চেপে উনুনে হাওয়া দিয়ে আগুন জ্বাললো। তিন ঘণ্টা কাটলো। পর্দা সরিয়ে স্যাকরা খানসামাকে ডেকে বললে—ঘোলউলিকে বলো, এসে তার ঘোলের হাণ্ডা নিয়ে যাক। আমার ঘোলের কাজ শেষ হয়েছে।

ঘোলউলি এসে ঘোলের হাণ্ডা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে গেল।

রাজা এলেন দরজার কাছে, বললেন—কামরায় আসতে পারি?

—আজ্ঞে, নিশ্চয় আসবেন, মহারাজ! স্যাকরা দিলে জবাব।

রাজা ঢুকলেন কামরায়। বালতি দেখিয়ে স্যাকরা বললে—ঐ আরক-মেশানো জলে আপনার হাতী চব্বিশ ঘণ্টা ভিজানো থাকবে, মহারাজ। কাল বেলা দু'টোয় আমি এসে বালতি থেকে হাতী তুলে সভায় হাজির করে দেবো, মহারাজ। এখন এ ঘর তালাবন্ধ করে তার চাবি আপনি নিজের কাছে রেখে দেবেন, কাকেও চাবি দেবেন না...মহারাণী-মাকে পর্য্যন্ত না। কাল আমি এলে আপনি নিজের হাতে এ ঘরের চাবি খুলবেন মহারাজ।

রাজা বললেন—তাই হবে।

পরের দিন...রাজার ধৈর্য্য থাকে না...কেবলি ভাবছেন, ঘড়িওয়ালা ঘড়ি বাজাতে ভুল করছে না তো? কখন দু'টোর ঘণ্টা বাজাবে?

বাজলো দু'টোর ঘণ্টা। রাজা সভায় বসে আছেন...মন্ত্রী, পাত্র, মিত্র, অমাত্য, সভাসদরা আছেন, তাছাড়া বহু প্রজা এসেছে...তামাসা দেখতে।

সোনার হাতীটাকে রাখলো হাণ্ডার মধ্যে... [পৃঃ ৩১০

স্যাকরা এলো। রাজা তাকে নিয়ে চললেন। খাস-কামরার চাবি রাজা নিজের হাতে খুললেন...কামরায় ঢুকলো স্যাকরা। বালতির জলে যত চুন ঢেলে গিয়েছিল, সব চুন থিতিয়ে বালতির তলায় জমে আছে। দিব্যি পরিষ্কার জল...তকতক ঝকঝক করছে—সে জলে হাতী...হাতীও ঝকঝক করছে।

বালতি থেকে হাতী তোলা হোলো। স্যাকরা মুছলো হাতীর গায়ের জল...মুছে হাতীটি দিলে রাজার

● সোনার হাতী
শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়

হাতে। বললে—এবার সভায় চলুন মহারাজ...কষ্টিতে সোনা কষে নেবেন...ওজন বুঝে নেবেন।

সভায় এলেন রাজা। সভায় লোক একেবারে গিশগিশ করছে।

স্যাকরা বললে—আপনার নিজের স্যাকরাকে দিয়ে পরখ করান, মহারাজ।

সে কি। এত কড়াকড়...তার মধ্যে কি করে সব সোনা পাচার হলো।

রাজার স্যাকরা তখনি করলো ওজন। পাকা একশো ভরির হাতী! তারপর কষ্টিপাথরে কষে সোনা পরখ।

কষ্টিতে হাতীর মাথা ঘষে রাজার স্যাকরা...শুঁড় ঘষে, গা ঘষে, ল্যাজ ঘষে, একবার নয়, দুবার নয়...বার বার ঘষে। যত ঘষে, তার চোখ হয় বড়...যেন ছানাবড়া। তার মুখে কথা নেই।

রাজা বললেন—কি দেখছো হে?

রাজার স্যাকরা বললে—আজ্ঞে মহারাজ, এক রতি সোনা এর কোথাও নেই। গায়ে শুধু সোনার জলের পালিশ!

রাজা বললেন—বলো কি! কিসে তৈরী হলো হাতী?

রাজার স্যাকরা বললে—আজ্ঞে, পিতলের হাতী...আগাগোড়া পিতলের তৈরী।

রাজা অবাক! বললেন—সে কি! এত কড়াক্কড়...তার মধ্যে কি করে সব সোনা পাচার হলো! এ্যাঁ...

রাজা বললেন স্যাকরাকে—বলো, কোনো ভয় নেই...আমি অভয় দিচ্ছি!

হাতীর স্যাকরা তখন সব কথা খুলে বললে...দিনের বেলা রাজপুরীতে সোনার হাতী, এবং রাত্রে নিজের বাড়ীতে পিতলের হাতী তৈরীর কাহিনী। তারপর স্যাকরাণীকে ঘোলউলি সাজিয়ে ঘোলের হাণ্ডায় করে পিতলের হাতী আনয়ন এবং সোনার হাতী অপসারণের সব কথাই সে জানালো।

শুনে রাজা খুব খুশী হলেন। বললেন—হ্যাঁ, ওস্তাদ বটে। দেবো তোমাকে—সাজা নয়...তোমার এই বুদ্ধি আর বাহাদুরির জন্য তোমার মজুরির উপর এক হাজার মোহর...বখশিশ!

---

# 'জাম্বু-গাম্বু-ডাম্বু'

বিমলচন্দ্র ঘোষ

জাম্বু গাম্বু ডাম্বু
হুম্ হুম্ হুম্ হাম্বু!
সুর ভাঁজছে গাছের ডালে
হুড়ুম দুড়ুম তাল বেতালে
লাফায় ঝাঁপায় ডিগবাজী খায়
থ্যাবড়া মুখের ভঙ্গী দেখায়
মাতিয়ে বনের চারপাশ,
গিট্‌কিরি দেয় কোরাস শোনায়
নাচের গানের সার্কাস।

হঠাৎ তা'রা শুনতে পেল
বনের কিছুদূরে,
প্রাণ খুলে গান গাইছে কা'রা
আজব রকম সুরে!

তিন স্যাঙাতে যুক্তি কোরে
লম্ফ দিয়ে মাটির 'পরে
বনের ধারে দেখতে এল
জাম্বু গাম্বু ডাম্বু
বাঘ শিকারী ল্যাং সাহেব আর
ব্যাং সাহেবের তাম্বু!

তিন কালোয়াৎ শুনতে পেল,
শিকারী ল্যাং ব্যাং
গান গাইছে চুরুট ফুঁকে
ছড়িয়ে লম্বা ঠ্যাং।
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় তাঁবুর মাথা
দুলছে যেন ফানুস,
গানের ফাঁকে চুরুট টানে
আজব দুটো মানুষ!

জাম্বু বলে ফিস্‌ফিসিয়ে,
চুরুট টানার ফলে
ওদের গানের মিষ্টি আওয়াজ
মিষ্টি কথা বলে!

এমন সময় আর্দালী চ্যাং
ওষুধ নিয়ে এসে
গেলাস মেপে ল্যাং ব্যাং-কে
খাইয়ে গেল হেসে।
অবাক হয়ে দেখলো সবি'
জাম্বু গাম্বু ডাম্বু
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় দুলছে যেন
বাঘ শিকারীর তাম্বু।

ল্যাং ব্যাং চ্যাং বাঘ মারতে
চললো গহন বনে
তিন বন্দুক ঝুলিয়ে কাঁধে
স্ফূর্তিভরা মনে।
জাম্বু গাম্বু ডাম্বু
শূন্য দেখে তাম্বু
মনের সুখে উঠলো গেয়ে
হুম্ হুম্ হুম্ হাম্বু!

তিন স্যাঙাতে বললে এবার
আয়রে চুরুট ফুঁকে,
গলার আওয়াজ মিষ্টি করি
গাইতে মনের সুখে।

এই না বলে আহ্লাদেতে
তাঁবুর মধ্যে উঠলো মেতে,
চুরুট ফোঁকে জাম্বু সাহেব
পাইপ টানে গাম্বু,
ওষুধ নিয়ে আর্দালী ব্যাং
সাজলো ভুঁড়ো ডাম্বু।

জাম্বু গাম্বু মনের সাধে
ছাড়তে গেল ধোঁয়া,
কাসির চোটে ভাঙলো গলা
পুড়লো গায়ের রোঁয়া।
জাম্বু বলে ভাইরে—!!
বাঁচার আশা নাইরে—!!
ঠোঁট জ্বলছে বুক জ্বলছে
জ্বলছে গলার নলী,
কণ্ঠে যে আর বেরোয় না রে
মিষ্টি গানের কলি—!!

চেঁচায় দু'জন পরিত্রাহি
ডাম্বু ঢাকে কান,
ওষুধ গেলাস রইলো পড়ে
বেরোয় বুঝি প্রাণ!
তিন স্যাঙাতে দারুণ লাফায়
তিড়িং মিড়িং লাফ;
জাম্বু গাম্বু ডাম্বু বলে
বাপরে চুরুট বাপ্!!

# অভিনন্দন

## শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

এরকম যে হবে তা সে ভাবতেও পারেনি।

শিবনাথ গিয়েছিল ছেলের জন্য ওষুধ আনতে। কলকাতা শহরের একটা বড় রাস্তার মোড়ে মস্ত বড় ওষুধের দোকান। বাড়ী থেকে বেশি দূরে নয়। হেঁটে গেলেও চলতো। কিন্তু পাছে দেরি হয়ে যায় তাই সে ছুটতে ছুটতে গিয়ে চলন্ত একটা ট্রামের হাতল ধরে' উঠে পড়েছিল—এই তার অপরাধ। ট্রামে ছিল অসম্ভব ভিড়। বসবার জায়গা তো ছিলই না, গাড়ীর ভেতরে গিয়ে একপাশে যে একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকবে—তারও উপায় নেই। কেউ একটুখানি সরেও দাঁড়ালো না। ক্রমাগত শুধু অপরিচিত হিতৈষীদের হিতোপদেশ বর্ষিত হ'তে লাগলো ঃ

—হাতল্ ধরে' ঝুলবেন না মশাই, নেমে পড়ুন।

—হাতীর মত একটা 'বাস্' এলেই দেবে চিঁড়ে-চ্যাপ্‌টা করে'।

—কপালে মৃত্যু যদি থাকে তো কে বাঁচাবে বলুন!

হঠাৎ এই মৃত্যুর কথাটা তার কানে যেতেই শিবনাথ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

বাড়ীতে তার ছেলে মৃত্যুশয্যায়। তারই জন্যে সে ওষুধ আনতে যাচ্ছে।

কাঁচের পুতুলের মত সুন্দর তার দু'বছরের শিশু—মিনু। রেশমের মত কোঁকড়ানো এক মাথা চুল। ঢলঢলে কালো দুটি চোখ। মুক্তোর মত সাজানো ছোট ছোট দাঁত। মুখে তার আধো-আধো কথা!

পঁচাত্তোর টাকা মাইনের দরিদ্র কেরাণী এই শিবনাথ! সংসারে তার রাজপুত্রের মতো ওই একটিমাত্র ছেলে!

সেই ছেলে আজ দশদিন বিছানায় শুয়ে।

যে-ছেলে সব সময় ছুটে ছুটে ঘুরে বেড়ায়, যে-ছেলে শুধু হাসে আর হাসায়, গত তিনদিন থেকে

সেই ছেলের মুখে না-আছে হাসি, না-আছে কথা। চোখ দুটো হয়েছে লাল, অমন সুন্দর মুখ ম্লান হয়ে গেছে বাসি ফুলের মত। ঘন-ঘন শুধু মাথা নাড়ছে আর কাঁদছে। কোথায় যে কিসের যন্ত্রণায় সে এমন ছট্‌ফট্ করছে কিছুই বলতে পারছে না।

কি নিদারুণ অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে যে দিন কাটছে তা জানেন একমাত্র ভগবান!

দু'হাত দিয়ে মিনুকে তার বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে' মা শুধু প্রার্থনা করেছে—"ছেলেকে আমার ভালো করে' দাও ভগবান! নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক এই শিশু কি এমন অপরাধ করেছে যার জন্যে তার এই কষ্ট?"

নিরুপায় অসহায়ের মত শিবনাথ শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা—দিনের পর দিন।

প্রথম প্রথম খুবই ভেবেছে সে। ভেবেছে—ছেলের অসুখ করেছে, সেরে যাবে। এমন অসুখ সব ছেলেরই হয়। তার ছেলেরও হয়েছে। এই সামান্য ব্যাপারের জন্য এত চিন্তাই বা কিসের?

ছেলে কিন্তু সারলো না। অসুখ কেমন যেন বেড়েই চললো।

ছেলেকে চোখের আড়াল করতে ইচ্ছে করে না। অথচ আপিস না গেলে চাকরি যাবে। চাকরি গেলে খেতে পাবে না। কাজেই আপিস তাকে যেতেই হয়।

আপিস যায়। কাজও করে। আপিসের ছুটির পর আগে সে পায়ে হেঁটেই বাড়ী ফিরতো। এখন আর তার পায়ে হেঁটে দেরি করে' বাড়ী ফেরবার মত মনের অবস্থা নয়। অথচ মাসের শেষ। হাতে টাকা নেই। যৎসামান্য যা আছে তাই দিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে ছেলের চিকিৎসা চলে না। আপিসের বড়বাবুর কাছে ধার চেয়েছিল। ধার মেলেনি। তাই সে অপেক্ষা করছে আর দুটো দিনের। দু'দিন পরেই মাইনে পাবে পঁচাত্তোর টাকা।

মাইনে পেলেই সে ডাক্তার ডাকবে। তার জানা সবচেয়ে বড় ডাক্তারের ফিস্ ষোলো টাকা। ষোলো টাকাই দেবে।

কিন্তু তার আগেই যদি ছেলেটা মরে যায়? আপিস থেকে বাড়ী ফেরবার পথে সব-চেয়ে খারাপ কথাগুলোই তার মনে হয়। মনে হয়, বাড়ীর দোরের কাছাকাছি যেতেই যদি সে শুনতে পায় তার স্ত্রীর কান্না? বাড়ী গিয়ে যদি সে দেখে—তার মিনুর জ্বর একদম সেরে গেছে—গা-হাত-পা বরফের মত ঠাণ্ডা, নাকে নিশ্বাস পড়ছে না, অমন সুন্দর কালো দুটো চোখের তারা ঘোলাটে,...ডাকলে সাড়া দেয় না, মুখখানি ম্লান...! আর সে ভাবতে পারলে না। শিবনাথের চোখ দিয়ে দর্ দর্ ক'রে জল গড়িয়ে এলো।

লুকিয়ে চোখের জল মুছে সে তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে দেখলে—মিনু বেঁচে আছে, কিন্তু এখনও তার যন্ত্রণার লাঘব হয়নি।

শিবনাথ মাইনে পেয়েছে।

আর কোনও কথা নয়। ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে সে বাড়ী ঢুকলো।

● অভিনন্দন
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মিনুকে অনেকক্ষণ ধ'রে দেখলেন ডাক্তারবাবু। বললেন ঃ আরও আগে ডাকেননি কেন? কেন ডাকেনি?

শিবনাথ ডাক্তারের মুখের পানে সকরুণ চোখে তাকিয়ে রইলো। শিবনাথের স্ত্রী ছিল দোরের একপাশে চুপ করে' দাঁড়িয়ে। তার দু'চোখ তখন জলে ভরে' এসেছে।

ডাক্তার ইন্‌জেক্‌সন্‌ দিলেন, ওষুধ দিলেন।

শিবনাথ জিজ্ঞাসা করলে, "ছেলেটা বাঁচবে তো?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "দেখি চেষ্টা করে'।"

তারপর চললো যমে-মানুষে টানা-টানি। দিনের পর দিন।

ডাক্তারবাবু আবার এলেন।

মাত্র পঁচাত্তোরটি টাকা সম্বল!

তাইতে খেতে হয় দু'বেলা, বাড়ী ভাড়া দিতে হয়, প্রতিমাসে যাবতীয় খরচ ওইতেই চালাতে হয় শিবনাথকে।

এবার কিন্তু বাড়ী ভাড়া দেওয়া হলো না। খেতে হয় তাই একবেলা চারটি খেলে, বাকি টাকা ডাক্তারের ওষুধে আর ইন্‌জেকসানেই ফুরিয়ে গেল।

সেদিন তার শেষ সম্বল ছিল মাত্র দশটি টাকার একটি নোট। ডাক্তারের লেখা প্রেসক্রিপ্‌সানের সঙ্গে নোটটি ভাঁজ করে রেখে শিবনাথ গিয়েছিল ওষুধের দোকানে।

মনের মধ্যে একমাত্র চিন্তা—এই দশটি টাকা ফুরিয়ে গেলে কি করবে সে? স্ত্রীর গায়ে এতটুকু সোনা নেই, সঞ্চয় নেই একটি পয়সাও।

কারও কাছে দয়া ভিক্ষা করতে শিবনাথের মাথা হেঁট হ'য়ে যায়। এমন দিনও গেছে তার জীবনে যখন সে পয়সার অভাবে সারাটা দিন না খেয়েই কাটিয়ে দিয়েছে তবু কারও কাছে সে একটি পয়সাও ধার চাইতে পারেনি। ধার দেবার সামর্থ্য আজকাল আছেই-বা কার? ধার তাকে দেবেই-বা কে?

এমনি-সব নানান্‌ কথা ভাবতে ভাবতে ওষুধের দোকানটা সে পেরিয়ে চলে গিয়েছিল। হঠাৎ সেদিকে নজর পড়তেই সে চলন্ত ট্রাম থেকে চীৎকার করে' উঠলো ঃ "রোখ্‌কে!"

ট্রাম যে চালাচ্ছে সে তার আজ্ঞাবহ দাস নয়। ট্রাম থামলো না। থামবার জায়গাটা একটু দূরে। শিবনাথ অধৈর্য্য হ'য়ে উঠেছিল। চলন্ত ট্রাম থেকে সে ঝাঁপিয়ে নামবে কিনা ভাবছে, এমন সময় পাশের ভদ্রলোক তার হাতখানা চেপে ধরলেন—"মরতে চান নাকি?"

শিবনাথ অন্যমনস্কের মত বলে ফেললে ঃ

"হ্যাঁ।"

বললে বটে, কিন্তু ট্রাম থেকে শিবনাথ নামতে পারলে না। সুতরাং তার মরাও হলো না।

শিবনাথ নামলো দূরের একটা "ট্রাম ষ্টপেজে" গিয়ে—আরও অনেকের সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে। ডাক্তারখানায় ওষুধ নিয়ে তাকে বাড়ী ফিরতে হবে। তারপর যেতে হবে আপিস। দেরি হয়ে যাবে

● অভিনন্দন
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বলে একরকম ছুটতে ছুটতে শিবনাথ ঢুকলো গিয়ে ওষুধের দোকানে।

কিন্তু সর্ব্বনাশ? ওষুধের দোকানে ঢুকে' পকেটে হাত দিয়ে প্রেসক্রিপ্‌সান বের করতে গিয়ে শিবনাথ দেখলে—প্রেসক্রিপ্‌সানও নেই, নোটও নেই; হাতটা তার সোজা পকেটের নীচের দিকে বেরিয়ে গেল।

এমন সুন্দর ভাবে পকেটটা কেটে কে যে কখন তার এই সর্ব্বনাশ করেছে কিছুই সে বুঝতে পারলে না।

অনাহারে অনিদ্রায় দুশ্চিন্তায় একে তো এম্‌নিতেই সে দাঁড়াতে পারছিল না, তার ওপর এই সর্ব্বনাশা পরিস্থিতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনে হ'লো পৃথিবীটি যেন সহসা অন্ধকার হয়ে গেল। শিবনাথ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। দোকানের চৌকাঠটা ধ'রে টাল্‌ সাম্‌লে নিলে।

যে সন্তানটিকে ঘিরে তারা দুই স্বামী-স্ত্রী সীমাহীন দারিদ্র্যের অসহনীয় যন্ত্রণাকে উপেক্ষা ক'রে আনন্দময় একটি নীড় রচনা করেছিল—তাকেই কেড়ে নেবার চরমতম দুর্ভাগ্যের এই বুঝি পূর্ব্বাভাস!

শিবনাথের স্ত্রী তোলা উনুনে যৎসামান্য কিছু রান্না করে' স্বামীর পথ চেয়ে বসে ছিল। শিবনাথ খোকার জন্যে ওষুধ নিয়ে আসবে। স্নান করবে, খাবে—খেয়ে আপিস যাবে।

শিবনাথ এলো।

এলো নির্জ্জীবের মত।

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলে ঃ এত দেরি হ'লো?

শিবনাথ জবাব দিলে না। মিনুর শিয়রের কাছটিতে বসে পড়লো। মুখে কথা নেই।

—হর্লিকস্‌টা দাও। খোকা খেতে চাচ্ছে।

শিবনাথের কাঁদতে ইচ্ছে ক'রছে চীৎকার ক'রে। কিন্তু গলায় কি যেন আট্‌কেছে মনে হ'লো। চোখের জল গেছে শুকিয়ে।

—ওরকম করে' তাকিয়ে আছো কেন? কি হ'য়েছে?

—হয়নি কিছু। যা হয়েছে তা এই দ্যাখো।

বলে' শিবনাথ তার জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখিয়ে দিলে—হাতটা নীচের দিকে বেরিয়ে গেল।

তার স্ত্রীর আর বুঝতে বাকি রইলো না—কি সর্ব্বনাশ তাদের হয়েছে।

মুখ দিয়ে তার একটি কথাও বেরুলো না। মনে মনে বললে শুধু—হে ভগবান! যে তার এই সর্ব্বনাশ করেছে; তার বিচার তুমি কোরো!

পৃথিবীতে প্রায়ই দেখা যায়—পাপ-পুণ্যের সূক্ষ্ম বিচার হয় না।

দেখা যায়, অমানুষিক অন্যায় করেও মানুষ সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করছে। আবার মহা পুণ্যবান্‌ ব্যক্তিরও দুঃখ-দুর্দ্দশার সীমা নাই।

● অভিনন্দন
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কিন্তু এক্ষেত্রে কেমন যেন বিপরীত কাণ্ড ঘটে গেল।

যে-লোকটি শিবনাথের পকেট কেটেছিল, তাকে আমরা চিনি। ভদ্রলোকের ছেলে। লেখাপড়া শেখেনি। পাড়ার যত সব বকাটে ছেলেদের নিয়ে হৈ-হৈ করে বেড়ায়, এ-হেন খারাপ কাজ নেই যা সে করেনি। নাম কালীপদ। সবাই বলে কালোগুণ্ডা।

বুড়ী মা যখন বেঁচেছিল তখন তার বিয়ে হয়ে গেছে। ভদ্রভাবে উপার্জ্জন সে করতে পারে না। মানুষকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করে, পকেট কাটে, চুরি করে, ধরা পড়ে, মার খায়। একবার কোথায় যেন কি একটা অপকর্ম্ম করে' কিছুদিন জেলও খেটে এসেছে।

বছর-দুই আগে তার একটি মেয়ে হয়েছে। সেই মেয়েটির হয়েছিল অসুখ। অসুখটা কিছুতেই সারছিল না। স্ত্রী তাই দিবারাত্রি ঝগড়া করছিল—"মেয়েকে ডাক্তার দেখাবার মুরোদ যার নেই—তার বিয়ে করা কেন?"

মেয়েটার অসুখ সেদিন বেশ বাড়াবাড়ি। কালোগুণ্ডা বেরিয়েছিল অর্থের সন্ধানে। যেমন ক'রে হোক্ টাকা সে আজ আনবেই।

বেচারা শিবনাথ পড়ে গেল তারই খপ্পরে।

কালোগুণ্ডা তারই পকেটে কেটে চট্ করে' একটা গলির ভেতর ঢুকেই হাতের মুঠো খুলে দেখে—দশ টাকার একটি নোট আর একটি ওষুধের প্রেসক্রিপ্সান!

মনে মনেই সে একবার হাসলে।

ভগবানে বিশ্বাস তার ছিল না। তবু সে ভাবলে—ভগবান নামে অদৃশ্য কোনও শক্তি যদি থেকেই থাকে, তা'হলে সে রসিক নিঃসন্দেহ।

হয়ত'-বা এমনও হ'তে পারে—ওষুধের এই প্রেসক্রিপ্সান ঠিক তার মেয়ের মতনই আর একটি শিশুর।

যারই হোক্, অত-সব ভাববার অবসর তার নেই। প্রেসক্রিপ্সানটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে টাকাটা নিয়ে সে ছুটলো বাড়ীর দিকে।

বাড়ীর দোরে এসেই থম্‌কে সে থেমে গেল।

মনে হ'লো তার স্ত্রী যেন কাঁদছে।

তবে কি তার মেয়েটা মরে গেল?

সংবাদ পেতে দেরি হলো না। দোরে দাঁড়িয়েই সে জানতে পারলে, সত্যিই তার মেয়েটা মরে গেছে।

আর-একবার সে ভগবানের কথা ভাবলে। ভাবলে—ভগবানের এই নিষ্ঠুর পরিহাসের কথা।

এরকম বড়-একটা হয় না। এ যেন মানুষের এক বানানো গল্প।

একজনের চিকিৎসার টাকা—খরচ হলো আর-একজনের শ্মশানে।

● অভিনন্দন

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কিসে যে কি হয় কিছু বলা যায় না।

সেদিন থেকে কালোগুণ্ডার কি যে হলো কে জানে, কারও সঙ্গে কথা বলে না, চুপচাপ ঘুরে বেড়ায়; কি যে ভাবে, কি যে করে—সে-ই জানে।

জীবনের এই একটি মাত্র ঘটনা—কোথায় কোন্ তন্ত্রীতে আঘাত করে' গুণ্ডা-প্রকৃতির এই মানুষটির অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন এনে দিলে, সে নিজেই তা বুঝতে পারলে না।

কালো চুপ করে' বসে বসে ভাবে—কি বিচিত্র এই দুনিয়া!

যে-মানুষ একদিন ভেবেছিল, ভগবান বলে' কোথাও কিছু নেই, ভেবেছিল—মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে মনের কল্পনা দিয়ে ভগবান তৈরি করেছে, সেই মানুষেরই চিন্তার জগৎ একেবারে ওলট্-পালট্ হয়ে গেল।

পথ চলতে চলতে সেদিন পথের ধারে হঠাৎ তার চোখে পড়লো একটি মন্দির। কিসের যেন পার্ব্বণ ছিল সেদিন। অগণিত নরনারী চলছে সেই মন্দিরের দিকে। কালো থম্‌কে থামলো। তাকিয়ে দেখলে, মন্দিরের ভেতর ওই তো সেই বিগ্রহ। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সেইদিকে। দাঁড়ালো গিয়ে বিগ্রহের সুমুখে। হাত দুটি জোড় করে' সে থর্ থর্ করে' কাঁপতে লাগলো। মনে মনে উচ্চারণ করলে তার সর্ব্বান্তঃকরণের ঐকান্তিক প্রার্থনাবাক্য।—হে ভগবান! শুনেছি তুমি নাকি দয়াময়। তা' যদি সত্য হয় তো তুমি আমাকে দয়া কর। অজান্তে বহু পাপ করেছি আমি। আমাকে তুমি ক্ষমা কর!

বাড়ীর পাশে গঙ্গা। লোকালয় থেকে দূরে গিয়ে চুপ করে' বসে থাকে সে গঙ্গার তীরে। সুমুখে প্রবহমাণ জলস্রোত। ভাবে, তারও জীবনস্রোত ঠিক অমনি করেই বয়ে চলেছে। অতীতদিনে যে-সব দুষ্কর্ম্ম সে করেছে—একটি একটি করে' তার মনে পড়ে। অনেক অন্যায়—অনেক পাপ সে করেছে। তার মধ্যে দুটি ঘটনার সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে তার মনের মধ্যে।

একদিন—যেদিন তার মেয়েটা মারা যায়—সেদিনের সেই প্রেসক্রিপ্‌সানের সঙ্গে দশটি টাকা। আর একদিন—গভীর এক অন্ধকার রাত্রে তারই এক পরিচিত অন্তরঙ্গ বন্ধুর শোচনীয় মৃত্যু।

বেলেঘাটার অন্ধকার একটা গলিরাস্তা দিয়ে তার বন্ধু বাড়ী ফিরছিল। পকেটে ছিল একশটি টাকা। দশ টাকার দশখানি নোট।

এই নোটগুলি যদি সে সহজে ছেড়ে দিত, তাহ'লে হয়ত' তাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে হ'তো না। হত্যা সে করতে চায়ওনি।

কিন্তু সে-ও টাকা নেবে, বন্ধুও ছাড়বে না। দু'জনে চললো হাতাহাতি। চারিদিক অন্ধকার। কেউ কাউকে চিনতে পারছে না। বেশি দেরি করাও চলে না। লোক জড়ো হয়ে যাবে। কালো বাধ্য হয়ে তার গলাটা চেপে ধরলে দু'হাত দিয়ে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ!

হাত ছেড়ে দিতেই সোজা হয়ে পড়ে গেল সে মাটির ওপর।

পকেট থেকে নোটগুলো বের করে' নিলে। কাছাকাছি কেউ কোথাও নেই। নাকের কাছে হাত রেখে দেখলে।—নিশ্বাস পড়ছে না।

● অভিনন্দন
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সোনা সমেত জাহাজখানি নদীর অতল গর্ভে···

"স্বামী, শুধু অক্ষর পরিচয় আছে মূর্খ বিপ্র আমি।

আকাশটা ছিল মেঘে ঢাকা। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল।

বন্ধুর ছোট ভাই সুরেশ বোধকরি আসছিল তার পিছু-পিছু। এতক্ষণ পরে সে এসে থম্‌কে থামলো সেইখানে!

বিদ্যুতের আলোয় সুরেশ বোধহয় চিনতে পেরেছিল কালোকে। চীৎকার করে' ডাকলে, "কালো-দা!"

কালো তখন টাকা নিয়ে সরে' পড়েছে।

সরে' পড়লেও দূর থেকে তার কানে এসে বেজেছিল সুরেশের মর্ম্মভেদী কান্নার আওয়াজ!

গলাটা চেপে ধরলে দু'হাত দিয়ে [পৃঃ ৩২০

আজ নতুন করে' আবার সেই আওয়াজ যেন তার বুকে এসে বাজলো।

কিন্তু আশ্চর্য্য, সুরেশ তাকে চিনতে পেরেও কিছু করেনি। কারও কাছে তার নাম পর্য্যন্ত বলেনি।

কালো ভেবেছিল সুরেশ যখন তাকে চিনতে পেরেছে, তখন এই নিয়ে নিশ্চয়ই একটা হৈ চৈ কাণ্ড-কারখানা হবে, পুলিশ আসবে, তাকে ধরে নিয়ে যাবে, হাজতে রাখবে, তারপর তার বিচার চলবে।

কিন্তু কিছুই হয়নি।

তারপরেও সে এক মাস ছিল বেলেঘাটার বস্তিতে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর একাকী সে বেরিয়ে পড়েছিল শহরের পথে—নিরুদ্দেশের যাত্রী!

গঙ্গার তীরে বসে বসে এই সব কথাই সে ভাবছিল। রাত্রি তখন বোধকরি দশটা বেজে গেছে। শীতকাল। ঘাটে লোকজন কেউ কোথাও নেই।

কালো উঠি উঠি করছে। এমন সময় মনে হলো সাদা কাপড় পরা একটি মেয়ে যেন গঙ্গার জলে

গিয়ে নামছে।

মেয়েটি যেখানে নামছে, সেখানে কারও নামবার কথা নয়। বাঁধানো ঘাট সেখান থেকে অনেক দূরে। প্রকাণ্ড একটু পুরনো বটগাছের তলায়—অন্ধকার যেখানে বেশ জমাট্ বেঁধেছে, সেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে মনে হলো মেয়েটি যেন পা টিপে টিপে এগিয়ে চলেছে জলের ওপর দিয়ে।

কালোর সন্দেহ্ হলো—মেয়েটি নিশ্চয় গঙ্গার জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে চায়! তাড়াতাড়ি কালো সেইদিকে এগিয়ে গেল। গিয়ে দেখে, সত্যিই তাই। মেয়েটি একা নয়, কাপড়ে জড়ানো একটি শিশু তার কোলে।

কালো বললে, উঠে এসো মা। ছি! এ রকম করে' আত্মহত্যা করতে নেই।

মেয়েটি সত্যিই উঠে এলো। ধীরে-ধীরে অন্ধকার গাছের তলায় সে দাঁড়ালো। বললে, কেন তুমি আমায় বাঁচালে? বাঁচবার ইচ্ছে আমার নেই।

কালোর মনে হ'লো এতদিন পরে জীবনে বোধহয় একটা ভাল কাজ সে করলে। বললে, না। মরতে তোমাকে আমি দেবো না। চল—বাড়ী চল।

মেয়েটি বললে, বাড়ীতে আমি মুখ দেখাবো কেমন করে?

কালো বললে, আমি তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি চল। যা বলতে হয় আমি বলবো।

চলুন।

মেয়েটি চললো আগে আগে। কালো চললো তার পিছু পিছু।

নির্জ্জন একটা গলিরাস্তা ধরে' চীৎপুরের দিকে এগিয়ে চলেছে তারা। খানিক দূর গিয়ে বড় রাস্তায় পড়বার আগে মেয়েটি থম্‌কে থামলো। কোলের ছেলেটিকে কালোর দিকে বাড়িয়ে ধরে' বললে, "ধরুন একে দু'হাত দিয়ে। ঘুমুচ্ছে।"

কালো ছেলেটিকে নিলে দু'হাত বাড়িয়ে। আপাদমস্তক কাপড় দিয়ে ঢাকা। খুব কচি শিশু বলেই মনে হ'লো।

মেয়েটি বললে, আপনি একটু এগিয়ে গিয়ে রাস্তাটা পার হয়ে যান। এখানে আমার ননদের বাড়ী। দেখলে সন্দেহ করবে। আমি একটু গাঢাকা দিয়ে যাচ্ছি আপনার পিছু পিছু।

ছেলেটিকে দু'হাত দিয়ে বুকে চেপে কালো রাস্তা পার হলো গাড়ী-ঘোড়া বাঁচিয়ে। তখন তার পিছন ফিরে তাকাবার অবসর ছিল না। ওপারে গিয়ে পিছন ফিরে তাকালে। কোন্‌দিকে যাবে? ডানদিকে? না, বাঁদিকে?

কিন্তু কোথায় সে মেয়েটি?

এই তো আসছিল পিছু পিছু? রাস্তা পার হয়েছে, না ওই দিকের কোনও গলিতে ঢুকে পড়লো? না, দেখা হয়ে গেল তার ননদের সঙ্গে?

কালো দাঁড়ালো একটা গাড়ী বারান্দার নীচে—ফুটপাথের ওপর। যাবে কোথায় সে? ছেলে রয়েছে তার কোলে!

● অভিনন্দন
**শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়**

আকাশটা ছিল মেঘে ঢাকা। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছিল।

বন্ধুর ছোট ভাই সুরেশ বোধকরি আসছিল তার পিছু-পিছু। এতক্ষণ পরে সে এসে থম্‌কে থামলো সেইখানে!

বিদ্যুতের আলোয় সুরেশ বোধহয় চিনতে পেরেছিল কালোকে। চীৎকার করে' ডাকলে, "কালো-দা!"

কালো তখন টাকা নিয়ে সরে' পড়েছে।

সরে' পড়লেও দূর থেকে তার কানে এসে বেজেছিল সুরেশের মর্ম্মভেদী কান্নার আওয়াজ!

গলাটা চেপে ধরলে দু'হাত দিয়ে [পৃঃ ৩২০

আজ নতুন করে' আবার সেই আওয়াজ যেন তার বুকে এসে বাজলো।

কিন্তু আশ্চর্য্য, সুরেশ তাকে চিনতে পেরেও কিছু করেনি। কারও কাছে তার নাম পর্য্যন্ত বলেনি।

কালো ভেবেছিল সুরেশ যখন তাকে চিনতে পেরেছে, তখন এই নিয়ে নিশ্চয়ই একটা হৈ চৈ কাণ্ড-কারখানা হবে, পুলিশ আসবে, তাকে ধরে নিয়ে যাবে, হাজতে রাখবে, তারপর তার বিচার চলবে।

কিন্তু কিছুই হয়নি।

তারপরেও সে এক মাস ছিল বেলেঘাটার বস্তিতে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর একাকী সে বেরিয়ে পড়েছিল শহরের পথে—নিরুদ্দেশের যাত্রী!

গঙ্গার তীরে বসে বসে এই সব কথাই সে ভাবছিল। রাত্রি তখন বোধকরি দশটা বেজে গেছে। শীতকাল। ঘাটে লোকজন কেউ কোথাও নেই।

কালো উঠি উঠি করছে। এমন সময় মনে হলো সাদা কাপড় পরা একটি মেয়ে যেন গঙ্গার জলে



● অভিনন্দন
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গিয়ে নামছে।

মেয়েটি যেখানে নামছে, সেখানে কারও নামবার কথা নয়। বাঁধানো ঘাট সেখান থেকে অনেক দূরে। প্রকাণ্ড একটু পুরনো বটগাছের তলায়—অন্ধকার যেখানে বেশ জমাট্ বেঁধেছে, সেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে মনে হলো মেয়েটি যেন পা টিপে টিপে এগিয়ে চলেছে জলের ওপর দিয়ে।

কালোর সন্দেহ হলো—মেয়েটি নিশ্চয় গঙ্গার জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে চায়! তাড়াতাড়ি কালো সেইদিকে এগিয়ে গেল। গিয়ে দেখে, সত্যিই তাই। মেয়েটি একা নয়, কাপড়ে জড়ানো একটি শিশু তার কোলে।

কালো বললে, উঠে এসো মা। ছি! এ রকম করে' আত্মহত্যা করতে নেই।

মেয়েটি সত্যিই উঠে এলো। ধীরে-ধীরে অন্ধকার গাছের তলায় সে দাঁড়ালো। বললে, কেন তুমি আমায় বাঁচালে? বাঁচবার ইচ্ছে আমার নেই।

কালোর মনে হ'লো এতদিন পরে জীবনে বোধহয় একটা ভাল কাজ সে করলে। বললে, না। মরতে তোমাকে আমি দেবো না। চল—বাড়ী চল।

মেয়েটি বললে, বাড়ীতে আমি মুখ দেখাবো কেমন করে?

কালো বললে, আমি তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি চল। যা বলতে হয় আমি বলবো।

চলুন।

মেয়েটি চললো আগে আগে। কালো চললো তার পিছু পিছু।

নির্জ্জন একটা গলিরাস্তা ধরে' চীৎপুরের দিকে এগিয়ে চলেছে তারা। খানিক দূর গিয়ে বড় রাস্তায় পড়বার আগে মেয়েটি থম্‌কে থামলো। কোলের ছেলেটিকে কালোর দিকে বাড়িয়ে ধরে' বললে, "ধরুন একে দু'হাত দিয়ে। ঘুমুচ্ছে।"

কালো ছেলেটিকে নিলে দু'হাত বাড়িয়ে। আপাদমস্তক কাপড় দিয়ে ঢাকা। খুব কচি শিশু বলেই মনে হ'লো।

মেয়েটি বললে, আপনি একটু এগিয়ে গিয়ে রাস্তাটা পার হয়ে যান। এখানে আমার ননদের বাড়ী। দেখলে সন্দেহ করবে। আমি একটু গাঢাকা দিয়ে যাচ্ছি আপনার পিছু পিছু।

ছেলেটিকে দু'হাত দিয়ে বুকে চেপে কালো রাস্তা পার হলো গাড়ী-ঘোড়া বাঁচিয়ে। তখন তার পিছন ফিরে তাকাবার অবসর ছিল না। ওপারে গিয়ে পিছন ফিরে তাকালে। কোন্‌দিকে যাবে? ডানদিকে? না, বাঁদিকে?

কিন্তু কোথায় সে মেয়েটি?

এই তো আসছিল পিছু পিছু? রাস্তা পার হয়েছে, না ওই দিকের কোনও গলিতে ঢুকে পড়লো? না, দেখা হয়ে গেল তার ননদের সঙ্গে?

কালো দাঁড়ালো একটা গাড়ী বারান্দার নীচে—ফুটপাথের ওপর। যাবে কোথায় সে? ছেলে রয়েছে তার কোলে!

● অভিনন্দন
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। মেয়েটি ফিরলো না। পাশের দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। কোথায় কোন্ বাড়ীর ঘড়িতে ঢং ঢং করে' এগারোটা বাজলো।

চৌমাথার মোড়ের দিকে নজর পড়তেই হঠাৎ মনে হ'লো তেমনি সাদা কাপড়-পরা একটা মেয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। কালো তাড়াতাড়ি সেইদিকে এগিয়ে গেল।

বেশ একটু জোরে জোরে পা চালিয়ে যাচ্ছিল সে।

রাস্তায় পাহারা দিচ্ছিল যে দু'জন পুলিশ—তাদের নজর পড়লো কালোর দিকে। বুকের কাছে কাপড়ের পুঁটলিটা চেপে ধরে' যেরকম ভাবে সে পথ চলছিল—পাহারাওলা ভাবলে বুঝি-বা চোরাই মাল নিয়ে পালাচ্ছে লোকটা।

কালো তখন মেয়েটিকে ধরে' ফেলেছে। বললে, এই যে, আমি এখানে।

মেয়েটি তার মাথার ঘোম্‌টা খুলে যেই মুখ ফিরিয়েছে, কালো অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

এ তো সে-মেয়ে নয়।

কালো বললে, মাপ করবেন। আপনি ন'ন্।

পাহারাওলা তখন তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বললে, কি নিয়ে ভাগছো তুমি? চোরাই মাল?

কালো বললে, না না, চোরাই মাল নয় পাহারাওলা-সাহেব, ছেলে।

কাপড়ের পুঁটলিটা খুলে দেখালে কালো।

কিন্তু এ কি! রাস্তার জোর আলো এসে পড়েছিল তাদের ওপর। সেই আলোয় ছেলেটাকে দেখাতে গিয়ে কালো চম্‌কে উঠলো। এ তো ঘুমন্ত ছেলে নয়। মরা ছেলে।

কালো খুলে বললে সব কথা। কিন্তু পাহারাওলা সে ইতিহাস শুনে কি করবে? বললে, চলো—থানায় চল!

মরা ছেলেটাকে তেমনি করে' চেপে ধরে কালো চললো থানায়।

দারোগাবাবু সব শুনলেন, দেখলেন, যা করবার করলেন।

ছেলের মৃতদেহ পাঠানো হ'লো 'মর্গে', আর কালো রইলো থানার হাজতে বন্দী।

তারপর আদালতে মামলা উঠলো। কালোর বিচার হ'লো।

দাগী আসামী কালো। কাজেই বিচারে তার জেল হয়ে গেল তিন মাস।

কালো প্রতিজ্ঞা করেছিল—জীবনে আর সে কোনও অপরাধ করবে না—পাপ করবে না। যতদিন বাঁচবে মানুষের উপকার করবে।

প্রথম উপকার করতে গিয়ে তার এই শাস্তিভোগ।



জেল তার অপরিচিত নয়। দেখতে দেখতে কেটে গেল তিনটি মাস।

এ তার বিগত দিনের কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত। বন্দীশালায় তিনটি মাসের প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্ত্ত সে অনুতাপ করেছে। সর্ব্বান্তঃকরণের ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়েছে সেই তাঁরই কাছে—যিনি সর্ব্বশক্তিমান,

• • অভিনন্দন

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

যিনি চির-জাগ্রত, যিনি সব-কিছু দেখতে পাচ্ছেন, যিনি অন্তর্য্যামী।

দস্যু রত্নাকরের উপাখ্যান সে জানে। যাঁর কৃপায় সেই রত্নাকর হয়েছিল চিরপূজ্য মহাকবি, সেই পরম কৃপালুর কৃপা প্রার্থনাই হ'লো তার একমাত্র প্রার্থনা।

অগ্নি পরিশুদ্ধ কালো বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে এলো একেবারে অন্য মানুষে রূপান্তরিত হ'য়ে।

প্রতিজ্ঞা করলে সে, না খেয়ে রাস্তার ধারে যদি সে মরে পড়ে থাকে তাও ভালো—তবু সে এমন কাজ কোনোদিন করবে না—মানুষের যাতে অকল্যাণ হয়।

জীবিকা উপার্জ্জনের মাত্র একটা পথই জানা ছিল কালোর। কিন্তু সে-পথে আর সে হাঁটবে না।

একটা কাজ চাই। দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান।

লেখাপড়া সে শেখেনি। বাংলায় সে অতি কষ্টে নিজের নামটা মাত্র সহি করতে পারে।

কাজের সন্ধানে যেখানেই যায়, ফিরে আসে বিফল হয়ে।

থাকবার মধ্যে ছিল তার অটুট্ স্বাস্থ্য। দুই বাহুতে ছিল অপরিমিত শক্তি।

কিন্তু তাও বুঝি আর থাকে না! দুটো দিন কেটে গেল রাস্তার জল খেয়ে। গ্রীষ্মকাল। রাত্রি কাটলো ফুটপাতের ওপর বাড়ীর রকে শুয়ে।

হঠাৎ দেখলে একটা রাস্তার ধারে বড় বড় মাটির জালায় জল নিয়ে একটা লোক জলসত্র খুলেছে। সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটা বললে, হাত পাতো।

কালো হাত পাতলে। লোকটা তার হাতের ওপর কতকগুলো ভিজে ছোলা আর গুড় দিলে।

আজ তার একটা কথা মনে পড়ে গেল। তার স্ত্রী একদিন সকালে ভিজে ছোলা, আদার কুচি আর একটু নুন দিয়েছিল খেতে।

ছোলা সে খায়নি। বলেছিল, ছোলা তো ঘোড়ায় খায়।

সেই ছোলা আজ তার মনে হলো যেন অমৃত।

আরও চারটি চেয়ে নিলে। তারপর অনেকখানি জল খেয়ে উঠে দাঁড়ালো কালো।

কারও বাড়ীতে চাকরের কাজ করবে কিনা তাই ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে সে চলেছে তো চলেইছে। কখন সে যে শহরের বাইরে এসে গেছে বুঝতেই পারেনি।

পথের ধারে কতকগুলো লোক জড়ো হয়েছে। কি যেন তারা দেখছে।

কালো এগিয়ে গেল। দেখলে, একটা মোটরকার কাৎ হয়ে পড়ে আছে, আর লোকজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। গাড়ীর ভেতরে লোকজন কেউ নেই। সাদা চামড়ার একজন ইংরেজ কি যেন বলছে তাদের, কিন্তু কেউ তার কথা শুনছে না।

কালো জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার?

একটা লোক তাকে বুঝিয়ে দিলে, এই রাস্তা দিয়ে আসছিল একটা গরুর গাড়ী। সেই গাড়ীটাকে পাশ কাটিয়ে বাঁচাতে গিয়ে সাহেব তার হাত ঠিক রাখতে পারেনি, গাড়ীটা গিয়ে পড়েছে নালায়।

● অভিনন্দন
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

রাস্তার পাশে খোলা নর্দ্দমার কাদায় গাড়ীর একটা চাকা বসে গেছে। মোটরের ইঞ্জিন চালিয়ে সাহেব অনেক চেষ্টা করেছে গাড়ীটাকে তোলবার, কিন্তু তুলতে পারেনি। এখন সাহেব বলছে কেউ যদি দুটো শক্ত বাঁশ এনে গাড়ীর নীচে চাড় দিয়ে গাড়ীটাকে তুলে দিতে পারে, সাহেব তাকে বখ্‌শিশ দেবে পাঁচ টাকা।

কিন্তু রাজি হচ্ছে না কেউ।

লোকগুলো একে একে সরে' যাচ্ছে।

কালো সাহেবের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বললে, আমি একবার চেষ্টা করে' দেখবো সাহেব?

সাহেব পরিষ্কার বাংলায় বললে, তুমি একা পারবে?

কালো বললে, আর যে কেউ আসছে না সাহেব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব মজা দেখছে। দেখি চেষ্টা করে'।

এই বলে' কালো এগিয়ে গেল। পরনের কাপড়খানা হাঁটুর ওপরে তুলে, দু'হাত গিয়ে গাড়ীর চাকাটা নর্দ্দমার পাঁক থেকে শুকনো রাস্তার ওপর তুলে দিলে।

তখনও যারা দাঁড়িয়েছিল, হাঁ করে' তাকিয়ে তাকিয়ে তারা দেখলে।

কে একজন বললে, ব্যাটা মারলে পাঁচটা টাকা।

কালোর হাতে পায়ে নর্দ্দমার পাঁক লেগেছিল। রাস্তার ধারে ছিল একটা টিউব-ওয়েল। সাহেব নিজে গিয়ে টিউব-ওয়েলের হাতল চালিয়ে জল তুলে দিলে। কালো হাত-পা ধুয়ে পরনের কাপড়টা ঠিক করে' নিয়ে সাহেবকে একটি নমস্কার করে' চলে যাচ্ছিল। সাহেব বললে, যাচ্ছ কোথায়? শোনো।

কালো থামলো। সাহেব কিছু বলবার আগেই সে বলে বসলো, "বখ্‌শিশ আমি নিতে পারবো না সাহেব। আপনার এই সামান্য উপকারটুকু করে' আমি যে আনন্দ পেলাম, আপনার পাঁচ টাকা বখ্‌শিশের চেয়ে তার দাম অনেক বেশি।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করলে, কি কর তুমি? কোথায় থাকো?

কালো ম্লান একটু হাসলে। বললে, "ওকথা জিজ্ঞাসা কোরো না সাহেব। আমার থাকবার আস্তানাও নেই, খাবার সংস্থানও নেই। আমি একটা চাকরির সন্ধানে বেরিয়েছি।"

সাহেব বললে, "বেশ তো টাকাকড়ি নেবে না, না নাও, কিন্তু আমারও তো মনের সান্ত্বনা দরকার। তুমি আমার উপকার করলে, আমাকেও তোমার একটা উপকার করতে দাও।"

কালো বললে, "উপকার করবেন আপনি? সেই একই কথা হ'লো।"

চুপ করে' কি যেন ভাবলে। ভেবে বললে, "তা হোক্। একটা চাকরি করে' দিতে পারবেন? যে-কোনও ছোটখাটো চাকরি। আমি কিন্তু লেখাপড়া জানি না।"

সাহেব বললে, "এসো আমার সঙ্গে।"

কালোকে সাহেব তার গাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তুললে। তারপর নিজে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে গেল তার বাংলোয়।

● অভিনন্দন

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

দমদমে সাহেবের চমৎকার বাংলো।

মস্ত বড় এক কারখানার জেনারেল ম্যানেজার।

কালো চাকরি পেলে। বেতন মাসে পঞ্চাশ টাকা। একা মানুষ। পঞ্চাশ টাকাই যথেষ্ট।

কাজ এমন বিশেষ কিছুই নয়। তদারক করবার কাজ। তার ওপর বড়-সাহেবের প্রিয় পাত্র।

প্রথম প্রথম কালোকে সবাই হিংসা করতো।

কিন্তু কালোর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সবাই ছিল তার আপনজন।

যেখানে মানুষের দুঃখ-বিপদ, সেইখানেই কালো!

ডাকতে হয় না, খবর দেবার প্রয়োজন হয় না, অযাচিতভাবে গিয়ে হাজির হয়, প্রাণপণে সেবা করে।

বিনিময়ে কোনো-কিছুর প্রত্যাশী নয় সে। প্রয়োজন হ'লে বরং কিছু দিয়েই আসে, নিয়ে আসে না কিছু।

হরিবাবুর ছেলের কলেরা হ'লো। কালো গিয়ে হাজির!

কে যেন বললে, "মরবে নাকি কালোদা? ছোঁয়াচে রোগ যে।"

কালো হাসে শুধু। কথাটার জবাব দেয় না।

লোকে উপদেশ দেয় ঃ "তোমার নিজের কিছু হ'লে কে দেখবে?"

কালো তার হাতখানা আকাশের দিকে তুলে বলে, "ভগবান।"

কারখানার ঝাড়ুদার নান্‌কু একদিন পড়ে গেল মহা বিপদে। সতেরো বছরের জোয়ান্ ছেলে তার মরে গেল মুখে রক্ত উঠে। যক্ষ্মা হয়েছিল ভেবে কেউ আর শ্মশানে যায় না। আপনার স্বজাতি স্বজন যারা এসেছিল সবাই একে একে সরে' পড়লো। একা নান্‌কু অকূল পাথারে পড়ে গিয়ে কাঁদতে লাগলো মরা ছেলের শিয়রে বসে।

হঠাৎ দেখা গেল কোমরে গামছা বেঁধে কালো এসে হাজির!

নান্‌কু হাতজোড় করে বললে, "আপনি বাম্‌হন্, আর হামি যে ছোটা জাত্ বাবু!"

কালো বললে, "রেখে দে তোর ছোটা জাত! চল্।"

কারও প্রয়োজন হ'লো না। নান্‌কুর সঙ্গে নিজে কাঁধ দিয়ে মৃতদেহ নিয়ে কালো চলে গেল শ্মশানে।

কারখানার ঝাড়ুদার থেকে বড় সাহেব পর্য্যন্ত সবাই চিনলে কালোকে।

কালো হ'লো সকলের প্রিয়পাত্র।

কালো হ'লো সকলের—'কাল্-দা'।

এমন মানুষ আর হয় না!

● অভিনন্দন
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কালোর মুখে হাসি যেন লেগেই আছে। মানুষের উপকার করবার সুযোগ পেলে আর যেন সে কিছুই চায় না। এইতেই তার আনন্দ!

কারখানা থেকে একটু দূরে—বড় রাস্তার ওপারে ছিল একটা বস্তি। অনেকগুলি গরীব মানুষ একসঙ্গে বাস করতো সেখানে।

একদিন রাত্রে হঠাৎ সেই বস্তিতে লাগলো আগুন! আগুনের লাল শিখা দূর থেকে দেখা গেল।

কালো ছুটলো সেইদিকে।

অনেকে নিষেধ করলে তাকে। কালো কিন্তু কারও নিষেধ বারণ শুনলে না। সেইখানে গিয়ে হাজির হ'লো।

—"রেখে দে তোর ছোটা জাত।" [পৃঃ ৩২৬

গিয়ে দেখলে, খড়ের, টিনের আর খাপ্‌রার বস্তি দাউ দাউ করে জ্বলছে। মেয়েরা হাউমাউ করে' কাঁদছে আর জোয়ান মরদেরা সব আগুন নেবাবার চেষ্টা করছে। আগুন কিন্তু নিবছে না। কারণ সবাই দেখা যাচ্ছে আপন আপন ঘর সামলাবার জন্যে ব্যস্ত।

কালো গিয়েই দুটো চালাঘর টেনে ছাড়িয়ে দিলে। আগুন আর ছড়িয়ে পড়লো না।

এক বুড়ী কাঁদছে আর বুক চাপড়াচ্ছে। কিন্তু কেউ তার কথা শুনছে না। সে বলছে, তার ছ'সাত বছরের নাতনী বোধহয় বেরুতে পারেনি ঘর থেকে। একটা ছাগলের বাচ্চা আনবার জন্যে ঢুকেছিল সে।

আঙুল বাড়িয়ে বুড়ী তার ঘরটা দেখিয়ে দিলে।

কালো জিজ্ঞাসা করলে, কি নাম তার নাতনীর। বুড়ী বললে, লখিয়া।

কালো ঢুকলো গিয়ে সেখানে।

আগুন ছিল না, কিন্তু কালো ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার। ছাগলের বাচ্চাটা চীৎকার করছিল। কালো সেই শব্দ লক্ষ্য করে' গিয়ে দেখলে মেয়েটি ধোঁয়ায় পথ হারিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে আর খক্ খক্ করে' কাশছে।

● অভিনন্দন
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

এক হাতে লখিয়া আর এক হাতে ছাগল—দুটোকেই তুলে আনলে কালো।

বুড়ী চোখে ভাল দেখতেও পায় না। বুঝতেও পারলে না—কে তার নাতনীকে এনে দিলে। আশীর্ব্বাদ করতে লাগলো দু'হাত তুলে ঃ "ভগবান তোমার ভাল করুন বাবা!"

আগুন নিবিয়ে কালো ফিরে এলো কারখানায়।

রাত্রে বুঝতে পারেনি। পরের দিন সকালে দেখলে হাতে তার বড় বড় তিনটে ফোস্‌কা হয়েছে।

ফোস্‌কা ফেটে ঘা হলো। সে ঘা শুকলো একমাস পরে।

ঘাট বাঁধানো একটা পুকুর ছিল কারখানার পাশে। অনেকে স্নান করতো সেই পুকুরে। ছেলেরা সাঁতার কাটতো।

হরিশবাবু কারখানার আপিসের বড়বাবু। তাঁর মাছ ধরবার সখ। ওই পুকুরে নাকি মাছ আছে বড় বড়।

হুইল, ছিপ, চার সবই সংগ্রহ করলেন হরিশবাবু। রবিবার ছুটির দিন। গিয়ে বসলেন পুকুরের ধারে মাছ ধরতে।

কিন্তু দুষ্টু ছেলে-ছোক্‌রার দল—ঠিক সেই সময় জলে নেমে পড়লো সাঁতার কাটতে। হরিশবাবু অনেক করে' বললেন। অনেক অনুরোধ করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না। এমন শব্দ করে' হাত-পা ছুঁড়ে ছেলেরা সাঁতার কাটতে লাগলো যে, হরিশবাবু ছিপ গুটিয়ে নিয়ে বাড়ী ফিরতে বাধ্য হলেন। মাছ সেদিন আর ধরা হলো না।

মাছ যদি ধরতেই হয়, কাল্‌-দার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ছেলেরা কাল্‌-দার কথা শোনে।

হরিশবাবু বললেন কাল্‌-দাকে।

কালো বললে, ছেলেরা সুইমিং ক্লাব করেছে যে! আপনারও রবিবার ছাড়া সময় নেই, ওদেরও তাই। আচ্ছা, ওদের বলে-কয়ে একটা রবিবার আমি বন্ধ করে' দেবো।

ছেলেদের বলতে গিয়ে হ'লো বিপদ। ছেলেরা বললে, "আমরা তো সারাদিন জলে পড়ে থাকি না। থাকি মাত্র ঘণ্টাখানেক। উনি সেই একঘণ্টা বাদ দিয়ে তো বসতে পারেন মাছ ধরতে।"

হরিশবাবু বললেন, "তা সত্যি। কিন্তু আমি ঠিক যে-সময়টিতে মাছ ধরবার জন্যে বসবো ঠিক সেই সময়েই যদি ওদের সাঁতারের সময় হয় তাহ'লে তো আমি নাচার।"

ছেলেদের বলে-কয়ে কালো ঠিক করে' দিলে—আগামী রবিবার ছেলেরা সাঁতার কাটবে না, হরিশবাবু সারাদিন মনের আনন্দে মাছ ধরতে পারেন।

মুখের কথায় কিন্তু বিশ্বাস হ'লো না হরিশবাবুর।

রবিবার বিকেলে হরিশবাবু গেলেন মাছ ধরতে। কালোকে বলে' গেলেন, তুমি ভাই একবার যাবে পুকুরের দিকে। কিছু বিশ্বাস নেই ছেলেদের।

● অভিনন্দন
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

হরিশবাবু আপিসের সর্ব্বেসর্ব্বা বড়বাবু। ধরতে গেলে কালোর মনিব। কালোকে যেতেই হবে।

গেল ঠিক পাঁচটায়।

কিন্তু কোথায় হরিশবাবু?

হরিশবাবুর খোলা ছাতিটা পুকুরের পাড়ে রয়েছে পড়ে, অথচ হরিশবাবুকে দেখা যায় না। গেলেন কোথায়?

কালো সেই ছাতিটা লক্ষ্য করে' পুকুরের কিনারে গিয়ে দেখে—সর্ব্বনাশ! ছিপটা জলের ওপর ভাসছে, আর হরিশবাবু পুকুরের ডুবন্-জলে হাবুডুবু খাচ্ছেন। পুকুরের জলটা ছিল পরিষ্কার। কালো দেখলে, হরিশবাবু ভুড়ভুড়ি কেটে জলে ডুবছেন।

কালো আর স্থির থাকতে পারলে না। গায়ের জামাটা খুলে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়লো পুকুরের জলে, তারপর অতিকষ্টে হরিশবাবুর অত বড় একটা লাশকে টেনে তুললে পুকুরের পাড়ে।

ভগবান রক্ষা করেছেন—হরিশবাবু তখনও মরেন নি। কালো যদি আর-একটু দেরি করে' আসতো তাহ'লেই হয়েছিল। হরিশবাবুর মৃতদেহ ভেসে উঠতো পুকুরের জলে।

হরিশবাবু শহরের মানুষ—সাঁতার জানেন না। অনেকখানি জল খেয়ে তখন বেশ কাবু হয়ে পড়ে ছিলেন। জলটা বমি করে' একটুখানি সুস্থ হয়ে হরিশবাবু সর্ব্বপ্রথমে তাঁর জীবন রক্ষা করবার জন্যে ধন্যবাদ দিলেন কালোকে তারপর যা বললেন তার মর্ম্মার্থ এই যে, দুষ্টু ছেলেরা নির্ঘাত তাঁর চারের জায়গায় কাঁটাগাছের ডাল ফেলে রেখেছিল। সেই কাঁটাগাছের ডালে তাঁর বঁড়শি আট্‌কে গেল। টেনে টেনে কিছুতেই যখন বঁড়শি ছাড়াতে পারলেন না, তখন তিনি এক পা এক পা করে' জলে নেমেছিলেন বঁড়শিটা ছাড়াবার জন্যে। কিন্তু কে জানতো যে জলের নীচে গভীর গর্ত্ত আছে। হঠাৎ পা হড়্‌কে তিনি পড়ে যান সেই গর্ত্তের মধ্যে। তার পরেই বাস, মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি!

কিন্তু ছেলেরা কাঁটাগাছের ডাল ফেলেনি। কথাটা একদম মিথ্যা। প্রমাণ হয়ে গেল সেইদিনই সন্ধ্যায়। হুইল্-লাগানো অত দামী ছিপটা উদ্ধার করা একান্ত প্রয়োজন। হরিশবাবুকে নিরাপদে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে কালো নিজেই গেল পুকুরের দিকে। কালোর সঙ্গে গেল ছেলের দল। প্রয়োজন হলে তাকে তারা সাহায্য করবে।

সাহায্য করার প্রয়োজন হ'লো না। দেখা গেল, ছিপটা যেখানে ছিল সেখানে নেই। বাঁধানো ঘাটের কাছে ছিপের মাথাটা মাত্র দেখা গেল। একহাঁটু জল সেখানে। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার, কালো যেই ছিপটা ধরতে যাবে, দেখা গেল, ছিপটা সরে' যাচ্ছে। সবাই অবাক্ হয়ে গেল। ছেলেরা চীৎকার করে উঠলো, "পালিয়ে এসো কাল্-দা, যাক্‌গে একটা ছিপ্। পুকুরে 'দানো' আছে।"

কিন্তু অত সহজে কালো ছাড়্‌বার ছেলে নয়।

হাত দিয়ে প্রাণপণে চেপে ধরে' কালো যখন হুইল ঘুরিয়ে সুতো সমেত ছিপ্‌টাকে তুললে, দেখা গেল, বঁড়শিটা গিলে ফেলেছিল প্রকাণ্ড একটা কাৎলা মাছ।

মাছটা তখন ছিপ্ টেনে টেনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে! মুখ দিয়ে কাঁচা রক্ত বেরুচ্ছে।

● অভিনন্দন

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

তাহ'লে এই মাছের টানেই হরিশবাবু কুপোকাৎ হয়েছিলেন!

সেই মাছ দিয়ে হরিশবাবুর বাড়ীতে হলো পোলাও রান্না। ছেলেরা নিমন্ত্রিত হয়ে হৈ হৈ করে' খেয়ে এলো।
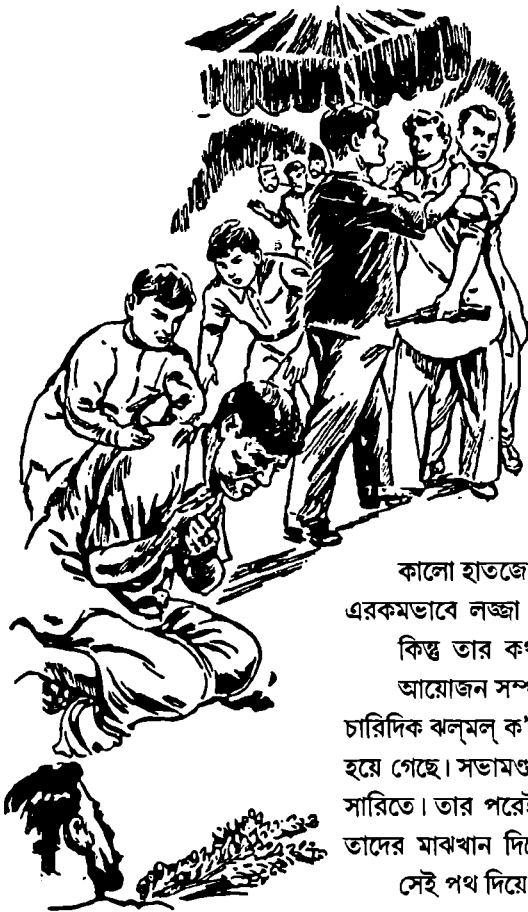
কাল্-দার জয়-জয়কার! কাল্-দাই হরিশবাবুর জীবন রক্ষা করেছে।

হরিশবাবু তার প্রতিদান দিতে কসুর করলেন না।

নিজে টাকা খরচ করে' তাঁর বাড়ীর সুমুখে কারখানার ময়দানে হরিশবাবু তৈরি করালেন এক সুসজ্জিত মণ্ডপ। কাল্-দাকে দেওয়া হবে মানপত্র। কাল্-দার সম্বর্দ্ধনা সভা।

বড় সাহেব নিজে চাঁদা দিলেন পাঁচশ' টাকা। কারখানার আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই দিলে—যার যেমন সাধ্য।

উৎসবের আনন্দে কারখানা মুখরিত হয়ে উঠলো।

কালো হাতজোড় করে' বললে, এ-সব আবার কেন? আমাকে এরকমভাবে লজ্জা দেওয়া আপনাদের উচিত হচ্ছে না।

কিন্তু তার কথা কে শোনে!

আয়োজন সম্পূর্ণ হ'লো। রবিবার সন্ধ্যায় উজ্জ্বল দীপালোকে চারিদিক ঝল্‌মল্ ক'রে উঠলো। কারখানার মাঠ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। সভামণ্ডপে কারখানার সাহেব-মেমেরা বসেছেন প্রথম সারিতে। তার পরেই বসেছে কারখানার ছোট বড় সব কর্ম্মচারী। তাদের মাঝখান দিয়ে বেদীতে যাবার রাস্তা।

সেই পথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে কাল্-দা গিয়ে মঞ্চে বসবে। গলায় ফুলের মালা দেওয়া হবে। ইংরেজিতে মানপত্র লিখেছেন বড় সাহেব নিজে। সেইটিই সর্ব্বপ্রথম পড়া হবে। তারপর হরিশবাবু নিজে পড়বেন ছাপানো মানপত্র বাংলায়। তারপর কালোকে দেওয়া হবে কতরকমের কত উপহার।

আর্ত্ত চীৎকার করে কালো বসে পড়েছে [পৃঃ ৩৩১

● অভিনন্দন
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ফুল আর ফুলের মালা এসেছে প্রচুর। নান্‌কু পর্য্যন্ত দিয়েছে একটা ফুলের স্তবক।

কালো আসছে। ছেলেরা তাকে আনতে গিয়েছিল।

কালো আসছে সবার আগে আগে হাতজোড় করে। পরনে পরিষ্কার খাটো ধুতি, গায়ে হাত-কাটা হাফ্ সার্ট।

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ হ'লো। গুলির আওয়াজ!

আবার আর-একটা!

আর্ত্ত চীৎকার করে' কালো তখন বসে পড়েছে সেইখানে। তার সাদা জামা লাল রক্তে ভেসে যাচ্ছে!

যে-লোকটা গুলি করেছে লোকজন তাকে ধরে' ফেলেছে।

চারিদিকে অসম্ভব গোলমাল। কতক জড়ো হয়েছে কালোর কাছে, কতক সেই লোকটাকে ঘিরে। তার হাতের ষ্টেনগান্ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

কালোর কাছে ধরে আনা হ'লো। কালো তাকে চিনতে পারলে। এ সেই তার বন্ধুর ভাই সুরেশ। যে-বন্ধুকে সে নির্ম্মমভাবে হত্যা করেছিল। এতদিন পরে সে তার প্রতিশোধ নিলে নিজের হাতে।

কালো তাকে একটি কথাও বললে না।

সুরেশও নির্ব্বাক্।

এত লোক যে তাকে এত নির্য্যাতন করলে, তবু তার মুখ দিয়ে একটি কথাও কেউ বের করতে পারলে না।

কালোকে সে যে কেন হত্যা করলে কেউ তা' জানতে পারলে না।

কালোকে দেখবার জন্য কারখানার দু'জন ডাক্তার ছুটে এলেন, কিন্তু কিছুই তাঁরা করতে পারলেন না।

হাতদুটি জোড় করে' হাসতে হাসতে কালো সকলকে প্রণাম করলে। তার পরেই সব শেষ হয়ে গেল।

পুলিশ যখন এলো, কালোর তখন মৃত্যু হয়েছে। মুখের হাসি তখনও তার মিলিয়ে যায়নি।

তারপর—

সে এক মহা সমারোহে হলো তার শব সংকার।

ফুলের মালায় শবদেহ আচ্ছন্ন করে নিয়ে যাওয়া হলো শ্মশানে। বড় সাহেব থেকে নান্‌কু ঝাড়ুদার পর্য্যন্ত সকলেই শবানুগমন করলে।

নদীতীর আলোকিত হলো চিতাগ্নিশিখায়! আর সেই আগুনে আহুতি দেওয়া হ'লো অজস্র পুষ্পসম্ভার। কালোর দেহের সঙ্গে সব-কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

চোখ-ভরা জল নিয়ে কারখানার লোকজন আবার কারখানায় ফিরে' এলো।

---

# ঘনার বচন

প্রেমেন্দ্র মিত্র

উলটোপুরা যাবে কি?
সেখানে চাল সাবেকী।
বিকোয় শুধু ঘোড়ার ডিম,
পাঁচ পা সাপের, ব্যাঙের শিং,
ভিজে বেড়াল, শেয়ানা কাক,
নতুন নরুন, দাও যদি নাক,
শিকড় বাকড়, ফুসমন্তর,
ধাঁধা চোলাই বক-যন্তর।
বিকোয় কিছু, বিকোয় মিছু,
লাফ্ দেয় দর উঁচু-নিচু।

দোকান আছে, সওদা নেই
খরিদ করবে কি?
তিন শূন্যে কে জানে মাল
খাঁটি কি মেকি!

গদ্দিতে গ্যাঁট দোকানদার
দেখা বিস্তি খেলে,
গলায় গামছা দিয়ে বসায়
দাম জানতে গেলে।

শুধোয় আগে ওজন কত,
মাপে বুকের ছাতি,
হাঁটিয়ে দেখে চলন কেমন
ডাইনে না বাঁ-হাতি।

হাঁড়ির খবর খুঁটিয়ে জেনে
পাতে শীতল পাটি,
গড়গড়াতে ছিলিম সাজে
টানলে দাঁতকপাটি।

আদবকায়দা নিখুঁত সবই
বেচা-কেনার ঠাট।
ছাড়ান ছিড়েন নেইক কারো
মাড়ালে চৌকাট।

দামের ওপর দস্তুরি নেয়
বাজিয়ে গুনে টঙ্কা;
তারপরে মাল পাও কি না পাও
কিসের লবডঙ্কা!

উল্টোহাটা যায় তবুও
আদিশূরের নাতি
পরনে তার টেনা জোটেনা,
পাগ্ পঞ্চাশ-হাতী!

# সুন্দরবনে ফুটবল খেলা

**পরিমল গোস্বামী**

গত বছর সুন্দরবনে আন্তর্জাতিক পশুপাখীরা একটি মানব সপ্তাহ পালন করেছিল, আশাকরি সে কথা মনে আছে। আমি ছিলাম সেবারের সেই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি।

কিন্তু আমি চলে আসার পর যে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছিল তা মাত্র অল্প দিন হল আমি জানতে পেরেছি।

মানব সপ্তাহ পালনের সময় অনেক পশুই অনুপস্থিত ছিল। তার কারণ তারা রওনা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পথে দেরি হওয়াতে ঠিক সময়ে এসে পৌঁছতে পারে নি।

আফ্রিকার সিংহ এসেছিল দিন তিনেক পরে। আরও যারা পরে এসেছিল তাদের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের কয়েকটি শেয়াল উল্লেখযোগ্য।

মানব সপ্তাহ শেষে ওরা একটা বৈঠক বসিয়েছিল। ওদের আলোচনার বিষয় ছিল খেলাধুলো।

ওদের পরস্পরের এই প্রথম দেখা এবং এই শেষ দেখা, আর কোনো দিনই দেখা হবে না। তাই ওদের এই মিলন যাতে চিরকাল মনে থাকে এমন কিছু করা দরকার। শেষ পর্যন্ত একটা খেলার আয়োজন করাই ঠিক হল।

হনুমান প্রস্তাব করল ফুটবল খেলা খুব মজার হবে। সে কলকাতার মাঠে একটি গাছে বসে বহুদিন ফুটবল খেলা দেখেছে, অ্যাসোসিয়েশনের নিয়মও সে জানে। হনুমানের বাড়ি যুক্তপ্রদেশে। সে খেলার নিয়ম সব বুঝিয়ে দিল সবাইকে।

ফুটবল খেলাই ঠিক হল।

একটা চিল বলল সেও অনেকবার ফুটবল খেলা দেখেছে, দরকার হলে সে সাহায্য করতে পারবে।

কিন্তু ফুটবল খেলতে যে একটি বল দরকার হয়, সে কথা আগে কারো মনে ছিল না। যখন মনে পড়ল তখন খেলার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেছে।

ভালুক সমস্যার সমাধান ক'রে দিল। সে বলল এ বনে অনেক বল আছে, ভাবতে হবে না।

বল মানে বাতাপি লেবু।

কিন্তু খেলা যখন ঠিক হয়ে গেছে তখন বাতাপি লেবুই সই। এমন কি কিছুই না পেলেও খেলা বন্ধ করার আর সময় ছিল না।

বলের সমস্যা তো কিছুই না, যে সব বড় বড় সমস্যা ওদের সমাধান করতে হয়েছে তা শুনলে অবাক হতে হয়। একটি হচ্ছে—চার পায়ে খেললে তা মানা হবে কি না এবং হ্যাণ্ডবল আদৌ হবে কি না।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক হল শুধু হাতীর হ্যাণ্ডবল হবে, বল যদি তার শুঁড়ে লাগে। কারণ শুঁড়ই হাতীর হাত। খেলার সময় শুঁড়টিকে জড়িয়ে মাথার কাছে রাখতে হবে। আর কারো হ্যাণ্ডবল হবে না।

দল ভাগ হবে কি ক'রে সেইটে ছিল সব চেয়ে বড় সমস্যা। প্রথমে ঠিক হল ভারতীয় এবং অভারতীয় দুই দল হবে এবং জোড় মিলিয়ে খেলোয়াড় দাঁড় করাতে হবে। কিন্তু হিসেব ক'রে দেখা গেল ভারতের ক্যাঙারু নেই, অথচ ক্যাঙারুকে বাদ দিয়ে খেলা চলতে পারে না।

এবং বিদেশের বাঘ নেই, অথচ বাঘ একটি বিশিষ্ট খেলোয়াড়। ভারতীয় হাতী আফ্রিকার হাতী, ভারতীয় গণ্ডার আফ্রিকার গণ্ডার, ভারতীয় সিংহ আফ্রিকার সিংহ—সবই জোড় মেলে, শুধু ঐ দুটি ছাড়া।

অবশেষে ঠিক হল ভারতের দিকে থাকবে শুধু বাঘ, সিংহ এবং চিতা, অন্যদিকে থাকবে মিশ্র পশুরা। ভারতীয়দের পক্ষে গোলরক্ষক শুধু থাকবে হনুমান। ইংরেজ শেয়াল এদের নাম দিল 'ইন্টারন্যাশন্যাল মিক্সড" ভার্সাস "ইণ্ডিয়ান ইলেভেন"। ভারতের দিকের সিংহ, বাঘ ও চিতাকে মিশ্র বলা হল না, তার কারণ প্রাণীতত্ত্ববিদদের মতে এ তিনটিই বিড়াল জাতীয় প্রাণী। ওদের সাধারণ নাম Felis। সিংহ Felis leo, বাঘ Felis tigris এবং চিতা Felis pardus।

● সুন্দরবনে ফুটবল খেলা
পরিমল গোস্বামী

এর পর প্রশ্ন উঠল রেফারির। কে হবে রেফারি? জিরাফ বলল, "আমি চেষ্টা করতে পারি, গলাটা লম্বা, সবটা মাঠ একসঙ্গে দেখতে পাব, আমাকে বাঁশিটা দিন।"

"তাই তো বাঁশির কথা তো ভাবা হয় নি!" ব'লে ময়াল সাপ জিব কাটল। বানর বলল, "কিছু ভাবনা নেই, আমি বাঁশির ব্যবস্থা করছি।"

বানর চট ক'রে নারকল পাতা জড়িয়ে একটা বাঁশি তৈরি ক'রে দিল। জিরাফ বাজাতে লাগল সেটি মুখে নিয়ে। সবাই বলল, বেশ হবে। কিন্তু মিনিট খানেক পরেই দেখা গেল জিরাফের মুখে বাঁশি নেই, সে লজ্জায় ঘাড় হেঁট ক'রে আছে।

সিংহ অধীর ভাবে গর্জন ক'রে বলল, "বাঁশি কি হল?"

জিরাফ ভয়ে ভয়ে বলল, "খেয়ে ফেলেছি।"

জিরাফের উপর যে বিশ্বাস জন্মেছিল সেটি নষ্ট হয়ে গেল; এত লোভ যার তাকে রেফারির পদ দেওয়া যায় না।

রেফারি হল, ক্যাঙারু।

বিদেশী পশুদের অবস্থান ঠিক হল এই রকম ঃ

গোলরক্ষক—হাতী (আফ্রিকা), দুজন ব্যাক—জলহস্তী (আফ্রিকা), তিনজন হাফ ব্যাক—ভালুক (রাশিয়া), পাঁচজন ফরওয়ার্ড—ওরাঙ-উটান (আফ্রিকা) ও ক্যাঙারু (অস্ট্রেলিয়া)।

হাতী গোলরক্ষক হওয়াতে হ্যাণ্ডবলের প্রশ্ন আর রইল না।

সব ঠিক, এমন সময় চিল হঠাৎ ট্যাঁ ট্যাঁ ক'রে উঠল। সে বলল, "বন্ধুগণ, একটি অতি সাংঘাতিক ভুল হয়ে গেছে।"

সবাই চমকে গেল এ কথা শুনে।

চিল বলল, "আগে মনে ছিল না, এখন মনে পড়ল হঠাৎ। ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের একটি নিয়ম আছে, বল হাতে লাগলে হ্যাণ্ডবল নামক একটি অপরাধ হয়। একমাত্র গোলরক্ষক বল হাতে ধরতে পারে, আর কেউ পারে না।"

হনুমান বলল, "হ্যাণ্ডবলের কথা আগেই হয়ে গেছে, অতএব নতুন ক'রে ও কথা তোলার মানে হয় না।"

চিল বলল, "একটু ধৈর্য ধর হনুমান। ফরওয়ার্ড সেণ্টারে তোমরা দাঁড় করাচ্ছ তিনটি ওরাঙ-উটান এবং আউটসাইডে দুটি ক্যাঙারু। এদের মধ্যে ওরাঙ-উটান তিনটি বেআইনি হয়েছে।"

"কেন কেন?"—সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। বাঘ এগিয়ে এসে গর্জন ক'রে বলল, "পায়ে ছুঁলেও হ্যাণ্ডবল হবে কেন?"

ওরাঙ-উটান উৎসাহের সঙ্গে বলল, "দেখুন আর কি—পাখীর আস্পর্ধা দেখুন।"

বাঘ আবার প্রশ্ন করল, "তুমি ভুল বলছ, পায়ে বল লাগলে হ্যাণ্ডবল হবে কেন?"

চিল বলল, "ওরাঙ-উটানের যে পা-ই নেই।"

- সুন্দরবনে ফুটবল খেলা
  পরিমল গোস্বামী

সবাই আবার হৈ হৈ ক'রে উঠল।

চিল বলল, "আমি সত্যি কথাই বলছি। ওরাঙ-উটানের পা নেই, ওর চারখানাই হাত। হনুমানেরও তাই। কি গো হনুমান, জান না এ কথা?"

হনুমান অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

চিল বলল, "শিম্পাঞ্জি, ওরাঙ-উটান, হনুমান এবং ওদের যাবতীয় জ্ঞাতিগুষ্টি—কারোই পা নেই, ওদের চারখানাই হাত। চারখানা হাতই সমান কাজে লাগে—একেবারে সমচতুর্ভুজ ওরা। যাকে ওরা বাজারে পা ব'লে চালাচ্ছে, তা পা নয়, তা ওরা হাতের মতোই ডালপালা ধরার কাজে ব্যবহার করে।"

সবাই স্তম্ভিত হল এ কথা শুনে। বলল, "ওর পা দুখানা যে পা নয়, তার আর কোনো প্রমাণ আছে?"

চিল বলল, "চোখে দেখা ভিন্ন আপাততঃ আর কিছুই নেই। তবে সময় থাকলে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় গিয়ে সেখানকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসতে পারেন।"

বাঘ বলল, "সময় নেই, বিশ্বাস করলাম কথাটা। তার আরও কারণ, হনুমান, ওরাঙ-উটান, সবাই মাথা নিচু ক'রে আছে। কিন্তু ওদের বাদ দিলে, ওদের জায়গায় কে খেলবে?"

চিল বলল, "সহজ মীমাংসা আছে। ওরাঙ-উটানকে গোলরক্ষক করুন এবং ফরওয়ার্ডে দুটি জিরাফকে দাঁড় করিয়ে দিন। ওরা ছুটতে পারে ভাল এবং বল হেড ক'রে গোল দিতে পারবে সহজে।"

অবশেষে তাই ঠিক হল।

ইউনিফর্ম পরার কথা উঠেছিল, কিন্তু তার কোনো দরকার হল না, কারণ দু'পক্ষেই খেলোয়াড়রা সম্পূর্ণ আলাদা, চিনতে অসুবিধে হবে না।

ক্যাঙারু হল রেফারি, শুধু তাকে একটি হাফ প্যাণ্ট পরিয়ে দেওয়া হল।

কিন্তু আবার এক নতুন বাধা। এক ঝাঁক ভ্রমর খুব সন্দেহপূর্ণভাবে রেফারির মাথার চারদিকে এসে গুন্ গুন্ করতে লাগল। রেফারি একটু ভড়কে গেল ওদের এই ব্যবহারে। বেচারা বিদেশী ক্যাঙারু—এদেশের হালচাল কিছুই জানে না।

একটি ভ্রমর জিজ্ঞাসা করল, "তোমাদের ক্যাপ্‌টেন কে?"

এ প্রশ্নে সবাই এ ওর মুখের দিকে চাইতে লাগল। তাই তো, কোনো দিকেই তো কোনো ক্যাপ্‌টেন ঠিক করা হয় নি। তখন সিংহ এগিয়ে এসে বলল, "কি বলবার আছে আমাকে বল।"

ভ্রমর জিজ্ঞাসা করল, "রেফারি মানে কি?"

সিংহ বলল, "তা দিয়ে তোমার কি কাজ?"

এক পণ্ডিত ভ্রমর এগিয়ে এসে বলল, "কাজ আছে। 'রেফারি' সন্ধি বিচ্ছেদ করলে হয় রেফ + অরি। তার মানে রেফের শত্রু। আর আমাদের নাম হচ্ছে, দ্বিরেফ। দ্বিরেফ মানে ভ্রমর। সন্দেহ হচ্ছে, রেফারি মানেই দ্বিরেফারি! তোমরা কি বল?"

বাংলাদেশের পণ্ডিত শেয়ালরা খুব ভাবতে লাগল। ইংল্যাণ্ডের শেয়াল কাছেই ছিল, সে তো কথাটা



● সুন্দরবনে ফুটবল খেলা
পরিমল গোস্বামী

শুনেই একচোট হেসে নিল। হাঃ হাঃ হুয়া হুয়া! তারপর বলল, "রেফারি ইংরেজী কথা, ওর বানান হচ্ছে referee, এর সন্ধি বিচ্ছেদ হয় না। অতএব তোমরা নিশ্চিন্ত থাক।"

ভ্রমররা এ কথায় অনেকটা নিশ্চিন্ত হল, বলল, "বেশ, মেনে নিলাম কথাটা, দেখো যেন ধাপ্পা-টাপ্পা না হয়।"

সবাই হেসে ওঠাতে জলহস্তীর গাছে চড়া আর হল না।

খেলা আরম্ভ হয়ে গেল। কি উল্লাস দর্শকদের মধ্যে! ভারতীয়দের দিকেই সমর্থক বশি, কারণ বিদেশ থেকে তো আর হাজার হাজার পশুপাখী আসতে পারে নি। বল বিদেশী দলের গোলের কাছে যায় আর গোল গোল হালুম হুলুম ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দে সুন্দরবন মুখরিত হয়ে ওঠে। ভারতীয়রা প্রায় পনেরো মিনিট ধ'রে চেপে রেখেছে ওদের, এমন সময় হঠাৎ বাঁশি বেজে উঠল। কি ব্যাপার, না ভারতীয় পক্ষের চিতা অফসাইড ক'রে বসেছে। সেণ্টার থেকে সিংহ বল পাস ক'রে বাঁ ধারে দিয়েছিল ঠিক, কিন্তু চিতা বেগ সামলাতে না পেরে অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছিল তার আগেই। ভারতীয়দের সমর্থকদের 'গোল' 'গোল' চিৎকার থেমে গেল হঠাৎ। তারা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগল। উগ্র সমর্থকেরা জিভ চাটতে লাগল, পা কামড়াতে লাগল, হাত কামড়াতে লাগল, লেজ কামড়াতে লাগল।

দর্শকদের জন্য কোনো গ্যালারি তো আর ছিল না, তাই যে যেখানে সুবিধে বসে গেছে। হনুমান, বানর, চিতা, সাপ আর পাখীরা সবাই গাছের ডাল আশ্রয় করেছে। বাঘ, সিংহ, শেয়াল, পেঙ্গুইন, জলহস্তী, গণ্ডার, জিরাফ, জিব্রা, হাতী—এরা সব মাটিতে দাঁড়িয়ে গেছে। জলহস্তী একবার গাছে ওঠার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সবাই হেসে ওঠাতে তার গাছে চড়া আর হল না।

আবার আরম্ভ হল খেলা। সে কি খেলা! দু'তিন মিনিট পর পর বল ফেটে যাচ্ছে, তখুনি আবার

● সুন্দরবনে ফুটবল খেলা
পরিমল গোস্বামী

নতুন বলের যোগান দেওয়া হচ্ছে। লাইনসম্যানের কাজ করছে বানরেরা। এইবার পালা এলো বিদেশী দলের। ভালুক বল নিয়ে যেন ভেল্‌কি খেলছে, এর উপর ক্যাঙারুর লাফ আর জিরাফের দৌড়। বাঘেরা একেবারে ঘেমে উঠেছে, হাঁফাচ্ছে। বিপক্ষের ক্যাঙারু অদ্ভুত খেলছে—নিজেই বল এগিয়ে দিয়ে নিজেই এক লাফে গিয়ে ধ'রে নিচ্ছে। গোল হয় হয়, ভারতীয় উগ্র সমর্থকদের সুর নরম হয়ে এসেছে, এমন সময় বাজল বাঁশি! কি ব্যাপার? না ভারতীয় দল ফাউল করেছে পেনালটি এরিয়ার মধ্যে। হায় হায় কি সর্বনাশ! তার মানে ভারতীয়দের গোল খাওয়া এবারে কে ঠেকায়।

ঘটনাটা ঘটেছে এই ঃ ক্যাঙারু যখন বল নিয়ে যমের মতো এগিয়ে যাচ্ছিল গোলের দিকে, তখন ভারতীয় পক্ষের হাফ ব্যাক চিতা (হাফ বাঘও বটে) তার লেজটি ক্যাঙারুর পায়ে জড়িয়ে তাকে চিৎ ক'রে ফেলেছে। নির্ঘাৎ ফাউল।

আন্তর্জাতিক দর্শকেরা আনন্দে হৈ হৈ করতে আরম্ভ করেছে। ভারতীয় দর্শকদের মুখ শুকিয়ে গেছে। গোটাকত হনুমান, চিতা ও ময়াল সাপ মূর্ছিত হয়ে গাছ থেকে নিচে পড়ে গেল। কিন্তু কে আর এখন তাদের ফার্স্ট এড্ দেয়!

ওদিকে ভারতীয় উগ্র সমর্থকদলের মধ্যে চট ক'রে কি একটা গোপন পরামর্শ হল, আর সঙ্গে সঙ্গে তারা গর্জন করতে করতে দর্শকদের সীমানা পার হয়ে ছুটে এলো রেফারির দিকে এবং এসেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অন্যরা চেঁচাতে লাগল, "ফাউল হয় নি, ফাউল হয় নি, অ্যাসোসিয়েশনের রুল বুকে লেজের বিরুদ্ধে কোনো আইন নেই, আমরা মানব না এ ফাউল।"

ততক্ষণে রেফারি ক্যাঙারুর অবস্থা অতি শোচনীয় হয়ে উঠেছে। অতগুলো বাঘের চাপে প্রাণ যায়। এমন সময় হঠাৎ তার এক ঘটনা মনে পড়ে গেল। তাদের দেশে ঠিক এমনি চাপে প'ড়ে এক চোর তাদের জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছিল,—গড সেভ দি কিং। এ গান গাইলে সবাইকে উঠে দাঁড়াতে হয়। চোর বেঁচে গিয়েছিল সেবারে। ক্যাঙারুরও এখন বাঁচবার ঐ একটি মাত্র উপায়ই আছে। পরীক্ষা করতে বাধা কি? সে বাঘেদের চাপের ভিতর থেকে ভাঙা বাংলায় গেয়ে উঠল 'জন গণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা'।

আশ্চর্য ফল হল। বাঘেরা সঙ্গীতের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য উঠে দাঁড়াল, ক্যাঙারুও আপাততঃ বেঁচে গেল।

বিদেশীরা একত্র হয়ে আলোচনা করতে লাগল নিজেদের মধ্যে। তারা বলল, এ রকম তো কোনো দেশে হয় না, ফুটবল খেলায় রেফারির উপর আক্রমণ কোথাও তারা দেখে নি। ওরাঙ-উটান বলল, "বুঝতে পারছি ভারতের এটা বড় খারাপ সময় চলেছে। এ সবই দুর্নীতির ফল।" তারপর সে ইংল্যাণ্ডের শেয়ালদের দিকে চেয়ে বলল, "আর এটি তোমাদেরই কীর্তি—তোমরা যারা এতদিন এ দেশ দখল ক'রে ছিলে। আফ্রিকাতেও আমাদের অবস্থা এই রকম করেছ, কিংবা আরও খারাপ। অতএব ভাই সব, নিন্দা ক'রে লাভ নেই। আমরা পরস্পর দূরে দূরে আছি, তাই কেউ কাউকে চিনি না, কেউ কাউকে ভালবাসি না।"

● সুন্দরবনে ফুটবল খেলা
পরিমল গোস্বামী

ক্যাঙারু জিজ্ঞাসা করল, "কি করলে দেশে দেশে বন্ধুত্ব হতে পারে?"
ভালুক এগিয়ে এসে বলল, "সংস্কৃতি বিনিময়ে হতে পারে।"
ওরাঙ-উটান বলল, "ঠিক্ কথা। চল আমরা এ বিষয়ে পরামর্শ করিগে।"

"দস্তুর যা, তা মানতেই হবে। কি বলেন মোসা?"

অন্যদিকে—বাংলাদেশের যে সব বাঘের মাথা ঠাণ্ডা, তারা বিদেশীদের কাছে কি ক'রে মুখ দেখাবে এই ভয়ে চুপে চুপে জঙ্গলে গিয়ে বসেছে। এক বুড়ো বাঘ আর এক বুড়ো বাঘকে বলল, "কি জানি ভাই খেলার নিয়ম তো জানি না।" কাছে এক হনুমান ছিল, বাঘ তাকে জিজ্ঞাসা করল, "ভাই তুমি বলত, এই রেফারির উপর ঝাঁপিয়ে পড়া কি আইন-সঙ্গত হয়েছে?"

হনুমান বলল, "আরে মোসা, কলকাতার মাঠে রেফারির উপর হামলা চালানোই তো দস্তুর মনে হয়। দেখেছি কি না—কয়েক বছর ধ'রে দেখে আসছি। এই হামলা, এই আক্রমণ হয় বলেই তো খেলার মজা। আর এই জন্যই তো দর্শকদের সংখ্যা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে সেখানে। রেফারিকে মারা বোধ হয় অ্যাসোসিয়েশন থেকে পাস হয়ে যাবে। দস্তুর যা, তা মানতেই হবে। কি বলেন, মোসা?"

বাঘ অবাক হয়ে হনুমানের দিকে চেয়ে রইল। সত্যিই তো দর্শকেরা এতে আমোদ পায়, একে তো মানতেই হবে। বলল, "ঠিক বলেছ ভাই, খেলার ওটাই তো উদ্দেশ্য, একটু আমোদ করা, তা যে ভাবেই হোক, হলেই হল। আচ্ছা এসো ভাই, ধন্যবাদ।"

বাঘ নীরবে জঙ্গলে ঢুকে গেল। এর পরে কি হল সে রিপোর্ট এখনও পাইনি।

---

# শিকারী জীবন

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

সেবার ভীষণ গরম পড়েছে—ঘরে থাকা মহাদায়
ফুটি-ফাটা হ'য়ে মাঠগুলো যেন সাগর শুষিতে চায় ।
ভিজে খস্‌খসে জানালা দরজা ঢাকিয়া নিয়েছি, তাই
"কোল্ড ষ্টোরেজের" আরামের সুখ আমারো যে পাওয়া চাই ।
সঙ্গী শুধুই ছয়টি কুকুর "গ্রেট ডেন"—পরিচয়
মার্ব্বেল-মেঝে-শয্যায় আছে মহাসুখে নিশ্চয় !

বেলা দু'পহর, বাহিরে অনল—প্রখর সূর্য্যতাপে
ঘরের মধ্যে আমি শুয়ে আছি অন্ধকারের খাপে !
এমন সময় সিঁড়িতে কাহার হইল পদধ্বনি—
পুরানো কালের ভুঁড়িয়াল চোবে সাড়া দিল তক্ষণি ।
কহিল, "হুজুর, একাঠা কিষাণ জানালো সে নিবেদন
শের মহারাজ পানের বরজে করিয়াসে আগমন ।"
কহিনু, "কোথায়, ডেকে নিয়ে এসো, সে কোন্ মূর্ত্তিমান্,
ভরা দুপুরে, এলো কী পুলকে, শুনি তারই ব্যাখ্যান ।"

কথা না সরিতে উদয় হইল জয়নাল, মহারবে
কহিল "ব্যাঘ্র—হুজুর, শীঘ্র—এখুনি যেতে হবে ।"
ঈষৎ হাসিয়া বলিনু তাহারে—"এ কথা সত্য বটে,
বাঘের খবর দিলে বখ্‌শিশ—কিন্তু তোমার ঘটে
একটু বুদ্ধি না রাখিলে চলে? জানেরও মূল্য আছে—
সেটা ভুলে গেলে চলে কী কখনো—বিশেষ আমার কাছে ?"

ফুলাইয়া গাল কহে জয়নাল—"এদিকে ছাগল ভেড়া
সাবাড় দিলে যে শোরের বাচ্চা—যত গরু সেরা সেরা

'টেরাই' করেই দেখা যাক্ তার বিক্রম কতখানি
হুজুরের কাছে ঘায়েল হবে যে নিশ্চয় তাহা জানি।"
কহিলাম তারে—"তবে যেতে হোলো—এসো চোবে মহারাজ,
কুকুর লইয়া যাব এই রণে, লোকজনে নাহি কাজ।
মোটর গাড়ীটা আর "ভ্যান্" নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকো
জমাদারও যাবে কুকুরের সাথে, কোথায় সে, তারে ডাকো।"

চিন্তিত চোবে, ভুঁড়িতে বুলায়ে দক্ষিণ করতল,
"পেটমে বহুৎ দরদ" কহিয়া খুঁজিতে লাগিল ছল
কি ক'রে এড়াবে দারুণ রৌদ্রে শিকারের উৎসব।
কহিনু, "কিছুটা ঘাম ঝরিলেই ঠিক হ'য়ে যাবে সব।"
মাথল মাথায় লুঙ্গি পরনে জয়নাল আগে চলে,
আমিও তাহার পশ্চাতে আছি শিকারের কুতূহলে।
মোটরে উঠিয়া জলের কুঁজোটি রাখিনু ততক্ষণ,
লোটা সোঁটা নিয়ে সামনের "সীটে" চোবের সিংহাসন।

প্রচণ্ড রবি মাথার উপরে আগুন ঢালিয়া যায়
বহ্নিধারায় স্নান করে ধরা শুদ্ধা হইতে চায়।
জল হাতে নিয়ে দিই চোখে মুখে—উঃ আঃ বাবাঃ বুলি—
চোবেজী করিছে—দাদারে ঃ আহা রে ঃ ভিজে অঙ্গোছি তুলি
মুণ্ডিত শিরে পিছনে দুলিছে সুদীর্ঘ টিকি তার
তাই বেয়ে জল পড়ে অবিরল পৃষ্ঠের চারিধার।
অবাক করিল জয়নাল শুধু—সাহসের সীমা নেই—
নির্বাক হ'য়ে আছে বুঢ়া ডুবে বাঘের চিন্তাতেই!

* [illegible]

[illegible] রায়

বলরামপুর নয় বহুদূর—কিছুটা বালির পথ
"এ্যানা প্যাড়ালোডা" রোড় মেনে, তায় উঠি' বাষ্পীয় রথ,
লাগিল নাচিতে, তাল দিয়ে মোরা সঘনে উঠিনু দুলি',
দুপাশের ধুলো—পাউডার মাখি'—সাধ্য কী চোখ খুলি'

দেখি চারিধারে—এলাম কোথায়—
আর কত পথ বাকী !
হেনকালে গাড়ী থামাতে বলিয়া
জয়লাল কাছে ডাকি'
"ঐ যে হোথায় পানের বরজ,
এখানেই নেমে যাই
ওরে আস্‌গর, ব্যাটা বল দেখি,
ব্যাঘ্র আছে, কী নাই?"
বৃক্ষের পরে ছোট্ট ছেলে সে
শুয়ে আছে লাবেজান—
শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দেয়—
"ঠিক আছে বাপজান ।"

চোবে মহারাজে দিলাম রেহাই—পাঁচটি কুকুর সাথে
জয়লাল সহ পানের বরজে, বন্দুক লয়ে হাতে
গেলাম যখন, হেরিনু লম্বা চওড়া সে গ্রীনরুম
ঘন পাটকাঠি শক্ত বাঁধনে—আচ্ছাদনের ধুম !
সূর্য্য-কিরণ প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে বারে বারে
ভিতরে আরাম করিছে বিরাম শীতল অন্ধকারে ।
এতোটুকু এক দরজার ফাঁকে মাথা গলে যাওয়া যায়,
ভিতরে কিন্তু ঘন জঙ্গলে এগুনো বিষম দায় !

● শিকারী-জীবন
শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

বাহিরে দাঁড়ায় কুকুরের দল লেলিয়ে দিলাম তাই
লালফৌজের কিস্মতে তারা দেখায় যে খ্যামেসাই।
মহা বিক্রমে তেড়ে গেল সবে পানের বরজ মাঝে
ব্যাঘ্রমশাই কুঞ্জবিহারে কোথায় লুকিয়ে আছে।

হঠাৎ সঘন গর্জ্জন জাগে
নাভিকুণ্ডের ডাক
ব্যাঘ্রের সনে কণ্ঠ মিলায়ে
সারমেয় ছাড়ে হাঁক!
বেগতিক বুঝে শার্দ্দূল প্রভু
বাহিরে ছুটিয়া আসে
বাঘের মতই কুকুরগুলিরে
দেখিয়া দারুণ ত্রাসে।
আর কোথা যায়—বন্দুক মোর
নিমেষে গরজি ওঠে
বক্রভঙ্গী ব্যাঘ্রলম্ফ পলকে
ধরায় লোটে!
আর এক গুলী—কিন্তু
তাহার প্রয়োজন নেই আর
যেটুকু জীবন ধরে ছিল তাও কোথায় যে গেল তার
সংবাদ রাখে চিরন্তনের চিরমহাজন সেই
মানুষ বাঘের বাঁচা ও মরাটা চলে যাঁর নিয়মেই!

এলো আস্‌গর, এলো সে চৌবে, জয়নাল আসে আর
কুকুরগুলিও লম্ফপ্রদান করিছে বারম্বার!
উপরে তপন তাপন কিরণে বরিষে আশীর্ব্বাণী
রঞ্জিত হ'ল ব্যাঘ্র-শোণিতে ধরার অঙ্গখানি।

---

# মায়ের দাসীত্ব মোচন

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

(১)

বহু বহু যুগ আগেকার কথা। আর এক পৃথিবীর কথা। তখন পৃথিবীতে ছিল সত্য-যুগ।

মহা-ঋষি কশ্যপ তাঁর দুই পত্নী, কদ্রু আর বিনতাকে ডেকে বল্লেন, তোমাদের দুজনার সেবায় আমি পরম পরিতুষ্ট, আমি সৌর-মণ্ডল প্রদক্ষিণে যাচ্ছি, তোমরা বর চাও!

কদ্রু সপত্নী বিনতাকে মনে মনে ভীষণ হিংসা করতেন, তাই তিনি ঋষির কাছে বর চাইলেন, আপনার বরে আমার যেন মহা-বলশালী সহস্র নাগ সন্তান হয়!

কদ্রুর প্রার্থনা শুনে বিনতা বল্লেন, হে ঋষি, আমার সহস্র সন্তান চাই না, আপনার বরে আমি যেন দুটি মাত্র পুত্র-সন্তান পাই কিন্তু তারা দুজনেই যেন কদ্রুর সহস্র সন্তান থেকে বলশালী হয়!

মহা-ঋষি কশ্যপ তথাস্তু বলে দুজনকেই ঈপ্সিত বরদান করে চলে গেলেন।

(২)

কালক্রমে ঋষির বরে কদ্রু সহস্র নাগ-অণ্ড প্রসব করলেন আর বিনতা মাত্র দুটি অণ্ড প্রসব করলেন।

কদ্রুর যত্নে সেই সহস্র অণ্ড একটু একটু করে বড় হতে লাগলো এবং যথাকালে সেই সহস্র অণ্ড বিদারণ করে অমিত-তেজ সহস্র নাগশিশু বেরিয়ে এলো।

কিন্তু বিনতার সেই দুটি অণ্ড তেমনি পড়ে থাকে। তারা একটু একটু করে আকারে বড় হতে থাকে বটে কিন্তু অণ্ড বিদারণের কোন লক্ষণই দেখা যায় না। বিনতাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কদ্রু উপহাস করে, সে-উপহাসে বিনতা লজ্জায়, ক্ষোভে ভেঙ্গে পড়ে।

একদিন বিনতা আর ধৈর্য্যধারণ করে থাকতে পারলেন না, একটি অণ্ড নিয়ে তিনি নিজেই ভেঙ্গে ফেল্লেন। ভেঙ্গে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অণ্ডের ভেতর থেকে সহস্র হীরক-দ্যুতির মত আলো ঝলমল করে উঠলো, মহা-বেদনায় বিনতা দেখেন, অণ্ডের ভেতর থেকে এক বিচিত্র শিশু বেরিয়ে এলো, তার অর্দ্ধ দেহ গঠিত, আর অর্দ্ধ দেহ অগঠিত।

বিনতাকে ডেকে সেই অগঠিত শিশু অভিশাপ দিয়ে উঠলো, সপত্নীর জ্বালায় তুমি যেমন অধীর হয়ে অগঠিত অবস্থায় বিকলাঙ্গ করে আমাকে জন্ম দিলে, আমার অভিশাপে তেমনি তোমাকে সেই সপত্নীরই দাসীত্ব করতে হবে!

শোকে, বেদনায় বিনতার দু'চোখ অশ্রুতে ভরে এলো। অশ্রু-ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখলেন, সেই জ্যোতির্ম্ময় অগঠিত শিশু সূর্য্যলোকের দিকে চলে গেল।

বিমূঢ় বিনতার কাণে এলো দৈববাণী, এক পুত্রের অভিশাপে তুমি হবে দাসী, কিন্তু দ্বিতীয় পুত্রের

শৌর্য্যে বীর্য্যে তুমি মুক্ত হবে দাসীত্ব থেকে! অধীর না হয়ে অপেক্ষা করে থাক সেই মুক্তিদাতা দ্বিতীয় পুত্রের জন্মলগ্নের জন্যে!

অবশিষ্ট সেই একটি অণ্ডের দিকে চেয়ে বিনতা অশ্রু-নেত্রে অপেক্ষা করে থাকেন, অপেক্ষা করে থাকেন পাঁচশত বর্ষ! নীরবে শুধু অন্তরে প্রার্থনা করেন, কবে তুমি আসবে, হে পুত্র, হে জননীর মুক্তিদাতা!

(৩)

পাঁচশত বর্ষের অপেক্ষার পর বিনতা সহসা একদিন দেখলেন, অণ্ড যেন ভেতর থেকে নড়ে উঠলো...অণ্ডের মসৃণ গায়ে ফাটল ধরলো...সেই ফাটলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো দীর্ঘচঞ্চু বিরাটকায় এক পক্ষী, গরুড়।

অণ্ড ভেদ করে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে গরুড়ের দেহ আকাশের মেঘের মত বিরাট হয়ে উঠলো, তার দুই পাখার বিধুননে বাতাসে ঝড় জেগে উঠলো। বিনতা ভীত হয়ে উঠলেন।

জননীকে ভীত দেখে গরুড় নিজের দেহকে আবার সঙ্কুচিত করে ফেল্লেন। জননীর কাছে এসে সদ্যজাত গরুড় বলেন, মাগো, আমি ক্ষুধার্ত্ত!

বিনতা সখেদে বলেন, তোর উপযুক্ত আহার আমি কোথায় পাব?

গরুড় বলেন, তার জন্যে তুমি ভেবো না, আমার আহার আমি নিজেই সংগ্রহ করে নিচ্ছি!

এই বলে গরুড় নিজের দেহকে আবার বিপুল করে বিরাট দুই পাখা মেলে আকাশে ঝড় তুলে নবোদিত সূর্য্যের দিকে উড়ে চলেন।

তার বিরাট দেহের ছায়ায় পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে আসে। দিনের বেলায় হঠাৎ অন্ধকার দেখে সহস্র-নাগ-পুত্র-বেষ্টিত কদ্রু আকাশের দিকে চেয়ে দেখেন, দেখেন সমস্ত সূর্য্যের আলো-কে অঙ্গে মেখে গরুড় উড়ে চলেছেন...

(৪)

বিনতার বুকে সঙ্গোপনে কাঁপে প্রথম পুত্রের অভিশাপ, দাসীত্ব, সপত্নীর দাসীত্ব...কদ্রুর অন্তরে কাঁপে আশঙ্কা, মহা-আশঙ্কা...কদ্রু বুঝতে পারেন, তাঁর সহস্র পুত্রের চেয়ে ঢের বেশী বলশালী বিনতার একটি মাত্র পুত্র।

দিবানিশি কদ্রু মনে মনে ভাবেন, কি করে সপত্নী বিনতার তেজ ম্লান করবেন।

(৫)

সমুদ্র-মন্থনের কথা নিয়ে আলোচনা করতে করতে হঠাৎ কদ্রু বিনতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সমুদ্র মন্থনের সময় যে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব উঠেছিল, তার রঙ কি?

বিনতা উত্তর দেন, উচ্চৈঃশ্রবা শ্বেত-বর্ণের!

কদ্রু প্রতিবাদ করে বলেন, কিন্তু তার পুচ্ছ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ!

বিনতা বলেন, অসম্ভব!

কথায় কথায় কদ্রু বিনতাকে তর্কের উত্তেজনায় আকর্ষণ করে নিয়ে আসেন। দুজনেই তর্কে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তখন সময় বুঝে কদ্রু বলেন, বেশ, এই নিয়ে দেবতা সাক্ষী করে পণ রাখা যাক্। যদি তোমার

● মায়ের দাসীত্ব মোচন
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

কথা সত্য হয়, তা হলে আমি পাঁচশত বৎসর তোমার দাসীত্ব করবো...আর আমার কথা যদি সত্য হয়, তা হলে তোমাকে পাঁচশত বৎসর আমার দাসীত্ব করতে হবে!

বিনতা স্থির জানতেন, দুগ্ধ-শুভ্র উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ কখনো কৃষ্ণবর্ণ হতে পারে না, তাই কদ্রুর কথায় তিনি সম্মত হলেন।

বাড়ী ফিরে এসে কদ্রু তাঁর সহস্র নাগ-পুত্রদের ডেকে পাঠালেন, বিনতার সঙ্গে পণের অঙ্গীকারের কথা জানালেন, বল্লেন, জননীর মানরক্ষার জন্যে তোমাদের আজ রাতেই এক কাজ করতে হবে...উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছকে আবৃত করে তোমরা এমন ভাবে ঝুলে থাকবে, যাতে পুচ্ছকে কৃষ্ণবর্ণ দেখায়!

জননীর আবেদনে তারা সম্মত হলো।

(৬)

রাত্রি প্রভাত হতেই কদ্রু বিনতাকে নিয়ে উচ্চৈঃশ্রবা দর্শনে বেরুলেন। উচ্চৈঃশ্রবার কাছ বরাবর যেতেই কদ্রু চীৎকার করে বলে ওঠেন, ঐ দেখ, আমার কথাই সত্য, উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ!

বিস্ময়ে হতবাক বিনতা দেখেন, সত্যই দুগ্ধ-শুভ্র অশ্বের পুচ্ছদেশ ঘন কৃষ্ণবর্ণ! তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে জেগে ওঠে তাঁর প্রথমজাত পুত্রের অভিশাপের স্মৃতি! এমনি করেই সেই অভিশাপ সত্য হলো!

লজ্জায়, বেদনায় বিনতা মাথা হেঁট করে থাকেন,—পণে বদ্ধ তিনি, পণ রক্ষা করতেই হবে.... পাষাণে বুক বেঁধে স্বীকার করে নেন্ সপত্নীর দাসীত্ব!

(৭)

ক্ষুধার সাময়িক নিবৃত্তি করে গরুড় ফিরে এলেন জননীর কাছে। ফিরে এসে দেখেন, জননীর মুখ ম্লান, এমন ম্লান মুখ তিনি আর কিছুরই দেখেন নি।

কাতরে জননীকে জিজ্ঞাসা করেন, মাগো, কিসের জন্যে তুমি এমন ম্লান বিষণ্ণ হয়ে আছ? আমি কামচারী গরুড়, তোমার পুত্র, ইন্দ্রকেও ভয় করি না...তুমি সেই গরুড়ের জননী, কেন তুমি থাকবে বিষণ্ণ হয়ে?

পুত্রের কথায় জননী বিনতার মাতৃ-হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে কিন্তু সেই নিদারুণ দাসীত্বের কথা পুত্রকে জানাতে তাঁর মুখে ভাষা জোটে না।

মাকে তবুও বিষণ্ণ নীরব দেখে গরুড় বলেন, মাগো, তুমি আদেশ দাও, আমি এই মুহূর্ত্তে খেলার কন্দুকের মতন সূর্য্যকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলছি, আমার এই পাখার ঝাপটে মন্থিত সমুদ্রকে আবার উদ্বেল করে তুলছি, বল মা, চুপ করে থেকো না!

তবুও বিনতা মাথা হেঁট করে থাকেন।

এমন সময় সারা অঙ্গে অলঙ্কার ঝলমল করতে করতে কদ্রু এগিয়ে আসেন। ঘাড় তুলে বিনতাকে আদেশ করেন, আমি রম্য দ্বীপে যাব ছেলেদের সঙ্গে দেখা করতে....আমাকে কাঁধে করে নিয়ে চল!

গরুড় সেই অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে শিউরে ওঠেন। বিনতার লাঞ্ছনাকে নিবিড় করবার জন্যে কদ্রু এই জাতীয় অসম্ভব সব আদেশ করতেন।

জননীর দিকে চেয়ে গরুড় জিজ্ঞাসা করেন, কি ব্যাপার মা?

জননী বিনতার দু'চোখ দিয়ে শুধু অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

● মায়ের দাসীত্ব মোচন

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

কদ্রু বলেন, তোমার মা পণে হেরে আমার দাসী হয়েছেন। দাসীকে যা আদেশ করবো, তা পালন করতে সে বাধ্য!

গরুড় বিস্ময়ে জননীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেন, এ কি সত্যি মা?

বিনতা বলেন, হাঁ, সত্য! দুর্ভাগ্য তোমার, তুমি দাসী-পুত্র হয়েই জন্মেছ!

গরুড় বলেন, দাসী-পুত্র হয়ে জন্মাতে পারি কিন্তু গরুড় কখনো দাসী-পুত্র হয়ে থাকতে পারে না!

কদ্রুর কাছে এসে গরুড় বিনয়ে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি আমাকে বলুন, কি হলে আপনি আমার জননীকে দাসীত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারেন?

কদ্রু মনে মনে ভাবেন। সব চেয়ে অসম্ভব যা, দাসীত্বের বিনিময়ে তাই তিনি চাইবেন। তাই গরুড়ের কথায় উত্তর দেন, যদি সূর্য্যলোক থেকে অমৃতভাণ্ড এনে আমাকে দিতে পার, তাহলে দাসীত্বের পণ থেকে তোমার জননীকে মুক্তি দিতে পারি!

স্বচ্ছন্দে গরুড় বলে ওঠেন, তাই হবে...সূর্য্যলোক থেকে অমৃতভাণ্ডই আপনাকে এনে দেবো!

সর্পমাতা কদ্রু হেসে ওঠেন। বলেন, বেশ, সেই অসম্ভবের জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম!

গরুড় স্থির কণ্ঠে বলেন, অসম্ভবকে সম্ভব করবার জন্যেই গরুড় জন্মেছে!

(৮)

পুত্র-গর্ব্বে বিনতার মাতৃহৃদয় ভরে ওঠে। আদর করতে করতে পুত্রকে বলেন, কিন্তু তুই কি করে সূর্য্যলোক থেকে অমৃত আনবি? সে যে দেবতারও অসাধ্য কাজ!

গরুড় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলেন, তোমার গরুড় যে দেবতাদেরও চেয়ে শক্তিশালী! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঋষির তপস্যার শক্তিতে আমার জন্ম...আমার শক্তির কি কোন সীমা আছে? কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছে...মনে হয় বিশ্ব-চরাচর খেয়ে ফেলি! তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা, ক্ষুধার নিবৃত্তি করেই আমি অমৃত সংগ্রহে যাচ্ছি! তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর!

বিনতা পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করেন কিন্তু হঠাৎ সেই সময় তাঁর একটা কথা মনে পড়ে গেল। আঙ্গুলের পর্ব্বের মত ছোট যাট হাজার বালখিল্য ঋষি গাছের ডালে ঝুলে যুগ-যুগান্ত ধরে তপস্যা করছেন। পাছে কীটপতঙ্গ মনে করে গরুড় তাঁদেরও খেয়ে ফেলেন, তাই তিনি সতর্ক করে দিলেন, তপস্যা-সিদ্ধ ঋষির ক্রোধের চেয়ে ভয়াবহ জিনিস সৃষ্টিতে আর নেই। ভুলেও যেন গরুড় তাঁদের কাছে না যায়!

মাকে প্রণাম করে গরুড় আকাশ কাঁপিয়ে উড়ে চল্লেন।

(৯)

কিন্তু মহাবিপদে পড়লেন। পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা, অথচ জননীর সতর্কবাণী মেনে বেছে বেছে খেতে গিয়ে তাঁর খাওয়া হয় না। যা সামান্য প্রাণী মেলে, তাতে পেট ভরে না। সর্ব্বদাই ভয় হয়, কোথায় কোন্ গাছে বালখিল্য ঋষিরা ঝুলছেন, হয়ত তাঁর ডানার ঝাপটেই সেই ডাল ভেঙ্গে পড়ে যাবে!

ঘুরতে ঘুরতে গরুড় রিক্ত-তরু প্রান্তরের দেশে এসে পড়লেন, দেখেন সেখানে তরুও নেই, কিন্তু কোন প্রাণীও নেই। ক্ষুধায় শরীর অবশ হয়ে আসে। এমন সময় আকাশ থেকে গরুড় দেখলেন, তাঁর জন্মদাতা মহা-ঋষি কশ্যপ এক পর্ব্বত-চূড়ায় ধ্যানস্থ বসে আছেন।

গরুড় নেমে কশ্যপের সামনে উপস্থিত হলেন এবং পিতৃ-বন্দনা করতে লাগলেন। ধ্যান ভেঙ্গে কশ্যপ

● মায়ের দাসীত্ব মোচন
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

গরুড়কে দেখে বিস্মিত হলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, এই বিরল-প্রাণী দেশে কিসের জন্যে তিনি এসেছেন?

পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে গরুড় বলেন, এখন আমি ক্ষুধার জ্বালায় বড়ই বিপন্ন বোধ করছি, আপনি আমাকে বলে দিন্, নিরাপদে কোথায় খাদ্য সংগ্রহ করতে পারি!

মহা-ঋষি কশ্যপ ক্ষণকাল চিন্তা করেন, তারপর বলেন, ভালই হয়েছে, তুমি শ্বেত-অরণ্যের মহা সরোবরে যাও...সেখানে দেখবে এক বিশালকায় গজ আর বিরাট দেহ কচ্ছপ প্রতিমুহূর্ত্ত পরস্পরকে আক্রমণ করছে, তুমি তাদের দুজনকেই উদরসাৎ করতে পার!

গরুড় বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, এ তো বড় অদ্ভুত ব্যাপার! তারা কে, কেনই বা প্রতিমুহূর্ত্ত পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করছে?

মহাঋষি কশ্যপ বলেন, তাদের কাহিনী সত্যই অদ্ভুত, শোন বলছি!

(১০)

বিভাবসু আর সুপ্রতীক, দুই সহোদর ভাই। মুনির সন্তান। মৃত্যুর সময় মুনি বিরাট ঐশ্বর্য্য রেখে গেলেন।

আত্মীয়-স্বজনেরা সেই ঐশ্বর্য্যের লোভে দুই ভায়ের মধ্যে বিরোধ বাধাবার চেষ্টা করতে লাগলো। এবং ঐশ্বর্য্যের চেয়ে বিরোধের বড় বিষয় আর কিছুই নেই।

দুই ভাই মিলে মিশে এক সঙ্গে ছিল। আত্মীয়েরা রাতদিন তাদের কাণে জপাতে লাগলো, সম্পত্তি ভাগ করে নেবার কথা। আত্মীয়েরা জানতো, সম্পত্তি ভাগ করতে গেলেই বিরোধ লাগবে।

আত্মীয়দের কথায় অবশেষে দুই ভাই সম্পত্তি ভাগ করে নেবার কথা তুল্লো। সম্পত্তির দু-অংশ সমান ভাবে ভাগ করা হলো। কিন্তু বিভাবসুর হিতৈষীরা বিভাবসুকে বোঝাতে লাগলো, তাকে ফাঁকি দিয়ে ছোট ভাই সুপ্রতীক বেশী নিয়েছে। সুপ্রতীকের হিতৈষীরা সুপ্রতীককে বোঝাতে লাগলো, এইভাবে বিভাবসু তার ন্যায্য অংশের বেশী নিতে চায়।

হিতৈষীদের প্ররোচনায় দেখতে দেখতে দু'ভায়ের প্রীতি উবে গেল। প্রত্যেক ছোটখাট ব্যাপারে তারা পরস্পরকে সন্দেহ করতে লাগলো। সন্দেহ সংঘর্ষে পরিণত হয়।

এইভাবে একদিন যখন দুই ভায়ে তুমুল ঝগড়া হচ্ছে, তখন বড় ভাই বিভাবসু রেগে ছোট ভাইকে অভিশাপ দিলে, পরের কথায় বিশ্বাস করে তুই সহোদর ভাইকে অবিশ্বাস করিস্, আমি অভিশাপ দিচ্ছি, বনে তুই গজ হয়ে পড়ে থাকবি!

সেই অভিশাপ শুনে ছোট ভাই সুপ্রতীক রেগে গর্জ্জে উঠলো, আমার ন্যায্য অংশ থেকে আমাকে বঞ্চিত ক'রে আবার আমাকেই তুই অভিশাপ দিলি, আমিও অভিশাপ দিচ্ছি, তুই সেই বনে কচ্ছপ হয়ে থাকবি!



এইভাবে দুই ভাই পরস্পর পরস্পরের অভিশাপ টেনে আনলো। এবং সেই অভিশাপের বন্ধনে তারা যুগ-যুগান্ত ধরে মহা-সরোবরের ধারে মনুষ্যজন্মের প্রবৃত্তি অনুযায়ী প্রতিমুহূর্ত্ত পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করে চলেছে। কেউ কাউকে পরাজিত করতে পারে না, অথচ কলহ থেকে থামতেও পারে না। ভ্রাতৃ-বিরোধের এই শাস্তি। তাই তুমি যদি তাদের উদরসাৎ কর, তা হলে মহা-অভিশাপ থেকে তাদের মুক্ত করবে!

পিতার মুখ থেকে সেই অদ্ভুত কাহিনী শুনে গরুড় গজ-কচ্ছপের সন্ধানে আকাশে উঠলেন।

● মায়ের দাসীত্ব মোচন

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

(১১)

কিছুক্ষণ আকাশে ওড়ার পর গরুড় দেখলেন, নীচে এক বিরাট সরোবরে দশ যোজন দেহ নিয়ে বিরাট কচ্ছপ সমস্ত জল আলোড়ন করে বেড়াচ্ছে, আর বিরাট শুঁড় নিয়ে তার দ্বিগুণ কলেবর এক হস্তী তাকে আক্রমণ করে চলেছে।

যুগ-যুগান্তের প্রতিনিয়ত কলহে দুজনেই ক্লান্ত, কিন্তু এমনি অভিশপ্ত জীবন যে কলহ থেকে এক মুহূর্ত্তও তারা বিশ্রাম করতে পায় না। কামচারী গরুড় তাঁর দেহকে বিরাট করে দুই পায়ের নখ দিয়ে সেই গজ আর কচ্ছপকে শূন্যে তুলে নিলেন।

কিন্তু সেই বিরাট ভার নিয়ে অরণ্য থেকে ওঠবার সময় গরুড়ের পাখার তাড়নে এক সুবিশাল গাছের ডাল সশব্দে ভেঙ্গে পড়লো। হঠাৎ গরুড়ের মনে জননীর সতর্কবাণীর কথা মনে পড়লো। তিনি তাড়াতাড়ি পড়বার মুখে সেই ভাঙ্গা ডালটি ঠোঁটে করে তুলে ধরলেন। সেই অস্বস্তিকর বোঝা নিয়ে তিনি এক পর্ব্বতশিখরে নেমে দেখেন, কি সর্ব্বনাশ! গাছের সেই ভাঙ্গা ডালে তখনো ধ্যানস্থ বালখিল্য ঋষিরা ঝুলছেন!

গজ-কচ্ছপকে রেখে দিয়ে গরুড় বালখিল্য ঋষিদের স্তব করতে বসেন। গরুড়ের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বালখিল্য ঋষিরা অন্যত্র চলে গেলেন।

সমস্ত বাধা তুচ্ছ ক'রে গরুড় চন্দ্রলোকের দিকে চলে গেলেন।

গরুড় ফিরে দেখেন, নতুন জায়গায় এসে গজ আর কচ্ছপ ঠিক তেমনি ভাবে পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করবার উদ্যোগ করছে। আর কালবিলম্ব না করে গরুড় তাদের দুজনকেই উদরসাৎ করে ফেল্লেন।

পরিতৃপ্ত ক্ষুধা, গরুড় চল্লেন সূর্য্যলোকের দিকে, অমৃতের সন্ধানে।

(১২)

সমস্ত দেব-মহলে মহা-আতঙ্কের মত সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো, যা কখনো কেউ কল্পনা করে নি, গরুড় আসছেন অমৃতভাণ্ড নিয়ে যাবার জন্যে!

মহা-ঋষির আশীর্ব্বাদে গরুড় দেব-মানবের অবধ্য, কামচারী। অর্থাৎ যখন খুসী যে কোন দেহ ধারণ করতে পারেন, কখনো ধূলি-কণার মত ক্ষুদ্র কীটের আকার, কখনো পাহাড়ের মতন বিশাল দেহ।

দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে গরুড়কে বাধা দিলেন কিন্তু সমস্ত বাধা তুচ্ছ ক'রে নন্দনলোক ধূলায় ভরে গরুড় চন্দ্রলোকের দিকে চলে গেলেন।

চন্দ্রলোকে এসে দেখেন, বিরাট অগ্নি-চক্র চন্দ্রমণ্ডলকে ঘিরে নিয়ত আবর্ত্তিত হচ্ছে। গরুড় স্বর্ণদেহ ধারণ করে সেই অগ্নিবেষ্টনী পার হয়ে সূর্য্যলোকের দিকে চল্লেন।

সূর্য্যলোকে এসে দেখেন, অমৃতভাণ্ডকে ঘিরে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র প্রতি মুহূর্ত্ত তীব্র বেগে ঘুরছে। তীক্ষ্ণ

● মায়ের দাসীত্ব মোচন
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দৃষ্টি দিয়ে গরুড় দেখেন, সেই ঘূর্ণায়মান চক্রের ভেতর একটা ছোট ছিদ্র, ধূলিপরিমাণ দেহ ক'রে গরুড় সেই ছিদ্রের ভেতর দিয়ে অমৃতভাণ্ডের কাছে উপস্থিত হলেন এবং অমৃতভাণ্ড নিয়ে আবার সেইভাবে দেহ পরিবর্ত্তন করে নীলাকাশে এসে পড়লেন।

কিন্তু সামনেই দেখেন, সমস্ত আকাশপথ জুড়ে জ্যোতির্ম্ময় দেহ সুদর্শন-চক্রধারী ভগবান বিষ্ণু!

(১৩)

ভগবান বিষ্ণু সুদর্শন-চক্র হাতে গরুড়ের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। কিন্তু গরুড় তাতে বিন্দুমাত্র ভীত হলেন না।

সমস্ত আকাশ তাঁদের সংঘর্ষে বাঙ্ময় হয়ে উঠলো। বিষ্ণুর সমস্ত আক্রমণ গরুড় হেলায় তুচ্ছ করেন, সগর্ব্বে বলেন, তোমার উচিত নয় আমার পথ রোধ করা।

বিষ্ণু বলেন, অমৃত নিয়ে পৃথিবীতে তুমি যেতে পার না!

গরুড় বলেন, দেবতারা তো অমর, অমৃতে আর তাদের কি প্রয়োজন? তা ছাড়া, অমৃতে আমার কোন লোভ নেই, আমি চাই আমার জননীর দাসীত্ব মোচন করতে...তার জন্যে জীবন থাকতে আমি পরাঙ্মুখ হবো না!

গরুড়ের কথায় ভগবান বিষ্ণু অত্যন্ত প্রীত হন, বলেন, আমি আর তোমাকে বাধা দেবো না। তোমার বীরত্বে, তোমার মাতৃভক্তিতে আমি মুগ্ধ হয়েছি গরুড়, বল, তুমি কি বর চাও!

গরুড় স্থিরকণ্ঠে বলেন, যদি বর দাও, তা হলে এই বর দাও যে আমার আসন তোমারও ওপরে হবে!

ভগবান বিষ্ণু বলেন, তথাস্তু!

তখন গরুড় বলেন, আমাকে তুমি যে সম্মান দিলে, তার প্রতিদানে, আমিও তোমাকে বর দিতে চাই, বল কি বর তুমি চাও আমার কাছে!

হেসে ভগবান বিষ্ণু তখন বলেন, তা হলে এই বর দাও যে, তুমি হবে আমার বাহন!

গরুড় বলেন, তাই হবে!

ভগবান বিষ্ণুর বরে গরুড়ের আসন হলো বিষ্ণুর রথের চূড়ায়, আর গরুড়েরই বরে বিষ্ণুর বাহন হলেন গরুড়।

ভগবান বিষ্ণু পথ ছেড়ে দিলেন। অমৃতভাণ্ড নিয়ে গরুড় চল্লেন জননীর সকাশে।

(১৪)

কিন্তু প্রমাদ গণলেন দেবরাজ ইন্দ্র। অমৃতের রক্ষক তিনি। গরুড় যদি অমৃত পৃথিবীতে নিয়ে যায়, তা হলে চলে যাবে স্বর্গের আধিপত্য....মানুষ অমর হয়ে দেবতাদের করবে তুচ্ছ!

গরুড়ের পথরোধ করে বজ্রহাতে তিনি দাঁড়ালেন।

গরুড় হেসে উঠলেন। বল্লেন, বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রকে ভয় করি না, তোমার বজ্র আমার কি করবে?

ইন্দ্র গরুড়কে লক্ষ্য করে বজ্র ছুঁড়লেন। গরুড় নিজের ঠোঁট দিয়ে পাখা থেকে একটা পালক তুলে বজ্রের সামনে ধরলেন! বল্লেন, যে ঋষির তপস্যাপূত হাড় দিয়ে তোমার বজ্র তৈরী, তাঁর তপস্যার সম্মানে এই একটা পালক আমি নষ্ট হতে দিলাম!

বজ্র সেই একটি পালককে পুড়িয়ে চলে গেল। গরুড়ের অঙ্গ ছুঁতেও পারলো না।

● মায়ের দাসীত্ব মোচন

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সেই ব্যাপার দেখে ইন্দ্র স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বুঝলেন, যুদ্ধ করে গরুড়কে তিনি নিরস্ত করতে পারবেন না। তখন হাতজোড় করে নিবেদন করলেন, গরুড়, পরাজিত ইন্দ্র তোমার সখ্য কামনা করে!

ইন্দ্রের আবেদনে গরুড়ের বীরহৃদয় পরম প্রীত হলো। আনন্দে বলে উঠলেন, আমিও তোমাকে আজ থেকে আমার পরমবন্ধু বলে স্বীকার করে নিলাম!

তখন ইন্দ্র বলেন, শোন বন্ধু, অকালে পৃথিবীতে অমৃত নিয়ে গিয়ে সৃষ্টির বিভ্রাট ঘটিয়ো না। তা ছাড়া সবচেয়ে ভয়ের কথা, এই অমৃত যদি তোমার বিমাতার হাতে দাও, তাহলে তাঁর বিষধর নাগপুত্রেরা এই অমৃতের স্বাদ পেয়ে অমর হয়ে থাকবে...বিষে জর্জ্জরিত হয়ে যাবে পৃথিবী! যে বিষধর, অমৃতে তার নেই অধিকার!

ইন্দ্রের কথার যুক্তি গরুড়ের অন্তর স্পর্শ করে। তবুও তিনি বলেন, কিন্তু এই অমৃত না নিয়ে গেলে আমার জননীর দাসীত্ব যে ঘুচবে না! জননী দাসী হয়ে থাকবে, এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না!

তখন ইন্দ্র পরামর্শ দেন, তুমি এক কাজ কর........অঙ্গীকার অনুযায়ী তুমি এই অমৃতভাণ্ড তোমার বিমাতার হাতে দাও....আমি সেই ভাণ্ড ছদ্মবেশে অপহরণ করে নেবো!

এই বলে ইন্দ্র গরুড়কে বুঝিয়ে দেন কি করতে হবে। তাতে সম্মত হয়ে গরুড় অমৃতভাণ্ড নিয়ে পৃথিবীতে বিমাতা কদ্রুর সামনে উপস্থিত হলেন।

**(১৫)**

গরুড়কে সত্যসত্যই অমৃতভাণ্ড নিয়ে আসতে দেখে কদ্রু অবাক হয়ে যান।

গরুড় সদ্যজাত নবীন ঘাসের ওপর সেই অমৃতভাণ্ড রেখে কদ্রুকে বলেন, তাহলে আজ থেকে আমার জননী মুক্ত!

অমৃতের লোভে কদ্রু বলেন, নিশ্চয়ই!

কদ্রুর নাগ-পুত্রেরা ছুটে আসে। তাদের ডেকে গরুড় বলেন, এই নবীন কুশের ওপর অমৃত রইলো, তোমরা নদীতে স্নান সেরে পবিত্র দেহে অমৃত গ্রহণ কর!

মহানন্দে জননীকে নিয়ে নাগ-পুত্রেরা নদীতে স্নান করতে যায়, গরুড়ও জননীর কাছে চলে গেলেন।

সেই অবসরে ইন্দ্র এসে অমৃতভাণ্ড অপহরণ করে নিয়ে গেলেন।

কদ্রুকে নিয়ে নাগেরা ফিরে এসে দেখে, অমৃত নেই, কুশ-ঘাস যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে। স্বর্গের চক্রান্ত বুঝতে পেরে কদ্রু দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। নাগেরা অমৃত আস্বাদের লোভে জিভ বার করে সেই কুশ-ঘাস লেহন করে, তার ফলে তাদের প্রত্যেকের জিভ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল।

**(১৬)**

ওধারে গরুড় দাসীত্ব-মুক্ত জননীকে প্রণাম করে বলেন, মাগো, তোমার মুক্তির জন্যে অমৃত আনতে গিয়ে, আমি অমৃত-পদ লাভ করেছি, ভগবান বিষ্ণুর শ্রীচরণের ভার বইবার অধিকার পেয়েছি!

বীর পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করে জননী বিনতা বলেন, আশীর্ব্বাদ করি বৎস, যে কেউ জগতে জননীর ব্যথা দূর করবে, সে যেন তোমারই মতন পায় অমৃত-পদ!

মাতৃ-আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে খগরাজ গরুড় উড়ে চলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সকাশে!

---

বুদ্ধদেব বসু

ফল খেয়ে ফল নেই, দুধে নেই বল,
জন্তু ও উদ্ভিদ সব করে ছল।
পড়েছে অনেক পাত চিনেমাটি কাংস্যে
মশলাবিবর্জিত মৎস্যে ও মাংসে।
মিশ্রি-ত ছানা আর চিহ্নিত ক্ষীর,
পাথর-বাটির দই, মাখন, পনির—
('চিহ্নিত' মানে চাও? সোজা তার ফন্দি,
'চিনি' আর 'নিহিতে'র ভেবে দ্যাখো সন্ধি।)
যে-কথা বলছিলাম, করো অবধান,
দুগ্ধের উত্তম যত অবদান,
তৎসহ জান্তব পুষ্টির টেক্কা
সজ্ঞানে কোনোদিন করিনি উপেক্ষা।
নির্মেদ কুক্কুট, মসৃণ মেষ,
রোহিতের সন্ততি অবিনিঃশেষ,
অনতিপক্ক ডিম, যকৃতের খণ্ড
দিনে-দিনে যত খাই, তত করি পণ্ড।
ভেবো না রয়েছি শুধু প্রোটিনের লাইনে,
সব জানি যত কথা লেখা আছে আইনে।
খাদ্যে চাই যে রাখা উপাদানসাম্য,
অন্তত মানুষের পক্ষে প্রামাণ্য।
তা না-হ'লে শরীরের কেল্লায় ক্রমে
বিদ্রোহ বেড়ে ওঠে, আয়ু আসে ক'মে।
—অবশ্য এ-নিয়ম পশুদের নেই তো,
খাদ্য বিষয়ে তারা মানে অদ্বৈত।
গোরু শুধু ঘাস খায়, পক্ষীরা ফল,
বৃক্ষের পত্রেই গরিলার বল।
ঝোপঝাড়, জঙ্গল, কলাগাছ আস্ত—
তাতেই দিব্যি টেঁকে হস্তীর স্বাস্থ্য।
ক্ষত্রিয় আছে যারা খাঁটি 'এরিয়ান',
কক্ষনো হয় না তো ভেজিটেরিয়ান;
ব্যাঘ্র, সিংহ আদি বীর্যে গরিষ্ঠ
নিঃশাক মাংসেই থাকে একনিষ্ঠ।
এদিকে তিমি-র পেটে কারা যায় বলো তো?
শুধু জল—নোনা জল; বেঁচে থাকে ফলত।
অর্থাৎ সেই জলে চিংড়ির গোষ্ঠী
(কিচ্ছুটি নয় আর) দেয় তারে পুষ্টি।

চুপচাপ করে বক জপতপ আহ্নিক,
অথচ লক্ষ্য মাছ—তাই বকধার্মিক।
কৈলাসে যেতে-যেতে খিদে হ'লে উগ্র
রাজহাঁস ছিঁড়ে নেয় পদ্মের টুকরো।
ঈগল বাঁধুক বাসা আকাশের মিনারে,
শুদ্ধ আমিষ চাই লাঞ্চে ও ডিনারে।
এমনি জগৎ জুড়ে;—মানুষের কিন্তু
বিবিধ খাদ্য চাই, চাটনি পরন্তু।
যা-কিছু উদরে নেয় সমুদয় প্রাণীরা,
তারো চেয়ে আরো বেশি খান গুণীজ্ঞানীরা।
রুটিতে মাখন চাই, শাক-পাতা মাংসে,
নুন চিনি বাদ দিলে দুধ ভাত পানসে।
ঝাল, ঝাঁজ, তেতো আর স্নিগ্ধ, কষায়
সান্তর চান সব মানবমশায়।
শুক্তোয় শুরু, আর মিষ্টি ও গব্যে
শেষ করা সদাচার ভোজনের পর্বে।
মাঝখানে আসে যায় নানা উৎকৃষ্টি,
প্রকৃতি ও মানুষের যত কিছু সৃষ্টি।
মাটি ফুঁড়ে ওঠে যেটা, যেটা থাকে তলাতে,
জন্মায় খেতে, মাঠে, ঝোপঝাড়, জলাতে,
ঝ'রে পড়ে বোঁট থেকে, ঝুলে থাকে বৃক্ষে,
জ'মে উঠে মৌচাকে সুখ দেয় ঋক্ষে,
লুকোয় লতার বুকে, পক্ষীর জঠরে,
জলের গহনে আর কাননের কোটরে,
চার পায়ে ছোটে যারা, ওড়ে বায়ুমার্গে,
বঁড়শিতে, জালে ধরা পড়ে দুর্ভাগ্যে—
ইত্যাদি সব-কিছু মানুষের বায়না,
তা না-হ'লে স্বাস্থ্যের আশা করা যায় না।
খাদ্যে রয়েছে প্রাণ অতিশয় সূক্ষ্ম,
সভ্য সমাজ মানে সেটাকেই মুখ্য।
বলেন বৈজ্ঞানিক, 'ভিটামিন এগারো
বিস্তর কৌশলে নিতে যদি না পারো,
নির্ঘাৎ থপথপে, নয়তো বা চিমসে
হ'লে পরে কেউ আর করবে না হিংসে।
দাঁত ন'ড়ে, টাক প'ড়ে, অকালেই বুড়িয়ে,
উদ্যম, উচ্চাশা সব যাবে ফুরিয়ে।
বেঁকে যাবে শিরদাঁড়া, ম্লান হবে চক্ষু,
কিংবা অসুখে ভুগে মেজাজ তরক্ষু।
আজকে যতই হাসো আহ্লাদে গর্বে
ভিটামিন কম হ'লে কাল ঠিক মরবে।
অথচ এগারো ঐ থাকে না একত্র,
খুঁটে তুলে নিতে হবে যাকে পাও যত্র।
তালিকা তৈরি আছে—এটা শুধু ভনিতা—
শোনো হে বালক, শিশু, বৃদ্ধ ও বনিতা,
সাবধানে সব যদি করো উদরস্থ
হবে সুখী, দীর্ঘায়ু, বীতরোগ, স্বস্থ।'

এখন কথাটা শোনো : আমি এই রুটিনে
বলিনি তো কক্ষনো, 'এইবার ছুটি নে।'
খেয়েছি যা-কিছু আছে তালিকায় উক্ত,
আপেল কিংবা বেল, কখনো বা শুক্তো।
এমনি কাটিয়ে এসে বহু বৎসর,
আজ দেখি সংসার অতি মৎসর।
যত না যত্নে থাকি বিজ্ঞানে বাধ্য,
অবশেষে, যারে খাই, তারই আমি খাদ্য।
হাঁ ক'রে হাজার পোকা খেতে চায় আমাকে,
ছোটো শিশু দোলনায় হেসে ওঠে দেমাকে।
ঘুম ভেঙে উঠে তাই প্রত্যহ ভাবছি,
তাহ'লে সিঁড়ির ধাপে উঠছি না নাবছি।
শীতে হই হিমসিম, জ্বালা বাড়ে গ্রীষ্মে,
সত্যি কখন ভালো থাকে যে মনিষ্যে!
কেন হাঁচি, কেন কাশি, মাথা-কনকন?
কেন মুখে বদলায় রেখা-অঙ্কন?
চুলে আর চক্ষুতে কেন রং অন্য?
দৌড়োতে হাঁপ ধরে, সে কিসের জন্য?
যত ভাবি এই সব, তত হই ব্যস্ত,
এবং ততই বুঝি বৃথাই সমস্ত।
কাল পাছে মরি, তাই আজ ধুকপুক,
কিছুতেই সারবে না আমার অসুখ।

# অমরেশের বাঘ স্বীকার

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

[অমরেশ বলে, "বয়স আমার হ'য়েছে, যথেষ্ট বয়স হ'য়েছে, আমাদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-পাঠিকার বয়স বেড়েছে, দলের ছোঁড়াগুলোরও বয়স হ'য়েছে, এখন কি আর থিয়েটারের ধ্যাষ্টামো ভাল লাগে? মাচা বেঁধে গোঁফ কামিয়ে, রামঃ!" ফলে এবার পুজোর আগে অমিয় থিয়েটারের কথাটা পাড়বারই সুযোগ পেল না। এমন কি দু' একবার যে অমরেশ গ্রামের ভাল করতে গিয়েছিল তাতেও সে রাজী হলোনা এবার। দলের সকলেই কোলকাতায় চাকরী-বাকরী করে। বাকী দু একজনকে দেশ থেকে আনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সেদিন অমরেশের বৈঠকখানায় এই নিয়ে তুমুল তর্ক।]

## প্রথম দৃশ্য

[স্থান—অমরেশের বৈঠকখানা। সবাই জড়ো হ'য়ে উত্তেজিতভাবে আলোচনা করছে। একা অমরেশের গলার কাছে সবাই কেমন ম্লান। তবু ওরই মধ্যে অমিয়ের গলা আর মাঝে মাঝে পরাণের গলা শোনা যাচ্ছে। অমরেশ ঘরময় পায়চারী করছিল। হাত দুটো পেছনে জড়াজড়ি করা। মাথাটি ঈষৎ ঝোঁকানো। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—]

অমরেশ ঃ—না। অকারণ ধ্যাষ্টামোর মধ্যে আমি নেই। কাজের মতো কাজ হয়, 'না' বলবো না।

অমিয় ঃ—ধ্যাষ্টামো বলছো কাকে?

অমরেশ ঃ—এই ফি বছর থিয়েটার করাকে। এটা যেন হাই তোলার মতো সংক্রামক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বর্ষার মেঘ যেই কেটে গেল, অমনি অমিয়ের মাথা ঘুরতে লাগলো, গা বমি বমি করতে লাগলো। কতক্ষণে অমরেশ মামাকে ধরবো, কতক্ষণে থিয়েটারটা পাশ করাবো, এই হ'ল চিন্তা।

অমিয় ঃ—সেটা চিরকাল ক'রে এসেছি বলে!

অমরেশ ঃ—চিরকাল দেখাস্‌নি অমিয়। কতকাল থিয়েটার করছিস শুনি? দশ-বারো-পনেরো বছর? আবার কতো?

পতিত ঃ—তাই বা কম হলো কি?

অম ঃ—কম-বেশীর কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে—গোঁফ কামিয়ে মেয়েছেলে সেজে, গলা সরু ক'রে 'প্রাণনাথ' 'প্রাণনাথ' শুনতে পারবো না আমি। সে তোদের মামী আসার আগে, যখন ওসব শোনা অভ্যেস ছিল না, তখন শুনেছি—ভালও লেগেছে হয়তো, তাই বলে—নো ভ্যারাইটি, নো ডিভিয়েশান, জন্ম জন্ম তাই শুনতে হবে? এখন কাণ অন্যরকম হ'য়ে গেছে!

পতিত ঃ—অভিনয় তো!

অম ঃ—সেটা তোদের। আমার কী? কোদাল নিয়ে মাঠের ঘাস চাঁছা থেকে সুরু ক'রে ত্রিপল খাটানো থেকে, পার্ট শেখানো থেকে, সিন টানা অবধি, সব কাজ আমাকে একাই করতে হয় শেষকালে। ম্যাও ধরবে কে?

অমিয়র দিকে চেয়ে।

চোখ ছলছল ক'রে কোন লাভ হবে না অমিয়। থিয়েটারের ব্যাপারে আমি পাথর, আমি কালাপাহাড় হ'য়ে গেছি। ওতে আর বিগলিত হচ্ছি না।

ভুবন ঃ—তবে খ্যি—খ্যি—খ্যি—খ্যি—

অম ঃ—একটি ঝাঁপড় দেবো খ্যি-খ্যি করলে। বয়স হ'য়েছে না? মার্চেন্ট অফিসে চাকরী করিস্ কী ক'রে?

ভুবন ঃ—(হেসে) তখন মুখে গু—গু—গু—

অম ঃ—(চেয়ে থেকে) কী বলছিস কী? পাগল করবি দেখছি আমায়!

পতিত ঃ—না। ও বলছে অফিসে একটা গুলি দিয়ে রাখে মুখে।

অম ঃ—তাহ'লে আমার বেলায় গুলিটা আর সরাস্নি বাবা।—সোণা আমার, বাবা আমার! একটা জন্ম জ্বালিয়েছিস, জীবনের শেষ কটা দিন একটু শান্তিতে থাকতে দে।

সামনের দিকে চেয়ে—

আরে মশাই! আপনি সেই অধঃপতিতের মামা না? সেই দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে আমায় ডুবিয়েছিলেন না?

পরিতোষ ঃ—আজ্ঞে হ্যাঁ।

অম ঃ—বাঃ! দেহেও গত্তি লেগেছে দেখছি!

পরিতোষ ঃ—আজ্ঞে হ্যাঁ! শরীরটা একটু—

অম ঃ—বিনয় ক'রে "একটু" বলবেন না। চোখ জুড়িয়ে গেল আপনাকে দেখে। তারপর? কী মনে ক'রে? থিয়েটারের বাসনা নাকি?

পরিতোষ ঃ—হ্যাঁ। পতিত বললে—

অম ঃ—বন্ধুভাবে একটা উপদেশ দিই। মনে রাখবেন। এই ভাগ্নে-সংঘটিকে একদম বিশ্বাস করবেন না। ডোবাবার যম ওরা। ওরা খালি দূরে দাঁড়িয়ে 'এনকোর' বলার লোক।

অমিয় ঃ—একবারে অন্য কথায় চলে গেলে যে! ছুটি হ'য়ে গেছে। কী করবে বলে দাও। যদি প্লে হয়—

অম ঃ—বৌমা কেমন আছে রে?

অমিয় ঃ—ভাল। যদি প্লে হয়, তবে আজই একটা নাটক—

অম ঃ—দিদি, জামবু, সবাই ভাল আছে তো?

অমিয় ঃ—হ্যাঁ সব ভাল। তাহ'লে একটা নাটক ঠিক ক'রে আজই—

অম ঃ—হ্যাঁরে! ওখানে ইঁটের দর কী রকম যাচ্ছে রে?

অমিয় ঃ—দুত্তোর!

সবাই চুপচাপ। অমরেশ সেদিনকার খবরের কাগজ খুলে—

অম ঃ—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! দিন গেল প্রভু! নৌকায় পাল তোলো এবার!

পরিতোষ ঃ—আমি একটা প্রস্তাব করবো অমরেশ বাবু?

অম ঃ—করবেন?

পরিতোষ ঃ—যদি আদেশ করেন।

অম ঃ—না করলে হয় না?

পরিতোষ ঃ—একটা নতুন আইডিয়া মাথায় এসেছে—

অম ঃ—এসেছে, না আসি আসি করছে?

পরিতোষ ঃ—এসেই গেছে!

অম ঃ—উদ্গীরণ করুন।

পরিতোষ ঃ—আমি ভাবছিলাম—যদি আপনাদের থিয়েটার না হয়,—তবে জঙ্গলে যাবো।

অম ঃ—প্রেরণা পেয়েছেন?

পরি ঃ—না আমি বলছিলাম?

অম ঃ—বুঝেছি যদি প্রেরণা পেয়ে থাকেন চলে যান, না পেয়ে থাকেন বটানিকালে সেরে আসুন!

পরি ঃ—না হাজারীবাগে—

অম ঃ—হাজারী দুই হাজারীর কথা হচ্ছে না বাগে পেলে দুশো একশো নেবেন—

অমিয় ঃ—তোমার হ'য়েছে কি মামা? আজ তোমার সঙ্গে যে কথাই কওয়া যাচ্ছে না!

অম ঃ—এ বছর যাও বা যাচ্ছে, সামনের বার তাও বন্ধ! একেবারে মৌনী বাবা। সব ইশারায় ম্যানেজ! হ্যাঁ বাবা!

● অমরেশের বাঘ স্বীকার
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

পরি ঃ—আমি বলছিলাম—এই ছুটিতে হাজারীবাগে শিকার করতে গেলে কেমন হয়?

অম ঃ—(কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে) কোথায়?

পরি ঃ—হাজারীবাগে?

অম ঃ—কী শিকার?

পরি ঃ—মেন্‌লি পাখী-টাখী, বন-মুরগী আর খরগোস—, তবে যদি বাঘ-টাঘ এসে যায়—

অম ঃ—কী দিয়ে?

পরি ঃ—বন্দুক দিয়ে!

অম ঃ—(শান্ত গলায়) ছেলের আছে, না—কিনতে হবে?

পরি ঃ—ছেলের কি মশাই? বড়দের রাইফেল। থ্রি-সিক্স-ফাইভ!

অমরেশ কিছুক্ষণ স্থির চোখে চেয়ে রইলো পরিতোষের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললো—

অম ঃ—অমিয়!

অমিয় ঃ—মামা!

অম ঃ—ডাউন দিচ্ছে নাকি? ওকে বলে দে—যে আমি এইট্‌-এইট্‌-ফাইভ হ্যাণ্ডেল করি!

অমিয় ঃ—মামা এইট্‌ এইট্‌—

পরি ঃ—এইট্‌-এইট্‌-ফাইভ? জীবনে শুনিনি তো?

অম ঃ—পতিত!

পতিত ঃ—মামা!

অম ঃ—তোর মামাকে বলে দে,—লোকে যা চোখে দ্যাখেনি—আমি সেই সব জিনিষ ব্যবহার ক'রে থাকি!...তাহ'লে বাঘও মারবেন বলছেন?

পরি ঃ—আজ্ঞে হ্যাঁ।

অম ঃ—বেশ। চিড়িয়াখানায় ক'বার দেখা আছে?

পরি ঃ—চিড়িয়াখানা কেন? জঙ্গলেই দেখা আছে।

অম ঃ—আ-চ্ছা! তাহ'লে অমিয়!

অমিয় ঃ—মামা!

অম ঃ—তাহ'লে এবারকার মতো—মানে এ-খেপের পুত্তোর মতো, চলো আমরা জঙ্গলেই যাই। শিকার যদি কিছু পাওয়া যায়—তাই স্বীকার।

পরাণে ঃ—তাহ'লে আমি আর ক্যানে যাবো মামা? উখানে তো সিন লাগবে না?

অম ঃ—নাইবা লাগলো। তবু এই সিনে তোর থাকা দরকার। বুঝলি কিছু?

পরাণে ঃ—না।

অম ঃ—আর কবে বুঝবি? আমি কি সারাজীবন বেঁচে থেকে—তোদের খালি বুঝিয়েই যাব?

পরাণে ঃ—উকথা বলবেন না মামা! ক্যানে? আমাকে একবারের বেশী—দুবার কি কোন সিন বুঝোতে হয়েছে কোনদিন?

অম ঃ—নাঃ! তুই আর ভুবন—এই দুটো হ'ল আমার ষ্ট্যাণ্ডিং দুষ্টগ্রহ।

ভুবন ঃ—আমি আবার খ্যি—খ্যি—খ্যি—খ্যি—

অম ঃ—চুপ কর! মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারিস্—বলবি, নইলে চুপ ক'রে দেখে যাবি। শুধু দেখে যাবি,—বুঝলি?

ভুবন ঃ—হ্যাঁ।

[একটু চুপ]

পরি ঃ—তাহ'লে অমরেশ বাবু!

অম ঃ—আদেশ করুন!

পরি ঃ—যদি হাজারীবাগ যাওয়া হয়, তাহ'লে আমাকে বলুন! কেননা আমি সেইভাবে ব্যবস্থা করবো তো?

অম ঃ—খাওয়া-দাওয়ার বুঝি?

পরি ঃ—কিছু তো করতে হবে।

অম ঃ—কিছু কী মশায়? সবিশেষ! আপনি তো জানেন, যেখানেই যাই, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা না করলে আমি যেতেই পারবো না!

পরি ঃ—আজ্ঞে হ্যাঁ। যথাসাধ্য চেষ্টা তো করবোই!

অম ঃ—যথাসাধ্য কী মশাই? এখনো বলুন! সেই বুঝে আমি গাত্রোৎপাটন করবো। কোলকাতার বাইরে লিলুয়া গেলেই আমার মুর্গী না খেলে অসুখ করে।

পরি ঃ—মুর্গী হবে বৈকি!

অম ঃ—বৈকি নয়, হবে বলুন!

পরি ঃ—হবে।

অম ঃ—অমিয়!

অমিয় ঃ—মামা!

অম ঃ—তাহ'লে নে বাবা, চটপট গুছিয়ে ফ্যাল্। কী কী জিনিষ নিতে হবে, তার একটা ফর্দ্দ ক'রে দিন মশায়।

পরি ঃ—আসুন—অমিয় বাবু, লিষ্ট ক'রে দিই।

● অমরেশের বাঘ স্বীকার
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

অমিয় ঃ—চলুন!

দুজনে উঠে গেল। অমরেশ কিছুক্ষণ কপাল টিপে আকাশের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর চোখ ফিরিয়ে ঘরের কালীমূর্ত্তির দিকে চেয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। তারপর ঘরের সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে—'ফোঁৎ' ক'রে একটা নিঃশ্বাস ফেলে—চুপ ক'রে সতরঞ্চির দিকে চেয়ে আঙুল দিয়ে আঁক কষতে লাগলো।

পতিত ঃ—কিছু ভাবছ কি মামা?

অম ঃ—হ্যাঁ।

পতিত ঃ—কী ভাবছো—বলো?

অম ঃ—ভাবছি, এককালে অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলাম, আজ আবার সেই আমি পাখী মারতে যাচ্ছি—হাজারীবাগে। নিয়তির কী আশ্চর্য্য লীলা! ওঃ!

পতিত ঃ—তাহ'লে কি যাওয়া স্থগিত থাকবে মামা?

অম ঃ—কেন?

পতিত ঃ—পাখীগুলোর প্রাণ বাঁচাবার জন্যে!

অম ঃ—আমি তো নিমিত্ত মাত্র বাবা পতিত। তিনি আমার হাত দিয়ে ওদের নিধন করবেন—কাজেই—

পতিত ঃ—তাহ'লে যাওয়া স্থির?

অম ঃ—অনিচ্ছাসত্ত্বেও—হ্যাঁ। এগিয়ে দ্যাখ—অমিয়র লিষ্টি কী দাঁড়াল! কুক্কুট যেন কোন রকমেই বাদ না যায়—এইটে শুধু দেখিস্।

পতিত ঃ—না না সেকি একটা কথা হ'ল?

পতিত উঠে ভেতরে গেল। পরাণে আর ভুবন বসে আছে।

অম ঃ—আমার সামনে অমন উদাস মুখে বসে থাকিস্‌নে ভুবন। একটা ধ্যানের আমেজ এসেছে, কী বলতে কী ব'লে ফেলবো,—শেষ হ'য়ে যাবি। সরে যা।

ভুবন ঃ—তাহ'লে কি আম্—আম্—আম্—

অম ঃ—অসময়ের জিনিষ গ্যারাণ্টি দিতে পারবো না,—তবে হ্যাঁ, চেষ্টা করবো খাওয়াতে। যা।

ভুবন ঃ—না। আম্—আম্—আমই—

অম ঃ—ওরে হ্যাঁ আমই খাওয়াবো।

ভুবন হতাশভাবে হাত নাড়লো। তারপর কিছুক্ষণ করুণ চোখে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে উঠে গেল।

পরাণে ঃ—তাহ'লে মামা!

অম ঃ—থামিস্‌নে, বলে ফেল!

পরাণে ঃ—তাহ'লে আমি গোছগাছ ক'রে লিই?

অম ঃ—অনুমতি না পেলে পা বাড়াবি না,—এত ভাল লোক তো তুই নস্ পরাণে। (চেঁচিয়ে) বলাবলির কী আছে। সবাই যাচ্ছে, তুইও যাবি।

পরাণে ঃ—উখানে বাঁশ-টাশ পাওয়া যাবে তো?

অম ঃ—তোকে বেঁধে নিয়ে যাবার মতো—দু'চারখানা কি পাবো না? পাবো। যা!

পরাণেও চলে গেল। অমরেশ স্থির হ'য়ে বসে কী চিন্তা করলো। তারপর নাক টিপে কোন নাক দিয়ে নিঃশ্বাস বইছে দেখে নিলো।

অমরেশের স্ত্রী প্রবেশ করলো, একহাতে ডিশে লুচি আর হালুয়া, আর একটা গেলাসে জল—অন্য হাতে। জিনিষ দুটি রেখে আস্তে আস্তে বললো—

অম-বৌ ঃ—হ্যাঁগো, তুমি নাকি হাজারীবাগ যাচ্ছো?

অম ঃ—না-কি নয়, সত্যই যাচ্ছি।

অম-বৌ ঃ—আমায় নিয়ে চলো না। জঙ্গল দেখিনি কখনো?

অম ঃ—সে একদিন ধাপার ওদিক থেকে দেখিয়ে নিয়ে আসবো। হাজারীবাগ যেতে হবে কেন?

অম-বৌ ঃ—না-না খাঁটি জঙ্গল—

অম ঃ—জঙ্গলে ভেজাল মেশাতে গয়লারা এখনো পারেনি,—তার আগেই তোমায় দেখিয়ে আনবো।

অম-বৌ ঃ—জঙ্গলে আবার গয়লা ভেজাল দেবে কিসের?

অম ঃ—গাছের। গরু সেই গাছপালা খেয়ে ভেজাল দুধ দেবে।

অম-বৌ ঃ—খালি বাজে কথা। তুমি আমায় নিয়ে যাবে কিনা তাই বলো না!

অম ঃ—বড় বেদনা পেলাম প্রিয়ে।

অম-বৌ ঃ—তার মানে তুমি নিয়ে যেতে চাও না। বেশ! তাহ'লে তাই হবে। দেখি, তুমি কেমন করে যাও!

অম ঃ—তার মানে কি অহিংস প্রতিরোধের ইঙ্গিত করছো?

অম-বৌ ঃ—অহিংস কেন হবে? প্রতিরোধ যদি করি, সহিংসই করবো।

● অমরেশের বাঘ স্বীকার—
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

অম ঃ—যথা?

অম-বৌ ঃ—যাবার সময়েই দেখতে পাবে।

অমরেশের বৌ চলে গেল। অমরেশ কিছুক্ষণ সেই দিকে চেয়ে থেকে, আস্তে আস্তে বললো—

অম ঃ—হুঁ!

উঠে পায়চারী করতে লাগলো। অমিয় একটা ফর্দ্দ হাতে ঢুকলো। বললো—

অমিয় ঃ—সব ঠিক হ'য়ে গেল মামা!

অম ঃ—কিছুই ঠিক হ'য়ে যায় নি।

অমিয় ঃ—তার মানে?

অম ঃ—তার মানে মামী বেঠিক।

অমিয় ঃ—যথা?

অম ঃ—মামী বলে গেল,—তাকে নিয়ে না গেলে সে সহিংস প্রতিরোধ করবে।

অমিয় ঃ—সেটা কী বস্তু?

অম ঃ—ক্যা মালুম! বললে—যাবার সময় দেখতে পাবে!

অমিয় ঃ—যাবার সময় দেখতে পেলেতো চলবে না, দেখাটা এখনই দরকার।

অম ঃ—আমি জানি না। আমি এসব ধ্যাষ্টামোর মধ্যে নেই। ম্যানেজ যা করবার আগে করো। নইলে এখান থেকে পাদমেকং ন গচ্ছামি। যাবার সময় সেই ঝাঁটা-টাটা বেরোলে—তখন কিন্তু টেম্পার রাখা মুস্কিল হবে।

অমিয় ঃ—তাতো হবেই। আচ্ছা আমি দেখছি।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে—

অমিয় ঃ—মামী! ও মামী!...মা-আ-মী গো!

গম্ভীর মুখে অমরেশের বৌ এসে দাঁড়াল।

অম-বৌ ঃ—কী বলছো?

অমিয় ঃ—কী ভয় দেখিয়েছো আমার মামাকে?

অম-বৌ ঃ—ভয় দেখানো তো নয়,—হাজারীবাগ গেলে আমায় নিয়ে যেতে হবে।

অমিয় ঃ—সে কথা মামাকে বলতে গেছলে কেন? আমাকে বললেই তো হতো! বেশতো চল।

অম ঃ—চলো মানে?

অমিয় ঃ—চলো মানে—মামীমা যাবে। শুধু তোমাকে মানে—মেয়েছেলেকে নিয়ে যাবার যে অসুবিধে, সেটা তুমি দূর ক'রে নাও।

অম-বৌ ঃ—কী অসুবিধে?

অমিয় ঃ—কিছু না। সামান্য। বন্দুক ছোঁড়াটা শিখে নাও।

অম-বৌ ঃ—আমি বন্দুক ছোঁড়া শিখবো কেন?

অমিয় ঃ—নাহ'লে—জঙ্গলের মধ্যে ক্যাম্পে থাকবে কী ভরসায় মামী? অনেক সময় তোমাকে একলা থাকতে হবে—বিশেষ ক'রে রাত্রে অনেক দিন একলা থাকতে হবে। আমরা যাবো বাঘ শিকার করতে। তুমি তো আর আমাদের সঙ্গে গাছে উঠতে পারবে না। কাজেই তোমাকে ক্যাম্পেই থাকতে হবে।

অম-বৌ ঃ—আর একটা কী?

অমিয় ঃ—অনুমতি দিতে হবে যে তুমি মুরগী খাবে।

অম-বৌ ঃ—কেন? অন্য জিনিষ পাওয়া যায় না?

অমিয় ঃ—সে তো সহরে। কিন্তু জঙ্গলে বনমুরগী ছাড়া খাদ্যই নেই।

অমরেশের বৌ কিছুক্ষণ অমরেশের দিকে চেয়ে রইল। অমরেশ জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল।

অম-বৌ ঃ—কই, এসব কথাতো তুমি আমায় বলোনি?

অম ঃ—চান্স পেলাম কোথায়?

অম-বৌ ঃ—বেশ যাও। আমি যাবো না।

চলে যেতে যেতে দরজার কাছ থেকে ঘরের দিকে চেয়ে বললো—

কী কী গোছাতে হবে, বলে দিয়ে যাও।

চলে গেল। অমিয় গিয়ে অমরেশের পায়ের ধুলো নিলো। অমরেশ তার মাথায় হাত দিয়ে বললো—

অম ঃ—বিসমার্ক, চার্চ্চিল, বল্লভভাই প্রভৃতির বুদ্ধির কথা ব'য়ে পড়েছি, কিন্তু আজ চোখে দেখলাম। কী আশীর্ব্বাদ করবো ভেবে পাচ্ছিনে। শুধু বলছি—আজ থেকে নিজের নাম স্যাক্রিফাইস্ করলাম। আজ থেকে শুধু আমি অমিয়ের মামা। যা! যোগাড় কর্‌গে।

● অমরেশের বাঘ স্বীকার
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

অমিয় চলে গেল। অমরেশ উঠে দাঁড়িয়ে ঘরে টাঙানো কালীমূর্ত্তির দিকে চেয়ে বললো—

মাগো! ভাগ্নে পাঠিয়েছ—মামার মতো। শুধু এই প্রার্থনা—শুধু দেখো অকালে টেঁসে না যায়।

ধীরে ধীরে পায়চারী করতে লাগলো—

**বিরতি**

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[হাজারীবাগ জঙ্গলের ক্যাম্প। একা একা বসে আছে অমরেশ ক্যাম্প খাটে। দুম ক'রে বন্দুকের শব্দ হ'ল। চম্‌কে উঠে দাঁড়াল অমরেশ। পতিত রাইফেল নিয়ে ঢুকলো। শিকারের পোষাক পরা।]

অম ঃ—এই উল্লুক!

পতিত ঃ—কী মামা?

অম ঃ—আমাকে না জিগ্যেস ক'রে বন্দুক ছুঁড়বি না অমন আচমকা।

পতিত ঃ— কেন?

অম ঃ—নো কেন? কৈফিয়ৎ দেবার পর চাণক্য আর মন্ত্রীত্ব করে না। এভাবে আমার নার্ভটাকে স্যাটার করবার কোন অধিকার নেই তোমাদের! মাইণ্ড দ্যাট্‌!

পতিত ঃ—না, একটা খরগোস পালাচ্ছিল কিনা,—

অম ঃ—নো খরগোস। শুধু খরগোস নয়, নো গোস বিজনেস ইন দ্য ক্যাম্প।

দুম্‌ ক'রে আবার আওয়াজ হ'ল।

পতিত ঃ—এই দ্যাখ। আবার কে ছুঁড়লো। (ক্যাম্পের দরজা খুলে) এই। বন্দুক ছুঁড়িস না রে, মামা বকছে!

বন্দুক নিয়ে পরাণের প্রবেশ।

পরাণে ঃ—কী হয়্যাছে গো মামা?

দেখা গেল অমরেশ চেয়েই আছে।

পরাণে ঃ—হেই দ্যাখ! অমুন কোর‍্যা তাকিয়্যা আছো ক্যানে গো? মামা।

অম ঃ—(মৃদু গলায়) তুই বন্দুক নিয়ে কী করছিলি?

পরণে ঃ—প্যাক্‌টিশ!

অম ঃ—বড় বুকে লাগলো পরাণে?

পরাণে ঃ—বুকে? ক্যানে গো? আমি তো উদিক পানে মারিনি!

অম ঃ—উল্টে এসে লেগেছে। পরাণে! বাবা। জঙ্গলে এসেছিস বলে কি তুইও বন্দুক ছুঁড়বি?

পরাণে ঃ—শিখছি গো!

অম ঃ—বাড়ী গিয়ে শিখিস।

ঠাকুর (পাচক) প্রবেশ করলো।

ঠাকুর ঃ—বাবু, এখন কি বেকফাঁস দেবো?

অম ঃ—ও বাবা! এও ইংরেজী বলে যে! কী হ'ল সকালে?

ঠাকুর ঃ—চারখানা ক'রে এগ্‌টোস্‌,—সঙ্গে ওমলেট, আর চারটে ক'রে রসগোল্লা—আর—

অম ঃ—আরো?

ঠাকুর ঃ—আজ্ঞে হ্যাঁ। ছ'খানা ক'রে লুচি, হালুয়া তরকারী।

অম ঃ—বাঃ! এদিকে তো ভালই মনে হচ্ছে। এখন এই বন্দুকের আওয়াজটা যদি ঠেকাতে পারতিস্‌!

ভুবনের প্রবেশ। তারা হাতেও বন্দুক। তাকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে। মুখ-চোখ লাল।

অম ঃ—এই! ওটা ধরেছিস কেন? রেখে দে,—রেখে দে বলছি! থো!

ভুবন ঃ—ন্‌—নাঃ! জঙ্গলে একটা ন্যে-ন্যে-ন্যে—

অম ঃ—আচ্ছা নেব পরে। এখন তুই ওই বন্দুক রাখতো!

ভুবন ঃ—সেকি! আমি যে—খ্য—খ্য—খ্য—খ্য—

অমরেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে।

অম ঃ—ছেলেটার জন্যে এমন দুঃখ হয় মাঝে মাঝে। ওকে এনেছে জঙ্গলে। বাঘ দেখলেও বল্‌তে পারবে না। বা—বা—বা—করবে। সবাই ভাববে সিনারী দেখে বলছে বুঝি! সাবাড় হ'য়ে যাবে।

ভুবন ঃ—ন্‌—না, মাম্‌-আমা! আমি এখন কথা খু—খুব—প—প—প—প—প—অষ্ট বল্‌তে পারি।

অম ঃ—সেতো দেখতেই পাচ্ছি।

ভুবন ঃ—শুধু উত্—উত্—উত্-তোর—

● অমরেশের বাঘ স্বীকার
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

অম ঃ—উত্তর দক্ষিণ জ্ঞান থাকে না, না? স্বাভাবিক। থাক্‌গে! তার জন্যে দুঃখ করিসনে। অমন হয়। খাবি চল্!

সবাই চলে গেলে অমরেশ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এমন সময় পরিতোষ ঢুকলো। দেখেই বললো—

পরি ঃ—আজ রাত্রেই অমরেশ বাবু।

অম ঃ—কোথায়?

পরি ঃ—মাচায়। খবর পেয়েছি একটা ম্যানইটার এসেছে, সেটাকে আজই খতম করতে হবে।

অম ঃ—বেশ তো! যান, শেষ ক'রে আসুন।

পরি ঃ—তার মানে? আপনি যাবেন না?

অম ঃ—না। আমার শরীরটা আবার কী রকম যেন'—! তাছাড়া—

পরি ঃ—না না মশায়! আপনারই জন্য এসব করা, আর আপনি যাবেন না কী রকম? আপনাকে যেতেই হবে।

অম ঃ—আপনি তো মশাই, ভারী নেই আঁকড়ে! বলছি না আমার শরীর ভাল নেই। তবু বলে যেতে হবে। শেষকালে একটার বদলে যদি দুটো বাঘ মারা পড়ে?

পরি ঃ—পড়ে পড়বে। That is wanted! চলুন!

অম ঃ—চ্যাংড়ামীর একটা সীমা আছে পরিতোষ বাবু! যা বলবেন—সাবধান হ'য়ে বলুন! জঙ্গলে গেলে আমার কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। একবার আসামের রাজা আমায় ডেকে মহাবিপদে পড়েছিলেন!

পরি ঃ—কী হ'য়েছিল?

অম ঃ—যা হবার। জঙ্গলে ঢুকে তখন বাঘ মারতে মন চাইলে না। বললাম—হাতী দাও। শেষকালে অনেক খুঁজেপেতে একটা গুণ্ডা হাতী মেরে তবে মেজাজ ঠাণ্ডা হয়। আমি একটু খ্যাপাটে শিকারী!

পরি ঃ—সত্যি কথা বলতে কি, আমিও তাই।

অম ঃ—অ!

পরি ঃ—হাজারীবাগের জঙ্গলে গুণ্ডা হাতী পাওয়া—যাক্‌গে! তাহ'লে চলুন। এবার খাওয়া-দাওয়া ক'রে এক পেট ঘুমিয়ে নেওয়া যাক্। রাত্তির জাগতে হবে তো?

অম ঃ—ক্যানো?

পরি ঃ—আরে মশায়! গাছের ওপর রাত কাটাতে হবে তো?

অম ঃ—হুঁ। গাছের ওপর?

পরি ঃ—আজ্ঞে হ্যাঁ। আসুন খেয়ে নেওয়া যাক।

দুজনে খাবার ক্যাম্পে যাবার জন্য পা বাড়ালো। পরিতোষ বেরিয়ে গেল। অমরেশ বেরোতে যাবে,—এমন সময় দুম্ দুম্ ক'রে দুটো শব্দ হ'ল বন্দুকের। অমরেশ চম্‌কে উঠে পেছন ফিরে চাইল। ফিরে এসে ক্যাম্প খাটে বসলো। দেখা গেল তার হাতটা কাঁপছে অল্প অল্প।

[অমিয় ঢুকলো]

অমিয় ঃ—কী হ'ল মামা? ফের বসে পড়লে যে!

অম ঃ—কী করবো?

অমিয় ঃ—কী করবো মানে? খেয়ে নাওগে! একি! তোমার হাত কাঁপছে কেন মামা?

অম ঃ– কই? (চেয়ে) ও কিছু না। ছেলেবেলায় তবলা বাজানো অভ্যেস ছিল তো? তাই—এখনো চুপচাপ বসলে—মাঝে মাঝে—

অমিয় ঃ—তুমি তবলা বাজাতেও নাকি?

অম ঃ—হ্যাঁ।

[চুপচাপ]

অম ঃ—অমিয়!

অমিয় ঃ—মামা!

অম ঃ—একটা কথা জিগ্যেস করবো?

অমিয় ঃ—হ্যাঁ।

অম ঃ—এই শিকারে আসাটা কার উর্ব্বর মাথা থেকে বেরিয়েছে?

অমিয় ঃ—কেন? পরিতোষ মামার! ওযে মস্ত বড় শিকারী! দেখছো না,—কত সরঞ্জাম ছিল ওর?

অম ঃ—দেখতে পাচ্ছি। নর্ম্মদা যুদ্ধের শোধ, খিজুয়া যুদ্ধে নেমে বলে—আমায় হাজারীবাগ এনেছে?

অমিয় ঃ—নর্ম্মদাই বা কী, আর খিজুয়াই বা কোথায়? কী বলছো তুমি?

অম ঃ—সেই যে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ পালা হয়েছিল,—মনে নেই?

অমিয় ঃ—হ্যাঁ।

● অমরেশের বাঘ শীকার
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

অম ঃ—সেই সময় কড়া দিয়েছিলাম তো। তারই শোধ মনে হচ্ছে—এবার এই জঙ্গলে—আদায় হবে। কিন্তু—

অমিয় ঃ—তুমি ক্ষেপেছ? তাই কখনো হয়? সে কবেকার কথা?

অম ঃ—যবেকার কথাই হোক,—উশুল তো চাই! তাই জঙ্গলে এনে টাইট্ দিচ্ছে। কিন্তু তোমায় একটা কথা বলি—তুমি এই বন্দুক ছোঁড়াটা বন্ধ করো দিকিনি!

অমিয় ঃ—প্র্যাক্‌টিশ্ করছে তো—

অম ঃ—একবারে জায়গায় গিয়ে প্র্যাকটিশ্ করতে বলো। এখানে কাণের কাছে দুরুম দড়াম করলে,—ধরো যদি আমার মুড্ খারাপ হয়ে যায়—

অমিয় ঃ—না না, মুড্ খারাপ হবে কেন? আমি এখনি বারণ ক'রে দিচ্ছি।

দুম ক'রে আবার বন্দুকের শব্দ—

অম ঃ—(চমকে উঠে চীৎকার ক'রে) উইল ইউ ষ্টপ ইট্ অর নট্। নার্ভের ওপর চোট লাগে এটা জ্ঞানগম্যি নেই ইডিয়টের দল কোথাকার। আশ্চর্য্যের ব্যাপার! ব্যাটা পরাণে,—যার হাতে থাকতো কাটারী, তারও হাতে বন্দুক? অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি?

অমিয় ঃ—তোমার বন্দুকটা একবার দেখে নেবে না মামা?

অম ঃ—আমার বন্দুক মানে?

অমিয় ঃ—তোমার জন্যে ফোর সেভেন ফাইভ—যেটা পরিতোষ মামা এনে রেখেছে। আরে, যেটা নিয়ে আজ জঙ্গলে যাবে রাত্রে শিকার করতে,—সেইটে একবার দেখে নেবে না?

অম ঃ—সারাজীবন ফোর সেভেন ফাইভ নিয়ে ঘর করছি,—আমায় আর ও সব দেখাসনি!

অমিয় ঃ—ঠিক আছে। পরিতোষ মামা নিয়ে এসেছে—তার যেন মুখ থাকে। বাঘ যেন তোমার গুলিতেই মরে।

অমরেশ কিছুক্ষণ অমিয়র দিকে চেয়ে রইল। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বললো—

অম ঃ—আমরা যেখানে যাচ্ছি, জায়গাটার নাম কী র‍্যা?

অমিয় ঃ—কাট্‌কাম্‌সারি।

অম ঃ—কাজকাম্‌সারি?

অমিয় ঃ—না না। কাট্‌কাম্‌সারি।

অম ঃ—এত খারাপ নাম যখন, তখন বাঘ থাকবে আলবাৎ। কখন যাওয়া হবে?

অমিয় ঃ—রাত্রি ৭টা নাগাদ।

অম ঃ—হুঁ। চল খেয়ে আসি!

দুজনে চলে গেল। মঞ্চ অন্ধকার হ'ল। মঞ্চ কিছুক্ষণ ফাঁকা থাকবে। আলো বদল ক'রে বোঝাতে হবে, রাত্রিকাল। ঘরে একটি হ্যারিকেন জ্বলছে। ফাঁকা ঘর।

বাইরে সমবেত কণ্ঠে শৃগালের ঐকতান শোনা গেল। ছুটে ঘরে ঢুকলো অমরেশ। সে এসে ক্যাম্প খাটে বসলো। আবার উঠলো। পায়চারী করলো। আবার বসলো। আবার শেয়াল ডাকলো। উঠলো অমরেশ। হঠাৎ পেটে হাত দিয়ে শুয়ে পড়ে। 'উঁ-হু-হু-হু' শব্দ ক'রে কাতরাতে লাগলো। একটু পরে অমিয়, পতিত, ভুবন আর পরাণে সেজেগুজে বন্দুক নিয়ে ঢুকলো—

অমিয় ঃ—ঠিক যা ভেবেছি তাই। মামা এসেই বিছানা নিয়েছে।

পতিত ঃ—বিছানা নিলে তো চলবে না। যেতে হবে যে আমাদের সঙ্গে।

ভুবন ঃ—মা—ম্মা—তো এখনো—ব্রি—ব্রি—ব্রিচেসই পরেনি। বন্—বন্—ওন্দুকটাও ঝ্যো—ঝোলানো। নাক—আক্ ডাকছে না তো?

পরাণে ঃ—না গো না। মামা জিরেন লিচ্ছে একটু। মামা! মামাগো! ল্যাও! উঠো। বাঘ মারতে যাবে না?

অম ঃ—ও বাবা! বাবাগো! ও মা! মরে গেলুম!

বন্ধুরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো।

অমিয় ঃ—কী হ'য়েছে মামা?

অম ঃ—কে রে অমিয়? তোর মামীকে বলে দিস্—আমি এই জঙ্গলে দেহ রাখলাম।

পতিত ঃ—সে কি!

অম ঃ—আর সে কি! ও বাবা! ও মা! কত আশা করেছিলাম যে আজ নতুন কায়দায় একটা বাঘ শিকার ক'রে দেখিয়ে দোব তোদের যে বাঘ মারা কাকে বলে। কিন্তু—ও বাবা! মাগো!

● অমরেশের বাঘ স্বীকার
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

ভুবন ঃ—আরে এতো খ্যু—খ্যু—খ্যুব—অসুখ করলো মামার!

পরিতোষের প্রবেশ। পুরো সজ্জিত হয়ে।

পরি ঃ—কী কাণ্ড? তোরা এখনো ক্যাম্পে পা ঘষছিস! যাবি কখন?

অমিয় ঃ—যাবো কি?

পরাণে ঃ—ঐদিকে যে আরারাম তারারাম লেগে গিয়াছে!

পরি ঃ—কী হ'য়েছে?

পতিত ঃ—তাতো বোঝা যাচ্ছে না। এসে দেখছি মামা শুয়ে শুয়ে 'ও বাবা' 'ও মা' করছে!

পরি ঃ—সে কি! কী হয়েছে অমরেশ বাবু! (সাড়া নেই) ও অমরেশ বাবু!

অম ঃ—মা! মাগো! (সুরে) শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারী। কেন মা তোমার এমন বেশ!

পরাণে ঃ—(কেঁদে ফেললো) অমিয় দাদা! মামা গান গাহিছে ক্যানে গো?

পরি ঃ—কী হ'ল মশাই আপনার?

অম ঃ—পেটে দারুণ যন্ত্রণা।

পরি ঃ—পেটে! তাহ'লে তো মশায় জঙ্গলে যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ থাকবেন গাছের ওপর মাচায়। হঠাৎ কেন হ'ল?

অম ঃ—হঠাৎ নয়, ছ' মাস থেকে।

পরিতোষ কী ভাবলো। তারপর বললো—

পরি ঃ—ইস্! সব আপ্‌সেট্ ক'রে দিলেন অমরেশ বাবু! চলহে তোমরা। একলা থাকতে ভয় করবে না তো?

অম ঃ—এত বেদনাতেও হাসালেন। গেঁইয়ার—যাক্‌গে।

ধীরে ধীরে সবাই বেরিয়ে গেল।

পরি ঃ—আর একটা কথা বলে যাই অমরেশ বাবু। জঙ্গলের মধ্যে ক্যাম্প। কিছু বলা যায় না। যদি দেখেন যে বাঘ-টাঘ ঢুকে পড়েছে ক্যাম্পে। হাতের কাছেই লোডেড্ বন্দুক রইলো, তৎক্ষণাৎ গুলি করবেন। ভোরে দেখা হবে। জঙ্গল তো! নেক্‌ড়ে-ফেক্‌ড়ে আসার খুব চান্স।

পরিতোষ চলে যেতেই অমরেশ উঠে বসলো। তারপর নামতে নামতে—বন্দুকটা হাতে নিয়ে বললো—

অম ঃ—ওরে! ইয়ে হয়েছে—এখন যেন অনেকটা ভাল বোধ করছি। চল্। তাহ'লে যাওয়াই যাক্।

দৌড়তে দৌড়তে পিছনে গেল।

—বিরতি—

## তৃতীয় দৃশ্য

[গভীর বন। রাত্রে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, চারপাশে জোনাকী জ্বলছে। চারপাশ অন্ধকার। মঞ্চের ক্রমবর্দ্ধমান আলোতে দর্শককে বোঝাতে হবে যে অন্ধকার চোখে সয়ে যাচ্ছে। দেখা গেল পাশাপাশি দুটো গাছে মাচা বেঁধে বসে আছে—দলশুদ্ধ সবাই। একটা গাছে পরিতোষ, অমরেশ, ভুবন আর একটা গাছে আর সবাই। হঠাৎ বিকট স্বরে কী একটা পাখী ডেকে উঠলো অমরেশ চমকে উঠে চাইলো চারদিকে।]

পরি ঃ—(আস্তে আস্তে) পাখী।

অম ঃ—জোরে বলুন না মশায়! সূক্ষ্ম ক'রে বলছেন কেন? ভাবটা এমন করছেন—যেন নর্ম্ম্যাণ্ডির যুদ্ধক্ষেত্রে এসে বসে আছেন। জোরে কথা বলুন।

পরি ঃ—বলছি ওটা পাখী।

অম ঃ—কী পাখী?

পরি ঃ—জঙ্গুলে পাখী।

অম ঃ—পাখী দেখাবেন না পরিতোষ বাবু। উননব্বুই বচ্ছর শুধু পাখী মেরেছি। বুঝেছেন?

পরি ঃ—আজ্ঞে হ্যাঁ। উননব্বুই।

অম ঃ—হ্যাঁ। ভালুকছানার মতো পাখী কখনো চ্যাঁচায়? এগুলোকে পাখালী বলে।

পরি ঃ—পাখালী?

অম ঃ—হ্যাঁ। একবার সুন্দরবনে গেছি বাঘ শিকার করতে। বসে আছি তো বসেই আছি, বসে আছি তো বসেই আছি, এমন সময়—এই ডাক। অবিকল এই ডাক। সঙ্গে ছিল ক্যানারাম—ব্যাচারাম দুই ভাই। কথা হ'ল—এই পাখালীটাকে কে মারতে পারে? আমি

● অমরেশের বাঘ স্বীকার
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

তখন চোখ বুজে আওয়াজ লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে দিলাম এক রাউণ্ড,—সাঁ—আ—আ—আ—ঝট্‌পট্‌ ঝট্‌পট্—পড়লো এসে একেবারে সামনে। চার হাত লম্বা আড়াই হাত চওড়া মাল। তিন দিন ধরে মাংস খাওয়া গেল।

পরি ঃ—পাখী?

অম ঃ—পাখালী।

পরি ঃ—হ্যাঁ পাখালী। কিন্তু শুনিনিতো কখনো!

অম ঃ—ক'বার জঙ্গলে গেছেন যে পাখালীর কথা শুনবেন! খালি রোয়াবীর কথা! হাজারীবাগের জং—

হঠাৎ বাঘের গর্জ্জন শোনা গেল। কেঁপে উঠলো অমরেশ। পরিতোষ সতর্ক হ'য়ে বললো—

স্—স্—স্—স্—স্। বাঘ।

অম ঃ—কী বাঘ?

পরি ঃ—এখন কথা বলবেন না অমরেশ বাবু!

অম ঃ—কেন?

পরি ঃ—মানুষের গলা শুনলে বাঘ সরে যায়।

অম ঃ—(চেঁচিয়ে) বড্ড বাজে কথা বলেন আপনি। বাঘ! কী বাঘ, কোথায় বাঘ, কেন বাঘ, কিসের বাঘ, এই চারটি প্রশ্নের জবাব না পেলে—এই টঙ্গে উঠে বসে আছি কী জন্যে?

পরি ঃ—অমরেশ বাবু! আপনি চুপ করুন। আপনার পায়ে পড়ি। বাঘ চলে যাবে।

অম ঃ—(আরো চেঁচিয়ে) চলে যাবে তো আমি কী করবো মশায়? মানুষের গলা শুনলে বাঘ সরে যায়, কী কাঠের বাঘ মশায় সেটা?

পরি ঃ—ওঃ! তাই নিয়ম স্যার!

অম ঃ—ফের রোয়াবী? নিয়ম দেখাবেন না পরিতোষ বাবু। তেত্রিশ বছর শুধু নিয়মে চলেছি। আমার কাছে জিনিষটা ক্লিয়ার না করলে—আমি হাজারীবাগে এলুম কেন? গাছে ভুলে এখন ভগবদ্গীতা আওড়াচ্ছেন।

পরি ঃ—হোপলেস্!

অম ঃ—অমিয়!

অমিয় ঃ—(পাশের গাছ থেকে) এখন কথা কয়োনা মামা। রয়্যালটা আসতে আসতে ফিরে গেল!

অম ঃ—কোথায় গেল বল্ তো?

অমিয় ঃ—কী ক'রে বলবো?

অম ঃ—শিখে রাখ। গিন্নীকে লাইফ ইন্সিওরের কথাটা বলতে গেল।

অমিয় ঃ—ও।

অম ঃ—কেন বলতো গেলো—বলতো?

অমিয় ঃ—জানিনা।

অম ঃ—তা জানবি কেন? জানলে জ্ঞান হবে যে। মুখ্যুর ডিম কোথাকার? শুধু শুধু বি-এ টা পাশ করলি? পতিত!

পতিত ঃ—কী মামা?

অম ঃ—তুই জানিস,—গিন্নীকে কেন লাইফ ইন্সিওরের কথা বলতে গেল বাঘটা?

পতিত ঃ—না মামা।

অম ঃ—দড়ি বেঁধে ওই গাছটায় ঝুলে পড়্! গাধা কোথাকার? ভুবন? তুই জানিস্?

ভুবন ঃ—গিন্—গিন্—গিন্—

অম ঃ—ঘাট হয়েছে বাবা। চুপ কর।

পরি ঃ—আরে! আপনি যে গাছের উপর ইস্কুল খুলে দিলেন মশাই। একটু চুপ না করলে—

অম ঃ—চুপ করুন। জঙ্গলও থাকবে—বাঘও থাকবে,—কিন্তু শিক্ষার দিন থাকবে না। এনি বডি? শোন তাহ'লে? বাঘটা আমার গায়ের গন্ধ পেয়েছে। পেয়েই বুঝেছে যে আজ সাক্ষাৎ যম এসেছে বনে। তাই গিন্নীকে বলতে গেল লাইফ ইন্সিওরের কথা।

পরি ঃ—আপনিই পাগল করবেন অমরেশ বাবু? বাঘের আবার লাইফ ইন্সিওর কী মশাই?

অম ঃ—হ্যাঁ মশায়। ক'টা জিনিষ জানেন এ দুনিয়ার? এদেরও এসোসিয়েশন আছে। ইন্সিওর আছে। এদের জঙ্গলের মধ্যে একটা মাংসের ষ্টক আছে! যে যার শিকার থেকে খানিকটা ক'রে মাংস সেখানে রেখে আসে—রুগ্ন জীর্ণ বৃদ্ধ পশুদের জন্য, এটা হ'ল প্রিমিয়াম। প্রিমিয়াম দিতে দিতে বাড়ীর কর্ত্তা যদি হঠাৎ মারা যায়, তবে অন্য পশুরা মিলে তার ফ্যামিলীকে হেল্‌প্ করে। সেই কথাটাই বলতে গেল যে—যদি আর না ফিরি—তবে ইন্সিওরের কর্ত্তাদের খবরটা দিও। একা বাঘিনী

● অমরেশের বাঘ শীকার
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

তো নয়, ছেলেপুলেও আছে তো?

পরি ঃ—আজ্ঞে হ্যাঁ।

অম ঃ—তবে?

আবার বাঘ ডাকলো। অমরেশ পড়তে পড়তে বেঁচে গেল।

অম ঃ—(গর্জ্জন ক'রে) ভুবন!

ভুবন ঃ—(ভড়কে গিয়ে) ম্যা—ম্যা—ম্যা—ম্যা—

অম ঃ—মা নয়, আমি। এই ধারে—সরে এসে বোস্! আমি পড়ে গেলে—পৃথিবীর ক্ষতি হবে। এদিকে আয়!

ভুবন সরে এসে বসলো।

অম ঃ—(খুব জোরে) অমিয়! খুব সাবধান। মাথায় গুলি করবি, বুঝলি?

পরি ঃ—গুলি করতে হবে না অমরেশ বাবু! বাঘ সরে গেছে।

[চুপচাপ]

পরি ঃ—অমরেশ বাবু!

অম ঃ—আজ্ঞে!

পরি ঃ—বলছি, চলুন ক্যাম্পে যাই। কারণ ডাক শুনলেই আপনি যে ভাবে চ্যাঁচাচ্ছেন, তাতে তো আজ আর কোন আশা নেই!

অম ঃ—ভোর রাত্তিরে আশা আছে। আমি যখন কুয়ালালামপুরে উনিশ ফুট বাঘটা মারি—

অমিয় ঃ—কুয়ালালামপুরে তুমি আবার কবে গেলে মামা?

অম ঃ—গিয়েছিলাম একবার।

অমিয় ঃ—কই আমি তো—

অম ঃ—তুই তখনো হোসনি।

অমিয় ঃ—ও।

[চুপচাপ]

হঠাৎ সামনে আলো দেখা গেল। দু' তিনজন মানুষ আসছে দেখা গেল। চীৎকার শোনা গেল—

অ—ম্ রে শ বাবু!

অম ঃ—কী ব্যাপার অমিয়? বাঘ তো আমায় অমরেশ বাবু বলে ডাকবে না। ডাকলে বড় জোর মামা বলতে পারে।

অমিয় ঃ—না—না, কারা যেন আসছে!

আমার ডাক ঃ—অ—ম্—রেশ বাবু—উ—উঃ!

অম ঃ—(চেঁচিয়ে) কে—এ—এ—এ?

পরি ঃ—(ভুবনকে) হ'য়ে গেল আজ।

নেপথ্যে ঃ—আমি প্র্যাক্‌টিক্যালি তোমার মামা পুণ্ডরী—

অম ঃ—খ্যাঁক্ কো। আসুন, আসুন, আস্তে-আজ্ঞা হোক্। ওরে দড়ির মইটা নামিয়ে দে! আমার মামা এসেছেন।

পরি ঃ—আপনার মামা কোন্ মাচায় উঠবেন?

অম ঃ—আমাদেরটায়। অন্য মাচায় দিয়ে তো আমার বিশ্বাস হবে না পরিতোষ বাবু। ভুবন! মইটা নামিয়ে দে!

ভুবন তাড়াতাড়ি দড়ির মইটা নামিয়ে দিলো। পুণ্ডরীকাক্ষ— দুলতে দুলতে উঠে আসছেন। নীচে থেকে দুজন লোক (হ্যারিকেন হাতে) বললো—

নীচের লোক ঃ—আমরা তাহলে এবার যাই স্যার!

পুণ্ডরী ঃ—হ্যাঁ, এস ভাই—এস। প্র্যাক্‌টিক্যালি যা করেছো আজ—আমি কখনো ভুলবো না।

নীচের লোক ঃ—আচ্ছা স্যার—নমস্তে!

লোক দুটি চলে গেল। পুণ্ডরীকাক্ষও উঠে এলেন।

অম ঃ—তুমি এ সময় কোত্থেকে এলে মামা?

পুণ্ডরী ঃ—কী করবো? কলেজে বেরোব, এমন সময় পুঁটলীর চিঠি এল—অমরেশ আর অমিয় দুজনে মিলে হাজারীবাগের জঙ্গলে প্র্যাক্‌টিক্যালি বাঘ শিকার করতে গেছে। তুমি ওদের ফিরিয়ে আনো, মারবার জন্য একটা কেন—দুটো বাঘ আমি কিনে দেব। বাড়ীতে বসে সেটাকে মারুক না!

অম ঃ—বাড়ীতে বসে?

পুণ্ডরী ঃ—হ্যাঁ বাবা।

অম ঃ—যাকগে। বসুন! তাই চলে এলেন!

পুণ্ডরী ঃ—না এসে থাকতে পারি? আমার পুঁটলীর—

অম ঃ—আপনার পুঁটলীর জিনিষ ওই গাছে আছে।

পুণ্ডরী ঃ—বেশ-বেশ। তা' এখানে এখন কী করছো

● অমরেশের বাঘ স্বীকার

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

বাবা তোমরা, মাচা বেঁধে? ছবি-টবি তোলার ব্যাপার বুঝি?

অম ঃ—না। দু' একটা বাঘ মারবো।

পরি ঃ—অমরেশ বাবু—স্ স্ স্ স্! রেডি!

হঠাৎ একটা বাঘ ডেকে উঠলো। পুণ্ডরীকাক্ষকে ভুবন না ধরে ফেললে তিনি পড়ে যেতেন। হঠাৎ মাচার উপরে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে ফেললেন।

পরি ঃ—আরে, করছেন কি মশায়, চুপ করুন। আপনাদের গোলমালের চোটে বাঘটা 'কীলে'র কাছে আসতে পারছে না যে!

অম ঃ—মামা!

পুণ্ডরী ঃ—বাবা! ওরে এযে সাক্ষাৎ যমে ডাকছে। গাছপালা কাঁপছে যে রে। চল্ বাড়ী যাই!

অম ঃ—আসুন, আপনি ঘুমোবেন আসুন। শুয়ে পড়ুন এখানে। এটা বেশ বড় মাচা, বেশ ঘুমোতে পারবেন। নিন্ শুয়ে পড়ুন।

পুণ্ডরীকাক্ষ কোন কথা না বলে শুয়ে পড়লেন।

পরি ঃ—উনি একবারে জঙ্গলে না এসে ক্যাম্পে যেতে পারতেন।

অম ঃ—কী ব্যাপার? আজ খুব চ্যাডাং চ্যাডাং ছাড়ছেন যে! ক্যাম্পে—লোক কে আছে শুনি?

পরি ঃ—না, ওঁরা তো তিনজন ছিলেন। তাই বলছি।

অম ঃ—খুব বাজে কথা বলছেন। মাথা মোটা না হলে এমন কথা কেউ বলে না।

পরিতোষ চুপ ক'রে রইল।

অমিয় ঃ—(ও গাছ থেকে) মামা!

অম ঃ—বলে যা। কাণ আছে।

অমিয় ঃ—সব যে চুপচাপ হ'য়ে গেল গো।

অম ঃ—চিন্তা করছে।

হঠাৎ জঙ্গলের দিকে চেয়ে ভুবন চেঁচিয়ে উঠলো—

ভুবন ঃ—মামা—খ্য—খ্য—খ্য—খ্য—

অম ঃ—(শান্ত গলায়) খরগোস বলতে চাইছিস?

ভুবন ঃ—হ্যাঁ।

অম ঃ—অত নীচে দৃষ্টি দিস্‌নে। নজর উঁচু কর একটু। (একটু থেমে) হ্যাঁরে। তুই কী করতে এসেছিস?

ভুবন ঃ—বা—বা—আগ্ মারতে।

অম ঃ—মারতে হবে না। বাঘ এদিকে এলেই—তুই বলিস এই যে আমি এখানে। ওপরে চেয়ে তোর হাতে বন্দুক দেখলেই—ধপ্ ক'রে মাটিতে পড়বে আর মরবে।

ভুবন ঃ—মো—মো—

অম ঃ—ওরবে।

[চুপচাপ]

পরি ঃ—আজ আর কিছু পাওয়া যাবে না।

অম ঃ—অস্থির হবেন না মশায়। ভগবান পাওয়া আর বাঘ পাওয়া—এক কথা। বাঘকে বাগে পেতেই না দেরী। নইলে ব্যাপারতো সোজা।

ও গাছ থেকে পরাণে ঃ—(চীৎকার) লিলো... লিলো...লিলো...

অম ঃ—কী হ'য়েছে?

অমিয় ঃ—ঘুমের মধ্যে চেঁচাচ্ছে।

পরি ঃ—শিকারে একটা রেকর্ড হ'ল আজ।

অমিয় ঃ—এই! এই পরাণে!

পরাণে ঃ—এ্যাঁঃ! বাঘ কতি?

অমিয় ঃ—তুই চেঁচাচ্ছিস যে ঘুমের মধ্যে।

পরাণে ঃ—আচ্ছা।

একটু পরে নাক ডাকতে লাগল।

পরি ঃ—(আপন মনে) ছি ছি ছি!

অম ঃ—ছি ছি এত্তো জঞ্জাল। আরে মশায় ছট্‌ফট্ করছেন কেন? বাঘটা আসুক আগে।

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

গাছের খুব কাছে..."খ্যি...খ্যি—খ্যি—খ্যিঃ" শব্দে কাদের যেন সমবেত হাসির শব্দ শোনা গেল। ছাগলটা যেন ম্যা ম্যা ক'রে ডাকতে লাগলো। মনে হ'ল সমস্ত বনস্থলী যেন হাসতে আরম্ভ করেছে।

● অমরেশের বাঘ স্বীকার
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

অমরেশের চোখ বড় হ'য়ে উঠেছে। সে চট্‌ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বিরাট বন্দুকটি তুলে লক্ষ্য করলো,—

পরি ঃ—কী করছেন? স্যুট করবে না—ওগুলো হায়েনা! এই দেখ! আরে, দেখা যাচ্ছে না—মারবেন কাকে?

সমস্ত বন কাঁপিয়ে কামানের শব্দের মতো '৪৭৫'-এর শব্দ হ'ল। বিরাট ধাক্কায় অমরেশ গাছ থেকে ছিট্‌কে নীচে পড়ে গেল।

অকস্মাৎ বাঘের গর্জ্জন শোনা গেল।

অমিয় ঃ—(কেঁদে উঠলো) মা—মা গো। পরীমামা। চলুন—তুলে আনি মামাকে!

পরি ঃ—চুপ করুন। একটু না দেখে—

পতিত ঃ—(কেঁদে) এ্যাদ্দিনে অমরেশমামা খোয়া গেল গো! এ জিনিষ আর পাবো না! উঃ!

চুপচাপ। মঞ্চ অন্ধকার হ'য়ে পরিষ্কার হ'ল। গাছ থেকে সবাই নামলো।

দেখা গেল একটা ঝোপের পাশে অমরেশ পড়ে আছে। অমিয় ছুটে গিয়ে ডাকলো।—

অমিয় ঃ—মামা।

অমরেশ উঠে বসলো—

অম ঃ—(গম্ভীর মুখে) কী?

অমিয় ঃ—তুমি যে পড়ে গিয়েছিলে গাছ থেকে বন্দুক ছোঁড়বার সময়?

অম ঃ—কখন?

অমিয় ঃ—কাল রাত্রে।

নেপথ্যে পতিত ঃ—আরে! এ কী কাণ্ড!

পতিত একটা গুলি-খাওয়া হায়েনাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। গুলি লেগে মাথাটা চুরমার হ'য়ে গেছে। সবাই হতভম্ব হ'য়ে একবার অমরেশের দিকে একবার হায়েনার দিকে চাইতে লাগলো।

অমিয় ঃ—তুমি মেরেছ মামা?

অম ঃ—না। পরীমামা মেরেছে ব্রহ্মতেজ দিয়ে।

অমিয় ঃ—কিন্তু মাইরী বলছি,—বন্দুক ছুঁড়তে গিয়ে বাঁটের কুঁদোর ধাক্কায় তুমি মাচা থেকে ছিটকে পড়ে গিয়েছিলে?

অম ঃ—(পরিতোষকে) কী মশায়? আপনারও সেই ধারণা?

পরি ঃ—কী জানি দাদা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

অম ঃ—তা পারবেন কেন? জীবনে বন্দুক ছুঁড়েছেন কখনো? ওই ডাইভ্‌টা ওই রকম। ওকে বলে হাওয়াইয়ান ডাইভ। ওতে দেখায়—শিকারী গাছ থেকে পড়ে গেল—কিন্তু তা নয়।

গট্‌ গট্‌ ক'রে মরা হায়েনটার কাছে এগিয়ে গিয়ে পা দিয়ে তার মাথাটা দেখিয়ে—

তা যে নয় তার প্রমাণ এর মাথায় গুলি লাগা। যে হায়েনাকে আপনি চোখে দেখেননি—তার মাথায় গুলি লাগে কেমন ক'রে?

হুঃ। জীবনে আর কখনো আমার সঙ্গে শিকারে আসার কথা বলবেন না! চল্‌!

জঙ্গলের দিক থেকে পুণ্ডরীকাক্ষ বেরিয়ে এলেন।

তুমি আবার কোথায় গিয়েছিলে?

পুণ্ডরী ঃ—এই একটু ওদিকে—

অম ঃ—বলে গিয়েছিলে আমাকে? যদি রয়্যাল তাড়া করতো?

পুণ্ডরীকাক্ষ কেঁপে উঠে অস্ফুটে বললেন—না। সবাই এগিয়ে গেল। শুধু মাটিতে বোকার মতো পরিতোষ বসে। পতিত কাছে এল।

পতিত ঃ—মামা! বাড়ী চলো! কী হ'ল?

পরি ঃ—আমি সুইসাইড করবো পতিত। কী হ'ল ব্যাপারটা—আমায় বুঝিয়ে বল্‌ তো! আমি একটা নাম করা শিকারী। আমি হলপ ক'রে বলতে পারি—লোকটা ছোঁড়া দূরে থাক্‌—বন্দুক ধরতেও জানে না। হায়েনার ডাকে ভয় পেয়ে বন্দুক ছুঁড়তে গিয়ে ধাক্কা লেগে পড়ে গেছে। অথচ—

পতিত ঃ—ওই ডাঁটটুকুই ওর মূলধন! চলো। এটাকে মিরাকল্‌ বলে মেনে নাও।

পরিতোষের হাত ধরে তাকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে গেল...

---

# মেঘ শিশুদের গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন

—এস, ওয়াজেদ আলি, বি, এ (কেণ্টাব), বার-এট-ল

বাতাসে মায়ের ডাক
ফিরে চল্ ফিরে চল্ ;
ঝড়-হানা আকাশেতে
হেসে বলে মেঘদল !
সাগর মায়ের কোলে ফিরে যাবো আয়
স্নেহভরা মার কোল পাবো না কোথায় ।
ডেকে ওঠে কালো বাজ
বিদ্যুৎ জ্বলে ঐ,
দুলে ওঠে মার বুক
উত্তাল অথই ।
চলে যাই, গলে যাই
মিশে যাই মার সাথে,
টুপ্ টাপ্ টিপ্ টাপ্
রিম্ ঝিম্ ঘন রাতে ॥

---